রিহলাহ ইবনে বতুতা

[ইবনে বতুতার বিশ্বভ্রমণের আদ্যোপান্ত বিবরণ]

১



t.me/BoierSomahar

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক
মাহদি হাসান

ক

৯৮৩ ঈ.।

বাদক, সম্পাদক ও
কে দু' যুগ আগে
ম দেওবন্দ থেকে
স, আরবি সাহিত্য,
সিরুল কুরআনের
রের উদ্দেশে কলম
শক আগে। তখন
কলম বয়ে চলেছে
ও রচনা মিলিয়ে
খ্যা একশো।

জামেয়া মাদানিয়া
ছিলেন। বর্তমানে
তু বানাতিল ইসলাম
যোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

থেকে প্রচুর কালজয়ী
ছন। অনূদিত গ্রন্থের
মাআরিফুল কুরআন,
ইতিহাস বিশ্বকোষ,
র, তাবলীগ সিরিজ,
কুরআনি আরবি শিখুন
গ্র।

জীবন, জ্ঞান ও কর্মে

t.me/BoierSomahar

MAKTABATUL AZHAR
মাকতাবাতুল আযহার
www.maktabatulazhar.com

রিহলাহ ইবনে বতুতা

[বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার বিশ্বভ্রমণের আদ্যোপান্ত বিবরণ]

[১ম খণ্ড]

(تحفة النظار في غرائب
الأمصار وعجائب الأسفار)

t.me/BoierSomahar

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল ফারুক
মাহদী হাসান

মাকতাবাতুল আযহার

t.me/BoierSomahar

অনুবাদকের কথা

১. ইবনে বতুতার বিশ্বভ্রমণ

৭২৫ হিজরিতে বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তার ঐতিহাসিক বিশ্বভ্রমণ শুরু করেন উত্তর মরক্কোর তাঞ্জিয়ার নগরী থেকে। যাকে আরবিতে বলে, তানজা। উদ্দেশ্য, মক্কা নগরীতে এসে হজ আদায় করবেন। সেই যাত্রাপথে তিনি ভ্রমণ করেন উত্তর আফ্রিকা ও মিসরের উঁচু অঞ্চল। এরপর লোহিত সাগর পাড়ি দেন।

এই পথে বিপর্যয় নেমে এলে তিনি পথ বদল করে শামদেশ ও ফিলিস্তিন হয়ে মদীনায় পৌঁছেন। সেখান থেকে যান পবিত্র মক্কা নগরীতে। প্রথম হজ আদায় করে আবারও তিনি বেরিয়ে পড়েন। এবারের যাত্রা ইরাকের উদ্দেশে। এ সময় তিনি মুসেল, দিয়ারে বকর প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করে দ্বিতীয়বারের মতো মক্কা নগরীতে ফিরে আসেন। ৭২৯ হিজরিতে তিনি হজ আদায় করেন।

৭৩০ হিজরিতে তিনি আবারও বেরিয়ে পড়েন। এবারের যাত্রায় তিনি দক্ষিণ আরব, পশ্চিম আফ্রিকা ও পারস্য অঞ্চলের দেশগুলোতে ভ্রমণ করেন। হুরমুজ হয়ে মক্কায় ফিরে মিসর ও শামদেশের পথ ধরে আবারও বেরিয়ে পড়েন। এ সময় তিনি কুসতুনতুনিয়া ভ্রমণ করেন। সেখান থেকে খাওয়ারিজম, বুখারা ও আফগানিস্তান হয়ে হিন্দুস্তানে পৌঁছেন। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে এসে তার ভবঘুরে মন এদেশের মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে পড়ে। এসময় তিনি দিল্লির বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন।

এরপর তিনি চীনের উদ্দেশে রওনা হন। যাত্রাপথে তিনি মালদ্বীপে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। সেখান থেকে আমাদের মাতৃভূমি বাঙলার পথ ধরে যাত্রা শুরু করেন। শেষতক চীনের জাইতুন অঞ্চলে পৌঁছেন। সেখান থেকে সুমাত্রা অঞ্চলের পথ ধরে আরবের উদ্দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শাম ও মিসর হয়ে চতুর্থবারের মতো মক্কা নগরীতে আগমন করেন।

হজ শেষে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলো ভ্রমণ করে ৭৫০ হিজরিতে ফেজ নগরীতে পৌঁছেন। সেখান থেকে গ্রানাডা হয়ে আফ্রিকায় ফিরে আসেন। এরপর ৭৫৪ হিজরিতে তাম্বাকো ও মালি ঘুরে মরক্কোতে ফিরে আসেন।

২. ইবনে বতুতার বিশ্বভ্রমণ

প্রায় ত্রিশ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রায় ইবনে বতুতা তৎকালীন পৃথিবীর প্রায় পুরোটাই নিজ চোখে দেখেছেন। তিনি তার বর্ণনায় সে দেশগুলোর সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছেন। তাদের অর্থনৈতিক জীবনের কোনো আলোচনাই তিনি বাদ দেননি।

১. তিনি তার সফরনামায় পূর্ববর্তী পর্যটকদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন স্থানে ইবনে জুবায়র আন্দালুসির সফরনামার খণ্ডিত অংশ পেশ করেছেন।

২. যাত্রাপথে প্রতিটি নগরীর ভালো-মন্দ তুলে ধরেছেন। আবহাওয়ার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিবরণ পেশ করেছেন। সেখানকার বিচার-সালিশ ব্যবস্থার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি ধর্মচর্চার প্রকৃত চিত্রও তুলে ধরেছেন।

৩. এক নগরী থেকে অন্য নগরীর দূরত্ব ইত্যাদিও তার আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি। কখনো দিন হিসেবে, কখনো ফারলং হিসেবে দূরত্ব জানিয়েছেন।

৪. তিনি তার এই সফরনামায় তৎকালীন বিভিন্ন রাজ্যের শাসক, গভর্নর ও বিচারপতিদের আচার-আচরণ, বদান্যতা-কার্পণ্য, নৈতিকতা ও অসততার সার্বিক চিত্র তুলে ধরেছেন।

৫. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি প্রতিটি নগরীর ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক মর্যাদার বিষয়টিও বাদ দেননি।

যার ফলে ধর্মচর্চা, ইতিহাস, জিওগ্রাফি- সবদিক থেকেই তার এই সফরনামা গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ব মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্যেই দরকারি।

৩. বিচারপতির আসনে ইবনে বতুতা

বিস্ময়কর বিষয় হলো, এই দীর্ঘ বিশ্বভ্রমণের মাঝপথে ইবনে বতুতা দুটি ভিন্ন অঞ্চলের বিচারপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। প্রথমে তিনি সুলতান মুহাম্মাদ উজবেকের আমলে দিল্লির কাজি ছিলেন। এরপর তিনি যখন চীনের উদ্দেশে যাত্রা করেন, তখন প্রায় দেড় বছর মালদ্বীপে অবস্থান করেন। সেখানেও তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

দুঃখজনক বিষয় হলো, ইবনে বতুতা খুব বেশি অপব্যয় করতেন। যার ফলে

t.me/BoierSomahar

তিনি উপার্জিত সম্পদ দেদারছে ব্যয় করতেন। তার এই মন্দ অভ্যাসের জন্যে অনেকেই প্রকাশ্যে উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

৪. আমাদের অনুবাদ

২০২১ সালে মাকতাবাতুল আযহার এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটি অনুবাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইতোপূর্বে আমাদের জানামতে বইটি আরো দু'বার বাংলায় অনূদিত হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো,

১. পূর্বের বইগুলোর অনুবাদ হয়েছে ইংরেজি থেকে। অথচ মূল বইটি আরবিতে রচিত। কোনো অনুবাদকই মূল আরবি বইয়ের সঙ্গে নিজ অনুবাদ মিলিয়ে দেখেননি। যার ফলে বইটির মূল ভাষ্য ক্ষুন্ন হয়েছে বহুলাংশে।

২. পূর্বের দুটো অনুবাদ অবিশ্বাস্যরকম সংক্ষিপ্ত। সর্বসাকুল্যে ৩০০ পৃষ্ঠার মতো। যার ফলে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়েছে। ইবনে বতুতা তার সফরনামার মাঝে প্রতিটি অঞ্চলের ভৌগলিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও সামাজিক যেই বিশদ চিত্র তুলে ধরেছেন, দুঃখজনকভাবে বাংলা অনুবাদে সেসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বাদ পড়েছে।

এজন্যে আমরা মূল আরবি থেকে বইটি অনুবাদের উদ্যোগ নিই। আরবির পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন স্থানে বইটির একাধিক উর্দু অনুবাদকর্ম থেকেও সহায়তা নিয়েছি। মূল আরবি থেকে অনুবাদের ফলে কলেবর এতোটাই বেড়ে গেছে যে, বইটিকে এক খণ্ডে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা, ৫১২ ও দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা, ৩০৪। অর্থাৎ দু খণ্ড মিলিয়ে পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়ালো, ৮১৬।

পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে আমরা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে মূল্যবান তথ্য টীকা আকারে যুক্ত করেছি। স্থানগুলোর নামের ইংরেজি উচ্চারণ যুক্ত করেছি। যা পাঠককে অনেক বেশি ঋদ্ধ করবে, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আমাদের অনুরোধ, বইটির কোথাও কোনো ত্রুটি বা মুদ্রণপ্রমাদ পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানিয়ে দেবার অনুরোধ রইলো।

-আবদুল্লাহ আল ফারুক

t.me/BoierSomahar

সূচি

অনুবাদকের কথা ৫
যাত্রার সূচনা ১৯
তানজা থেকে তিলিমসান ১৯
তিলিমসানে অবতরণ ২০
মিলিয়ানা নগরীতে আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গ লাভ ২১

আলজেরিয়া

বিজায়া নগরী ও মুওয়াহহিদিন রাজবংশের
স্বৈরাচারী নিপীড়ক শাসক ২৩
কন্সট্যাটাইন নগরী ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসক
কর্তৃক আমার কয়েকটি সমস্যার সমাধান ২৫
বোন নগরীতে ২৬

অবশেষে তিউনিসিয়ার মাটিতে

তিউনিসিয়ার বাদশাহ ও স্থানীয় জ্ঞানী-গুণীদের বিবরণ ২৭
জ্ঞানচর্চার প্রাচীন জনপদ সুসাহ নগরীতে ২৯
কাবুস (Gabbs) শহর অভিমুখে ৩০
পশ্চিম ত্রিপোলিতে প্রবেশ ৩১
শ্বশুরের সঙ্গে কলহের জেরে স্ত্রী ত্যাগ ৩২
নতুন বিয়ে ৩২
আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে ৩৩
আলেকজান্দ্রিয়ার ফটক ও সরাইখানা ৩৪
আলেকজান্দ্রিয়া মিনারা ৩৪
আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েকজন বিখ্যাত আলেম ৩৬
কাজি সাহেবের একটি মজার ঘটনা ৩৬
আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েকজন আধ্যাত্মিক বুযুর্গ ৩৮
শায়খ খলিফার কারামত ও স্বপ্নযোগে নবীজির দর্শনলাভ ৩৮
আরো এক বুযুর্গের কারামত, আমার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ৩৯

t.me/BoierSomahar

শায়খ আবুল হাসান শাযেলী রহ.-এর বিস্ময়কর মৃত্যু ৪০
আলেকজান্দ্রিয়ায় খ্রিস্টানদের দাপট ৪১
জনৈক বুযুর্গের কারামত ৪৩
ভ্রমণপিয়াসী মন কতখানে যে আমায় নিয়ে গেল ৪৪
দামনাহুর নগরীতে আগমন ও আমার অনুভূতি ৪৪
সবুজ শ্যামল 'ফাওয়া' নগরীর কোলে ৪৫
শায়খ মুরশিদির বিস্ময়কর কারামত ৪৬
কায়রোর পথে যাত্রা ৪৮
প্রাচীন নগরী 'আবয়ার' ও সেখানকার বিস্ময়কর প্রথা ৪৮
মাহাল্লাতুল কাবিরার একটি খানকায় কিছুক্ষণ ৫০
দিময়াত নগরীতে ৫১
তায়েফা ও কলন্দরিয়া নগরীতে ৫২
ফারাসকুর নগরীতে ৫৫
সামান্নুদ নগরীতে ৫৬

কায়রো নগরীতে

আমর ইবনুল আস মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল ও খানকা ৫৮
খানকায় কোনো নতুন আগন্তুক এলে ৫৯
মিসরের বিখ্যাত কবরস্থান ৬০
হুসাইন রা.-এর মাজার ৬১
নাফিসা বিনতে যায়দ বিন আলী বিন হুসাইন রা.-এর মাজার ৬১
ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাজারের চিত্র ৬১
আরো কিছু উলামা ও বুযুর্গানে দীনের মাজার ৬১
বিখ্যাত নীলনদ ৬২
নীলনদের সমতুল্য ভারতীয় নদী ৬৪
ঐতিহাসিক পিরামিড ৬৪
মিসরের তৎকালীন সম্রাট ৬৬
রাজন্যবর্গ ও একটি যুদ্ধবাজ জাতি ৬৭
তখনকার মিসরের কজন শীর্ষ বিচারপতি ৬৯
হানাফী ও মালেকী বিচারপতির মনোমালিন্য ৫৮
শীর্ষ উলামা ও দীনি ব্যক্তিত্ব ৭০
মাহমাল দিবসের ঐতিহাসিক উৎসব ৭১
কায়রো থেকে আসয়ুত : নতুন পথের যাত্রা ৭৩

t.me/BoierSomahar

শায়খ আবুল হাসান শাযেলী রহ.-এর বিস্ময়কর মৃত্যু ৪০
আলেকজান্দ্রিয়ায় খ্রিস্টানদের দাপট ৪১
জনৈক বুযুর্গের কারামত ৪৩
ভ্রমণপিয়াসী মন কতখানে যে আমায় নিয়ে গেল ৪৪
দামনাহুর নগরীতে আগমন ও আমার অনুভূতি ৪৪
সবুজ শ্যামল 'ফাওয়া' নগরীর কোলে ৪৫
শায়খ মুরশিদির বিস্ময়কর কারামত ৪৬
কায়রোর পথে যাত্রা ৪৮
প্রাচীন নগরী 'আবয়ার' ও সেখানকার বিস্ময়কর প্রথা ৪৮
মাহাল্লাতুল কাবিরার একটি খানকায় কিছুক্ষণ ৫০
দিময়াত নগরীতে ৫১
তায়েফা ও কলন্দরিয়া নগরীতে ৫২
ফারাসকুর নগরীতে ৫৫
সামান্নুদ নগরীতে ৫৬

কায়রো নগরীতে

আমর ইবনুল আস মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল ও খানকা ৫৮
খানকায় কোনো নতুন আগন্তুক এলে ৫৯
মিসরের বিখ্যাত কবরস্থান ৬০
হুসাইন রা.-এর মাজার ৬১
নাফিসা বিনতে যায়দ বিন আলী বিন হুসাইন রা.-এর মাজার ৬১
ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাজারের চিত্র ৬১
আরো কিছু উলামা ও বুযুর্গানে দীনের মাজার ৬১
বিখ্যাত নীলনদ ৬২
নীলনদের সমতুল্য ভারতীয় নদী ৬৪
ঐতিহাসিক পিরামিড ৬৪
মিসরের তৎকালীন সম্রাট ৬৬
রাজন্যবর্গ ও একটি যুদ্ধবাজ জাতি ৬৭
তখনকার মিসরের কজন শীর্ষ বিচারপতি ৬৯
হানাফী ও মালেকী বিচারপতির মনোমালিন্য ৫৮
শীর্ষ উলামা ও দীনি ব্যক্তিত্ব ৭০
মাহমাল দিবসের ঐতিহাসিক উৎসব ৭১
কায়রো থেকে আসয়ুত : নতুন পথের যাত্রা ৭৩

পথিমধ্যে যেসব ছোট-বড় নগরী দেখেছি ৭৩
মিসরের গভর্নর পদে খলিকার ক্রীতদাসকে নিয়োগ ৭৪
দরিদ্র হয়েও কবির জন্যে মূল্যবান উপহার ৭৫
খুসাইবের করুণ পরিণতি ও খলিফার অনুশোচনা ৭৬
নগ্ন গোসলের অপসংস্কৃতি ৭৭
হিজাযের পথে বিচিত্র শহর ও গ্রামে ৭৮
মানফালুত নগরীর বিস্ময়কর ঘটনা ৭৮
আসয়ুত নগরীতে ৭৯
আসয়ুত থেকে লোহিত সাগরের পথ ধরে
ঐতিহ্যের জনপদ শামদেশের উদ্দেশে ৮০
'হুওয়া' নগরীর বিদ্যাপীঠ ও সংস্কৃতি ৮১
জনৈক বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ ৮১
আকসুর নগরীতে পদার্পণ ও পরিদর্শন ৮২
আসনা ও উদফু নগরীতে ৮৩
আইযাব নগরীতে ৮৩
সালিহিয়্যা নগরীতে ৮৫
শুল্কঘর ও কাস্টমস সিস্টেম ৮৫

শামদেশে

গাজা নগরীতে ৮৮
দিয়ারে খলিল ৮৮
মসজিদের ভুগর্ভস্থ গুহা ও নবী-রাসূলদের কবরস্থান ৮৯
হযরত ইবরাহিম আ.-এর কবর ৮৯
হযরত ইউসুফ ও লুত আ.-এর কবর ৯০
ফাতেমা বিনতে হুসাইন রহ. এর কবর ৯১
বাইতুল মাকদিস, বেথেলহেম ও ইউনুস আ.-এর মাজারে ৯২
পৃথিবীর বৃহত্তম উপাসনালয় : আল মাসজিদুল মুকাদ্দাস ৯৩
কুব্বাতুস সখরা ৯৩
কুদসের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান ৯৪
কুদস অঞ্চলের শীর্ষ গুণীজন ৯৫
আসকালান নগরীতে ৯৫
অতীতের বিস্মৃত অধ্যায় ৯৬
ফিলিস্তিনের মাটিতে ৯৮

T.me/BoierSomahar

পথিমধ্যে যেসব ছোট-বড় নগরী দেখেছি ৭৩
মিসরের গভর্নর পদে খলিকার ক্রীতদাসকে নিয়োগ ৭৪
দরিদ্র হয়েও কবির জন্যে মূল্যবান উপহার ৭৫
খুসাইবের করুণ পরিণতি ও খলিফার অনুশোচনা ৭৬
নগ্ন গোসলের অপসংস্কৃতি ৭৭
হিজাযের পথে বিচিত্র শহর ও গ্রামে ৭৮
মানফালুত নগরীর বিস্ময়কর ঘটনা ৭৮
আসয়ুত নগরীতে ৭৯
আসয়ুত থেকে লোহিত সাগরের পথ ধরে
ঐতিহ্যের জনপদ শামদেশের উদ্দেশে ৮০
'হুওয়া' নগরীর বিদ্যাপীঠ ও সংস্কৃতি ৮১
জনৈক বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ ৮১
আকসুর নগরীতে পদার্পণ ও পরিদর্শন ৮২
আসনা ও উদফু নগরীতে ৮৩
আইযাব নগরীতে ৮৩
সালিহিয়্যা নগরীতে ৮৫
শুল্কঘর ও কাস্টমস সিস্টেম ৮৫

শামদেশে

গাজা নগরীতে ৮৮
দিয়ারে খলিল ৮৮
মসজিদের ভুগর্ভস্থ গুহা ও নবী-রাসূলদের কবরস্থান ৮৯
হযরত ইবরাহিম আ.-এর কবর ৮৯
হযরত ইউসুফ ও লুত আ.-এর কবর ৯০
ফাতেমা বিনতে হুসাইন রহ. এর কবর ৯১
বাইতুল মাকদিস, বেথেলহেম ও ইউনুস আ.-এর মাজারে ৯২
পৃথিবীর বৃহত্তম উপাসনালয় : আল মাসজিদুল মুকাদ্দাস ৯৩
কুব্বাতুস সখরা ৯৩
কুদসের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান ৯৪
কুদস অঞ্চলের শীর্ষ গুণীজন ৯৫
আসকালান নগরীতে ৯৫
অতীতের বিস্মৃত অধ্যায় ৯৬
ফিলিস্তিনের মাটিতে ৯৮

নাবলুস নগরীতে ৯৮
আজালুন নগরীতে ৯৮
আক্কা নগরীতে ৯৯
টায়ার নগরীতে ৯৯
সিডোন ও তাবারিয়া নগরীতে ১০১
ঐতিহ্যের জনপদ বৈরুতে ১০২
আবু ইয়াকুব ইউসুফের জীবনকাহিনি ১০২
ঐতিহ্যের জনপদ ত্রিপোলিতে ১০৫
ত্রিপোলির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ১০৬
কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসনুল আকরাদে ১০৬

ঐতিহাসিক জনপদ হিমস নগরীতে

হামা : হিমসের ভুস্বর্গ ১০৭
আবুল উলা মুআররির স্মৃতি বিজড়িত মুআররা নগরীতে ১০৮
সারমিন নগরীতে ১০৮

আলেপ্পো নগরীতে

আলেপ্পোর ঐতিহাসিক কেল্লা ১১১
আলেপ্পোর দোকানপাট, মাদরাসা, চিকিৎসালয় ও জামে মসজিদ ১১২
আলেপ্পোর বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য ও কল্যাণ ১১২
আলেপ্পোর শাসক ও বিচারক ১১৩
আলেপ্পো থেকে জাবালা অভিমুখে ১১৫
আন্তাকিয়া নগরীতে ১১৫
অজেয় কেল্লার পরিদর্শনে ১১৬
সাহয়ুন নামের ভূস্বর্গে ১১৮
একের পর এক নগরীতে ১১৮
কারাসিঙ্গুরের সংগ্রামী জীবন ১১৯
আত্মহত্যার মাধ্যমে সংগ্রামী জীবনের অবসান ১২১
নতুন জনপদ জাবালায় ১২২
ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ.-এর মাজার পরিদর্শন ১২২
সুলতানের শর্ত ১২৩
প্রাচীন জনপদ লাযিকিয়া নগরীতে ১২৬
নাস্তিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ১২৬
যুগের পালাবদল ১২৭

ফারুস গির্জা ১২৮
আকরা' অঞ্চলে ১২৮
লেবানন ও বা'লাবাক্কুর পর্বতমালা ১২৯
একটি বিস্ময়কর ঘটনা ১২৯
বা'লাবাক্কুর পথে ১৩০

প্রাচ্যের স্বর্গ দামেস্ক নগরীতে

দামেস্কের ইবনে উমাইয়া জামে মসজিদ ১৩৪
আয়েশা গম্বুজ ও যাইনুল আবিদিন গম্বুজ ১৩৬
মাশহাদে আলী বিন আবি তালিব ১৩৬
সাইয়িদুনা উসমান রা.-এর মুসহাফ ১৩৭
মসজিদের দৃষ্টিনন্দন মিনার ১৩৭
সাইয়িদুনা যাকারিয়া আ.-এর মাজার ১৩৮
দামেস্ক মসজিদের বৈশিষ্ট্য, বরকত ও ফযিলত ১৩৮
মসজিদের ফটক ও খালিদ রা.-এর পতাকা ১৩৯
দ্বিতীয় দরজা ১৪০
ঘড়িবিশিষ্ট ফটক ১৪১
দামেস্ক জামে মসজিদের তৃতীয় ফটক ১৪১
চতুর্থ ফটক ১৪২
দামেস্ক জামে মসজিদে কর্মরত ইমামগণ ১৪২
ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের ইমামদের নামায পরিচালনার পদ্ধতি ১৪৩
মাদরাসা, শিক্ষকমণ্ডলী ও পাঠদান পদ্ধতি ১৪৪
ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর কিছু বিতর্কিত ইজতিহাদ ১৪৬
দামেস্কের উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১৪৭
দামেস্কের মাটিতে হানাফি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১৪৮
দামেস্কের রাজফটক ১৪৮
কিছু উল্লেখযোগ্য কবরস্থান ১৫০
আরো কিছু ঐতিহাসিক কবর ও স্থাপনা ১৫১
মসজিদের কল্যাণে মহামারি দূর হলো ১৫২
দামেস্কের সাদা মিনার ১৫৩
ইবরাহিম আ.-এর স্মৃতি বিজড়িত পাহাড় ১৫৩
হাবিল-কাবিলের স্মৃতি বিজড়িত রক্তের গুহা ১৫৪
আদম আ.-এর স্মৃতি বিজড়িত গুহা ১৫৪

সাইয়েদুনা ঈসা ও মারইয়াম আ.-এর স্মৃতি বিজড়িত টিলা ১৫৫
ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব আজরের স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম ১৫৭
জনকল্যাণমূলক খাতের জন্যে অঢেল ওয়াকফ সম্পত্তি ১৫৭
আমি নিজ চোখে দেখেছি ১৫৮
দামেস্কবাসীর অনুপম আতিথেয়তা ১৫৮
দামেস্কবাসী একাকী ইফতার করে না ১৫৯
দামেস্কবাসীর আরো কিছু উল্লেখযোগ্য গুণাবলি ১৬০
দামেস্কবাসীর ধর্মচর্চা ১৬১
জানাযার খাটিয়ার সঙ্গে যাত্রা ও কুরআন তেলাওয়াত ১৬১
দামেস্কে এসে হাদীস অধ্যয়ন ১৬৩

হিজায

হৃদয়তীর্থ মদিনার পানে ১৬৫
নবীজির স্মৃতিবিজড়িত বুসরা নগরীতে ১৬৫
বিপদগ্রস্থ রাজাদের আশ্রয়স্থল কারাক কেল্লায় ১৬৬
সাওয়ানের বিপদসংকুল জঙ্গলে ১৬৭
ঐতিহাসিক তাবুক নগরীতে ১৬৮
আল্লাহর গজবে ধ্বংস হলো একটি উন্নত গোষ্ঠী ১৭০

মদিনা মুনাওয়ারা ও হারাম শরিফে

মসজিদে নববী ও নবীজির রওযা ১৭১
আবু বকর ও উমর রা.-এর বাড়ি ১৭২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিবিজড়িত মিম্বার ১৭৫
বর্তমানে যা মসজিদে নববীর খতিবের দায়িত্ব পালন করছেন ১৭৬
মসজিদের নববীর মুয়াযযিন ও খাদেম ১৭৬
মসজিদের নববীতে যে সকল বুযুর্গ ও জ্ঞানতাপস বাস করতেন ১৭৭
মদিনার গভর্নর চাচাকে হত্যা করে রক্ত দিয়ে অযু করেছিল ১৭৮
মদিনার বাইরের এলাকা ১৭৮
কুবা নগরী ১৮০
মদিনা থেকে মক্কা অভিমুখে ১৮৩
সম্মানিত মক্কা শহরের বিবরণ ১৮৮
মাসজিদুল হারামের বিবরণ ১৮৯
পবিত্র কাবাঘরের বিবরণ ১৯০
বরকতময় মিযাবের বিবরণ ১৯২

হাজরে আসওয়াদের বিবরণ ১৯৬
পবিত্র মাকামে ইবরাহিমের বিবরণ ১৯৮
হিজর ও মাতাফের (তাওয়াফের স্থান) বিবরণ ১৯৪
জমজম কূপের বিবরণ ১৯৭
মাসজিদুল হারামের ফটক এবং পার্শ্ববর্তী
ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহের বিবরণ ১৯৬
সাফা ও মারওয়ার বিবরণ ১৯৯
ঐতিহাসিক গোরস্থানের বিবরণ ২০০
মক্কার বাইরের কিছু ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ ২০০
মক্কাকে বেষ্টন করে রাখা পাহাড়গুলোর বিবরণ ২০১
একটি ঘটনা ২০৫
মক্কার দুই আমিরের বিবরণ ২০৬
মক্কার মানুষ ও তাদের মহত্বের কথা ২০৭
মক্কার বিচারক, খতিব, হজের মোসুমের ইমাম, আলেম
ও বুযুর্গদের বিবরণ ২০৮
একটি বরকতময় ঘটনা ২০৯
আরেকটি ঘটনা ২১১
মক্কায় আশ্রয় নেওয়া উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যক্তি ২১২
একটি আশ্চর্য ঘটনা ২১৪
মক্কায় আশ্রয় নেওয়া আরো কজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ২১৪
একটি ঘটনা ২১৪
তার ঘটনা ২১৯
নামায ও ইমামদের স্থানের ক্ষেত্রে মক্কাবাসীর নিয়ম-রীতি ২২১
জুমার নামায ও খুতবার ক্ষেত্রে তাদের রীতি ২২১
তাদের নতুন চাঁদ দেখার নিয়ম ২২৩
রজব মাসে তাদের প্রথা ২২৩
রজব মাসের উমরার বিবরণ ২২৪
শাবানের পনেরো তারিখের রাতে তাদের প্রথা ২২৭
মহিমান্বিত রমযান মাসে তাদের প্রথা ২২৭
শাওয়াল মাসে তাদের প্রথা ২২৯
কাবার ইহরাম ২৩০
হজের বিধান ও কার্যক্রম ২৩১

কাবার গিলাফ পরিবর্তন ২৩৪
মক্কা থেকে কুফা অভিমুখে ২৩৫

দক্ষিণ পারস্য ও ইরাক অঞ্চল

নাজাফের সমাধি ও কবরসমূহের বিবরণ ২৪১
নকিবুল আশরাফের বিবরণ ২৪৪
একটি ঘটনা ২৪৪
দক্ষিণ পারস্য এবং ইরাক ২৪৮
ওয়াসিত শহর ২৪৯
একটি ঘটনা ২৫২
বসরা শহর ২৫২
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ২৫৪
বসরার বরকতময় সমাধিসমূহের বিবরণ ২৫৫
একটি ঘটনা ২৬২
ইজাজ ও তুসতার শহরের শাসকের কথা ২৬৪
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ২৬৫
শিক্ষনীয় ঘটনা ২৬৭
শায়খ কুতুবুদ্দিনের উদারতা ২৭২
শায়খ মাজদুদ্দিনের আশ্চর্য কারামতের একটি ঘটনা ২৭৬
সিরাজের সুলতানের বিবরণ ২৮০
একটি ঘটনা ২৮৪
অনুরূপ একটি ঘটনা ২৮৫
অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ২৮৫
সিরাজের কিছু স্থাপনার বিবরণ ২৮৬
এই শায়খের কারামত ২৮৭
একটি ঘটনা ২৯০
তাদের জনৈক বুযুর্গের উদারতা ২৯১
কুফা শহরের বিবরণ ২৯৩
বাগদাদ শহরের বিবরণ ২৯৭
বাগদাদের পশ্চিমপ্রান্তের বিবরণ ৩০০
বাগদাদের পূর্বপ্রান্তের বিবরণ ৩০০
বাগদাদে খলিফা, আলেম ও বুযুর্গদের কবরের বিবরণ ৩০২
দুই ইরাক ও খোরাসানের সুলতানের বিবরণ ৩০৩

সুলতান আবু সাঈদের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখলকারীদের বিবরণ ৩০৭
মসুল শহরের বিবরণ ৩১২
কতইনা অদ্ভূত এই নাসিবিন ৩১৬
আমাদের অবস্থানের সময়ে মারদিনের সুলতানের বিবরণ ৩১৭
একটি ঘটনা ৩১৮

দক্ষিণ আরব, পূর্ব আফ্রিকা ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল

একটি বিস্ময়কর ঘটনা ৩২৩
সমুদ্রবক্ষে একটি ঘটনা ৩২৪
স্থানীয় সুলতানের বিবরণ ৩২৬
হালি-র সুলতানের বিবরণ ৩২৭
তার কারামত ৩২৯
ইয়েমেনের সুলতানের বিবরণ ৩৩১
একটি ঘটনা ৩৩৪
মোগাদিসুর সুলতানের বিবরণ ৩৩৬
কুলওয়ার সুলতানের বিবরণ ৩৪১
বদান্যতার ঘটনা ৩৪১
পানের বিবরণ ৩৪৬
নারিকেলের বিবরণ ৩৪৭
জাফারের সুলতানের বিবরণ ৩৪৯
এই পাহাড়ে পাওয়া আল্লাহর একজন ওলির কথা ৩৫১
একটি আশ্চর্য ঘটনা ৩৫২
ওমানের সুলতানের বিবরণ ৩৫৭
একটি ঘটনা ৩৫৭
হুরমুজের সুলতানের বিবরণ ৩৫৯
জামালুল লুকের ঘটনা ৩৬২
লার শহরের সুলতানের বিবরণ ৩৬৩
মুক্তোর খনির বিবরণ ৩৬৪
একটি ঘটনা ৩৬৭

এশিয়া মাইনর

আল আলায়া শহরের সুলতানের বিবরণ ৩৭১
আখিয়্যাতুল ফিতইয়ান (যুবক ভাইদের) কথা ৩৭২
আনাতোলিয়ার সুলতানের বিবরণ ৩৭৪

আকরিদুরের সুলতানের বিবরণ ৩৭৫
কুলহিসারের সুলতানের বিবরণ ৩৭৭
লাজিকের সুলতানের বিবরণ ৩৭৯
মিলাসের সুলতানের বিবরণ ৩৮১
একটি ঘটনা ৩৮২
লারান্দার সুলতানের বিবরণ ৩৮৩
বিরগির সুলতানের বিবরণ ৩৯০
একটি ঘটনা ৩৯৩
আরেকটি ঘটনা ৩৯৪
ম্যাগনেশিয়ার সুলতানের বিবরণ ৩৯৭
বারগামার সুলতানের বিবরণ ৩৯৯
বালিকেসিরের সুলতানের বিবরণ ৩৯৯
একটি ঘটনা ৪০০
বুরসার সুলতানের বিবরণ ৪০১
একটি ঘটনা ৪০৭
কারদিবুলির সুলতানের বিবরণ ৪১০
কাসতামুনিয়ার সুলতানের বিবরণ ৪১২
একটি ঘটনা ৪১৬
আরেকটি ঘটনা ৪১৯
এই অঞ্চলের প্রধান যানবাহন মালগাড়ির বিবরণ ৪২১
মহান সুলতান মুহাম্মাদ উজবেক খানের বিবরণ ৪৩০
সুলতানের স্ত্রীগণ ও তাদের আয়োজন ৪৩২
প্রধান স্ত্রী বা সুলতানার বিবরণ ৪৩৪
দ্বিতীয় স্ত্রীর বিবরণ ৪৩৫
তৃতীয় স্ত্রীর বিবরণ ৪৩৫
চতুর্থ স্ত্রীর বিবরণ ৪৩৬
সুলতান উজবেকের কন্যার বিবরণ ৪৩৭
সুলতানের দুই পুত্রের বিবরণ ৪৩৭
বুলগার শহরের উদ্দেশে আমার সফর ৪৩৮
অন্ধকারের ভূখণ্ডের বিবরণ ৪৩৮
তাদের ঈদ আয়োজনের বিবরণ ৪৪০
কুসতুনতিনিয়ার (কনস্ট্যান্টিনোপল) উদ্দেশে সফর ৪৪৫

কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের বিবরণ ৪৫১
কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) শহরের বিবরণ ৪৫৪
কেন্দ্রীয় বিশাল গির্জার বিবরণ ৪৫৬
কনস্টান্টিনোপলের মনাস্টারিগুলোর বিবরণ ৪৫৭
সন্ন্যাসী বনে যাওয়া সম্রাট জিরজিসের বিবরণ ৪৫৯
কনস্টান্টিনোপলের বিচারকের বিবরণ ৪৬০
কনস্টান্টিনোপল থেকে ফিরতি যাত্রা ৪৬০
তার একটি কারামত ৪৬৩

তুর্কিস্তান ও খোরাসান

খাওয়ারিজমের গভর্নর ৪৬৯
বিচারক আবু হাফস ও গভর্নর কাতলুদুমুরের বদান্যতা ৪৭১
একটি ঘটনা ৪৭২
খাওয়ারিজমের সুস্বাদু তরমুজ ৪৭২
একটি ঘটনা ৪৭৩
তাতারদের পূর্বপুরুষ এবং তাদের হাতে বুখারাসহ
অন্যান্য অঞ্চলের ধ্বংসযজ্ঞ ৪৭৬
মাওরায়ান্নাহার অঞ্চলের সুলতানের বিবরণ ৪৮১
একটি ঘটনা ৪৮১
একটি ঘটনা ৪৮১
একটি ঘটনা ৪৮৩
একটি ঘটনা ৪৯৩
একটি ঘটনা ৪৯৬
হেরাতের সুলতানের বিবরণ ৪৯৮
রাফেযিদের ঘটনা ৪৯৮
একটি ঘটনা ৫০১
ফকিহ নিজামুদ্দিনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ৫০২
শায়খ শিহাবুদ্দিন আল জামির ঘটনা ৫০৪
তার একটি কারামত ৫০৭

যাত্রার সূচনা

তানজা[১] থেকে তিলিমসান[২]

তানজা হলো আমার জন্মভূমি। এখানেই আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ৭২৫ হিজরির ২রা রজব বৃহস্পতিবার আমি এখান থেকে যাত্রা শুরু করি। আল্লাহর ঘরের হজ ও তাঁর প্রেমাস্পদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমি বেরিয়ে পড়ি।

সেটি ছিল একাকী নিঃসঙ্গ যাত্রা। আমার সঙ্গে কোনো সহযাত্রী বা সফরসঙ্গী ছিল না। রুক্ষ যাত্রাপথে সঙ্গ দেওয়ার মতো কিংবা নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে হাস্য-কৌতুক করার মতো কেউ ছিল না।

যাত্রা শুরু করাটাই আমার জন্যে ছিল একটি কঠিন সিদ্ধান্ত। তারপরও আমি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের বিচ্ছেদবেদনা সহ্য করতে রাজি হয়ে যাই। কারণ, আমার হৃদয়ে ছিল বিশ্বসফরের দুর্নিবার বাসনা। একটি চড়ুই পাখি যেভাবে তার বাসা থেকে উড়াল দেয়, আমি ঠিক সেভাবেই যাত্রা শুরু করি। যদিও তখন আমার বাবা-মা দুজনই জীবিত ছিলেন। আমাকে তাদের বিচ্ছেদবেদনাও হাসিমুখে সয়ে নিতে হয়েছিল। আমি যখন রাস্তায় পা রাখি, তখন আমি ছিলাম ২২ বছরে প্রাণোচ্ছল যুবক।

ইবনে জুযাই[১] বলেন, আমাকে আবু আবদুল্লাহ ইবনে বতুতা গ্রানাডায়

---

১. ইংরেজিতে এর উচ্চারণ হলো, Tangier (তাঞ্জিয়ার)। এটি উত্তর মরক্কোর একটি এলাকা। জিব্রাল্টার প্রণালীর একটি ছোট উপসাগরের তীরে অবস্থিত সমুদ্রবন্দর। যা তৎকালীন আন্দালুসের শাসনাধীন ছিল। এখানেই ইবনে বতুতার মাজার রয়েছে। বলা যায়, এই তানযাহ শহরটি পৃথিবীর অনেক উত্থান-পতনের ইতিহাসের নীরব সাক্ষী।–অনুবাদক

২. ইংরেজিতে এর উচ্চারণ হলো, Tlemcen (তিলিমসান)। উত্তর-পশ্চিম আলজেরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। প্রাদেশিক রাজধানী। সমুদ্রতল থেকে যার উচ্চতা ৮১৫ মিটার। রাজধানী থেকে এ নগরীর দূরত্ব ৫২০ কিলোমিটার। পূর্বে এ নগরীর ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকলেও নবম ঈসায়ি শতাব্দীতে তিলিমসান নাম লাভ করে। মুসলিম আন্দালুসের ইতিহাসের সঙ্গে এ নগরীর ঐতিহ্যের গভীর সংযোগ ছিল। এখনো সেখানে মুসলমানদের সোনালি যুগের অনেক ঐতিহাসিক দৃষ্টিনন্দন ও কারুকার্যখচিত স্থাপনা রয়েছে। জর্জ মার্কাইস এ নগরীর উপাধি দিয়েছেন, 'পশ্চিম আলজেরিয়ার অমূল্য রত্ন'।–অনুবাদক

জানিয়েছিলেন যে, তার জন্মস্থান হলো তানজা। সেখানে তিনি ১৭ রজব ৭০৩ হিজরি রোজ সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।

ইবনে বতুতা বলেন, আমি যখন যাত্রার পরিকল্পনা করি, তখন আমাদের শাসক ছিলেন আমিরুল মুমিনিন আবু ইউসুফ বিন আবদুল হক। ব্যক্তিজীবনে তিনি অত্যন্ত ধর্মানুরাগী ও সত্য পথের সৈনিক। পাশাপাশি তিনি একজন দয়াবান দানবীর শাসক। তার দানশীলতার সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার সুশাসনের কারণে গোটা দেশে পরম শান্তি ও স্বস্তির আবহ ছড়িয়ে পড়েছিল। জনগণ নিরাপত্তা ও সুশাসনের ছায়াতলে পরম তৃপ্তিময় জীবনযাপন করছিল। মহান সেই শাসকের ন্যায়পরায়ণতা ও সুনিপুণ রাজ্য পরিচালনার সুখ্যাতি বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছিল। যার শক্ত হাতের রাজ্য পরিচালনা দেশ থেকে শিরকের মূলোৎপাটন করেছিল। কোথাও কুফরির আগুন দেখা যেত না। ক্রুশপূজারীদেরকে তিনি পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তার পিতৃপুরুষদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিবাসী করুন। ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন। কেয়ামত প্রজন্ম তার বংশধরদেরকে এভাবে দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করার তাওফিক দান করুন।

তিলিমসানে[২] অবতরণ

তানজা থেকে যাত্রা শুরু করে সর্বপ্রথম আমি তিলিমসান নগরীতে এসে হাজির হই। সেসময় সেখানকার শাসক ছিলেন আবু তাশফিন আবদুর রহমান বিন মুসা বিন উসমান বিন ইয়াগমার আসান বিন যাইয়্যান।

তিলিমসানে আফ্রিকার শাসক সুলতান আবু ইয়াহইয়ার দুজন রাষ্ট্রদূত –আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবি বকর বিন আলী বিন ইবরাহিম নাফযায়ি ও

---

১. ইবনে জুযাইয়ের পুরো নাম, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমদ বিন জুযাই আল কালবি (১৩২১-১৩৫৭ ই.)। তিনি ছিলেন আন্দালুসের একাধারে একজন পণ্ডিত, কবি, ইতিহাসবিদ ও আইন বিষয়ক লেখক। ইবনে বতুতার ভ্রমণকাহিনিকে লিখিত রূপ দেওয়ার মাধ্যমে তিনি সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন। ৬৯৩ হিজরির রবিউস সানি মাসে আন্দালুসের রাজধানী গ্রানাডায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা আবুল কাসিম ৭৪১ হিজরির জুমাদাল উলার শুরুতে রিও সালাডোর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। ১৩৫২-৫৫ ই. সালের মধ্যে তিনি ইবনে বতুতার ভ্রমণকাহিনি রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। এর দু বছর পর ১৩৫৭ সালে ফেজ নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। –অনুবাদক

২. মু'জামুল বুলদানের মাঝে এই উচ্চারণই দেওয়া হয়েছে। –অনুবাদক

মহান মনীষী আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন বিন আবদুল্লাহ কুরাশি যুবাইদি–এর সঙ্গে ঘটে। এ দুজন মাহাত্ম্য তিউনিস শহরের কাজির পদে সমাসীন ছিলেন। বিশেষত দ্বিতীয়োক্ত জন ছিলেন তার সমকালের অন্যতম সর্বজন স্বীকৃত জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান। তিনি ৭৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

যেদিন আমি তিলিমসান নগরীতে পৌঁছি সেদিন ওই দুজন রাষ্ট্রদূতও সেখান থেকে রওনা হন। আমার বন্ধুগণ আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, আমি যেন তাদের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি। দোটানার শিকার হয়ে আমি তখন আল্লাহর কাছে ইস্তেখারা করি। অবশেষে কিছু প্রয়োজন নিষ্পন্ন করার জন্যে আমাকে আরো তিন দিন তিলিমসান নগরীতে অবস্থান করতে হয়। এরপর আমি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

মিলিয়ানা[১] নগরীতে আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গ লাভ

এর মাত্র কয়েকদিন পরেই মিলিয়ানা নগরীতে হাজির হই। সেখানে আফ্রিকার সুলতানের সেই দুই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটে। সময়টি ছিল প্রচণ্ড গরমের মৌসুম। গ্রীষ্মের তাপদাহ সইতে না পেরে দুজন রাষ্ট্রদূতই অসুস্থ হয়ে পড়েন। যার কারণে আমাদেরকে অতিরিক্ত ১০ দিন সেখানে অবস্থান করতে হয়।

যাত্রা শুরু করার পর কিছুদিন যেতেই কাজি আবু বকর সাহেব পুনরায় প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। মিলিয়ানা থেকে অল্প কয়েক মাইল দূরের একটি জনপদে আমাদেরকে যাত্রা বিরতি করতে হয়। দুঃখজনক হলো, সেখানে যাত্রার চতুর্থ দিন কাজি আবু বকর চাশতের সময় ইন্তেকাল করেন।

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত এই মৃত্যুর কারণে কাজি আবু বকর সাহেবের ছেলে আবুত তাইয়্যিব ও তার সফরসঙ্গী আবু আবদুল্লাহ যুবাইদি লাশ নিয়ে মিলিয়ানা ফিরে যান। সেখানে কাজি সাহেবের দাফন-কাফন সম্পন্ন হয়।

---

[১] মিলিয়ানা (**Miliana**) হলো উত্তর পশ্চিম আলজেরিয়ার একটি সম্প্রদায়ের নাম। তাদের দিকে সম্বন্ধিত করে নগরীটির নামকরণ হয়। রাজধানী আলজিয়ার্স থেকে ১১৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। লোহা উৎপাদনের জন্যে নগরীটি বিখ্যাত। –আ. আল ফারুক

আলজেরিয়া

মিলিয়ানা নগরীতে আমার যাত্রাবিলাসী মন পরিতৃপ্ত হচ্ছিল না। যার কারণে আমি তাদেরকে সেখানে রেখে তিউনিসের[১] একদল বণিকের সঙ্গে আল আলজেরিয়ার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। সেই বণিকদলের মধ্যে আলহাজ মাসঊদ ইবনুল মুনতাসির, আলহাজ আল আদুলি ও মুহাম্মাদ বিন হজর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অবশেষে আমরা আলজেরিয়ায়[২] এসে উপনীত হই। আমাদেরকে কয়েকদিন

---

[১] দেশটিকে আরবিতে লেখা হয়, তুনিস (تُونِس)। বাংলাতে আমরা লিখি 'তিউনিসিয়া'। রাষ্ট্রীয় নাম الجُمْهُورِيَّة التُونِسِيَّة। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত রাষ্ট্র। তিউনিস নামটি এসেছে বিশ্ববিখ্যাত বার্বার জাতির ভাষা থেকে। রাজধানীর নাম তিউনিস। এর পশ্চিমে আলজেরিয়া ও দক্ষিণ-পূর্বে লিবিয়া। এ কারণেই ইবনে বতুতা আলজেরিয়ার মিলিয়ানা নগরী থেকে এই তিউনিসে আসেন।

১৯৫৬ সালের ২০ মার্চ ফ্রান্সের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। তিউনিসিয়ার প্রায় সকল নাগরিক সুন্নি মুসলিম। প্রায় ৯৮%। অধিকাংশই মালিকি মাযহাবের অনুসারী। এখানকার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তবে পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের কারণে এখানে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া হচ্ছে না। অতীতের মতো এখনো তিউনিসিয়া পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় স্থান। এখানকার রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া, নয়নাভিরাম বেলাভূমি, বিচিত্র ভূ-প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি, সাহারা মরূদ্যান ও সুরক্ষিত প্রাচীন রোমান প্রত্নস্থলগুলো ভ্রমণপিয়াসীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। –অনুবাদক

[২] আরবিতে বলা হয়, আল-জাযাইর (الجزائر)। যার অর্থ, অনেকগুলো দ্বীপ। রাজধানী সংলগ্ন অনেকগুলো দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই রাষ্ট্রকে এখন বর্তমান বিশ্ব 'আলজেরিয়া' নামে চেনে। রাজধানীর নাম আলজিয়ার্স। যা ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত। ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মের কারণে আলজেরিয়াকে 'আরব বিশ্বের অংশ' গণ্য করা হয়। যদিও তা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত। আয়তনের বিচারে আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম ও বিশ্বের ১০ম বৃহত্তম রাষ্ট্র। এখানে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়াম (খনিজ তেল) ও প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে। এই খনিজ সম্পদের কারণে দখলদার ফরাসিদের হাতে দেশটির স্বাধীনতা এখন পর্যন্ত বিপন্ন। ৮ বছরের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর ১৯৬২ সালে ১০ লাখ নাগরিকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাগজে-কলমে স্বাধীনতা অর্জন করলেও ফ্রান্স নিয়ন্ত্রিত সামরিক সরকার এখনো দেশটিকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখছে।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে ইসলামপন্থী দল এফইএস বিজয়ী হয়। কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়ে নির্বাচন বাতিল করে দেয়। যার ফলে দেশটিতে গৃহযুদ্ধ চলছে।

বৈচিত্রপূর্ণ সংস্কৃতির দেশ আলজেরিয়া। এখানকার অধিকাংশ মানুষ আরবি, ফরাসি ও বার্বার ভাষায় আরো এক-দুটি স্থানীয় ভাষায় পারদর্শী।

আলজেরিয়ার সকল নাগরিক মুসলিম। জনগণ এখানে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এখানকার খনিজ সম্পদ লুটতরাজের মিশনে নিয়োজিত ফ্রান্স ও তাদের

শহরের প্রাচীরের বাইরে অবস্থান করতে হয়।[১] ততক্ষণে শায়খ আবু আবদুল্লাহ যুবাইদি ও মরহুম কাজি সাহেবের ছেলে চলে আসেন। তারা তখন আমাদের সফরসঙ্গী হয়ে যান।

আলজেরিয়া তৃপ্তির সঙ্গে পরিদর্শন করার পর আমরা পুনরায় সামনে অগ্রসর হই। আমাদের সামনের গন্তব্য হলো ওজ্জান[২] পর্বতমালার উপত্যকা।

বিজায়া[৩] নগরী ও মুওয়াহহিদিন[৪] রাজবংশের স্বৈরাচারী নিপীড়ক শাসক

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা বিজায়া নগরীতে পৌঁছি। আমাদের সফরসঙ্গী শায়খ আবু আবদুল্লাহ নগরীর কাজি আবু আবদুল্লাহ যাওয়াদির

আশির্বাদপুষ্ট সামরিক বাহিনী জনগণের সেই মৌলিক চাহিদাকে এখনো নির্মমভাবে পদপিষ্ট করে চলেছে।–অনুবাদক

[১] আগের যুগে প্রতিটি সম্ভ্রান্ত নগরীর চারপাশে প্রাচীর থাকত। জনগণের অর্থ ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে চারপাশে প্রাচীর গড়ে তোলা হতো। অধিকাংশ নাগরিক সেই প্রাচীর ঘেরা উন্নত নগরীতে বসবাস করত। তবে দারিদ্র্য বা অন্য কিছু কারণে কিছু লোক প্রাচীরের বাইরের অনুন্নত অংশে বাস করত।–অনুবাদক

[২] ওজান (Ouazzane) পর্বতমালা। আরবিতে লেখা হয়, وَزان। মরক্কো থেকে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি প্রাচীন নগরী। যা পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে উঠেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নগরীটির উচ্চতা ৬১৪ মিটার।

এক বর্ণনা অনুসারে রোমান যুগে, অন্য বর্ণনা অনুসারে আফ্রিকা বিজয়ী মুসা বিন নুসাইরের হাতে বনু উমাইয়া যুগে এ নগরীর গোড়াপত্তন হয়।

এই ওজান মরক্কোর সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে প্রাচীন নগরী। নগরীর দু পাশে দুটি সুউচ্চ পর্বত। আরেকপাশে সাগর। এখানকার নির্মল বাতাস ও ঘন যাইতুন বন পর্যটকদের কাছে সবযুগেই আকর্ষণীয় ছিল। –অনুবাদক

[৩] Bgayet হলো ভূমধ্যসাগরের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অধিকারী বন্দরনগরী। যা আলজেরিয়ার বিজায়া উপসাগরের তীরে অবস্থিত। আলজেরিয়ার কাবিলিয়া অঞ্চলের এই নগরীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রাচীন স্থাপনা, রেস্টুরেন্ট, স্বচ্ছ বালিয়াড়ি সবসময় ভ্রমণপিপাসুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। দীর্ঘ দিন উত্তর আফ্রিকা শাসনকারী বৃহত্তম মুসলিম রাজবংশ বনু হাম্মাদের আমলে এটি রাজধানী ছিল। তখন থেকেই সারা পৃথিবীতে এ নগরীর নাম-যশ ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে এটি আলজেরিয়ার পেট্রোলিয়াম সম্পদের অনেক বড় উৎস। –অনুবাদক

[৪] ঈসায়ি বারো শতকের মরক্কোন বংশোদ্ভূত বারবার মুসলিম রাজবংশ। যা একসময়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, আন্দালুস ও লিবিয়া শাসন করেছে। এই রাজবংশকে 'মুওয়াহহিদিন' বলা হতো এ কারণে যে, তারা তাদের মতো করে খালিস তাওহিদের দিকে মানুষকে ডাকত। তাদের সেই চিন্তাধারা ছিল খুবই কঠোর, উগ্র ও বৈচিত্র্যহীন। মাকতাবাতুল আযহার থেকে প্রকাশিত মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বিশ্বকোষের অষ্টম খণ্ডে এই রাজবংশ সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা রয়েছে। –অনুবাদক

আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে মরহুম কাজি সাহেবের ছেলে আবুত তাইয়্যিব স্থানীয় ফকিহ আবু আবদুল্লাহ আল মুফাসসিরের বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেসময় বিজায়া নগরীর শাসক ছিলেন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন সাইয়েদুন নাস।

আমাদের সফরসঙ্গীদের মাঝে অর্থাৎ তিউনিসিয়ার বণিকদলের একজন ছিলেন মুহাম্মাদ বিন হজর। যিনি মালিয়ানা থেকে আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন। এখানে এসে তিনিও ইন্তেকাল করেন। তিনি তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা রেখে যান। ইন্তেকালের সময় তিনি অসিয়ত করেছিলেন, সেই অর্থগুলো যেন আলজেরিয়ার নাগরিক মুহাম্মাদ বিন হাদিদার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। যিনি সেগুলো তার ওয়ারিসদের কাছে পৌঁছে দেবেন।

কিন্তু তার সেই অসিয়ত পূরণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ বিজায়ার শাসক ইবনে সাইয়েদুন নাস বিন হাদিদার হাত থেকে সমুদয় অর্থ ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনার মাধ্যমে আমি প্রথমবার মুওয়াহহিদিন শাসকদের জুলুম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি।

এখানে এসে আমিও জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ি। আমার সফরসঙ্গী আবু আবদুল্লাহ যুবাইদি আমাকে বন্ধুসুলভ পরামর্শ দেন যে, আমি যেন সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করি। তার পরামর্শ আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি তাকে তখন বলি, 'ভাগ্যে যদি মৃত্যু লেখাই থাকে তাহলে সেই মৃত্যু হোক রাসূলের পুণ্যভূমির যাত্রাপথে।'

আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'যদি আপনি যাত্রা করতে এতটাই দৃঢ় হন তাহলে এক কাজ করুন। আপনার বাহন বিক্রি করে ফেলুন। আপনার সঙ্গে যেই ভারী সামানপত্র রয়েছে সেগুলোও বিক্রি করে ফেলুন। আমি আপনাকে আমার তাবু ও বাহন ধার দেব। তাহলে আমরা সবাই তখন নির্ভার হয়ে যাব। তখন শান্তিতে আমাদের সফর অব্যাহত রাখতে পারব। কারণ হলো, সামনের পথ বিপজ্জনক। মরুভূমির বুদ্ধু দস্যুরা পথিমধ্যে সুযোগ পেলেই লুণ্ঠন করে বসে। কাজেই আমাদের মঙ্গল এখানেই যে, আমাদেরকে অতি অল্প সময়ে দ্রুততার সঙ্গে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।'

আমি জনাবের সেই পরামর্শ মেনে নিই। তার কথাগুলো মেনে বাহন ও ভারী

জিনিসপত্র বিক্রি করে ফেলি। তিনিও অঙ্গীকার মুতাবেক আমাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ধার করেন। মহান আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

কন্সট্যাটাইন নগরী ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসক কর্তৃক আমার কয়েকটি সমস্যার সমাধান

আমি পরিকল্পনামাফিক সফরের জন্যে পুনরায় প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আল্লাহর ওপর ভরসা করে যাত্রা শুরু করি। মহান আল্লাহর অনুগ্রহের ছায়াতলে আমরা আমাদের গন্তব্য হিজাযের পানে একটু একটু করে অগ্রসর হতে থাকি।

চলতে চলতে আমরা কন্সট্যাটাইন[১] এসে পৌঁছুই। শহরের প্রাচীরের বাইরের উপশহরে অবস্থান করি। রাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়। বর্ষণমুখর সেই রাতে তাবুর ভেতরে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেষ রাতে তাবু ছেড়ে স্থানীয় লোকদের বাড়িতে চলে আসি।

পরদিন প্রত্যুষে আমরা নগরপতির দরবারে হাজির হই। নগরপতি ছিলেন অত্যন্ত গুণী ও সজ্জন মানুষ। নাম, আবুল হাসান। সাক্ষাতের সময় তিনি লক্ষ্য করেন, আমার পরিধেয় বস্ত্রে বৃষ্টির দাগ রয়েছে।

তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। আমার পরিধেয় বস্ত্রটি গৃহভৃত্যের মাধ্যমে ধুয়ে দিলেন। আমার পাজামাটি পুরাতন হয়ে গিয়েছিল। তিনি আমাকে বা'লাবাক্কু নগরীর তৈরি একটি উন্নতমানের পাজামা উপহার দিলেন। শুধু তাই নয়, পাজামার দু প্রান্তে একটি করে স্বর্ণমুদ্রাও বেঁধে দিলেন। যাত্রাপথে এটি ছিল আমার জন্যে প্রথম আর্থিক সহায়তা লাভ।

---

[১] এটি তুরস্কের কনস্টান্টিনোপল নয়। অন্য আরেকটি ক্ষুদ্র নগরী। যা অতীতে ছিল খ্রিস্টান অধ্যুষিত নগরী। তবে বাণিজ্যিক কারণে এখানে নিয়মিত আরব বণিকদল যাতায়াত করত।

এই কন্সট্যাটাইন হলো আলজেরিয়ার ৫৮টি প্রদেশের মধ্য হতে একটি। যার রাজধানী একই নামের শহর। এ কারণে আরবিতে এ অঞ্চলকে বলা হতো, ولاية قسنطية। আলজেরিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে এই প্রদেশটি অবস্থিত। কথিত আছে, এটি পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন নগরী। খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগ থেকেই এ নগরীর অস্তিত্ব ছিল। যার ফলে এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের লোক আনাগোনা করত। –অনুবাদক

বোন[১] নগরীতে

কন্সট্যাটাইনে কয়েকদিন অবস্থান করার পর আমরা সামনে অগ্রসর হই। পথিমধ্যে বোন নগরীতে এসে হাজির হই। এখানে আমরা তিন দিন শহরের ভেতরে অবস্থান করি।

আমি এতদিন যেই বণিকদলের সঙ্গে যাত্রা করছিলাম তাদের সঙ্গ এখানে এসে শেষ হয়ে যায়। কেননা সামনের পথ খুবই বিপদসংকুল। এখন আমি একাই সফর করছি। আমার সঙ্গে সাথী-সঙ্গী কেউ নেই। বন্ধুর পথগুলো একাকীই অতিক্রম করে চলেছি। দুর্গম গিরিপথ, বন্ধুর মেঠোপথ ও কণ্টকাকীর্ণ পাহাড়ি ঘাঁটি অতিক্রম করে চলতে থাকি। রাস্তার নানা ধকলের সঙ্গে লড়াই করে একপর্যায়ে আমি নিজেই পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ি। জ্বরের প্রকোপে শারীরিক ও মানসিকভাবে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, বাহন থেকে নামার শক্তি ও সাহস; কোনোটাই ছিল না। পরিশেষে বাধ্য হয়ে মাথার পাগড়ি খুলে তা দিয়ে বাহনের সঙ্গে শরীর বেঁধে ফেলি, যেন দুর্বলতার কারণে বাহন থেকে পড়ে না যাই।

---

[১] আরবিতে বুনাহ ও ইংরেজিতে Bône লেখা হয়। আলজেরিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত এ নগরীটি আন্নাবা প্রদেশের রাজধানী। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় এটিও একটি বন্দর নগরী।

আন্নাবা হলো আলজেরিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পনগরী। এটিও পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় নগরী। বিশষ করে গ্রীষ্মকালে এখানকার সোনালি উপকূলগুলো অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে ওঠে। –অনুবাদক

অবশেষে তিউনিসিয়ার[১] মাটিতে

পড়ি-মরি করে অবশেষে তিউনিস নগরীতে এসে হাজির হই।

তিউনিস নগরীর অধিবাসীগণ শায়খ আবু আবদুল্লাহ যুবাইদি ও আবুত তাইয়্যেব প্রমুখকে স্বাগত জানাতে নগরীর বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। তারা তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে সাদরে বরণ করে নেন। পরস্পরে সালাম-কালাম হলো।

যেহেতু তাদের সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না; কাজেই এই অচেনা আগন্তুকের সঙ্গে তাদের কেউ সালাম বিনিময় বা কুশল জিজ্ঞাসা; কোনোটাই করল না। এ ধরনের নিস্তরঙ্গ পরিবেশ আমার হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। দু চোখ বেয়ে তপ্ত অশ্রুর ধারা ঝরে পড়ে।

স্থানীয় কয়েকজন হাজী সাহেব আমার সেই মর্মবেদনা অনুধাবন করে ফেলেন। তারা আমার দিকে এগিয়ে এসে সালাম নিবেদন করেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করেন। আমাকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেন। তাদের সঙ্গে আমি শহরের ভেতরে প্রবেশ করি। এখানকার বিখ্যাত দীনি বিদ্যাপীঠ মাদরাসাতুল কুতবিয়্যিনের[২] মেহমানখানায় অবতরণ করি।

তিউনিসিয়ার বাদশাহ ও স্থানীয় জ্ঞানী-গুণীদের বিবরণ

আমি যেসময়ে তিউনিসে আগমন করি তখন সেখানে রাজত্ব করতেন সুলতান আবু ইয়াহইয়া বিন সুলতান আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন সুলতান

---

[১] আফ্রিকার উত্তর উপকূলে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত রাষ্ট্র। দেশটির মধ্য দিয়ে এটলাস পর্বতমালা চলে গেছে এবং দেশটিকে উত্তরের উর্বর সমভূমি ও দক্ষিণের শুষ্ক, উষ্ণ মরুময় অঞ্চলে ভাগ করেছে।

[২] উত্তর আফ্রিকা তথা তিউনিসিয়ার সবচেয়ে পুরনো বিদ্যাপীঠ। তিউনিসের পুরনো অংশে সেই মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুলতান আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ১২৮৪ ঈসাব্দে এই মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থায়নের মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ব্যাপকতা লাভ করে।

আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন সুলতান আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন আবদুল ওয়াহিদ বিন আবু হাফস। তার শাসনামলে দেশটি বড় বড় আলেম, জ্ঞানী ও গুণীদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। তাদের মধ্য একজন ছিলেন বিচারপতি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন কাজি ইবনুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মাদ আনসারী খাযরাজী। মুহাম্মাদ আনসারী জনসমাজে 'ইবনুল গমামাহ' নামেও পরিচিত ছিলেন। সেখানে আরো ছিলেন খতিব আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন হাসান বিন আলী বিন আবদুর রফি' রিবয়ি। যিনি পাঁচটি দেশের বিচারপতিদের প্যানেল প্রধান পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেখানে ফকিহ আবু আলী উমর বিন আলী বিন কুদ্দাহ হাওয়ারি-ও ছিলেন। তিনিও পাঁচটি দেশের বিচারপতিদের বোর্ডপ্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তার আরেকটি পরিচয় হলো, তাকে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলেম ও আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব মনে করা হতো। সেই যুগে তার ও অন্যান্য সমকালীন আলেমদের অভ্যাস ছিল, তারা প্রতি শুক্রবার জুমার নামাযের পর শহরের প্রধান মসজিদ জামে' যয়তুনিয়্যাহর কোনো এক স্তম্ভের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে যেতেন। লোকেরা তাদের সামনে হাজির হয়ে বিভিন্ন মাসআলার ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন। তিনি জবাব জানিয়ে দিতেন। মোটামুটি চল্লিশ মাসআলার প্রশ্নোত্তরপর্ব সম্পন্ন হলে সেখান থেকে উঠে ফিরে যেতেন।

তিউনিসে আগমনের পর ঈদুল ফিতরের চাঁদ ওঠে। যখন ঈদের নামাযের জন্যে ঈদগাহে গমন করি, তখন সেখানে দেখতে পাই, স্থানীয় জনগণ যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে সাড়ম্বরে ঈদগাহে একত্র হচ্ছে। প্রত্যেকের গায়ে শোভা পাচ্ছে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক। সুলতান আবু ইয়াহইয়া গাড়িতে আরোহণ করে সেখানে আগমন করেন। তাঁর সকল আত্মীয়, সভাসদ, রাজন্যবর্গ ও সেবকেরা সারিবদ্ধভাবে পায়ে হেঁটে ঈদগাহে আসেন। দু রাকাত নামায আদায় হলো। এরপর খুতবা সম্পন্ন করে সবাই নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যায়।

এর কয়েকদিন পর শুরু হয়ে যায় হজের উদ্দেশ্যে হজযাত্রীদের বেরিয়ে পড়ার তোড়জোড়। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি রাজকীয় হজকাফেলা প্রস্তুত হয়। এই কাফেলার নেতা নির্বাচিত হন আবু ইয়াকুব সুসি। তিনি

ছিলেন 'ইকলিবিয়্যা'[১] নগরীর বাসিন্দা। আমাকে সেই রাজকীয় হজকাফেলার কাজি মনোনীত করা হয়। অবশেষে আমরা যিলকদ মাসের শেষ দিকে তিউনিস থেকে উপকূল ঘেঁষে এগিয়ে যাওয়া মহাসড়ক ধরে হিজাযের উদ্দেশে রওনা হই।

জ্ঞানচর্চার প্রাচীন জনপদ সুসাহ[২] নগরীতে

তিউনিস থেকে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আমরা সুসাহ নগরীতে পৌঁছি। আয়তনে যদিও বেশ ছোট্ট জনপদ; কিন্তু যেকোনো পর্যটক এখানকার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারবে না তিউনিস থেকে চল্লিশ মাইল[৩] দূরে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে নগরীটি অবস্থিত।

এখান থেকে রওনা হয়ে পরবর্তী শহর সাফাকিস (Sfax)[৪] নগরীতে এসে

---

[১] মু'জামুল বুলদানের মাঝে এই উচ্চারণ দেওয়া আছে। ইংরেজিতে উচ্চারণ হলো, কেলিবিয়া (Kelibia)। রাজধানী তিউনিস থেকে ১০৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বাইজেন্টাইন শাসনামলে এ নগরীর গোড়াপত্তন ঘটে। তখন নাম ছিল ক্লুপিয়া। –অনুবাদক

[২] سوسة بضم أوله। দেখুন, মু'জামুল বুলদান : ১/৫০৯। ইংরেজিতে লেখা হয় Soussa। এটিও তিউনিসিয়ার একটি শহর। রাজধানী তিউনিস থেকে ১৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। খ্রিস্টপূর্ব ১১০১ সালে ফিনিকিউ রাজবংশের সম্রাটদের হাতে এ নগরীর গোড়াপত্তন ঘটে। ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে এ নগরীর আরো দুটি ভিন্ন নাম ছিল। –অনুবাদক

[৩] বর্তমান মাইলের দূরত্ব ও পূর্বেকার মাইলের দূরত্ব সমান নয়।

[৪] তিউনিস থেকে ২৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। কাবুস সাগরের তীরে অবস্থিত। ইবনে জুযাই বলেন, এ নগরীর প্রশংসায় ইবনে হাবিব আত তান্নুখি নিচের পঙ্‌ক্তিগুলো লিখেছিলেন,

سقياً لأرض صفاقس	ذات المصانع والمصلّى
محمى القصير إلى الخليج	فقصرها السامي المعلّى
بلد يكاد يقول حين	تزوره أهلاً وسهلا
وكأنه والبحر يحس	ر تارة عنه ويملا
صبّ يريد زيارة	فإذا رأى الرقباء ولّى

যার অনুবাদ হলো,

'মহান আল্লাহ সাফাকিস ভূমিকে চিরকাল সিঞ্চিত সবুজময় করে রাখুন। যেখানে অনেক বড় বড় ভবন, উপসনালয় রয়েছে।

রয়েছে দ্বীপের ওপর কায়সারের প্রাসাদ। যার সুউচ্চ ভবনগুলো আকাশের সঙ্গে মিতালি করে বেড়ায়। এটি এমন এক নগরী, যেখানে কোনো অভ্যাগত এলে সে সুস্বাগতম বলে সংবর্ধনা জানায়।

পৌঁছি। এখানে নগরীর বাইরে প্রখ্যাত মালেকী আলেম ইমাম আবুল হাসান লাখমি মালেকীর কবর অবস্থিত। তিনি হলেন মালেকী ফিকহের অন্যতম নির্ভরযোগ্য কিতাব التبصرة [আত-তাবসিরাহ]-এর রচয়িতা।

কাবুস (Gabbs) শহর অভিমুখে

সেকাস (সাফাকিস) শহর থেকে বেরিয়ে কিছু দূর পথ চলার পর আমরা কাবুস[১] শহর পৌঁছি। আমরা সরাসরি শহরের ভেতরে প্রবেশ করে সেখানেই অবস্থান করি। এখানে তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। যার কারণে আমরা সেখানে দশ দিন অবস্থান করি। এরপর বেরিয়ে পড়ি।

সমুদ্রও তার আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হয়ে থাকে। কখনো সমুদ্র তার নৈকট্য অর্জন করে; কখনো বা উল্টো পায়ে ফিরে যায়।

তরঙ্গগুলো প্রচণ্ড মিলনাকাঙ্ক্ষায় ছুটে আসে; কিন্তু যাত্রীদলের উপস্থিতি দেখে সলজ্জ প্রত্যাবর্তন করে।'

জনৈক কবির পঙ্‌ক্তিতে সফাকিস নগরীর দুর্নাম

উপরের প্রশংসামূলক পঙ্‌ক্তিগুলোর বিপরীতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন তামিম—যিনি ছিলেন শিল্পরসিক, স্পষ্টভাষী ও বিরল ছন্দকলার অধিকারী কবি—সফাকিসের দুর্নাম করে লিখেছেন,

صفاقس لا صفا عيش لساكنها ولا سقى أرضها غيث إذا انسكبا

ناهيك من بلدة من حل ساحتها عانى بها العاديين الروم والعربا

كم ضل في البر مسلوباً بضاعته وبات في البحر يشكو الأسر والعطبا

قد عاين البحر من لؤم لقاطنها فكلما همّ أن يدنو لها هربا

যার অনুবাদ হলো,

'সাফাকিস; যার অধিবাসীগণ ভুলে গেছে, শান্তি কাকে বলে? যদিও এখানে বারিধারার বর্ষণ হয়; কিন্তু এখানকার ভূমিগুলো তৃপ্ত হয় না।

নগরীটির প্রশংসায় এতটুকু কথাই যথেষ্ট যে, এখানে যেই এসেছে, সে হয়তো রোমীয়দের লুণ্ঠনযজ্ঞের শিকার হয়েছে অথবা গ্রাম্য আরবদের হাতে কপর্দক হয়েছে।

স্থলপথে যারা এখানে এসেছে তারা পথিমধ্যে নিজের সর্বস্ব খুইয়েছে। আর সমুদ্রপথে যারা এসেছে তারা হয়তো গ্রেফতার হয়েছে অথবা ঝঞ্ঝার শিকার হয়েছে।

সমুদ্র এখানকার চরম বিপর্যস্ত দুরবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছে। এ কারণে কুদরত যতই তাকে শহরের নিকটবর্তী করে দেয়, সে ততই দূরে পলায়ন করে।

[১] কাবুস হলো, ত্রিপোলি ও সেকাস নগরীর মাঝখানে অবস্থিত আরেকটি ঐতিহাসিক জনপদ। এখানে প্রচুর খেজুর বাগান ও স্বচ্ছ জলধারা রয়েছে। সমৃদ্ধ নগরী হওয়ার নিরাপত্তার প্রয়োজনে শহরের চারপাশে পরিখা ছিল।

আমরা যখন কাবুস শহর থেকে বেরিয়ে ত্রিপোলির পথে রওনা হই তখন পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে আমাদের সঙ্গে শতাধিক ঘোড়সওয়ার ছিল। যাদের অধিকাংশই ছিল তুখোর তিরন্দাজ। তাদের ভয়ে আরব লুটেরাগুলো নিজেদের খুপড়ি থেকে বের হওয়ার সাহস করেনি। দরজা বন্ধ করে ভেতরেই লুকিয়ে ছিল। এভাবে আল্লাহ আমাদেরকে মরুচারী লুটেরাদের কবল থেকে রক্ষা করেন। কাবুস ও ত্রিপোলির মধ্যবর্তী এক স্থানে ঈদুল আযহার আনন্দঘন দিন চলে আসে। আমরা তখন ঈদের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করি। চতুর্থ দিনে ত্রিপোলিতে এসে পৌঁছি।

পশ্চিম ত্রিপোলিতে প্রবেশ

ত্রিপোলিতে এসে আমরা বেশ কিছু দিন অবস্থান করি। অনিন্দ্য সুন্দর এই শহরটি আমার দু'চোখে মুগ্ধতার আবির ছড়িয়ে দেয়। যার ফলে আমি এখানে কদিনের জন্যে নিবাস পেতে ফেলি।

এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সেকাস অবস্থানকালে তিউনিসিয়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়; কিন্তু নানা কারণে বাসর হয়নি। ত্রিপোলিতে এসে সেই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

ত্রিপোলির দর্শনীয় স্থানসমূহের পরিদর্শন শেষে কদিন পর পুনরায় সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। ৭২৬ হিজরির মুহাররম মাসের শেষ দিকে ত্রিপোলি থেকে রওনা হই। এবারের সফরে আমার সঙ্গে ছিল আমার নতুন স্ত্রী। এছাড়া বার্বার গোত্রের একটি দলও আমার সঙ্গে ছিল। দলপতির পতাকা হাতে তুলে নিয়ে আমি সবার আগে আগে চলতে শুরু করি। তিউনিসিয়া থেকে যেই যাত্রীদলটি আমাদের সঙ্গ দিয়ে ছিল, তারা বৃষ্টি ও সর্দির ভয়ে ত্রিপোলিতেই থেকে যায়। আমি সেই ভয়গুলোর পরোয়া না করে অভীষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে যাত্রা শুরু করি।

পথিমধ্যে আমরা অনেকগুলো জনপদ অতিক্রম করি। ম্যাসালতা,[১]

---

[১] ম্যাসালতা হলো, লিবিয়ার উত্তর-পশ্চিম অংশের একটি শহর। আরবিতে লেখা হয়, مسلاتة।–অনুবাদক

মিসরাতা,[১] ও কসরে সিরতে[২] ইত্যাদি এলাকাগুলো পেরিয়ে আমরা আমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখি। পথিমধ্যে বিভিন্ন কয়েকবার মরুচারী বেদুইন লুটেরা আমাদের ওপর আক্রমণ করার ফন্দি-ফিকির করেছিল; কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতি কারিশমায় একেকবার একেক কারণে তাদেরকে আশাহত হতে হয়। এভাবে আমরা নিরন্তর যাত্রা শেষে জঙ্গলের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে যাই। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে তাপস বারসিসার[৩] প্রাসাদে এসে যাত্রা বিরতি করি। যা 'কুব্বাতুস সাল্লাম' এর কাছাকাছি।

তবে এখানে আমাদের বিরতি ছিল খুবই ছোট্ট। এখানে ত্রিপোলিতে রয়ে যাওয়া বণিকদলের সঙ্গে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটে।

শ্বশুরের সঙ্গে কলহের জেরে স্ত্রী ত্যাগ

এখানে এসে কোনো এক কারণে শ্বশুরের সঙ্গে আমার তীব্র কলহ বাধে, যার কারণে বাধ্য হয়ে আমি তার কন্যাকে তালাক দিয়ে দিই।

নতুন বিয়ে

এখানে ফেজ[৪] নগরীর জনৈক শিক্ষার্থীর[৫] মেয়ের সঙ্গে আমি দ্বিতীয়বার

---

[১] মিসরাতা হলো, উত্তর-পশ্চিম লিবিয়ার একটি জেলা শহর। ত্রিপোলি ও বেনগাজির পর এটি লিবিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত। আরবিতে লেখা হয়, مسراتة –অনুবাদক

[২] সির্তে হলো, ত্রিপোলি ও বেনগাজির মাঝামাঝি সির্তে উপসাগরের দক্ষিণে অবস্থিত একটি শহর। ত্রিপোলি থেকে পূব দিকে ৪৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীর ঘেরা কেল্লা ছিল। ১.৭২ হেক্টর আয়তনের সেই কেল্লাটি ছিল মাটির তৈরি। কেল্লার ভেতরে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল। –অনুবাদক

[৩] বনু ইসরাইলের বিখ্যাত ভিক্ষু। এ লোক ষাট বছর আল্লাহর উপাসনা করেছিল। তার উপাসনার সুনাম-সুখ্যাতি মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে জনৈক নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করে। ব্যভিচারের ফলে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তখন দুর্নামের ভয়ে সে মেয়েটিকে হত্যা করে লাশ লুকিয়ে রাখে। তাকে যখন শূলিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হচ্ছিল, তখন সে জীবন বাঁচাতে আবারো শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়ে যায়। তাকে সেজদা করে। –অনুবাদক

[৪] ফেজ। আরবিতে বলে فاس। মরক্কোর উত্তর উপকূলের আরেকটি শহর। এটলাস পর্বতমালার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। মরক্কোর দ্বিতীয় বৃহত্তর নগরী। ১৮২ হিজরিতে দ্বিতীয় ইদরিস এ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। –অনুবাদক

[৫] এরা হলো, একদল বিশেষ শিক্ষার্থী। মুওয়াহহিদিন রাজবংশের পক্ষ থেকে তাদের জন্যে ভাতা নির্ধারিত ছিল। তাদের দায়িত্ব ছিল, এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ বিন তুমরাতের বইপত্র ও

পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হই। যা'আফিয়া[১] মহলে কন্যাদানের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। বন্ধুদেরকে সঙ্গে নিয়ে ধুমধামের সঙ্গে সাড়ম্বরে বৌভাত আয়োজন করি। ইত্যকার কারণে আমাদেরকে অতিরিক্ত আরেকটি দিন এখানে অবস্থান করতে হয়।

আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে

জুমাদাল উলার ১ তারিখে আমরা আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে পদার্পণ করি। আল্লাহ নগরীটিকে রক্ষা করুন। কেননা এটি মুসলমানদের একটি সংরক্ষিত সীমান্ত। এই ভূমি প্রত্যেক পর্যটকের চোখে স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দেয়।

এখানকার ভবনগুলো খুবই দৃষ্টিনন্দন। সর্বত্র নির্মাণশিল্পের নৈপুণ্য ও মজবুত স্থাপনার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রতিটি ভবনেই রয়েছে শৈল্পিক রুচিবোধের উৎকৃষ্ট প্রকাশ। সর্বত্র সমানভাবে বিরাজ করছে দীনদারিত্বের প্রভাব ও দুনিয়াদারিত্বের বিনম্র প্রকাশ। এখানকার ভৌত অবকাঠামা যেভাবে শৌর্য-বীরত্বের জানান দেয়, তদ্রূপ আন্তরিক আকর্ষণও সমানভাবে প্রকাশ করে। সারি সারি সুবিশাল ভবন হৃদয়ের ওপর সৌকর্যের বিশেষ চিত্র ফুটিয়ে তুলছে। কেননা শিল্পরসিকতা ও নির্মাণসৌন্দর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো ছিল অদ্বিতীয়। ভবনগুলোর শিল্পসুষমাকে যদি আমি জ্বলজ্বলে মুক্তোর দানা বলি, অতিরঞ্জন হবে না। এমনকি মুগ্ধতা ছড়ানো দীপ্তি, হৃদয়ছোঁয়া আকর্ষণ ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যের ভিত্তিতে আমি তাকে নববধু দাবি করলে, বাহুল্য হবে না।

আফ্রিকার মরক্কো আজ উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্বের যেই মহান মর্যাদা লাভ করেছে, বাস্তবতা হলো সেটি এই আলেকজান্দ্রিয়ারই অবদান।

শহরটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত। যার কারণে পাশ্চাত্যের অনুপম সৌন্দর্য ও প্রাচ্যের মনোলোভা সৌকর্য এখানে এসে একই স্রোতে মিশে গেছে। বাস্তবতা হলো, শহরটির প্রশংসায় ইতিপূর্বে যা কিছু বলা হয়েছে এবং বর্তমানে যেই গুণগান করা হচ্ছে, তার কোনোটাই অবাস্তব

বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

[১] লিবিয়ার সির্তে নগরী থেকে অল্প দূরে এই জনপদ অবস্থিত।

নয়। আবু উবায়দিল্লাহ বাকরি তার লেখা 'আল মাসালিক ওয়াল মামালিক' গ্রন্থে শহরটি বিস্ময়কর ও বিরল বিষয়গুলো সংকলন করেছেন। সেখানে তিনি হৃদয়গ্রাহী বাক্যে চমৎকার বিবরণী তুলে ধরেছেন।

আলেকজান্দ্রিয়ার ফটক ও সরাইখানা

শহরটির চারটি ফটক রয়েছে।

১. বাবুস সুদরাহ। এখান থেকে শহরটির রাজপথগুলো শুরু হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা এ সড়কে যাতায়াত করে থাকে।

২. বাবুর রশীদ। এটি একটি রাজপথ।

৩. বাবুল বাহার। এটিও দ্বিতীয়টির মতো সর্বসাধারণের ব্যবহৃত রাজপথ।

৪. বাবুল আখদার। এ ফটকটি শুধু বৃহস্পতিবার উন্মুক্ত করা হয়। বিভিন্ন মাজার ও মাকবারা যিয়ারতের জন্যে নাগরিকগণ এ ফটক দিয়ে বেরিয়ে থাকেন।

সমগ্র পৃথিবীতে আলেকজান্দ্রিয়ার সরাইখানার মতো দ্বিতীয় আরেকটি সরাইখানা আমার চোখে পড়েনি। যদিও তার থেকে ভারতবর্ষের কোলাম বা কালিকোট[১] সরাইখানা, তুরস্কের কাফেরদের সরাইখানা, চীনের যয়তুন সরাইখানাগুলো ব্যতিক্রম। যথাস্থানে সেগুলো নিয়েও আলোচনা হবে।

আলেকজান্দ্রিয়া মিনারা

আমি পূর্ব থেকেই আলেকজান্দ্রিয়ার মিনারার সুখ্যাতি শুনে এসেছি। ইচ্ছে ছিল, সুযোগ পেলে সেটি দেখে আসব। সেখানে হাজির হয়ে দেখতে পেলাম, তার এক পাশ ধসে পড়েছে। মিনারাটি মূলত একটি চতুর্ভুজ সুবিশাল ভবন। যা অনেক দূর উপরে উঠে গেছে। সেটির ফটক বরাবর আরেকটি সুউচ্চ ভবন রয়েছে। যা উচ্চতায় মিনারার ভবনের ফটকের সমান হবে। সেই ভবন ও মিনারার ফটকের মাঝখানে কাঠের শক্ত তক্তা রাখা আছে। এই তক্তা বেয়েই মিনারাটির ফটক পর্যন্ত যাওয়া যায়। তক্তা উঠিয়ে ফেললে মিনারার ফটকে যাওয়ার বিকল্প কোনো পথ থাকবে না। মিনারার ফটকের মাঝে একদল দেহরক্ষীর থাকার জায়গা রয়েছে।

---

[১]. কালিকোট হলো, ভারতের কেরালা প্রদেশের একটি জেলা। –অনুবাদক

যেই ফটকটি ধরে সেখানে যাতায়াত করতে হয় সেটি প্রস্থে ৯ বিঘত ও দৈর্ঘ্যে ১০ বিঘত হবে। চতুর্দিকে সেটির আয়তন হলো ১৪০ বিঘত। মিনারটি তৈরি করা হয়েছে একটি বড়সড় টিলার ওপর। ভবনের ভেতর অনেকগুলো কামরা রয়েছে।

এটি শহর থেকে এক ক্রোশ[১] দূরের একটি লম্বাকৃতির ময়দানে অবস্থিত। স্থানটিকে তিন দিক থেকে সমুদ্র এমনভাবে বেষ্টন করে রেখেছে যে, কেমনযেন সেটি শহর রক্ষার কাজ করছে। যার কারণে শহরের বাইরে থেকে কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই সেই শুষ্ক পথ ধরে আসতে হবে। এই লম্বাকৃতির ময়দানেই মিনারার কাছাকাছি একটি স্থানে আলেকজান্দ্রিয়ার কবরস্থান অবস্থিত। ৭৫০ হিজরিতে আমি যখন পশ্চিমাঞ্চলের পরিভ্রমণ শেষে এ নগরীতে ফিরে আসি তখন দ্বিতীয়বার সেই মিনারাটিকে দেখতে হাজির হই; কিন্তু ততদিনে মিনারাটির অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে, তার ফটকে ওঠার কোনো সুযোগই ছিল না। পূর্বের মিনারা ঘেঁষে মালিক নাসির আরো একটি মিনারার ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেছিল; কিন্তু নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার পূর্বে তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। যার ফলে সেটি অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়।

আমি যেসময় আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে আগমন করি তখন সেখানকার শাসক ছিলেন 'সালাহ উদ্দিন'। সেসময় আফ্রিকার অপসারিত সুলতান যাকারিয়া আবু ইয়াহইয়া বিন আহমদ বিন আবু হাফস লিহইয়ানী আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করছিলেন। মালিক নাসিরের নির্দেশে তাকে সেখানকার রাজকীয় প্রাসাদেই রাখা হয়েছিল। হাতখরচের জন্যে তার প্রাত্যহিক ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছিল, একশ স্বর্ণমুদ্রা। সেই অপসারিত সুলতানের সঙ্গে তার ছেলেদের মধ্য হতে আবদুল ওয়াহিদ, মিসরী ও ইসকান্দারি এবং তার দেহরক্ষী আবু যাকারিয়া বিন ইয়াকুব ও তার মন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনও বসবাস করতেন। সুলতান ইয়াহইয়া ও তার ছেলে

---

[১] ফারসাখ শব্দটি মূলত ইসলামি পরিভাষা। প্রাচীন কিতাবাদিতে প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এক ফারসাখ হলো, তিন মাইল দূরত্ব। বর্তমান হিসেবে ৫৫৪৪ মিটার বা ১৮ হাজার ফুট। জাওহারি রহ. সিহাহুল লুগাহ গ্রন্থে লিখেছেন, والفَرْسَخُ ثلاثة أميال।
উল্লেখ্য, মেট্রিক পদ্ধতির মাইল ও শরয়ী পরিভাষার মাইল এক সমান নয়। মেট্রিক পদ্ধতিতে এক মাইল হলো, ৫২৮০ ফুট। যা ১৬০৯. ৩৯৪৪ মিটার। –অনুবাদক

ইসকান্দারি এখানেই ইন্তেকাল করেন। তবে সেসময় পর্যন্ত তার অপর ছেলে মিসরী জীবিত ছিল।

ইবনে জুযযী বলেন, বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, লিহইয়ানীর ছেলেদের নামের প্রভাব তাদের জীবনেও প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। ইসকান্দারি বসবাস করত আলেকজান্দ্রিয়াতেই। মিসরী যদিও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন পেয়েছিল; সেও মিসরে বসবাস করেছে। আবদুল ওয়াহিদ একাকী আন্দালুস, মরক্কো ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে কাবুসের নিকটবর্তী জারবা দীপে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েকজন বিখ্যাত আলেম

এখানকার বিখ্যাত ব্যক্তিদের একজন হলেন, কাজি ইমাদুদ্দিন কিন্দী; যিনি ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত। তিনি অনেক বড় পাগড়ি পরিধান করতেন। আমি আমার বিশ্বভ্রমণকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাউকে এত বিশাল পাগড়ি পরতে দেখিনি। একদিন আমি জনাবকে মেহরাবের ওপর সমাসীন দেখেছি। তখন দেখলাম, গোটা মেহরাব তার পাগড়ির আড়ালে সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়ে গেছে।

এখানকার আরেকজন গুণী হলেন ফখরুদ্দিন ইবনুর রিগী। তিনি 'রিগা'[১] অঞ্চলের অধিবাসী। যিনি সেসময় স্থানীয় বিচারপতির দায়িত্ব পালন করতেন। বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাকেও অন্যতম জ্ঞানী গণ্য করা হতো।

কাজি সাহেবের একটি মজার ঘটনা

কাজি ফখরুদ্দিন ইবনুর রিগী সাহেবের দাদা ছিলেন 'রিগাহ' অঞ্চলের অধিবাসী। প্রথম জীবনে তিনি জ্ঞানার্জনে নিমগ্ন ছিলেন। এরপর তিনি হিজায সফর করেন। একরাতে তিনি শূন্য হাতে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে পদার্পণ করেন। পকেট শূন্য হওয়ার কারণে প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, রাতটি শহরের বাইরেই কাটিয়ে দেবেন। এরপর সুলক্ষণ পেলে শহরের ভেতরে প্রবেশ করবেন।

---

[১] মরক্কোর একটি প্রাচীন নগরী।

সেমতে, তিনি শহরের মূল ফটকের কাছেই বসে পড়লেন। সন্ধ্যার সময় যখন বাইরের সবাই শহরের ভেতরে প্রবেশ করে ফেলল এবং ফটক বন্ধ করার সময় ঘনিয়ে এলো, তখন দ্বাররক্ষী দেখতে পেল, শুধু তিনি একাই বাইরে পড়ে আছেন এবং ভেতরে আসতে বিলম্ব করছেন। তখন দ্বাররক্ষী বিরক্ত হয়ে বিদ্রুপ করে বলল, 'জনাব কাজি সাহেব, বাইরে কেন বসে আছেন? ভেতরে আসুন।' উত্তরে তিনি বললেন, 'ইনশাআল্লাহ আমি কাজিই হব।

তখন তিনি একটি মাদরাসায় চলে গেলেন। সেখানে অন্যান্য আলেম ও গুণীজনদের মতো দীনি শিক্ষার অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করলেন। ধীরে ধীরে তার অধ্যাপনার সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আশপাশে পঙ্গপালের মতো আলেম ও ফকিহদের ভিড় লেগে গেল। এভাবে ক্রমান্বয়ে একদিন তার পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি মিসর সম্রাটের কানে পৌঁছে যায়।

ঘটনাক্রমে সেসময় আলেকজান্দ্রিয়ার দায়িত্বরত বিচারপতি ইন্তেকাল করেন। সেসময় সেখানে এই বিচারপতির পদ অলংকৃত করার মতো বেশ কজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। নিজ নিজ যোগ্যতা ও মেধার কারণে প্রত্যেকের ব্যাপারেই জনমনে ধারণা ছিল যে, হয়তো তিনিই এ পদে সমাসীন হতে যাচ্ছেন। কিন্তু কাজি ফখরুদ্দিনের দাদা ছিলেন সবার কল্পনার অনেক বাইরে। তার সম্পর্কে কারো মনেই এ ধারণা উদিত হয়নি যে, তিনি এই সৌভাগ্য লাভ করতে যাচ্ছেন।

বিস্ময়করভাবে সবার ধারণার বাইরে সুলতান তাকে কাজি হিসেবে মনোনীত করেন। এ সময় তিনি তার ভৃত্যকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তুমি সবার মাঝে ঘোষণা করে দাও, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ঝগড়া ও কলহের ব্যাপারে ন্যায়বিচার প্রার্থী হয়, তাহলে সে যেন হাজির হয়ে যায়। আর তাকে এক্ষুণি কাজির পদে সমাসীন হতে বলো।

ইত্যবসরে শহরের সকল ফকিহ ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত হন। তারা সবাই অন্য ব্যক্তির ব্যাপারে একমত হন যে, তিনি কাজির পদ অলংকৃত করার সবচেয়ে বেশি যোগ্য। তার উপস্থিতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি এ পদের দাবীদার হতে পারে না। তারা তখন সুলতানকে নিজ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা

করার আহ্বান জানিয়ে একটি দরখাস্ত লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেননা সবাই নবনিযুক্ত বিচারপতির বিরুদ্ধে চলে গেছে।

তাদের সেই পরামর্শ সভায় একজন প্রখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'খবরদার, এমনটি করতে যাবেন না। কেননা আমি এই নতুন বিচারপতির ভাগ্যরেখা মিলিয়ে দেখেছি। জ্যোতিষ শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এ লোকটি একনাগাড়ে ৪০ বছর দায়িত্বভার পালন করবে।'

ওই জ্যোতিষীর এই আগামবার্তার কারণে প্রত্যেকেই তখন পূর্বের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। পরবর্তীতে তারা আর সুলতানের কাছে কোনো দরখাস্ত পেশ করেনি। আর কোনো চেষ্টাও করে দেখেনি। পরবর্তীতে দেখা গেছে, জ্যোতিষী যেমনটি বলেছিল, ঠিক তাই ঘটেছে। তিনি সারাজীবন ওই পদের ওপর সমাসীন থেকে দেশে আইন ও সুবিচারের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আলেকজান্দ্রিয়ার গুণীজনদের তালিকায় আরো কিছু নাম হলো, ওয়াজিহুদ্দিন সনহাজি ও শামসুদ্দিন। তারা দুজনই জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সুখ্যাতির অধিকারী ছিলেন।

আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েকজন আধ্যাত্মিক বুযুর্গ

আলেকজান্দ্রিয়ার অন্যতম সজ্জন বুযুর্গ হলেন, শায়খ আবু আবদুল্লাহ ফেইজি। তাকে সেসময়কার শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ মনে করা হতো। তার সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি যখন নামায শেষে সালাম ফেরাতেন তখন গায়েব থেকে তার সালামের জবাব আসত।

সেখানে আরেকজন বুযুর্গ ছিলেন। যিনি শায়খ খলিফা নামে প্রসিদ্ধ। তিনিও অনেক বড় আলেম দুনিয়াত্যাগী খোদাভীরু বুযুর্গ ছিলেন। তার অসংখ্য কাশফ ও কারামত রয়েছে।

শায়খ খলিফার কারামত ও স্বপ্নযোগে নবীজির দর্শনলাভ

আমাকে কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি জানিয়েছেন যে, একবার শায়খ খলিফা স্বপ্নে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পান যে, তিনি বলছেন, 'তুমি আমার যিয়ারতে চলে এসো।'

ঘুম থেকে জেগেই তিনি মদিনার পথ ধরলেন। সফর শেষে মসজিদে নববীর বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করলেন। প্রথমে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরুদ ও সালাম পাঠ করলেন। এরপর একটি স্তম্ভের সঙ্গে হেলান দিয়ে দু হাঁটুর ওপর মাথা রেখে সুফিয়ায়ে কেরামের তরিকা অনুসারে মুরাকাবায় ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে দেখতে পেলেন, সামনে একটি দস্তরখানে চারটি রুটি, এক পেয়ালা দুধ ও একহড়া খেজুর রয়েছে। তখন তিনি সেখান থেকে খাবার খেলেন এবং সফরসঙ্গীদেরও খাইয়ে দিলেন। এরপর আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে এলেন। সেবছর তিনি হজ করেননি।

আরো এক বুযুর্গের কারামত, আমার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

আলেকজান্দ্রিয়া বসবাসকারী আল্লাহঅন্তপ্রাণ মনীষীদের তালিকার আরেকটি নাম হলো, বুরহানুদ্দিন আ'রাজ। তিনি ছিলেন যুগের বিরল মনীষী, গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেম ও খোদাভীরু বুযুর্গ। তাকে ওই যুগের শীর্ষস্থানীয় আবেদ ও যাহেদ মনে করা হতো। আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থানকালে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেছি। একনাগাড়ে তিন দিন আমি তাঁর আতিথেয়তাও গ্রহণ করেছি। তিনি ছিলেন অন্যতম সাহিবে কারামত বুযুর্গ।

একদিন আমি তাঁর দরবারে হাজির হলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি দেশে দেশে ঘুরতে পছন্দ করো।'

আমি বললাম, 'জি, আমার কাছে ভ্রমণ অত্যন্ত প্রিয়।' যদিও সেসময় আমার মনে ভারতবর্ষ ও চীনের মতো দূর প্রাচ্যের দেশগুলোতে যাওয়ার তিল পরিমাণ কল্পনাও ছিল না।

তিনি বললেন, 'আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমার ভাই ফরিদুদ্দিনের সঙ্গে ভারতবর্ষে, রুকনুদ্দিন যাকারিয়ার সঙ্গে সিন্ধে ও বুরহানুদ্দিনের সঙ্গে চীনে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। তাদের কাছে তখন আমার সালাম পৌঁছে দেবে।'

তার মুখ থেকে এমন কথা শুনে আমি তখন বিস্মিত হয়ে পড়ি। সেসময় ওই দেশগুলোর দূরত্ব কল্পনা করে আমার শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়করভাবে পরবর্তী কালে শায়খের সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে

বাস্তবায়িত হয়েছিল। আমি সেই প্রান্তিক দেশগুলোতে পরিভ্রমণ করার সুযোগ লাভ করি। আমি যখন সেসব দেশে যাই, তখন ওই বুযুর্গদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতও ঘটেছে। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি তাঁর সালাম নিবেদনও করেছি।

বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে তিনি পাথেয় হিসেবে আমাকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিয়েছিলেন। আমি সেই দেরহামগুলোকে যত্নের সঙ্গে রেখে দিই। যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো আমার কাছে ছিল, আমি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অভাবের সম্মুখীন হইনি। সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো কোনো দিন ব্যয় করার প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। সামুদ্রিক এক সফরে হিন্দুস্তানের কাফের দস্যুরা আমাদের ওপর আক্রমণ করে আমার সকল সামানপত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। সেসময় তারা আমার সেই পরম যত্নের স্বর্ণমুদ্রাগুলোও ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

আলেকজান্দ্রিয়ার আরেক বুযুর্গ হচ্ছেন শায়খ ইয়াকুত হাবশী। তিনিও অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি হলেন শায়খ আবদুল ইবাদ মুরসির শিষ্য, যিনি হযরত আবুল হাসান শাযেলী রহ.-এর কাছে বাই'আতাবদ্ধ ছিলেন। হযরত শাযেলী রহ.-এর কারামতের কথা কেবা না জানে! জনগণ তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসতো।

শায়খ আবুল হাসান শাযেলী রহ.-এর বিস্ময়কর মৃত্যু

শায়খ ইয়াকুত নিজ সনদে নিজ মুরশিদ শায়খ আবুল আব্বাস মুরসি থেকে হযরত শাযেলী রহ.-এর কারামত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রতি বছর হজ করতেন। মিসরের উঁচু অঞ্চলের[১] পথ ধরে হিজাযে যেতেন। রজব মাস থেকে শুরু করে হজ শেষ করা পর্যন্ত মক্কা মুকাররমায় বাইতুল্লাহর ছায়ায় অবস্থান করতেন। এরপর রওযা মুকাদ্দাসে হাজির হয়ে যিয়ারত শেষে নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে আসতেন।

জীবনের শেষ বছর যখন তিনি হজের উদ্দেশে রওনা হন, তখন তিনি নিজ শহরের বাইরে বেরিয়ে এসে খাদেমকে বললেন, একটি কুড়াল, একটি

---

[১] আরবিতে বলা হয়, صعيد مصر। এটি হলো মিশরের দক্ষিণাঞ্চল। দক্ষিণে নুবিয়া ও উত্তরে নিম্ন মিশরের মধ্যবর্তী নীলনদের দু পাশের এলাকা নিয়ে এই 'উচ্চ মিশর' গঠিত। –অনুবাদক

টুকরি, খানিকটা কর্পূর আর মাইয়েতের কাফন-দাফনের আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে নাও।

খাদেম উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আমার মনিব, আপনি এই সামানগুলো কেন নিয়ে আসতে বলছেন?

উত্তরে তিনি বললেন, হুমাইসারা[১] পৌঁছুলে উত্তরটি পেয়ে যাবে।

খাদেমকে সঙ্গে নিয়ে শায়খ আবুল হাসান সেই স্থানে পৌঁছুলে সবার আগে তিনি গোসল সারেন। এরপর দুই রাকাত নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। দ্বিতীয় রাকাতের শেষ সেজদায় তাঁর প্রাণপাখি দেহপিঞ্জিরা ছেড়ে উড়ে চলে যায়।

তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। আমি তার মাজার যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এপিটাফের ওপর তাঁর নাম ও হযরত হাসান বিন আলী রা. থেকে তাঁর বংশপরম্পরা লেখা রয়েছে।

আমরা আগেই বলেছি যে, শায়খ প্রতিবছর উচ্চ মিসরের পথ ধরে লোহিত সাগর হয়ে হিজায গমন করতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি নৌযানে আরোহণের পর থেকে প্রতিদিন স্বরচিত 'হিযবুল বাহার'[২] পাঠ করতেন। তাঁর শিষ্যগণ শায়খের সেই আমল এখনো পালন করে থাকেন।

আলেকজান্দ্রিয়ায় খ্রিস্টানদের দাপট

২৭ হিজরিতে আমরা যখন মক্কা মুকাররমায় ছিলাম; তখন সেখানে বসে আমরা আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর একটি দুঃসংবাদ পাই। তা হলো, সেসময় এখানকার মুসলমান ও খ্রিস্টান ব্যবসায়ীদের মাঝে দাঙ্গা হয়েছিল। ওই সময় এখানকার নগরপিতা ছিলেন কুরকি নামের এক লোক। লোকটি খ্রিস্টানদের প্রশ্রয়ে অতিরঞ্জিত অনাচার করে বেড়াত। দাঙ্গা লাগানোর পর লোকটি রোম সাম্রাজ্যের কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে।

এরপর লোকটি মুসলমানদেরকে নগরীর ফটকের দু পাশের প্রাচীরের মাঝখানে একত্র হওয়ার নির্দেশ দেয়। যখন সমস্ত মুসলমান সেখানে একত্র হয় তখন সে দণ্ড হিসেবে সবকটি ফটক বন্ধ করে ফেলে।

---

[১] উচ্চ মিশর তথা মিশরের দক্ষিণাঞ্চলের একটি বিখ্যাত জায়গা। এখানেই শায়খ আবুল হাসান শাযলী রহ.-এর কবর অবস্থিত। যা পরিদর্শনে প্রত্যহ জনতার ঢল নামে। –অনুবাদক

[২] বিশেষ দোয়া সংকলন। সাগরযাত্রার নিরাপত্তার জন্যে তিনি অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু দোয়া-দুরুদ সংকলন করেছিলেন। –অনুবাদক

তার এই পদক্ষেপের কারণে মুসলমানগণ বিব্রত বোধ করে। এক পর্যায়ে তাদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তারা তখন ফটক ভেঙে ফেলে এবং নগরপিতার কোয়ার্টারের ওপর আক্রমণ করে। তখন সে পালিয়ে কেল্লার ভেতরে আশ্রয় গ্রহণ করে এং সেখান থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে থাকে।

এ সংবাদ কবুতরের মাধ্যমে মালিক নাসিরের কাছে পৌছে যায়। তখন সে 'জামালি' নামের একজন উর্ধ্বপদস্থ সামরিক অফিসার প্রেরণ করে। লোকটি আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে রওনা হয়। তার কিছুক্ষণ পরেই 'তাওগান' নামক আরেক অফিসারকেও প্রেরণ করে। এই অফিসারটি ছিল চরম স্বৈরাচারী ও গোয়াড়। শ্রুতি আছে যে, লোকটি সূর্যপূজারী ছিল। এই দুই অফিসার আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে পৌছে সেখানকার বড় বড় মুসলিম নেতা ও শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীদেরকে, বিশেষ করে কুইবেক পরিবারসহ অন্যান্যদের গ্রেফতার করে। তাদের প্রচুর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। কাজি ইমাদুদ্দিনের গলায় বেড়ি ঝুলিয়ে দেয়। দুই সারিতে ৩৬ জন মুসলমানকে শূলিতে চড়িয়ে ফাঁসি দেয়। এরপর তাদের প্রত্যেককে শরীরের মাঝবরাবর দ্বিখণ্ডিত করে। এই নির্মম হত্যাযজ্ঞটি শুক্রবার ঘটিত হয়। লোকেরা জুমার নামায আদায় করার পর নিহতদের সমাধি দেখতে পায়।

এই নির্মম বর্বরতা দেখে তাদের হৃদয় ভেঙে খানখান হয়ে যায়। শূলিবিদ্ধদের মাঝে একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীও ছিলেন। লোকেরা যাকে ইবনে রাওয়াহা নামে চিনতো। সেই সওদাগরের বাড়িতে একটি অস্ত্রশালাও ছিল। যেখানে প্রচুর অস্ত্র সংরক্ষিত ছিল। বিপদজনক পরিস্থিতিতে একশ জন ব্যক্তিকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়ে দেওয়ার সক্ষমতা তার ছিল। তার মতো আলেকজান্দ্রিয়ার অনেক লোকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এ ধরনের বিপুল অস্ত্রশস্ত্রের গুদাম ছিল। ওই দুই সামরিক কর্মকর্তার সম্মুখে ঘটনাচক্রে ইবনে রাওয়াহার মুখ থেকে এ কথা বেরিয়ে গিয়েছিল যে,

'আমি হলাম এ শহরের যিম্মাদার। এখানকার যে কোনো ফেতনা-ফাসাদ নির্মূল করার দায়ভার আমার কাঁধে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্যে কোনো সামরিক বাহিনী গঠন করার প্রয়োজন দেখা দিলে তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার সক্ষমতা আমার রয়েছে।'

ওই দুই সামরিক কর্মকর্তার মনে হলো, ইবনে রাওয়াহার এ কথার মাঝে বিদ্রোহের সুর রয়েছে। তারা তার কথাগুলোর বিকৃত অর্থ ধরে নিয়ে জিজ্ঞেস করল যে, 'তাহলে কি তোমার মনে সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ইচ্ছে রয়েছে?' এই অজুহাতে তারা তাকে হত্যা করে ফেলল। অথচ লোকটির মনে এ জাতীয় কোনো ইচ্ছেই ছিল না। তার বলার উদ্দেশ্য ছিল, আমি সুলতানের কল্যাণকামী এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে তাকে সহায়তা করতে পূর্ণ প্রস্তুত।

জনৈক বুযুর্গের কারামত

আমি আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থানকালে লোকমুখে শুনেছি যে, এখানে একজন বুযুর্গ বাস করেন। যিনি ব্যক্তিগতভাবে খুবই সজ্জন, নেককার, ইবাদতকারী, দুনিয়াত্যাগী ও আল্লাহঅন্তপ্রাণ। সারা দুনিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিভৃত এক প্রান্তে নিবাস পেতেছেন। তার নাম, আবু আবদুল্লাহ আল মুরশিদি। তাকে তার জনৈক মুরিদ একটি খানকা বানিয়ে দিয়েছিল। সেখানেই তিনি নিভৃত জীবনযাপন করতেন।

ওই বুযুর্গের সঙ্গে কোনো সহচর বা সেবক নেই। তার দরবারে কখনই আমির-উমারা, গোত্রপতি-নগরপতিদের আগমন হতো না। মহান আল্লাহ তার মাধ্যমে অসংখ্য কাশফ-কারামত প্রকাশ করেছেন।

তার কাছে কেউ যে জিনিস খাওয়ার নিয়ত করে আগমন করত, তাকে তিনি সেটাই আহার করাতেন। আগমনকারীর মনে শিরনি, ফল; যাই ইচ্ছে হোক, তিনি তা খাইয়ে দিতে পারতেন। অধিকাংশ সময় মানুষ অমৌসুমী জিনিসের নিয়ত করে আসত। আল্লাহর কী কুদরত, তারা তার কাছে তাদের নিয়তের জিনিস পেয়ে যেত! অনেক সময় বড় বড় ফকিহরা তার কাছে কোনো পদ পেতে বা কোনো আর্থিক সহায়তা পেতে শরণাপন্ন হতো। তিনি তখন কাউকে কোনো পদে অভিষিক্ত করে দিতেন। আবার কাউকে তার পদ থেকে অপসারিতও করতেন।

মোটকথা, তার মুখ থেকে যাই বেরোত, বাস্তবায়িত হয়ে যেত। আমি তার সেই ঘটনাগুলো এত প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তির কাছ থেকে শুনেছি যে, সেটি মুতাওয়াতিরের স্তরে পৌঁছে গেছে। কাজেই বিষয়টি নিয়ে সংশয়-সন্দেহ করার অবকাশও নেই। তাঁর খেদমতে মালিক নাসির অসংখ্যবার এসেছিল।

ভ্রমণপিয়াসী মন কতখানে যে আমায় নিয়ে গেল

এজন্যে আমি আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর সেই বুযুর্গের খেদমতে হাজির হওয়ার অভিপ্রায়ে রওনা হলাম। অনেকখানি পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে 'ফারওয়াজা' নামের বিশাল গ্রামে এসে হাজির হলাম। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সেই গ্রামে যেতে অর্ধদিন সফর করতে হয়েছে। এটি বেশ বড় থানাশহর। এ অঞ্চলের জন্যে স্বতন্ত্র বিচারক, গভর্নর ও পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে। আমি স্থানীয় লোকদেরকে সচ্চরিত্রবান ও আত্মমর্যাদাশীল পেয়েছি। এখানে এসে যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, তন্মধ্যে কাজি সফিউদ্দিন, খতিব ফখরুদ্দিন, শীর্ষস্থানীয় আলেমদের মধ্য হতে যাইনুদ্দিন মুবারক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আবদুল ওয়াহহাব সাহেব—যিনি অনেক বড় জ্ঞানী, আবেদ, যাহেদ ও বুযুর্গ—তাঁর সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। এ অঞ্চলের পরিদর্শক যাইনুদ্দিন ইবনুল ওয়ায়েয আমাকে আপ্যায়ন করান। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার জন্মস্থানের আয় কত?' আমি উত্তরে বলে, '১২ হাজার স্বর্ণমুদ্রা।' তখন তিনি প্রচণ্ড বিস্মিত হন। বলেন, এই থানাশহরটি থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রতি মাসে ৭২ হাজার স্বর্ণমুদ্রার আয়কর জমা হয়। মিসরের আয় বেশি হওয়ার বৃহত্তম উৎস হলো, এই নগরীটি। কেননা এখানকার সমুদয় অর্থ সেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়।

দামনাহুর নগরীতে আগমন ও আমার অনুভূতি

'ফারওয়াজা' নগরী থেকে বেরিয়ে 'দামানহুর' নগরীতে এসে পৌঁছুই। নগরীটির রূপ-সৌন্দর্য আমাকে বিমুগ্ধ করে। আমি যদি নগরীটিকে সমুদ্র তীরবর্তী সমস্ত শহরের 'মা' অভিহিত করি, তাহলে অন্যায্য হবে না। কেননা এই নগরীটিকে কেন্দ্র করেই সমুদ্রের তীরবর্তী অন্যান্য নগরী গড়ে ওঠেছে। সে যুগে এ নগরীর বিচারপতি ছিলেন, ফখরুদ্দিন ইবনে মিসকিন। তিনি ছিলেন একজন শাফেয়ী ফকিহ। যখন আলেকজান্দ্রিয়ার বিচারপতির পদ থেকে ইমাদুদ্দিন কিন্দীকে অপসারণ করা হয় তখন তার স্থানে তাকেই বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। আমি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে এ তথ্য পেয়েছি যে, ওই পদটি বগলদাবা করার জন্যে ফখরুদ্দিন বিন মিসকিন ২৫ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছিল।

সবুজ শ্যামল 'ফাওয়া' নগরীর কোলে

এখান থেকে আমরা ফাওয়া[১] নগরীতে এসে হাজির হই। শহরের অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য আমার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। প্রচুর ঘন পত্র-পল্লবে সুসজ্জিত অসংখ্য বাগান শহরটিকে অনন্য করে তুলেছিল। এখানে প্রখ্যাত তাপস শায়খ আবুন নাজাত রহ.-এর মাজার অবস্থিত। যার বুযুর্গির সুখ্যাতি দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তাকে বিভিন্ন দেশের 'তথ্যধারী' বলা হতো। এখান থেকে শায়খ আবদুল্লাহ মুরশিদির খানকা—যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বাসনায় আমি এতদূর ছুটে এসেছি—খুবই কাছে। খানকা ও শহরটির মাঝখানে একটি দ্বীপ রয়েছে। আমি এই নগরী থেকে বেরিয়ে দ্বীপ পার হয়ে আসরের নামাযের পূর্বে খানকায় এসে হাজির হই।

আমি যেসময় শায়খ মুরশিদির দরবারে এসে হাজির হই, সেসময় খাসিকিয়্যাহ রাজবংশের আমির সাইফুদ্দিন ইয়ালমালাক তাঁর দরবারে হাজির ছিলেন। খানকার বাইরে তিনি বেশ বড় একটি সৈন্যদল সঙ্গে নিয়ে অবতরণ করেছিলেন। যখন আমি তার দরবারে হাজির হয়ে সালাম নিবেদন করি তখন তিনি উঠে আমার সঙ্গে মুয়ানাকা করেন এবং তৎক্ষণাৎ খাবার হাজির করে আমার মেহমানদারি করেন। এ সময় তিনি কালো পশমের তৈরি একটি জুব্বা পরিহিত ছিলেন।

আসরের নামাযের জন্যে জামাত দাঁড়ালে তিনি আমাকে ইমাম বানিয়ে দেন। আমি যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, নিয়মিত প্রতি বেলায় ইমামতির দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হয়েছে।

রাতে যখন আমার চোখে ঘুমের আবহ চলে আসে তখন তিনি আমাকে বলেন, 'ছাদে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন।' তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। নিচু স্থানগুলো প্রচণ্ড গরমে তাতিয়ে ছিল। আমি আমির সাইফুদ্দিনকে বললাম, 'আপনিও আমার সঙ্গে ছাদে চলুন।' তিনি বললেন, 'আমি সবসময় আমার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটিতেই শয্যা গ্রহণ করি।'

---

[১] ইয়াকুত রহ. মুজামুল বুলদানের মাঝে এ নগরীর নাম লিখেছেন, 'ফুওয়া' (فُوَّة)। তিনি লিখেছেন, এ নগরীটি নীলনদের পাদদেশে অবস্থিত। সমুদ্র থেকে যার দূরত্ব পাঁচ থেকে ছয় ফারসাখ বা ক্রোশ। এখানে প্রচুর বিপণিবিতান ও ঘন খেজুর বাগান রয়েছে। –মু'জামুল বুলদান : ৪/২৮০

আমি শোয়ার জন্যে ছাদের ওপর উঠে এলাম। সেখানে চামড়ার এব বালিশ, একটি মাদুর, অযু করার জন্যে এক মটকা পানি এবং পান কর জন্যে এক কলসি পানি পূর্ব থেকে প্রস্তুত দেখতে পাই। আমি সেই মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ি।

শায়খ মুরশিদির বিস্ময়কর কারামত

খানকার ছাদে ঘুমিয়ে পড়ার পর স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি অনেক বড় একটি পাখির পিঠে সওয়ার হয়েছি। পাখিটি প্রথমে আমাকে কেবলার দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এরপর আমাকে ডান দিকে অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলে, অতঃপর বাম দিকে অর্থাৎ দক্ষিণাঞ্চলে নিয়ে যায়। এরপর আমি অনেক দূর পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সবশেষে পাখিটি আমাকে একটি অন্ধকার সবুজ প্রান্তে নামিয়ে দেয়। স্বপ্নটি দেখে আমি হয়রান হয়ে পড়ি। মনে মনে ভাবনায় পড়ে যাই, তাহলে কি শায়খের কারামত সম্পর্কে যেই কথাগুলো প্রসিদ্ধ; সেটাই কি আজ আমার ব্যাপারেও বাস্তব হলো। আমার স্বপ্নটি কি তার সেই কাশফেরই প্রতিফলন?

এরপর ফজরের ওয়াক্তে আমার ঘুম ভেঙে যায়। এ বেলায়ও নামাযের জন্যে শায়খ আমাকে এগিয়ে দেন। নামাযের পর আমির ইয়ালমালাক বিদায়ের উদ্দেশ্যে হাজির হয়। তিনি তাকে বিদায় দেন। এরপর উপস্থিত সমস্ত শুভ্যানুধ্যায়ীদেরকেও বিদায় দেন। সবাইকে নাশতা করার জন্যে ছোট ছোট রুটির টিক্কা প্রদান করেন।

আমি ইশরাকের নামায শেষ করে বসে আছি। তখন শায়খ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি হাজির হলাম। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছো?' আমি তাকে স্বপ্নের পূর্ণ বিবরণ জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি বললেন, 'তুমি প্রথমে হজ ও নবীজির কবর যিয়ারতের সৌভাগ্য হাসিল করবে। এরপর তুমি ইয়ামান, ইরাক, তুরস্ক পরিভ্রমণ করবে। সেখানে তুমি দীর্ঘদিন অবস্থান করবে। হিন্দুস্তানে আমার ভাই দিলশাদ হিন্দির সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে। সেখানে তুমি একটি বিপদের সম্মুখীন হবে। যার থেকে তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন।'

একথা বলে তিনি আমাকে কয়েকটি টিক্কা ও বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার বৈশ্বিক সফরে বেরিয়ে

পড়ি। শায়খের বরকতে পরবর্তী সফর আমার জন্যে হয়ে উঠে খুবই আরামপ্রদ। পদে পদে আমি নানা বরকতে ঋদ্ধ হতে থাকি।

আমি আমার দীর্ঘ যাত্রায় অনেক বড় বড় মনীষী ও বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি; কিন্তু তার মতো দ্বিতীয় কোনো বুযুর্গ অন্তত আমার চোখে পড়েনি। তবে হিন্দুস্তানের কামেল বুযুর্গ অলি সাইয়েদি মুহাম্মাদ আল মাওলাকে অবশ্যই তার থেকে ব্যতিক্রম রাখতে হবে।

কায়রোর পথে যাত্রা

আমার পরবর্তী গন্তব্য হলো কায়রো।

শায়খ ইবনে আবদুল্লাহ আল মুরশিদি থেকে বিদায় আমি 'নাহরারিয়া'[১] নগরীতে প্রবেশ করি। চমৎকার শহর। সর্বত্র নতুনত্বের ছাপ। নতুন বসতি, নতুন পথঘাট। বাজারটিকে খুবই প্রাণবন্ত ও জমজমাট মনে হলো। এখানকার নগরপতির নাম, সাদী। অনেক উঁচু মাপের ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার ছেলে ভারতনৃপতির সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। যথাস্থানে তাকে নিয়ে আলোচনা করব।

নগরটির বিচারপতি হলেন কাজি সদরুদ্দিন সুলাইমান মালেকী। তিনি মালেকী মাযহাবের একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম। ইতিপূর্বে তিনি মালিক নাসিরের প্রতিনিধি হয়ে ইরাক সফর করেছেন এবং মরক্কোর বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তার দৃষ্টিনন্দন মুখোচ্ছবি ও মুগ্ধকর অবয়ব সত্যি দেখার মতো। স্থানীয় জামে মসজিদের খতিব শরফুদ্দিন সাখাবিও অত্যন্ত সজ্জন মানুষ।

প্রাচীন নগরী 'আবয়ার' ও সেখানকার বিস্ময়কর প্রথা

এরপর আমি 'আবয়ার' নগরী অভিমুখে যাত্রা করি। এটি একটি প্রাচীন নগরী। সবুজ-শ্যামলিমাময় প্রাণবন্ত নগরী। আড়ম্বরপূর্ণ অনেকগুলো মসজিদ নগরীর শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। 'নাহরারিয়া' নগরী থেকে যার দূরত্ব খুব একটা নয়। এই দুই নগরীর মাঝখান দিয়ে নীলনদ বয়ে গেছে। এখানে অতি উৎকৃষ্টমানের কাপড় তৈরি হয়। সেই উন্নত কাপড়গুলো শাম, ইরাক ও

---

[১] আরবি নুসখায় এ জায়গার নাম এসেছে, নাহরারিয়্যাহ। আরবিতে نَحْرَارِيَّة। ইবনে মামাতির গ্রন্থে উচ্চারণ এসেছে, নাহরিরিয়্যাহ। আরবিতে نَحْرِيرِيَّة। উইকিপিডিয়ার তথ্যানুসারে এখন সে অঞ্চলটির নাম হয়েছে, মুহাম্মাদ নাজিব। ১৯৫৩ সালের ১৮ জুন মিশর একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হবার পর প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন মুহাম্মাদ নাজিব। তিনি এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জামাল আবদুন নাসিরের মতো তিনিও মিশরীয় বিপ্লবের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। –অনুবাদক

মিসরে প্রচুর দামে বিক্রি হয়। বিস্ময়কর বিষয় হলো, নাহরারিয়া নগরী যদিও আবয়ারের খুব কাছে; কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা এখানকার তৈরি কাপড়গুলো একেবারেই পছন্দ করে না। এখানকার বিচারপতি ইজ্জুদ্দিন মালিজি শাফিয়ীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি তাকে আচরণে বিনম্র ও মর্যাদায় সুউচ্চ পেয়েছি। তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে শাবান মাসের শেষ দিনে। এ দিনটিকে স্থানীয় লোকেরা يوم ارتقاب هلال رمضان তথা 'রমযানের চাঁদ দেখার দিন' বলে। ২৯ শে শাবানে স্থানীয় লোকদের প্রথা হলো, এদিন নগরীর সমস্ত ফিকহবিদ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আসর নামাযের পর বিচারপতির চত্বরে জমায়েত হন। ফটকের ওপর এক ব্যক্তি আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিধান করে দাঁড়িয়ে থাকে। যাকে نقيب المتعممين [নক্বীবুল মুতা'আম্মিমীন] বলা হয়ে থাকে। লোকটির গায়ে সরকারি স্টিকারও লাগানো থাকে। যখনই কোনো ফকিহ বা নেতা গোছের লোক আগমন করে তখুনি সেই ঘোষক তার আগমনের সংবাদ জানিয়ে উচ্চ আওয়াজে তার নাম ঘোষণা করে। বলে, 'বিসমিল্লাহি সাইয়েদিনা অমুক এসেছেন।' এর মাধ্যমে কাজি সাহেবসহ পূর্ব থেকে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অবহিত হন যে, কে এসেছে? তখন কাজি সাহেবসহ উপস্থিত সুধীমণ্ডলী তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ঘোষক তখন তাকে উপযুক্ত আসনে বসিয়ে দেয়।

প্রত্যাশিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হওয়ার পর কাজি সাহেব ও শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বাহনের ওপর আরোহণ করে রওনা হন। শহরের সমস্ত নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাদের পেছনে পেছনে একটি উঁচু স্থানে আরোহণ করেন। তার জন্যে এমন একটি স্থান নির্বাচন করা হয় যেখান থেকে সহজেই আকাশের বুকে হাস্যোজ্জ্বল চাদের মায়াবি মুখখানা দেখা যাবে। পূর্ব থেকেই সেখানে বসবার জন্যে গালিচা ইত্যাদি পাতা থাকে। তারা সেখানে আরোহণ করে নতুন চাঁদের ক্ষীণ মুখখানা দর্শন করে। অতঃপর সেখানেই মাগরিবের নামায আদায় করে ফিরে আসে। এ সময় প্রত্যেকের হাতে মশালবাতি, ফানুস ও ঝাড়বাতি শোভা পায়। শহরের সমস্ত রাজপথের ধারে দেখা যায় যে, দোকানদাররা নিজেদের দোকানগুলোতে আলোকসজ্জা করছে। সবাই তখন কাজিকে তার ঘর পর্যন্ত সঙ্গ দেয়। এরপর সেখান থেকে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে আসে। প্রতিবছর এ প্রথাটি ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয়।

মাহাল্লাতুল কাবিরার একটি খানকায় কিছুক্ষণ

এরপর সেখান থেকে মাহাল্লা কাবিরা নগরীর দিকে যাত্রা করি। এটি অত্যন্ত বিস্তৃত, জনবহুল ও সুন্দর নগরী। নামটির মাঝে বেশ সারল্য ও স্বচ্ছতা রয়েছে। এই শহরটিতে যেই কাজি দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি পদবির বিচারে প্রধান কাজি। অদ্রূপ এই শহরটির গভর্নরও পদমর্যাদার বিচারে প্রধান গভর্নর। আমি যে সময় এখানে প্রবেশ করি তখন সেখানে দায়িত্ব পালন করছিলেন কাযিউল কুযাত ইয্যুদ্দিন ইবনুল আশমারিন। অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি এখান থেকে দুই ফারলং দূরবর্তী একটি বাগানে অবস্থান করছিলেন। যার কারণে এখানে তার ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন আবুল কাসেম বিন বনুন মালিকি তিউনিসি। ওদিকে 'মানুফ' নগরীর কাজির দায়িত্ব পালন করছিলেন শারফুদ্দিন দিময়ারি। আমি সেই ভারপ্রাপ্তদ্বয়ের সাহচর্যে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে সেই বাগানে গমন করি। সেখানে আমি এক দিনের আতিথেয়তাও গ্রহণ করি। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে অবগত হই যে, এখান থেকে একদিনের দূরত্বে বুরলুস ও নাস্তারু নগরীদ্বয় অবস্থিত। এই নগরীগুলো নেককার বুযুর্গদের আবাসভূমি হিসেবে খুবই পরিচিত। সাহেবে কাশফ বুযুর্গ শায়খ মারযুক রহ.-এর মাজার সেখানেই অবস্থিত।

তার কাছ থেকে তথ্য পেয়ে আমি সেখানে উপস্থিত হই। শায়খ মারযুক রহ.-এর মাজারে হাজির হয়ে দেখতে পাই, এটি ঘন খেজুরের প্রচুর বৃক্ষ শোভিত একটি বাগানে অবস্থিত। চারপাশে ফল-ফসলের প্রচুর সমারোহ। আকাশে বিভিন্ন সামুদ্রিক পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। একটি বিশেষ প্রজাতির মাছ—যাকে স্থানীয় ভাষায় 'বিলুরী' বলা হয়—সর্বত্র সেই মাছের ছড়াছড়ি।

এখানে এসে 'মালতিন' নামের একটি মহল্লা পেলাম। এই মহল্লাতে অনেক তাপস, মনীষী বসবাস করেন। এটি একটি সাগরের তীরে অবস্থিত। নীল নদসহ আশপাশের বিভিন্ন নদীর পানি এ সাগরেই নেমে আসে। ছোট্ট এই সাগরটি 'বুহায়রায়ে তিন্নিস ও নাসতারু' নামে পরিচিত। আমি সাগরের তীরে শায়খ শামসুদ্দিন কালায়ী রহ.-এর খানকার আতিথেয়তা গ্রহণ করি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি অত্যন্ত সজ্জন বুযুর্গ। কোনো এককালে এই 'তিন্নিস' নগরী ছিল অত্যন্ত জনবহুল বৃহৎ জনপদ। কালক্রমে সেটি এখন অনেকটা বিরান হয়ে গেছে।

দিময়াত নগরীতে

এরপর আমি রমলা নগরীতে উপস্থিত হই। সেখান থেকে দিময়াত নগরীর পথ ধরি। এটি অত্যন্ত বিস্তৃত ও দৃষ্টিনন্দন নগরী। এখানকার ঘরবাড়ি ও বাগ-বাগিচাগুলো আমার চোখে বিস্ময়কর বিন্যাসে নির্মিত মনে হলো। নগরীতে সৌন্দর্যের কোনো কমতি নেই। বাগানে বিচিত্র ফল-ফসল শোভা পাচ্ছে। যাদের বাড়িগুলো নীলনদের পাড়ে নির্মিত তাদেরকে দেখলাম, তারা বালতি দিয়ে নীলনদ থেকে পানি তুলে ব্যবহার করছে। অধিকাংশ বাড়িগুলোকে দেখেছি যে, বাড়ির একাংশ পানির ওপর ভাসমান। যার কারণে তারা অনায়াসে নিজ বাড়ি থেকে নীলনদে নেমে গোসল সেরে নিচ্ছে।

নগরী জুড়ে প্রচুর কলাগাছ শোভা পাচ্ছে। স্থানীয় লোকেরা নৌকায় চেপে কলা বিক্রি করতে মিসরে নিয়ে যায়। এছাড়াও প্রতিটি বাড়িতে প্রচুর সংখ্যক ভেড়া দেখতে পেলাম। দিন-রাতে অলি-গলিতে ভেড়ার পাল বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। প্রচুর পরিমাণ বকরিও রয়েছে। দিময়াত নগরী সম্পর্কে জনমুখে চর্চিত রয়েছে যে, এ নগরীটির প্রাচীর হলো মিষ্টান্ন আর কুকুর হলো বকরি।

কোনো আগন্তুক এ নগরীতে এলে নিয়ম রয়েছে যে, স্থানীয় গভর্নরের অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ এখান থেকে বের হতে পারবে না। যার কারণে তাদেরকে তার থেকে মোহরাঙ্কিত চিরকুট নিয়ে নিতে হয়। ফটকের পাহারাদারের কাছে চিরকুট প্রদর্শন করলে সে বাহককে বাইরে বেরোবার অনুমতি দেবে। স্থানীয় নাগরিকদের পরিচয়ের জন্যে তাদের বাহুতে অমোচনীয় সিলমোহর অঙ্কিত রয়েছে। বাইরে বেরোতে হলে তাদেরকেও বাহুর সিলমোহর প্রদর্শন করতে হয়।

এখানকার আকাশে প্রচুরসংখ্যক সামুদ্রিক পাখি ওড়াওড়ি করে বেড়ায়। পাখিগুলোকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট মনে হলো। এখানকার মহিষের দুধ খুবই সুস্বাদু। এমন স্বাদের দুধ অন্য কোথাও পাইনি। এখানে প্রচুর পরিমাণে বুরি নামক সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। বিক্রির জন্যে এখান থেকে শাম ও রোমের বিভিন্ন এলাকায় রপ্তানি করা হয়। সমুদ্র ও নীলনদের মাঝখানে দিময়াত নগরীর বাইরে একটি ছোট্ট দ্বীপ রয়েছে। যা 'বরযখ' নামে পরিচিত। সেখানে একটি খানকা ও মসজিদ রয়েছে। যার তত্ত্বাবধায়ক হলেন শায়খ

বিন কুফল। তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে আমি শুক্রবার রাতে উপস্থিত হই। তখন দেখেছি, তার সঙ্গে একদল নিঃস্ব অসহায় লোক রয়েছেন। লোকগুলোকে অত্যন্ত নেককার পরহেযগার মনে হলো। তারা রাতভর কুরআন কারিমের তেলাওয়াত, ইবাদত ও যিকিরে মগ্ন ছিলেন।

দিময়াত নগরীটি এখন যেখানে অবস্থিত এটি হলো নতুন দিময়াত। যা জনবহুল ও প্রাণবন্ত নগরী। প্রাচীন দিময়াত নগরীটি বহুকাল আগে বিরান হয়ে গেছে। মালিক সালিহের যুগে ফিরিঙ্গিরা সেই নগরীটিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে ফেলেছিল।

তায়েফা ও কলন্দরিয়া নগরীতে

তায়েফা নগরীতে শায়খ জামালুদ্দিন আস সাদির মাজার অবস্থিত। যিনি তায়েফায়ে কলন্দরিয়া নামক একটি মতাদর্শের প্রবর্তক। এদের প্রতীক হলো, এরা মুখের দাড়ি, মোচ, ভ্রু; সবকিছুই কেটে ফেলে। আমি যখন নগরীটিতে আগমন করি তখন তাদের দলনেতা ছিলেন ফাতাহ তাকরুরি।

শায়খ জামালুদ্দিনের দাড়ি মোচ ভ্রু ইত্যাদি কেটে ফেলার নেপথ্য কারণ হলো, তিনি খুবই সুন্দর-সুশ্রী ছিলেন। তখন তাকে দেখে 'সাদাহ' নগরীর জনৈক রমণী প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। সে প্রতিনিয়ত তার কাছে প্রেমের আবেদন পেশ করতে থাকে। এমনকি পথে-ঘাটে তাকে প্রায়সময় উত্যক্ত করত। তার সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় সেই রমণী প্রচণ্ড লালায়িত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি সংযমের প্রতিমূর্তি হয়ে নিজেকে তার থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন।

যখন সবধরনের আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল হয়ে পড়ে তখন সেই রমণী চক্রান্ত করে এক দুষ্ট বৃদ্ধাকে দিয়ে ষড়যন্ত্রের জট পাকিয়ে তোলে। ওই প্রেমপ্রত্যাশী মহিলার ঘর ছিল মসজিদের গমনপথের ধারে। দুষ্ট বৃদ্ধা বাড়ির ফটকের ওপর একটি চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। শায়খ সেই পথ ধরে যাওয়ার সময় বৃদ্ধা তাকে ডেকে বলল, জনাব, আপনি কি চিঠি পড়তে জানেন? তিনি মাথা নাড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ, জানি।

তখন বৃদ্ধা মহিলা তার সামনে চিঠি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমার ছেলের কাছ থেকে এ চিঠিটি এসেছে। আপনি আমাকে একটু পড়ে শোনান। শায়খ তার অনুরোধে সায় দিলেন।

শায়খ চিঠি খুলতে উদ্যত হতেই ওই বৃদ্ধা মহিলা বলল, 'আমার বউমা স্তম্ভের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি যদি একটু এগিয়ে এসে উঠানে এসে পড়তেন তাহলে বউমা শুনতে পেত।'

শায়খ তার সেই অনুরোধও মেনে নিলেন। বাড়ির মূল ফটক ডিঙিয়ে ভেতরের উঠানে এলেন। এখন সামনে মূল বাড়ির দরজা। সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধা মহিলা ছুটে এসে সদর দরজায় খিল আটকে দিল। ভেতর থেকে সেই প্রেমপিয়াসী নারী শায়খের সামনে এসে হাজির হলো। ঘরের ভেতরে যতগুলো দাসী ছিল, তারা এগিয়ে এসে শায়খকে ঝাপটে ধরল এবং ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল।

শায়খকে একান্তে পেয়ে সেই নারী নিজের শরীর নিবেদন করল। অবস্থা বেগতিক দেখে শায়খ বুঝতে পারলেন, 'এই নারীর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা মুশকিল। এজন্যে তিনি কৌশলের আশ্রয় নিলেন। বললেন, 'তুমি যখন এত করে আমাকে চাইছো, তখন এক কাজ করো। আমাকে বাথরুম দেখিয়ে দাও।'

ফিক করে হেসে সেই নারী তাকে বাথরুমের পথ দেখিয়ে দিল। শায়খ এক বদনা পানি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। ঘটনাক্রমে সেসময় শায়খের কাছে নতুন ক্ষুর ছিল। তা দিয়ে তিনি নিজের দাড়ি, মুচ, ভ্রু ইত্যাদি শেভ করে ফেললেন। এরপর সেই নারীর সামনে এসে আবির্ভূত হলেন।

শায়খের এই কিম্ভূতদর্শন চেহারা দেখে ওই নারীর মনের যাবতীয় খায়েশ উড়ে গেল। দাসীদের মাধ্যমে ঘর থেকে বের করে দিলেন। এভাবে এই ছলনাময়ী নারীর কবল থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন।

সেদিনের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শায়খ মুখের দাড়ি, মোচ, ভ্রু ইত্যাদি কেটে ফেলতেন। তার দেখাদেখি তার অনুসারীরাও এভাবে ছাচাছোলা হয়ে থাকত।

কথিত আছে যে, একবার শায়খ দিময়াত নগরীতে এলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি এ নগরীতে এলে অবশ্যই সেখানকার কবরস্থানে হাজির হতেন। বরাবরের মতো এবারও তিনি কবরস্থানে এলেন। ওই সময় 'ইবনুল আমিদ' নামের এক ব্যক্তি ছিলেন এ অঞ্চলের বিচারপতি। একদিন তিনি কোনো এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির জানাযা উপলক্ষ্যে সেই কবরস্থানে এলেন। এখানে

এসে তিনি শায়খ জামালুদ্দিনকে দেখতে পেলেন। তখন বললেন, 'আ তো বিদআতি ভণ্ড পীর।' উত্তরে তিনি বললেন, 'আর আপনি জা বিচারপতি। কীভাবে বাহনে চড়ে কবরস্থান মাড়িয়ে যাচ্ছেন! আপনি জানেন না যে, জীবিত অবস্থায় যেভাবে মানুষকে সম্মান করতে হয়, অবস্থায়ও তেমনি সম্মান করতে হয়।'

উত্তরে বিচারপতি পাল্টা দোষ চাপিয়ে বললেন, 'তারচেয়েও নিন্দনীয় কা হলো, আপনি দাড়ি মুণ্ডন করেন।' তখন শায়খ বললেন, 'আমাকে লক্ষ করেই কথাগুলো বলেছেন তো'? এতটুকু বলেই তিনি মাথা নামিয়ে প্রচ জোরে চিৎকার করলেন। এরপর মাথা তুলতেই দেখা গেল, তার মুখে কাঁচ কুচকুচে দাড়ি শোভা পাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে বিচারপতি সাহেব ভয় পেলেন তার সঙ্গীরাও হতবিহ্বল হলো। সঙ্গে সঙ্গে তার বাহন থেকে নিচে নামল।

শায়খ তখন দ্বিতীয়বারের মতো প্রচণ্ড স্বরে চিৎকার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা মুখে সুন্দর সাদা ধবধবে দাড়ি ভেসে উঠল। এরপর তিনি তৃতীয় চিৎকা করলেন। মাথা তুলতেই দেখা গেল, তিনি পূর্বের মতো দাড়িহীন হয়ে গেছেন।

এমন অভাবিত দৃশ্য দেখে বিচারপতি সাহেব এগিয়ে এসে শায়খের হাতে চুমু খেলেন। সেদিনের পর থেকে তিনি আজীবনের জন্যে তার শিষ্য হয়ে গেলেন। শায়খের জন্যে একটি সুরম্য খানকা ভবন বানিয়ে দিলেন। যতদিন শায়খ জীবিত ছিলেন, প্রত্যহ তার কাছে এসে বসে থাকতেন। মৃত্যুর প শায়খকে সেই খানকায় দাফন করা হয়।

এরপর যখন সেই বিচারপতির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন তি অসিয়ত করেন যে, তাকে যেন সেই খানকার মূল গেইটের সামনে দাফ করা হয়। তাহলে যতজন দর্শনার্থী শায়খের কবর যিয়ারত করে আসবে তাদের প্রত্যেকেই তার কবর মাড়িয়ে যাবে।

দিময়াত শহরের বাইরে একটি প্রসিদ্ধ মাজার রয়েছে। নাম, 'শাতা' মিসরের জনগণ বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সেই মাজারে ভিড় জমায়। বছরে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে সেখানে জনগণের আনাগোনা আরো বেড়ে যায়।

দিময়াত শহরের বাইরে আরেকটি জনপ্রিয় স্থান রয়েছে। 'মুনিয়া' নামে বিখ্যাত সেই স্থানের চারপাশে অনেকগুলো বাগান। সেখানে 'ইবনুন নু'মান' নামের একজন তাপস বাস করতেন। আমি একরাতে তার খানকার অতি

হই। দিময়াত নগরীতে অবস্থানের দিনগুলোতে আমি আরেকজন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রচুর নামযশ শুনেছি। তাকে সবাই 'মুহসিনি' নামে একবাক্যে চিনতো। নীলনদের ধারে তিনি একটি মাদরাসা গড়ে তুলেছিলেন। আমি কিছু দিন সেখানে অবস্থান করেছিলাম। এক পর্যায়ে তার সঙ্গে আমার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ফারাসকুর নগরীতে

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ফারাসকুর[১] (Faraskur)। এটিও নীলনদের পাদদেশে অবস্থিত। আমি শহরের বাইরে অবতরণ করি। এখানে আসার পর একজন অশ্বারোহী এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, যাকে দিময়াত থেকে দানবীর মুহসিনি প্রেরণ করেছেন। সে আমাকে বলেন, 'আমির আপনার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন। তিনি আপনার গুণমুগ্ধ। এজন্যে তিনি আপনার জন্যে এই পথখরচ পাঠিয়েছেন।' এ কথা বলে লোকটি আমার হাতে এক থলে স্বর্ণমুদ্রা তুলে দেয়। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দিন।

এখান থেকে রওনা হই 'আশমুনুর রুম্মান'[২] নগরীর উদ্দেশে। এখানে প্রচুর আনার ফল উৎপাদিত হয়। সে কারণে নগরীর নামের সঙ্গে 'রুম্মান' শব্দও যুক্ত হয়ে গেছে। এখান থেকে গোটা মিসরে আনার ফল রপ্তানি হয়। বেশ পুরনো জনপদ। নীলনদ থেকে অনেকগুলো খাল ছড়িয়ে পড়েছে। তেমনি একটি খালের পাদদেশে এই নগরী অবস্থিত। এখানে একটি কাঠের পুল রয়েছে। সমস্ত নৌকা সেই পুলের কাছে নোঙর ফেলে থাকে। বিকেলের দিকে সেই পুল তুলে ফেলা হলে কিছু নৌকা উজানের দিকে ও কিছু নৌকা ভাটির দিকে বাইতে শুরু করে। এ অঞ্চলের জন্যেও স্বতন্ত্র বিচারপতি ও গভর্নর নিযুক্ত রয়েছে।

---

[১] মু'জামুল বুলদানের মাঝে ইয়াকুত রহ. এ নগরীর কথা উল্লেখ করেছেন যে, এটি হলো দিময়াত সংলগ্ন মিসরি গ্রাম। এছাড়াও প্রাচীন ইতিহাসের অনেকগুলো বইয়ে এই গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে এটি মিশরের দামিট্টা গভর্নরেটের একটি শহর। ১৯৫২ সালের সিপাহি বিপ্লবের আগে দাকাহলিয়া গভর্নরেটের অংশ ছিল। –অনুবাদক

[২] নীলনদের পূর্বপ্রান্তে উচ্চ মিসরে অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন জনপদ। এখানে প্রচুর ফলবাগান রয়েছে। যত্রতত্র খেজুর গাছের ছড়াছড়ি। আশমুন বিন মিসর এ জনপদের গোড়াপত্তন করেছিলেন, বিধায় তার দিকে সম্বন্ধিত করে 'আশমুনুর রুম্মান' বলা হয়। দেখুন, মু'জামুল বুলদান : ১/২০০

সামান্নুদ নগরীতে

এখান থেকে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সামান্নুদ[১] (Samannoud)। এটিও নীলনদের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে প্রচুর নৌঘাট রয়েছে। সবখানেই নৌকার ছড়াছড়ি। আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে এখানকার সমৃদ্ধ বাজারঘাট। আল মাহাল্লাতুল কাবিরা থেকে এখানকার দূরত্ব তিন ক্রোশ।

এখান থেকে আমরা কায়রোর উদ্দেশে রওনা হই। নীলনদের পথ ধরে উজানের দিকে আমাদের যাত্রা। এখানকার গ্রাম ও নগরগুলো এতটাই লাগোয়া যে, আপনার কাছে মনে হবে, সেগুলোকে সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করে তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে কোনো পথিকের সঙ্গে খাবার-দাবার নেবার প্রয়োজন পড়ে না। কেননা যেখানে ইচ্ছে নদীর পাড়ে নেমে অযু, ইস্তিঞ্জা, নামায ইত্যাদি সেরে নিতে পারবে। ক্ষুধা পেলে খাবারও খরিদ করতে পারবে। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে মিসর পর্যন্ত এবং মিসর থেকে উজানের পথে 'উসওয়ান'[২] পর্যন্ত একের পর এক অনেকগুলো বাজারঘাট রয়েছে।

---

[১] দিময়াত প্রান্তের একটি উপশহর। এটিও নীলনদের পাদদেশে অবস্থিত। আল মাহাল্লাতুল কাবিরা থেকে যার দূরত্ব দু মাইল। দেখুন, মু'জামুল বুলদান : ৩/২৫৪

প্রাগৈতিহাসিক নগরী। কথিত আছে যে, ফারাও সম্রাটদের আমলেও এই নগরীর অস্তিত্ব ছিল। যার ফলে এখানে প্রচুর প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নতত্ত্ব ও ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০ সালে এ নগরী ছিল তৎকালীন মিশরের রাজধানী।–অনুবাদক

[২] মিশরের উঁচু অঞ্চলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত বিশাল নগরী। উন্নত মানের খেজুরের জন্যে যে বিখ্যাত। প্রিন্স আগা খান জীবনের শেষ দিনগুলো এখানেই অতিবাহিত করেছিল। তাকে এখানেই সমাহিত করা হয়। তার সুরম্য সমাধি এখন দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

যদিও মূল কিতাবে أُسْوَان লেখা আছে। আলিফের ওপর পেশ। কিন্তু সাম্প্রতিক বইপত্রে আসওয়ান (Aswan) উচ্চারণ পাওয়া যায়। উইকিপিডিয়ার তথ্যানুসারে, নীলনদের পূর্ব তীরে আসওয়ান বাঁধের ঠিক উত্তর দিকে প্রথম জলপ্রপাতে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদরা ২০১৯ সালে আসওয়ানের একটি সমাধিতে মিশরীয়দের ৩৫টি মমিকৃত দেহাবশেষ আবিষ্কার করেছে। যা ৩৩২ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৩৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গ্রেকো-রোমান যুগের পুরনো নিদর্শন।–অনুবাদক

কায়রো নগরীতে

অবশেষে প্রতীক্ষিত নগরী মিসরে এসে পৌঁছুলাম। এই মিসর, যাকে বলা হয় 'উম্মুল বিলাদ' বা সমস্ত নগরীর জননী। এক সময়ের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক ফেরাউনদের রাজ্য। বিশাল বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে এই মিসর। এখানে এত প্রচুর বাড়িঘর রয়েছে যে, বলে-কয়ে শেষ করা যাবে না। সৌন্দর্যে একেকটি বাড়ি যেন অন্য বাড়িকে ছাড়িয়ে যাবে। এখানে সবসময় আগন্তুকদের ভিড় লেগে থাকে। এখানে দুর্বল-সবল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথ চলে। জ্ঞানী ও মূর্খ, প্রত্যেকেরই ছড়াছড়ি। যত্রতত্র মেধাবী ও মেধাহীন লোকের উপস্থিতি। ভালো-মন্দ, ভদ্র-অভদ্র—সব ধরনের লোক রয়েছে। মানবমিছিলকে মনে হয় সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ানো তরঙ্গ। বিশাল নগরীকে মনে হয়, মানুষের সংখ্যার তুলনায় সংকীর্ণ। শহর জুড়ে চাঞ্চল্যের কমতি নেই। যুগে যুগে অসংখ্য শক্তিশালী রাজবংশ এই অঞ্চল শাসন করেছে। এখানকার শাসকবর্গ কখনো কখনো আরব-আজমকেও পদানত করেছে। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সম্পদ নীলনদ। যা পৃথিবীর অপরাপর রাজ্যের ওপর এই মিসরকে স্বাতন্ত্র্য শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিয়েছে। এই নীলনদের কারণে এই অঞ্চল বৃষ্টির ওপর ততটা নির্ভরশীল নয়। পুরো অঞ্চল ঘুরে দেখতে হলে আপনাকে অন্তত এক মাস সময় দিতে হবে। যেকোনো আগন্তুক এখানকার ঐশ্বর্য দেখলে মুগ্ধ হবে।

শহরের বিশালতা অনুধাবন করার জন্যে এতটুকু তথ্যই যথেষ্ট যে, শহরবাসীর পানির প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে বারো হাজার উটের সমন্বয়ে গঠিত পানি পরিবেশক বাহিনী কর্মরত রয়েছে। এই নগরীতে অন্তত ত্রিশ হাজার কাঠের তৈরি দোকান রয়েছে। এই নীলনদের বুকে ছত্রিশ হাজার সরকারি ও বেসরকারি নৌযান রয়েছে, যা এখান থেকে উজানের দিকে উচ্চ মিসরের পথে এবং ভাটির দিকে আলেকজান্দ্রিয়া ও দিময়াতের পথে চলাচল করে থাকে। সেসব নৌযানের সাহায্যে নানা পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়ে থাকে। মিসরের বিপরীত দিকে নীলনদের অন্য পাদদেশে একটি জনপ্রিয় জায়গা রয়েছে। এখানকার লোকজনের কাছে যা 'রওযা' নামে পরিচিত।

বিনোদন ও ভ্রমণের জন্যে লোকজন সেখানে ঘুরতে যায়। সেখানে প্রচু দৃষ্টিনন্দন বাগান রয়েছে।

এমনিতেই মিসরের লোকজন বেশ আমুদে, চঞ্চল ও বিনোদনপ্রেমী একবার মালিক নাসির হাতে ব্যথা পেয়েছিলেন। যখন তিনি সুস্থ হন, তখ লোকেরা সে উপলক্ষ্যে ধুমধামের সাথে উৎসব করে। সেই উৎসব নি চোখে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তখন মিসরের সবগুলো বাজার সুসজ্জি করা হয়। প্রত্যেকেই নিজেদের দোকানপাট মনের মতো করে সাজায় উৎকৃষ্ট মানের রেশমি দামী কাপড় ও চড়া মূল্যের অলংকারের পসরা বসে একাধারে কয়েক দিন সেই উৎসব চলে।

আমর ইবনুল আস মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল ও খানকা

এখানকার অন্যতম বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র হলো আমর ইবনুল আস রা. মসজিদ। মানুষের মুখে মুখে আপনি এই মসজিদের প্রচুর সুখ্যাতি শুনতে পাবেন। এখানে জুমার নামায অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব থেকে পশ্চিম অভিমুখে একটি বিশাল রাজপথ রয়েছে। পূর্ব দিকে একটি খানকা রয়েছে, যেখানে একসময় ইমাম শাফেয়ী রহ. পাঠদান করতেন। মিসরের বুকে এত প্রচুর মাদরাসা রয়েছে যে, কারো পক্ষে তার সংখ্যা গুণে বলা সম্ভব নয়।

এখানে একটি বিখ্যাত হাসপাতাল রয়েছে, যা সুলতান মালিক মানসুরের মাকবারার কাছে দুটি রাজপ্রাসাদের মাঝখানে অবস্থিত। এখানে অসুস্থ ব্যক্তির সুচিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় অষুধপত্রের এত বিপুল সমাহার রয়েছে যে, তার প্রশংসা মুখে বলে শেষ করা যাবে না। এই হাসপাতালের দৈনন্দিন ব্যয়, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

মিসরের বুকে খানকা ও সরাইখানার অভাব নেই। এখানকার রাজন্যবর্গ খানকা ও সরাইখানা নির্মাণ করতে বেশ পছন্দ করেন। প্রতিটি খানকা একেকটি নির্দিষ্ট দলের জন্যে বরাদ্দকৃত। যার অধিকাংশ পরিচালক অনারব। তারা প্রত্যেকেই তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিকতা শাস্ত্রে দক্ষ ও প্রাজ্ঞ। প্রতিটি খানকার জন্যে আলাদা শায়খ নিযুক্ত রয়েছেন। খানকা পরিচালনার পদ্ধতি শুনলে আপনি বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। এখানকার রীতি হলো, প্রতিদিন সকালে খানকার সেবক এসে খানকায় উপস্থিত দরবেশদের কাছে যাবে। কে কী খেতে চায়, তা জেনে নেবে। প্রত্যেকের ইচ্ছানুযায়ী খাবার তৈরি করবে।

এরপর সময় হলে সবাই খাবারের দস্তরখানে সমবেত হবে। প্রত্যেকের সামনে পৃথক পৃথক রুটি ও তরকারি ইত্যাদি পাতা থাকবে। একজনের খাবারে অন্যজন অংশগ্রহণ করবে না। এভাবে প্রতিদিন নিয়ম করে দু বেলা খাবার পরিবেশন করা হয়ে থাকে। শুধু খাবারই নয়; শীত ও গ্রীষ্মকালে খানকায় উপস্থিত প্রত্যেক দরবেশকে ঋতু উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদও দেওয়া হয়। হাতখরচের জন্যে প্রত্যেককে মাসে কমপক্ষে দশটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হয়। স্তর অনুসারে কেউ কেউ ত্রিশ স্বর্ণমুদ্রা পর্যন্ত পেয়ে থাকে। প্রতি শুক্রবার রাতে চিনির তৈরি মিষ্টান্ন শিরনি ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও কাপড় ধোয়ার জন্যে সাবান দেওয়া হয়। গোসলখানার ফিস, নাপিতের বিল, আলোর বন্দোবস্ত করার জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণও দেওয়া হয়। প্রতিটি খানকায় এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সাধারণত অবিবাহিত ও বিবাহত্যাগী দরবেশগণই এই খানকাগুলোতে অবস্থান করে থাকে। যেসব দরবেশ বিবাহিত, তাদের জন্যে পৃথক খানকা রয়েছে।

এতসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্যে শর্ত হলো, প্রত্যেক দরবেশকে পাঁচওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাতের সঙ্গে আদায় করতে হবে। অবশ্যই রাতে খানকায় অবস্থান করতে হবে। খানকার গম্বুজের ভেতরে সমবেত হয়ে তাদের সম্মিলিত আমল হলো, প্রত্যেকেই নিজেদের স্বতন্ত্র গদিতে বসবে। প্রতিদিন ফজর নামাযের পর তারা একসঙ্গে সূরা ফাতহ, সূরা মুলক, সূরা নাবা তেলাওয়াত করে থাকে। এরপর এমন একটি কুরআন শরিফ নেওয়া হয়, যার প্রতিটি পারা আলাদাভাবে বাইন্ডিং করা। প্রত্যেকের হাতে একটি করে পারা ধরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তারা সম্মিলিতভাবে কুরআন কারিমের খতম করে। এরপর তারা কিছুক্ষণ যিকির-আযকার করে। সবশেষে কারীগণ প্রাচ্যের কেরাতশৈলী অনুসারে কেরাত পরিবেশন করে। অনুরূপ আমল তারা প্রত্যহ আসর নামায শেষেও সম্পন্ন করে থাকে।

খানকায় কোনো নতুন আগন্তুক এলে

যখন কোনো নতুন আগন্তুক খানকায় আসে তখন তার জন্যে নিয়ম হলো, সে কোমর বেঁধে আসবে। কাঁধে জায়নামায থাকবে। ডান হাতে যষ্টি ও বাম হাতে বদনা থাকবে। এমন অবয়বে কেউ খানকার দুয়ারে এলে প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে খানকার পরিচালকের কাছে সংবাদ পাঠাবে। পরিচালক বেরিয়ে এসে তাকে কিছু প্রশ্ন করবে। কোত্থেকে এসেছে, ইতিপূর্বে কোন কোন খানকায়

অবস্থান করেছে, সেগুলোর শায়খের নাম কী। এ জাতীয় কিছু প্রশ্ন করে তিনি প্রথমে আগন্তুকের সত্যবাদিতা পরখ করবেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাকে ভেতরে নিয়ে যাবেন এবং উপযুক্ত স্থানে তার জন্যে জায়নামায বিছিয়ে দেবেন। কোথায় গিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে, সে জায়গাটি জানিয়ে দেবেন। আগন্তুক দরবেশ সবার আগে অযু করবে। এরপর নিজ জায়নামাযে ফিরে দু রাকাত নফল নামায আদায় করবে। এরপর খানকার শায়খ ও উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর সঙ্গে মুসাফাহা করবে। এরপর সম্মিলিত অনুষ্ঠানে যোগদান করবে।

তাদের আরেকটি রীতি হলো, শুক্রবার এলে খানকার সেবকগণ তাদের সবার জায়নামায উঠিয়ে মসজিদে নিয়ে যাবে এবং সেখানে সুন্দরভাবে বিছিয়ে দেবে। নিজ নিজ শায়খের সঙ্গে সবাই একসঙ্গে খানকা থেকে বেরিয়ে মসজিদে যাবে। মসজিদে এসে প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়নামাযে নামায আদায় করবে। নামায শেষে পূর্বের রীতি অনুসারে কুরআন তেলাওয়াত করবে। এরপর সবাই একসঙ্গে শায়খের নেতৃত্বে খানকায় ফিরে আসবে।

মিসরের বিখ্যাত কবরস্থান

মিসরে একটি বিখ্যাত কবরস্থান রয়েছে। স্থানীয় জনগণের কাছে যা বরকতময় জায়গা। এই কবরস্থানের ফযিলত হিসেবে একটি বর্ণনা লোকমুখে বেশ চর্চিত, যা কুরতুবিসহ আরো অনেকেই বর্ণনা করেছেন। সেই স্থানটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়ের অংশ, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে, তা জান্নাতের অন্যতম একটি বাগান। মিসরবাসীদের রীতি হলো, তারা তারা সেই কবরস্থানের মাঝে বড় বড় আলিশান গম্বুজ, বাগান ও বাড়িঘর নির্মাণ করে থাকে। সেসব গম্বুজ ও স্থাপনার জন্যে তারা কারীদেরকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেয়। তাদের দায়িত্ব হলো, দিনরাত সেখানে বসে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করবে। মিসরের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সেই কবরস্থানের আশপাশে নিজেদের মতো করে খানকা ও মাদরাসা নির্মাণ করে থাকে। আমি সেখানে এ জাতীয় নির্মাণকাজ চলতে দেখেছি। ঘরের লোকজন, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নিয়ে তারা প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সেসব খানকায় যায়। সেখানে রাত্রিযাপন করে। এ সময় তারা নানা পদের খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এক মাজার থেকে অন্য মাজারে ঘুরে বেড়ায়।

হুসাইন রা.-এর মাজার

এখানকার অন্যতম বিখ্যাত মাজার হলো, সেই জায়গা, যেখানে হযরত হুসাইন বিন আলী রা.-এর পবিত্র মাথা সমাহিত। সেই মাজারকে কেন্দ্র করে সুবিশাল খানকা ও কাঙালখানা গড়ে উঠেছে। সেই খানকার ভবন বেশ দৃষ্টিনন্দন। ভবনের প্রতিটি দরজার কড়া ও শেকল রৌপ্যনির্মিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্রের মাজার যে ধরনের চাকচিক্যময় হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, তার কোনো অংশেই ঘাটতি রাখা হয়নি।

নাফিসা বিনতে যায়দ বিন আলী বিন হুসাইন রা.-এর মাজার

এখানকার আরেকটি বিখ্যাত মাজার হলো, যেখানে হযরত হুসাইন রা.-এর বংশধর সাইয়েদা নাফিসা রা. সমাহিত। তাঁর বংশধারা হলো, সাইয়েদা নাফিসা বিনতে যায়দ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী রা.। সাইয়েদা নাফিসা রা. তাঁর সমকালের বিদুষী নারী ছিলেন। তাঁর প্রার্থিত দোয়াগুলো আল্লাহ কবুল করতেন। তিনি প্রচুর ইবাদত করতেন। এই মাজারকে কেন্দ্র করে আরেকটি দৃষ্টিনন্দন ভবনে খানকা গড়ে উঠেছে। পোক্ত ভবন, কারুকার্য খচিত দেয়াল থেকে নূর ঝরছিল।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাজারের চিত্র

এই মিসরের আরেকটি বিখ্যাত মাজার হলো ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদরিস শাফেয়ী রহ.-এর মাজার। এখানেও একটি সুবিশাল খানকা রয়েছে। যার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে বড় অংকের অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। খানকার মাথায় একটি দৃষ্টিনন্দন গম্বুজ শোভা পাচ্ছে। এমন সুন্দর গম্বুজ আমি খুব কমই দেখেছি। অসাধারণ নির্মাণশৈলী, মজবুত স্থাপনা ও নয়নভোলা কারুকার্যের কারণে এই গম্বুজের সুখ্যাতি গোটা বিশ্বজুড়ে। আয়তনে নিদেনপক্ষে ত্রিশ গজ ছাড়িয়ে যাবে।

আরো কিছু উলামা ও বুযুর্গানে দীনের মাজার

আসলে মিসরের মাটিতে এত প্রচুর আলেম ও বুযুর্গানে দীনের মাজার রয়েছে যে, সেগুলোর প্রকৃত সংখ্যা গণনা করা মুশকিলই বটে। শুধু আলেম

ও বুযুর্গই নন; এখানে অনেক মহান সাহাবির মাজারও রয়েছে। এমন কিছু মাজার রয়েছে; যা নিঃসন্দেহে আমাদের মহান পূর্বসূরিদের স্মৃতি বহন করছে। যেমন, হযরত আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম, আশহাব ও আবদিল আযিয, আদবাগ ইবনুল ফারাজ, আবদুল হাকিমের দু ছেলে, আবুল কাসিম বিন শা'বান এবং আবু মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহহাব—এই মনীষীদের মাজারগুলো এমন অখ্যাত স্থানে যে, সবার পক্ষে সেগুলো খুঁজে বের করাও সম্ভব হবে না। হ্যাঁ, কারো ওপর যদি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা।

ইমাম শাফেয়ী রহ. তাঁর জীবনে দীনের জন্যে প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। তাঁর জীবনের পরতে পরতে আমাদের জন্যে রয়েছে সংগ্রাম, ত্যাগ স্বীকার ও দীনের জন্যে কুরবানি দানের অসাধারণ শিক্ষা। আমরা তাঁর জীবনসংগ্রামকে এই কবিতার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ বলতে পারি,

الْجِدُّ يُدْنِيْ كُلَّ أَمْرٍ شَاسِعٍ
وَالْجِدُّ يَفْتَحُ كُلَّ بَابٍ مُغْلَقِ

পরিশ্রম সহজ করে তোলে প্রতিটি দুরূহ কাজ
সংগ্রাম খুলে দেয় প্রতিটি বন্ধ দুয়ার।

বিখ্যাত নীলনদ

মিসরের বিখ্যাত নীলনদ হলো গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সুমিষ্ট পানির জলাধার। স্বাদ, ঘ্রাণ ও প্রবাহে অতুলনীয়। এই নীলনদের তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে অজস্র সুশৃঙ্খল শহর ও গ্রাম। পৃথিবীর অন্য কোনো জলাধারকে কেন্দ্র করে এত প্রচুর সভ্যতা ও জনপদ গড়ে উঠেনি। নীলনদের পানি দিয়ে যে পরিমাণ শষ্যক্ষেত সিঞ্চিত হয়, অন্য কোনো নদনদীর পানি দিয়ে ততটা সিঞ্চিত হয় না। এই নীলনদই একমাত্র নদী, যার ওপর আরবিতে 'বাহর' তথা 'সমুদ্র' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ 'যখন এই শিশুর জীবন বাঁচানো নিয়ে তোমার মনে উদ্বেগ জন্মাবে, তখন তাকে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করবে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে যে,

هٰذَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى ، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ : نَهْرَانِ بَاطِنَانِ ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، فَقُلْتُ : مَا هٰذَانِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : أَمَّا الْبَاطِنَانِ ، فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ ، فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ.

মিরাজ রজনীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিদরাতুল মুনাতাহায় পৌঁছেন, তখন তার উৎসে চারটি নদী দেখতে পান। তন্মধ্য হতে দুটি নদী প্রকাশ্য ও দুটি সুপ্ত। তিনি তখন জিবরিল আ. নদীগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি বলেন, সুপ্ত নদী দুটি জান্নাতের ভেতরে প্রবাহিত হচ্ছে। আর প্রকাশ্য নদী দুটি হলো, নীলনদ ও ফোরাত।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'নীলনদ, ফোরাত, সায়হুন ও জায়হুন—এ চারটি নদীই জান্নাত থেকে উৎসারিত।'

নীলনদ হলো পৃথিবীর একমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী নদী, যা দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত। পৃথিবীর অন্যান্য নদীগুলো এর বিপরীত। আরেকটি ব্যতিক্রমধর্মী বিস্ময়কর তথ্য হলো, যে মৌসুমে অন্য সমস্ত নদী প্রমত্তা থাকে, তখন এই নীলনদে ভাটা থাকে। এরপর যখন গ্রীষ্ম মৌসুমে সমস্ত নদীতে পানির প্রবাহ কম থাকে তখন নীলনদে সর্বাধিক প্রবাহ থাকে। আমি সিন্ধু নদীকেও নীলনদের অনুরূপ পেয়েছি। হাজিরন মাস থেকে শুরু হয় নীলনদের উন্মত্ত প্রবাহের সূচনা।

আরেকটি বিস্ময়কর তথ্য হলো, যে বছর নীলনদের পানি ষোলো গজ উঁচু হয়, সে বছর এ অঞ্চলে ভারসাম্যপূর্ণ ফসল উৎপাদন হয়। অর্থাৎ এ পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, যার মাধ্যমে সম্রাটের কর পরিশোধ হয়। যে বছর আরেকটু বেশি পানি হয়, সে বছর সবচেয়ে সুন্দর ও উপযোগী আবহাওয়া পাওয়া যায় এবং প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদন হয়। কিন্তু কোনো বছর যদি আঠারো গজ পর্যন্ত পানি বৃদ্ধি পায়, সে বছর জাতীয় অর্থনীতিতে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়। আবহাওয়ার মাঝে মহামারিসহ নানা রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। আবার যদি ষোলো গজের কম পানি হয়, সে বছর উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। অর্থাৎ সম্রাটের কর আদায় করার মতো উৎপাদন হয় না। যদি ষোলো গজ থেকে দু গজ কম প্রবাহ হয়, সে বছর সবচেয়ে কম উৎপাদন হয়।

নীলনদ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাঁচটি নদীর একটি। সেই পাঁচ না হলো, নীলনদ, ফোরাত, দজলা, সাইহুন, জাইহুন।

নীলনদের সমতুল্য ভারতীয় নদী

হিন্দুস্তানের সিন্ধু রাজ্যে আমি এমন পাঁচটি নদী দেখেছি, যা উপর্যু নদীগুলোর সমতুল্য। যার প্রথমটি হলো, সিন্ধু নদী। যার কারণে দেশটিকে 'পাঞ্জাব' বলা হয়। দ্বিতীয়টি হলো গঙ্গা। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান মৃত্যুর পর তারা মৃতদের ছাই সেই নদীতে নিক্ষেপ করে থাকে। তারা বিশ্ব করে, এই নদী স্বর্গ থেকে উৎসারিত। এ অঞ্চলের তৃতীয় বৃহৎ নদী হ যমুনা। কাফচাক উপত্যকায় একটি নদী আছে। নাম তার, অটল। য পাদদেশে 'সারা' নগরী অবস্থিত। আর পঞ্চমটি হলো, উত্তর চীনের 'খাত উপত্যকার 'সারভে' নদী। খানবালিক (পিয়ং) নগরী অবস্থিত। এ খানবালিক নগরীর তীর ঘেঁষে নদীটি প্রথমে খানসার নগরীতে পৌঁছেছে সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে যাইতুন নগরী ছাড়িয়ে গেছে। যথাস্থানে সে নদীগুলোর বিবরণ তুলে ধরব।

আমরা নীলনদের প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। এই নদীর কিছুদুর সামনে এগি তিনটি ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যার প্রতিটি শাখায় এত প্রচুর পা রয়েছে যে, শীত কিংবা গ্রীষ্ম—কোনো মৌসুমেই তা নৌকা ব্যতিরেকে পা হওয়া যায় না। এই নীলনদের পাদদেশে যতগুলো জনপদ রয়েছে, সেগুলো প্রতিটিতে নীলনদ থেকে অসংখ্য খাল ভেতরে প্রবেশ করেছে। প্রতি খালের ওপর হাউজ সদৃশ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা রয়েছে। যখনই পানি সিঞ্চনে প্রয়োজন পড়ে তারা খালের প্রবেশমুখ খুলে দেয়। ফলে অনায়াসে সেস ক্ষেতে পানি ছড়িয়ে যায়।

ঐতিহাসিক পিরামিড

পিরামিডকে আরবিতে বলে 'আহরাম'। শুধু মিসরই নয়; বিশ্বের এম বিস্ময়কর স্থাপনা, যা যুগের পর যুগ গোটা মানবজাতিকে বিস্মিত কর চলেছে। এই পিরামিডকে কেন্দ্র করে জনসমাজে অনেক মুখরোচক কথ শোনা যায়। এই পিরামিডগুলো কবে নির্মিত হলো? কে প্রথম নির্মা করেছে? এ নিয়ে বিস্তর অভিমত জনতার মুখে মুখে চর্চিত রয়েছে। কথি

রয়েছে যে, নূহ আ.-এর প্লাবনের পূর্বে যত ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়েছিল, তার সমুদয় প্রথম হুরমুজ (Hermes Trismegistus) এর অবদান। তিনি বাস করতেন মিসরের উঁচু অংশে। তার আরেক নাম ছিল, খানুক। তিনিই হলেন কুরআন কারিমে আলোচিত হযরত ইদরিস আ.। তিনিই সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে আলাপ তুলেছিলেন। সর্বপ্রথম উপাসনালয় তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। শুধু এতটুকুই নয়; নূহ আ.-এর প্লাবন সম্পর্কে তিনিই সর্বপ্রথম সে যুগের লোকদের সতর্ক করেছিলেন। তিনি সবার সামনে এ আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন যে, এই প্লাবনের প্রকোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল উপকরণ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। সকল বিদ্যা হারিয়ে যেতে পারে। প্লাবনের কবল থেকে রক্ষা করতে হলে উঁচু পিরামিড তৈরি করতে হবে। সেমতে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই আহরাম ও বারাবি নির্মিত হয়। সকল শিল্পোকরণ ও যন্ত্রাংশের ছবি সেই পিরামিডের গায়ে খোদাই করা হয়। বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা পেতে এমন অভিনব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়।

কথিত আছে যে, সেই প্রাগৈতিহাসিক সময়ে মিসরের জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল তখনকার রাজধানী মানুফ। ফুসতাত থেকে এক মঞ্জিল দূরত্বে সেই ঐতিহাসিক নগরী অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে যখন আলেকজান্দ্রিয়া নগরী গঠিত হয় ও মানুফের সকল নাগরিক এই নতুন নগরীতে বসতি স্থাপন করে তখন থেকে তা হয়ে যায় মিসরের রাজধানী। ইসলামের অভ্যুদয়ের আগ পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়াই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার।

হযরত আমর ইবনুল আস রা.-এর হাতে মিসর বিজিত হয়। তিনি তখন একটি নতুন রাজধানী নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেমতে ফুসতাত নগরীর গোড়াপত্তন করেন। যা অদ্যাবধি মিসরের রাজধানী।

এই পিরামিডগুলো ভীষণ শক্ত পাথর দিয়ে নির্মিত। পাথরগুলো পরস্পরে শক্তভাবে যুক্ত। পিরামিডের সবগুলো ভবন বেশ উঁচু ও কোনাকৃতির। অর্থাৎ সেগুলোর নিচের অংশ হলো অনেক চওড়া। কিন্তু উপর থেকে ওঠার সময় তা একটু একটু করে চিকন হতে থাকে। কোনো পিরামিডে দরজা নেই। এগুলো কোন পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়েছে, সেটাও অজানা। লোকমুখে কথিত রয়েছে যে, নুহ আ.-এর প্লাবনের আগে মিসরের কোনো এক সম্রাট ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেন। তখন তিনি নীলনদের পশ্চিম প্রান্তে এই সুবিশাল ও সুরক্ষিত পিরামিডগুলো নির্মাণ করার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করেন, যার

মাঝে একদিকে তখনকার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষিত রাখা পাশাপাশি রাজা-মহারাজাদের লাশগুলোও সংরক্ষণ করা হবে।

পিরামিডের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সেই সম্রাট রাজ্যের সক জ্যোতিষীকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেন যে, 'এই পিরামিডগুলো কোনোটির কোনো অংশ কি আগামীতে কেউ খোলার উদ্যোগ নেবে?' উত্তরে তারা জানায় যে, 'হ্যাঁ, উত্তর দিকের অমুক স্থানে এমন উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং সে খননকাজে এ পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে।

পিরামিড খোলার কাজে জ্যোতিষীরা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হওয়ার কথা বলেছিল, তার সমপরিমাণ অর্থ সেই সম্রাট ওই স্থানে গচ্ছিত রাখেন। এরপর পূর্ণ শক্তিমত্তা ব্যয় করে অত্যন্ত মজবুতভাবে নির্মাণ করেন। নির্মাণশেষে একটি শিলালিপিতে লিখে দেন যে, 'আমরা এই পিরামিডগুলো ষাট বছরে নির্মাণ করেছি। কারো যদি শক্তি থাকে, তাহলে সে যেন ছয় বছরে এগুলো ধ্বংস করে দেখায়। যদিও নির্মাণের চেয়ে ধ্বংস তুলনামূলক সহজ।'

কালক্রমে বাদশাহ মামুনুর রশিদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি তখন পিরামিডগুলো ধ্বংস করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তখনকার মিসরের কয়েকজন জ্ঞানী মানুষ তাকে সেই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেন। মামুনুর রশিদ তাদের সেই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে পিরামিড খননের নির্দেশ জারি করেন। সেমতে বিশাল অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হয়। দূর থেকে কামানের সাহায্যে আগুনের বিশাল গোলা পিরামিডের ওপর নিক্ষেপ করা হয়। দীর্ঘ শ্রম দিয়ে যৎসামান্য স্থান ভাঙা সম্ভব হয়। আজও সেই ভগ্ন স্থানটি দেখা যায়। তখন সেই ভাঙা জায়গা থেকে অল্প কিছু সম্পদ বেরিয়ে আসে। খলিফা মামুনুর রশিদ সেই সম্পদ পরিমাপ করার নির্দেশ দেন। মেপে দেখা গেল যে, খননকাজে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, এই সম্পদ তার সমান। এ কথা শুনে খলিফা খুবই বিস্মিত হন। তারা তখন পরিমাপ করে দেখেন যে, পিরামিডের দেয়ালগুলো প্রস্থে বিশ গজ।

মিসরের তৎকালীন সম্রাট

আমি যখন মিসর নগরীতে প্রবেশ করি তখন এখানকার সম্রাট ছিলেন আল মালিকুন নাসির আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইবনুল মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন

সালেহি। তিনি 'আলফি' নামে বেশি পরিচিত। কারণ হলো, আল মালিকুস সালিহ তাঁকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ক্রয় করেছিলেন। তিনি মূলত ছিলেন কাফজাক (Kipchak) অঞ্চলের অধিবাসী।

আল মালিকুন নাসির ছিলেন অনন্য চরিত্র ও অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সুলতান। তাঁর স্বপক্ষে শুধু এতটুকু তথ্যই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে হারামাইন শরিফাইনের সেবক হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। তিনি প্রতি বছর হাজিদের উপকারার্থে নানা জনকল্যাণমূলক খাতে অঢেল অর্থ ব্যয় করে থাকেন। তাদের সামানপত্র বহনের জন্যে উটের বন্দোবস্ত করেন। দুর্বল ও কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন লোকদের জন্যে খাদ্যপানি সরবরাহ করেন। মিসর ও শামদেশ থেকে কোনো দরিদ্র লোক হজে গমন করলে বা হিজরতের উদ্যোগ নিলে, তাদের জন্যে তিনি পাথেয় ও বিনামূল্যে বাহনের ব্যবস্থা করে দেন। তিনি নিজ ব্যবস্থাপনায় অসংখ্য লোককে হজ করিয়েছেন। কায়রোর বাইরে 'সারয়াকিস' নগরীতে তিনি দরিদ্রদের জন্যে সরাইখানা নির্মাণ করেছেন।

প্রসঙ্গত আরেকজন সুলতানের নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। তিনি হলেন, আমিরুল মুমিনিন নাসিরুদ্দিন। তাঁর সময়কার সকল দরিদ্র ও অনাথ যাকে নিজেদের পরম আশ্রয় মনে করত। তিনি ছিলেন আল্লাহর মহান খলিফা। অসংখ্য ছোট-বড় যুদ্ধে যিনি স্বশরীরে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যার ফলে তাঁর মাধ্যমে অসংখ্য বিজয় এসেছে। তিনিও তাঁর রাজধানীতে একটি অসাধারণ সরাইখানা ও খানকা নির্মাণ করেছেন। মজবুত স্থাপনা, কারুকার্য খচিত দেয়াল ও বিচিত্র চিত্রের কারণে সেই সরাইখানার সত্যি কোনো তুলনা হয় না। প্রাচ্যের সকল কারিগর মিলেও এ ধরনের আরেকটি স্থাপনা নির্মাণ করে দেখাতে পারবে না। জাতির কল্যাণে তিনি নিজ অঞ্চলে যে পরিমাণ বিদ্যাপীঠ, চিকিৎসালয় ও সরাইখানা নির্মাণ করেছেন, সে প্রসঙ্গে যথাস্থানে বিশদ আলোচনা তুলে ধরব।

রাজন্যবর্গ ও একটি যুদ্ধবাজ জাতি

বর্তমান মিসরের কয়েকজন শীর্ষ ব্যক্তিত্বের পরিচিতি তুলে ধরছি। তাদেরই একজন হলেন আমির বুকতুমুর। তিনি হলেন আল মালিকুন নাসিরের পানি সরবরাহকারী। সম্রাট তাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেন। বিস্তারিত ঘটনা যথাস্থানে বলব। আরেকজন হলেন আল মালিকুন নাসিরের সহকারী। নাম,

উরগুন আদ দুদার। তিনি ছিলেন আমির বুকুতমুরের সমপর্যায়ের পরিচয়। আরেকজন হলেন, তুশতু। যাকে সবাই 'হিমসে আখদার' নামে একবাক্যে চিনে। মিসরের অন্যতম সজ্জন মানুষ। গরিব-দুঃখী ও অনাথদের জন্য তিনি অকাতরে সম্পদ দান করে থাকেন। কেউ কুরআন কারিম শেখার উদ্যোগ নিলে তিনি তার সমুদয় ভরণপোষণ ও বেতনের দায়িত্ব বহন করেন। এই মিসরে 'হারাফিশ' নামের একটি যুদ্ধবাজ জাতি বাস করে থাকে। বুনো শক্তির কারণে সবাই তাদের সমীহ করে চলে। ওই আমির সবসময় এই যুদ্ধবাজ জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তা করতেন। ঘটনাক্রমে একবার আল মালিকুন নাসির সেই আমিরকে গ্রেফতার করে। সংবাদ শুনে হারাফিশ গোষ্ঠীর সকল সদস্য সুলতানের কেল্লার পাদদেশে জমায়েত হয়ে প্রতিবাদের শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। তারা একবাক্যে শ্লোগান তোলে যে, 'ওহে ল্যাংড়া রাজা, তাকে ছেড়ে দাও।' জনগণের সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের কারণে সুলতান তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

এ ঘটনার কিছু দিন পর সুলতান পুনরায় তাকে গ্রেফতার করে। তখন দেশের সকল অনাথ মিলে রাজকেল্লার সামনে অনুরূপ প্রতিবাদের আয়োজন করে। সেবারও সুলতান নিরুপায় হয়ে তাকে ছেড়ে দেয়।

আরেকজন হলেন মালিক নাসিরের উযির, যাকে সবাই একবাক্যে 'জুনদি' নামে চেনে। এ তালিকার আরেকজন হলেন বদরুদ্দিন আল বাবা। আরেকজন হলেন জামালুদ্দিন নায়িবুল কুরক। এ তালিকার সপ্তম ব্যক্তি হলেন তুকযুদুমুর। তুর্কি ভাষায় দুমুর শব্দের অর্থ লোহা। অষ্টম ব্যক্তি হলেন বাহাদুর হিজাযি। নবম জন হলেন কওসুন। দশম ব্যক্তি হলেন বাশতুক।

এখানে সংক্ষেপে দশজন শীর্ষ আমলার নাম তুলে ধরলাম। এদের প্রত্যেকেই জনকল্যাণমূলক কাজ, মসজিদ নির্মাণ, খানকা প্রতিষ্ঠা– ইত্যকার কাজে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতা করে থাকেন।

আরেকজন হলেন, সুলতান নাসিরের সেনাবাহিনী বিষয়ক মন্ত্রী ও রাজকীয় মুন্সি ফখরুদ্দিন কিবতি। তিনি মূলত কিবতি বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান ছিলেন। পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করে আদর্শ মুসলিম হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করতে সক্ষম হন। তাঁর অনন্য গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলে-কয়ে শেষ করা যাবে না। সুলতান তাঁকে যারপরনাই সম্মান করে থাকেন। জনগণের জন্যে তিনি অকাতরে অর্থ দান করেন। তাঁর অভ্যাস হলো, সন্ধ্যা ঘনিয়ে

এলে নীলনদের পাড়ে নির্মিত তার বাড়ির বিশেষ বৈঠকখানায় এসে বসতেন। এর পাশেই ছিল সুরম্য মসজিদ। মাগরিবের আযান হলে তিনি সেই মসজিদে চলে যেতেন। নামাযের পর সেই বৈঠকখানায় ফিরে এসে বসতেন। তখন তার সামনে খাবার পরিবেশন করা হতো। এ সময় তাঁর বাড়ির দুয়ার সর্বসাধারণের জন্যে খুলে দেওয়া হতো। কেউ এসে কোনো প্রয়োজন নিবেদন করলে তিনি তা পূরণ করে দিতেন। কেউ এসে আর্থিক সহায়তা করলে তিনি তার 'বদরুদ্দিন লুলু' নামক ভৃত্যকে বলতেন যে, একে নিয়ে বাড়ির বাইরের কোষাগারে যাও। সেখান থেকে তাকে প্রয়োজনীয় স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হতো। এরপর তার কাছে একদল ফকিহ এসে 'সহিহ বুখারী' পাঠ করা শুরু করত। ইশার নামায পর্যন্ত সেই বৈঠক চলতো।

তখনকার মিসরের কজন শীর্ষ বিচারপতি

ওই যুগে মিসরে প্রতিটি মাযহাবের ভিন্ন ভিন্ন বিচারপতি ছিল। তন্মধ্য হতে সর্বপ্রথম আমি শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান বিচারপতির নাম বলব। সুলতানের দৃষ্টিতে তিনিই হলেন দেশসেরা বিচারপতি। মিসরের যেকোনো স্থানে বিচারক নিয়োগ ও অব্যাহতির সর্বময় ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল। নাম, বদরুদ্দিন বিন জামাআহ। তাঁর ছেলে ইযযুদ্দিন এখন পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। আরেকজন হলেন মালেকী মাযহাবের প্রধান বিচারপতি ইমাম তাকিউদ্দিন আখনাঈ। তদ্রূপ হানাফি মাযহাবের প্রধান বিচারপতি ইমাম শামসুদ্দিন হারিরি। এই হারিরি সাহেব হলেন উঁচু স্তরের বুযুর্গ। তিনি এতটাই নিডর ছিলেন যে, কারো কোনো সমালোচনার পরোয়া করতেন না। মন্ত্রীরা পর্যন্ত তাঁকে ভয় করে চলতো। মিসরের এক লোক আমাকে এ ঘটনা শুনিয়েছে যে, একদিন সুলতান রাজদরবারের সবার সামনে স্বীকার করেন যে, 'আমি কাউকে ভয় পাই না। তবে ব্যতিক্রম হলেন শামসুদ্দিন হারিরী।' তদ্রূপ হাম্বলি মাযহাব থেকেও একজন প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তাঁর নাম এ মুহূর্তে বলতে পারব না; তবে লোকজন তাঁকে 'ইযযুদ্দিন' নামে ডাকত।

হানাফী ও মালেকী বিচারপতির মনোমালিন্য

সুলতান নাসিরের রীতি ছিল, তিনি প্রতি রোববার ও বৃহস্পতিবার বিশেষ বৈঠক আয়োজন করতেন। সেখানে দেশের সকল অভিযোগকারী ও বিচারপ্রার্থী স্বশরীরের হাজির হয়ে নিজেদের আর্জি পেশ করার সুযোগ

পেত। এ সময় তাঁর বাম পাশে চার মাযহাবের শীর্ষ চার ফকিহ আসন গ্রহণ করতেন। এরপর প্রত্যেকে নিজ নিজ আর্জি পেশ করার সুযোগ পেত। সুলতান তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকের অভিযোগের সমাধান করে দিতেন। সুলতানের এই অনন্য কার্যক্রমের জন্যে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দিন। অতীতে কোনো সুলতান এভাবে ন্যায়বিচারের তাৎক্ষণিক কার্যকরের দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেনি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হতো, দেশের কোনো নাগরিক যেন সুলতানের কাছে ন্যায়বিচার না পেয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাতে বাধ্য না হয়, এটাই বুঝি তার অদম্য সংকল্প ছিল।

এই বিশেষ রাজদরবারের প্রথা ছিল, সেই আসনগুলোর মধ্য হতে সর্বোচ্চ আসনে বসতেন শাফেয়ী মাযহাবের ফকিহ। তার পরের আসনে বসতেন হানাফি মাযহাবের বিচারপতি। তৃতীয় আসনে বসতেন মালেকী মাযহাবের কাজি এবং চতুর্থ আসনে বসতেন হাম্বলী মাযহাবের ফকিহ। যখন শামসুদ্দিন হারিরি ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন বুরহানুদ্দিন আবদুল হক হানাফি। তখন রাজন্যবর্গ পরামর্শ দেন যে, জেষ্ঠতার কারণে যেন তার উপরের আসনে মালেকী মাযহাবের ফকিহকে বসানো হয়। কারণ, পূর্ব থেকে এই রীতিই চলে আসছে। সে ভিত্তিতে মালেকী মাযহাবের ফকিহ যাইন বিন মাখলুফকে শাফেয়ী মাযহাবের ফকিহ তাকিউদ্দিন বিন দাকিকিল ঈদের সংলগ্ন আসনে সমাসীন করা হয়। হানাফি মাযহাবের ফকিহ যখন রাজকীয় আসনের এই পরিবর্তনের সংবাদ পান তখন ক্ষুদ্ধ হন এবং রাজদরবারে অনুপস্থিত থাকেন। তাঁর সেই অনুপস্থিতিকে সুলতান ভালো চোখে নেননি। তিনি অনুপস্থিতির কারণ বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ তাকে হাজির করার আদেশ দেন। সৈন্যদল গিয়ে তাকে তুলে এনে সুলতানের সামনে উপস্থিত করল। রাজদরবারের প্রহরী উঠে সেই ফকিহের হাত ধরে—যেখানে সুলতান বসানোর আদেশ দিয়েছিলেন—সেখানে বসিয়ে দেয়। আসনের এই বিন্যাস পরবর্তীকালেও অব্যাহত থাকে।

শীর্ষ উলামা ও দীনি ব্যক্তিত্ব

তৎকালীন মিসরের শীর্ষ আলেমদের মধ্যে ছিলেন শামসুদ্দিন ইস্পাহানি, (যাঁকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ যুক্তিবিদ মনে করা হতো।) শারফুদ্দিন যাওয়াবি মালেকী, বুরহানুদ্দিন শাযেলি। তিনি জামে সালেহ এর সহকারী বিচারপতি।

চতুর্থজন হলেন রুকনুদ্দিন ইবনুল কাওবে তিউনিসি। তাঁকেও যুক্তিবিদ্যার ইমাম মনে করা হতো। পঞ্চম ব্যক্তি হলেন শামসুদ্দিন বিন আদলান। শাফেয়ী মাযহাবের শীর্ষ আলেম। ষষ্ঠজন হলেন, বাহাউদ্দিন বিন আকিল। তিনিও দেশের শীর্ষ ফকিহ ছিলেন। সপ্তমজন হলেন, আসিরুদ্দিন আবু হাইয়্যান মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন হায়্যান গারনাতি। আরবি ব্যাকরণ নাহ্‌ব শাস্ত্রের পণ্ডিত। অষ্টমজন হলেন, বদরুদ্দিন আবদুল্লাহ মানুফি। এ তালিকায় আরো রয়েছেন বুরহানুদ্দিন সাফাকেসি ও কিওয়ামুদ্দিন কিরমানি। কিরমানি সাহেব বাস করতেন আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ মহলে। সবসময় তাঁর সঙ্গে একদল ফকিহ ও কারী অবস্থান করত। তিনি তাদেরকে বিভিন্ন শাস্ত্র পড়াতেন। তিনি সব মাযহাব অনুসারে ফতোয়া দিতে পারতেন। তিনি সবসময় সুতি আবা ও কালো কালারের সুতি পাগড়ি পরিধান করতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, আসর নামাযের পর সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বাগানে পায়চারি করতেন।

এ তালিকার আরো কজন ব্যক্তিত্ব হলেন, সাইয়েদ শামসুদ্দিন বিন বিনতে সাহিব তাজুদ্দিন বিন হানা, দেশশ্রেষ্ঠ কারী মাজদুদ্দিন আকসারায়ী। আকসারা হচ্ছে রোমদেশের একটি জায়গার নাম। বর্তমানে তিনি সারয়াকিস নগরীতে বাস করেন। আরেকজন হলেন শায়খ জামালুদ্দিন হুওয়াইযায়ী। আল হুওয়াজা হচ্ছে বসরা থেকে তিন দিনের দূরত্বের একটি জনপদ। আরেকজন হলেন দেশসেরা বুযুর্গ বদরুদ্দিন হুসাইনি। আরেকজন হলেন মাজদুদ্দিন ইবনুল হারামি। তিনি হলেন জাতীয় রাজকোষের তত্ত্বাবধায়ক ও ইমাম শাফেয়ী খানকার অধ্যাপক। এ তালিকার ষোড়শ ব্যক্তিত্ব হলেন নাজমুদ্দিন সাহরাতি। তিনিও উঁচু মাপের ফকিহ ছিলেন। মিসর জুড়ে তাঁর অনন্য প্রভাব ও জনপ্রিয়তা রয়েছে।

মাহমাল দিবসের ঐতিহাসিক উৎসব

মিসরের জনগণ সম্মিলিতভাবে এই দিবস পালন করে থাকে। মূলত এটি হলো উট প্রদক্ষিণের উৎসব। তারা দিবসটি এভাবে পালন করে থাকে যে, সর্বপ্রথম চার মাযহাবের চার শীর্ষ ফকিহ বাহনের ওপর আসন গ্রহণ করেন। তাদের সঙ্গে রাজকোষের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ও হিসাবরক্ষকও থাকেন। যাদের প্রত্যেকের নাম ও পরিচিতি আমি তুলে ধরেছি। তাদের সঙ্গে দেশের সকল শীর্ষ ফকিহ, রাজন্যবর্গ ও পারিষদও নিজ নিজ বাহনে আরোহন

করেন। এরপর এই বিশেষ কাফেলা সুলতানের প্রাসাদ হিসেবে ব্যবহৃত কেল্লার প্রধান ফটকের দিকে রওনা হন। তখন তাদের উদ্দেশে একটি বিশেষ উটের ওপর হাওদা বসিয়ে 'মাহমাল' বেরিয়ে আসে। যার সামনের আসনে সেই বছরের হজ কাফেলার প্রধান আমির উপবিষ্ট থাকেন। তার পেছনে থাকে কাফেলার নিরাপত্তায় নিয়োজিত সৈন্যদল ও খাদ্য বহনকারী উটের কাফেলা। এই দৃশ্য দেখার জন্যে মিসরের সকল নারী-পুরুষ সেই স্থানে জড়ো হয়ে থাকে। এভাবে রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সেই কাফেলাকে মিসর ও কায়রোতে প্রদক্ষিণ করানো হয়। কাফেলার সামনে থাকে হূদি সঙ্গীত পরিবেশনকারী পার্টি।

সাধারণত প্রতিবছর রজব মাসে এই মাহমাল উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। এই দৃশ্য দেখার পর অনেকের মনে হজের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধতে শুরু করে। যার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়, সে ওই কাফেলায় যোগদান করার জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে।



কায়রো থেকে আসয়ুত : নতুন পথের যাত্রা

মিসরের উঁচু উপত্যকার পথ ধরে আবারও বেরিয়ে পড়লাম পুণ্যভূমি হিজাযের উদ্দেশে। যে রাতে আমি মিসর থেকে বের হই, সেই রাত অতিবাহিত করি শহরের বাইরে একটি সুবিশাল সরাইখানায়। তাজুদ্দিন বিন হানা নামের এক দানবীর দিয়ারুত তীন মহল্লায় এই সরাইখানা নির্মাণ করেছেন। এই সরাইখানায় একদিকে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন ভবন, অন্যদিকে হাজার বছরের স্মৃতি বিজড়িত অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শনও এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। যেমন, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত পেয়ালার একটি খণ্ডবিশেষ রয়েছে। এরপর নবীজি সা. যেই সুরমাদানি থেকে চোখে সুরমা দিতেন, তার চিকন সুঁই এখানে রয়েছে। এরপর যেই সুঁই দিয়ে তিনি জুতো সেলাই করতেন, সেটাও এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। আমিরুল মুমিনিন আলী বিন আবি তালিব রা.-এর স্বহস্তে লিখিত কুরআন কারিম রয়েছে।

কথিত আছে, এই সরাইখানার প্রতিষ্ঠাতা এক লক্ষ দিরহাম দিয়ে আলোচিত ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংগ্রহ করেছেন। এরপর এই সরাইখানা নির্মাণ করে সেখানে এগুলো সযত্নে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এখানে যেসব ভৃত্য কাজ করে, তাদের বেতনসহ সরাইখানার যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি একাই বহন করেন। দর্শনার্থীদের জন্যে এখানে বিনামূল্যে খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও রয়েছে। এই মহতী উদ্যোগের জন্যে মহান আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দিন।

পথিমধ্যে যেসব ছোট-বড় নগরী দেখেছি

সরাইখানার পরিদর্শন সম্পন্ন করে আবারও বেরিয়ে পড়লাম। সর্বপ্রথম মুনিয়্যাতুল কায়িদ নামের একটি নগরীতে পৌঁছি, যা নীলনদের পাশে অবস্থিত ছোট্ট জনপদ।

এখান থেকে রওনা হয়ে 'বুশ' নগরীতে এসে পৌঁছি। পুরো মিসরের মধ্যে

এখানেই সবচেয়ে বেশি লেনিন কাপড় উৎপন্ন হয়। এখান থেকে মিসরের বিভিন্ন অঞ্চল; এমনকি আফ্রিকার নানা দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে।

এখান থেকে রওনা হয়ে পৌঁছুলাম 'দালাস' নগরীতে। এখানেও প্রচুর লেনিন বস্ত্র উৎপন্ন হয় এবং গোটা মিসরসহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়।

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম 'বিবা' নগরীতে।

সেখান থেকে 'আল বাহনাসা' পৌঁছি। বেশ বড় ও বাগ-বাগিচায় সমৃদ্ধ জনপদ। শহরজুড়ে প্রচুর নাগরিকের বসবাস। এখানে মিসরের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সুতি বস্ত্র উৎপন্ন হয়। শায়খ শারফুদ্দিন নামের একজন পণ্ডিত এখানকার বিচারপতি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সাক্ষাতে আমি তাকে বেশ বিনয়ী পেয়েছি। এছাড়াও শায়খ আবু বকর আযমি নামের একজন বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। বাড়িতে নিয়ে তিনি যথেষ্ট সমাদর করেছেন।

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছি 'মুনিয়্যাতু ইবনি খুসাইব' নগরীতে। নীলনদের পাড়ে গড়ে ওঠা এ নগরীটিও আয়তনে বেশ বড়। মিসরের উঁচু অঞ্চলে যতগুলো নগরী গড়ে উঠেছে, তন্মধ্যে এটাকে বলা যেতে পারে শ্রেষ্ঠ নগরী। এখানে প্রচুর মাদরাসা, মাজার, খানকা ও দৃষ্টিনন্দন মসজিদ রয়েছে।

মিসরের গভর্নর পদে খলিকার ক্রীতদাসকে নিয়োগ

এখানে এসে আমি লোকমুখে শুনতে পেয়েছি যে, আব্বাসি রাজবংশের কোনো এক খলিফা একবার মিসরবাসীর ওপর ক্রুদ্ধ হন। তখন তিনি শপথ করে বলেন যে, 'তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আমি আমার সবচেয়ে তুচ্ছ ক্রীতদাসকে তাদের গভর্নর বানাব।' খুসাইব নামে খলিফার একজন ক্রীতদাস ছিল। সেই ছিল সবচেয়ে তুচ্ছ দাস। তার দায়িত্ব ছিল, হাম্মামের চুলায় জ্বালানি কাঠ ঢেলে গরম পানি সরবরাহ করা। খলিফা তাকে মিসরের গভর্নর পদে নিয়োগ দিয়ে প্রেরণ করলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এমন বর্বর লোক গভর্নর হলে মিসরবাসীর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। কিন্তু কুদরতের কী বিস্ময়কর লীলা! গভর্নরের পদে আরোহণের পর লোকটি আমূল বদলে গেল। অত্যন্ত ভদ্র ও সজ্জন মানুষে রূপান্তরিত হলো। তাঁর বদান্যতা ও সমাজসেবার সুখ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। সে এই কৌশল অবলম্বন করত যে, যখনই খলিফার কোনো আত্মীয় বা পারিষদ পরিদর্শন করতে আসত, তার হাতে প্রচুর উপহারসামগ্রী তুলে দিত। যার

ফলে সে বাগদাদে ফিরে সবসময় তার ব্যাপারে ইতিবাচক রিপোর্ট জমা দিত।

দরিদ্র হয়েও কবির জন্যে মূল্যবান উপহার

একদিনের ঘটনা। আব্বাসি রাজবংশের কজন সদস্য না জানিয়ে কিছুদিন অনুপস্থিত থাকে। সুলতান তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েও হদিস বের করতে পারেননি। কিছু দিন পর তারা ফিরে আসে। তিনি অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা জানায়, 'আমরা খুসাইবের কাছে গিয়েছিলাম।' এ কথা বলে তার দেওয়া উপহারসামগ্রী প্রমাণ হিসেবে পেশ করে।

তখন সুলতান ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং আদেশ করেন, খুসাইবের দু চোখ অন্ধ করে দাও। আর তাকে মিসর থেকে বের করে বাগদাদে নিয়ে আসো এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় এখানকার বাজারে প্রদক্ষিণ করাও।'

গ্রেফতারের আদেশ জারি করার পর খুসাইবকে এক দণ্ড অবকাশও দেওয়া হয়নি। এমনকি তাকে নিজ বাড়িতে গিয়ে বিদায় নেওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়নি। বাহির থেকেই গ্রেফতার করা হয়। ওই সময় তার হাতে একটি মহামূল্যবান মুক্তা ছিল। সে তা লুকিয়ে ফেলে এবং রাতের অন্ধকারে কাপড়ের ভাজে সেলাই করে রেখে দেয়।

পরদিন খুসাইবের চোখে গরম জল ঢেলে অন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর তাকে বাগদাদে এনে বাজার-ঘাটে প্রদক্ষিণ করা হয়। ঘটনাচক্রে একজন কবি সেখানে তাকে দেখতে পেয়ে বলে, 'আমি আপনার প্রশংসায় একটি কবিতা লিখে বাগদাদ থেকে মিসরের উদ্দেশে রওনা করেছিলাম। কিন্তু যেদিন মিসরে পৌঁছি সেদিনই আপনাকে পদচ্যুত করে বাগদাদে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, আপনাকে সেই কবিতা আবৃত্তি করে শোনাব।'

উত্তরে খুসাইব বলল, 'আমার হতশ্রী অবস্থা তো দেখতে পাচ্ছো। এমতাবস্থায় কবিতা শুনিয়ে তুমি তো কিছুই পাবে না।'

উত্তরে সেই কবি বলল, 'আপনাকে কবিতা পাঠ করে শোনানোই আমার একমাত্র ইচ্ছা। বাকি রইলো বখশিশের কথা, তা তো আপনি সাধ্যের দিনগুলোতে নিয়মিত সবাইকে দিয়ে গেছেন। আল্লাহ আপনাকে তার জন্যে উত্তম বিনিময় দেবেন।'

তখন খুসাইব বললেন, 'ঠিক আছে। পড়ে শোনাও।'

তখন সে আবৃত্তি করল,

وأنت الخصيب وهذه مصر فتدفقا فكلاكما بحر

'মিসরের জন্যে আপনি নীলনদের চেয়ে কোনো অংশে কম নন,
আপনাদের বদান্যতার সমুদ্রের কারণে মিসর আজ সবুজ-শ্যামল।'

যখন পূর্ণ কবিতার পাঠ শেষ হলো তখন খুসাইব বললেন, 'আমার পরিধেয় বস্ত্রের অমুক স্থান সেলাই করা আছে। তা ছিঁড়ে ফেল।' কবি আদেশ পালন করলেন। ভেতর থেকে মহামূল্যবান মুক্তা বেরিয়ে এলো। খুসাইব তা গ্রহণ করতে বললেন।

তার দুরবস্থা দেখে সেই কবি কিছুতেই তা গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছিল না। খুসাইব তখন আল্লাহর কসম দিয়ে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন। অগত্যা কবি তা গ্রহণ করলেন এবং স্বর্ণকারের দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন।

মুক্তা হাতে নিয়ে স্বর্ণকার বলল, 'এমন মহামূল্যবান মুক্তার দাম পরিশোধ করা আমাদের সাধ্যে নেই। একমাত্র খলিফাই তা ক্রয় করার সক্ষমতা রাখেন।'

এক-দুই কান হয়ে সেই সংবাদ খলিফার কানে পৌঁছুলো। তিনি তখন কবিকে রাজদরবারে হাজির হতে বললেন।

খুসাইবের করুণ পরিণতি ও খলিফার অনুশোচনা

খলিফা তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোত্থেকে এই মুক্তা পেলে?' উত্তরে সে আদ্যোপান্ত ঘটনা খুলে বলল। খুসাইবের বদান্যতার সত্যিকার পরিচয় পেয়ে খলিফা সীমাহীন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। বললেন, 'খুসাইবকে এক্ষুনি হাজির করো।' প্রহরীরা তাকে রাজদরবারে নিয়ে এলো। খলিফা তখন দু হাত ভরে খুসাইবকে মূল্যবান স্বর্ণ-রুপা ও অর্থকড়ি উপহার দিলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কোনো চাওয়া থাকলে, বলো।'

উত্তরে সে জানাল, 'আপনি আমাকে মুনিয়্যা নগরী দান করুন।' খলিফা তার সেই ইচ্ছে পূরণ করে দিলেন। তখন থেকে খুসাইব এ নগরীতে বাস করতে শুরু করলেন। তার মৃত্যুর পর তার বংশধররা এখানকার জমিদার হয়ে শাসন করতে থাকে।

আমি যখন এ নগরীতে প্রবেশ করি তখন এখানকার বিচারক ছিলেন ফখরুদ্দিন নুওয়াইরি মালেকী। আর গভর্নরের পদে ছিলেন শামসুদ্দিন। আমি তাকে স্নেহশীল অভিজাত শাসক রূপেই পেয়েছি।

নগ্ন গোসলের অপসংস্কৃতি

একদিন আমি সেখানকার গণস্নানঘরে (হাম্মামখানায়) প্রবেশ করি। তখন দেখতে পাই, এখানে যারা গোসল করতে আসে সবাই নগ্ন হয়ে, জন্মদিনের পোশাকে গোসল করে। তাদের সেই কাজ আমার ভীষণ অপছন্দ হলো। আমি তখন শহরের গভর্নর শামসুদ্দিনের কাছে এসে অভিযোগ করলাম যে, 'আপনার জনগণ নগ্ন হয়ে গোসল করে।' তখন তিনি বললেন, 'আপনি অপেক্ষা করুন। আমি এখনই বিহিত করছি।' এ কথা বলে তিনি হাম্মামখানায় দায়িত্বশীলদেরকে ধরে নিয়ে আসার আদেশ করেন। সবাইকে ধরে আনা হলো। তিনি তখন তাদের কাছ থেকে এই মর্মে মুচলেকা নিলেন যে, আগামীতে কেউ যদি নিম্নাঙ্গের বস্ত্র ব্যতিরেকে স্নানঘরে প্রবেশ করে তাহলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

তিনি শুধু মৌখিক ধমকি দিয়েই ক্ষ্যান্ত হননি। বাস্তবেও কঠোরতার সঙ্গে এই আইন প্রয়োগ করেছেন।

হিজাযের পথে বিচিত্র শহর ও গ্রামে

মুনিয়্যাত ইবনে খুসাইব থেকে সামানপত্র গুছিয়ে আবারও গন্তব্যের পথে বেরিয়ে পড়লাম। পথিমধ্যে সবার আগে এলো 'মানলাভি' নগরী। ছবির মতো সাজানো ছিমছাট ছোট্ট জনপদ। নীলনদ থেকে দু মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ফকিহ শারফুদ্দিন দামিরি নামের শাফেয়ী মাযহাবের একজন ফকিহ এখানকার বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছেন। অধিকাংশ নাগরিকই বনু ফুযাইল বংশের সদস্য। এদেরই একজন লোক জীবনের বড় উপার্জন ব্যয় করে একটি বিশাল সুরম্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এ নগরীতে আমি গুণে গুণে এগারোটি সুগারমিল পেয়েছি। এখানকার রীতি হলো, কোনো অভাবী বা দুস্থ ব্যক্তি সেই চিনিকলে এলে কেউ প্রবেশ করতে নিষেধ করে না। ভেতরে বড় বড় ডেগচিতে চিনির শিরা থাকে। যে কেউ বাড়ি থেকে গরম রুটি এনে সেই তপ্ত শিরায় ভিজিয়ে রাখে। বেশ কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখার পর যখন রুটির ওপর চিনি জমে যায় তখন সে তুলে নিয়ে ভক্ষণ করে।

মানফালুত নগরীর বিস্ময়কর ঘটনা

মানলাভি নগরী থেকে রওনা হয়ে আমরা এসে পৌঁছুলাম 'মানফালুত' নগরীতে। এখানকার আবহাওয়া বেশ স্বাস্থ্যকর। নীলনদের পাড়ে থোকা থোকা বাড়িঘর।

এখানকার বাসিন্দাদের মুখ থেকে শুনতে পেয়েছি যে, একবার সুলতান নাসির আল মাসজিদুল হারামের অনুরূপ একটি বিশাল দৃষ্টিনন্দন মিম্বার তৈরির আদেশ করলেন। সুলতানের নির্দেশ বাস্তবায়ন করে যখন মিম্বার তৈরির কাজ সম্পন্ন হলো তখন আদেশ করলেন যে, তা নৌযানে তুলে নীলনদের পথ ধরে জেদ্দা সাগর অভিমুখে ভাসিয়ে নিয়ে যাও। সেখান থেকে স্থলপথ ধরে মক্কায় নেবে। সুলতানের নির্দেশ অনুসারে নৌযান ঊর্ধ্বমুখে বইতে শুরু করল। যখন সেই মিম্বারবাহী নৌযান মানফালুত নগরীর উপকণ্ঠে এসে পৌঁছে এবং স্থানীয় জামে মসজিদের সমান্তরাল হয়ে যায় তখন অস্বাভাবিকভাবে নৌযান থেমে যায়। মাঝি-মাল্লারা শত চেষ্টা করেও

নৌযান সামনে এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়; অথচ আবহাওয়া পুরোটাই অনুকূলে। লোকেরা বিস্মিত হয়ে হাল ছেড়ে দিলো। পরপর কদিন চেষ্টা করেও তারা নৌযানটিকে সামনে অগ্রসর করতে পারল না। বাধ্য হয়ে পুরো বৃত্তান্ত সুলতান নাসিরকে অবগত করল। সুলতান কুদরতের নির্দেশ বুঝতে পারলেন। আদেশ করলেন, এই দৃষ্টিনন্দন মিম্বারটি মানফালুতের জামে মসজিদে স্থাপন করো। সুলতানের নির্দেশ বাস্তবায়িত হলো। আমি সেই মিম্বার প্রত্যক্ষ করেছি।

এ নগরীতে আমি একটি ভিন্ন পণ্য বিক্রি হতে দেখেছি, যা অনেকটা মধুর মতো। তবে তা গম থেকে বানানো হয়। নাম, 'নায়দা'। মিসরের অনেক বাজারে আমি সেই মধুসদৃশ্য নায়দা বিক্রি হতে দেখেছি।

আসয়ুত নগরীতে

মানফালুত থেকে রওনা হয়ে আমরা এসে পৌঁছুলাম 'আসয়ুত' নগরীতে। ভূপৃষ্ঠ থেকে যথেষ্ট উঁচুতে অবস্থিত নগরী। সমৃদ্ধ বাজার-ঘাট। শারফুদ্দিন বিন আবদুর রহিম নামের এক লোক এখানকার বিচারক। লোকজন তার উপাধি দিয়েছে حاصل ما تمّ। এ নামেই সবাই তাকে চেনে।

লোকটির সঙ্গে এমন অদ্ভূত নাম জড়িয়ে পড়ার পেছনে একটি মজার ঘটনা রয়েছে। তা হলো, মিসর ও শাম অঞ্চলের রীতি হলো, যাবতীয় দান, সদকা, ওয়াকফ ও বহিরাগত অভাবী মুসাফিরদের যাতায়াতের অর্থ সাধারণত বিচারকের দায়িত্বে থাকতো। কোনো নগরীতে ফকির-দরিদ্র এলে সোজা বিচারকের কাছে চলে যেত। তার দায়িত্ব হলো, আগত অভাবী লোকের হালত নিরীক্ষণ করে যে পরিমাণ অর্থ সঙ্গত মনে করবেন, দান করবেন। সেই রীতি অনুসারে লোকজন কাজি শরফুদ্দিনের কাছেও আসত। কিন্তু এ লোকটির অভ্যাস ছিল, যখনই তার কাছে কোনো অভাবী বা দারিদ্র্য এসে অর্থ সহায়তা চাইতো, বরাবরই সে উত্তর দিত, حاصل ما تمّ। যার অর্থ, 'রাষ্ট্রীয় অনুদানের সমুদয় অর্থ শেষ হয়ে গেছে।' তার মুখ থেকে একই উত্তর শুনতে শুনতে লোকজন তার গলায় এ উপাধি এমন ভাবে ঝুলিয়ে দিয়েছে যে, এখন জন্মগত নামের চেয়ে এই প্রাপ্ত উপাধিতেই তাকে সবাই চেনে।

এ শহরে শায়খ শিহাবুদ্দিন ইবনুস সয়্যা' নামে একজন বুযুর্গ বাস করেন। তিনি তার খানকাতে আমার যথেষ্ট সমাদর করেছেন।

আসয়ুত থেকে লোহিত সাগরের পথ ধরে ঐতিহ্যের জনপদ শামদেশে

এবার এসে আমরা পৌঁছুলাম 'ইখমিম' নগরীতে। আয়তনে যেমন বিশাল, তেমনি মান-মর্যাদাতেও এগিয়ে। এখানে 'বারবি' নামের একটি বিশে স্থাপনা রয়েছে, যা 'ইখমিম বারবি' নামে সুপরিচিত। সাধারণত তা পাথর দিয়ে নির্মিত হয়ে থাকে। ভেতরে আদি যুগের হস্তলিপিতে খোদাই কর বিচিত্র নকশা ও চিত্র রয়েছে। যার মর্ম উদ্ধার করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি ভবনের গায়ে আকাশ ও নক্ষত্রের বিচিত্র চিত্রকল্প খোদাই করা রয়েছে বিচিত্র প্রাণীর ছবিও অঙ্কিত রয়েছে। কথিত রয়েছে যে, উড়ন্ত ঈগল সদৃশ নক্ষত্রপুঞ্জ যখন বৃশ্চিক রাশিতে ছিল, তখন এই বারবি নির্মিত হয়। দেয়াে অংকিত সেসব চিত্র নিয়ে লোকমুখে গুজবের শেষ নেই। এমনকি অনে অযৌক্তিক মিথও প্রচলিত রয়েছে।

'খতিব' নামের এক লোক এ নগরীতে বাস করতেন। একবার তিনি এস বারবির কিয়দংশ ধ্বংস করার কাজ শুরু করেছিলেন। সেখান থেকে সংগৃহীত পাথর দিয়ে তিনি একটি বিদ্যাপীঠ গড়ে তুলেছেন। তিনি এখন এ অঞ্চলের অন্যতম ধনী ও দানবীর। হিংসুকেরা বলে বেড়ায় যে, বারবির সেই ধ্বংসস্তূপ থেকেই তিনি কোনো গুপ্তধন পেয়েছেন।

এ নগরীতে এসে আমি স্থানীয় মনীষী শায়খ আবুল আব্বাস বিন আবদিয যাহেরের খানকায় অবতরণ করি। এখানে তাঁর দাদা আবদুয যাহিরের মাজার রয়েছে। নাসিরুদ্দিন, মাজদুদ্দিন ও ওয়াহিদুদ্দিন নামে তার আরো তিন ভাই রয়েছে। তাদের রীতি হলো, তারা প্রত্যেকে জুমার নামাযের পর সম্মিলিতভাবে বৈঠকে বসেন। তাদের সঙ্গে আলোচিত খতিব নুরুদ্দিন ও তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং স্থানীয় বিচারপতিও অংশগ্রহণ করেন। শহরের অন্যান্য লোকজনও সেই বৈঠকে যোগদান করেন। সবাই মিলে কুরআন কারিমের খতম দেন। এরপর আসর পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন থাকেন। আসর নামাযের পর সবাই সূরা কাহফ তেলাওয়াত করে বাড়ি ফিরে যান।

'হুওয়া' নগরীর বিদ্যাপীঠ ও সংস্কৃতি

ঐতিহাসিক 'ইখমিম' নগরী থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছি 'হুওয়া' নগরীতে। নীলনদের তীরে অবস্থিত এই নগরীও আয়তনে বেশ বড় ও প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ। এখানকার প্রসিদ্ধ তাকিয়ুদ্দিন ইবনুস সিরাজ মাদরাসায় আমরা অবতরণ করি। আমি দেখেছি যে, এখানকার লোকজন প্রতিদিন ফজর নামায শেষে এই মাদরাসায় সমবেত হয় এবং এক মনযিল কুরআন তেলাওয়াত করে। এরপর তারা শায়খ আবুল হাসান শাযিলি সংকলিত 'দোয়া-দরুদ' ও হিযবুল বাহর গ্রন্থ পড়ে। এ নগরীতেই এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী সাইয়েদ আবু মুহাম্মাদ আল হাসানি বাস করেন।

আমি সাক্ষাৎ লাভ ও সালাম নিবেদনের উদ্দেশ্যে তার বাসায় গিয়েছিলাম। সেসময় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তোমার অভিপ্রায় কী? আমি বললাম, 'আমি বাইতুল্লাহর উদ্দেশে রওনা হয়েছি। জেদ্দার পথ ধরে আমি সেখানে যাব।'

উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি এ পথ ধরে হজ করতে সক্ষম হবে না। প্রত্যাবর্তন করাই বরং তোমার জন্যে সমীচীন হবে। তুমি জীবনের প্রথম হজ করবে দারবে শামির পথ ধরে। জেদ্দার পথ ধরে নয়।'

আমি শায়খের কথাগুলো কান দিয়ে শুনলাম বটে; কিন্তু বাস্তবে মান্য করলাম না। যথারীতি পূর্বের পথ ধরে বাইতুল্লাহর দিকে এগুতে থাকলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে 'আইযাব' স্থানে পৌঁছার পর সামনে এগুনোর শক্তি হারিয়ে ফেললাম। কিছুতেই এগুতে পারলাম না। অগত্যা ফিরে আসতে হলো। এরপর আমি শামদেশ সফর করি। সেখান থেকে দারবে শাম হয়ে জীবনের প্রথম হজ আদায় করি। শায়খের ভবিষ্যদ্বাণী আমার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

জনৈক বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ

সেখান থেকে রওনা হয়ে চলে আসি 'কনা' নগরীতে। ছোট্ট নগরী হলেও এর বাজার-ঘাট বেশ সমৃদ্ধ। বিখ্যাত বুযুর্গ আবদুর রহিম কনাবী রহ. এর কবর এখানেই অবস্থিত। যিনি 'আল বারাহিনুল আজিবা' গ্রন্থের লেখক। যার অসংখ্য কারামাত এখন লোকমুখে প্রসিদ্ধ। সেই মহান বুযুর্গের পৌত্র

শিহাবুদ্দিন আহমদের সঙ্গে 'আল মাদরাসাতুস সাইফিয়্যাহ'-এ সাক্ষাৎ করেছি।

কনা থেকে রওনা হয়ে চলে আসি 'কুস' নগরীতে। আয়তনে বিশাল এ নগরীকে প্রকৃতি যেন দু হাতে বরকত ঢেলে দিয়েছে। এখানকার বাগানগুলো সবুজ-শ্যামল। বাজারগুলোতে পণ্যের বিপুল সমারোহ। যেকোনো নগরীর তুলনায় এখানে প্রচুর মসজিদ রয়েছে। মাদরাসার সংখ্যা গুণে শেষ করতে পারিনি। মিসরের উঁচু অংশের সর্বোচ্চ পদাধিকারী গভর্নর এ নগরীতেই বাস করে থাকেন। শহরের বাইরে শায়খ শিহাবুদ্দিন বিন আবদুল গফফারের খানকা অবস্থিত। প্রতিবছর রমযান মাসে সংসারবিরাগী দরিদ্র ও কাঙালেরা সেই খানকাতে সমবেত হয়ে থাকে।

এ অঞ্চলের অন্যতম শীর্ষ আলেম হলেন, কাজি জামালুদ্দিন ইবনুস সাদিদ। ফাতহুদ্দিন বিন দাকিকিল ঈদ এখানকার জামে মসজিদের খতিব। যিনি আমার দেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী সাহিত্যিক। সারা পৃথিবী ঘুরে আমার মনে হয়েছে, তার সমপর্যায়ের সাহিত্যিক স্রেফ দুজনই হতে পারেন। একজন হলেন, আল মাসজিদুল হারামের খতিব বাহাউদ্দিন তবারি। দ্বিতীয়জন হলেন খাওয়ারিজম নগরীর খতিব হুসামুদ্দিন শাতেবি। যথাস্থানে আমি তাদের দুজন সম্পর্কেও আলোচনা করব।

এছাড়াও এ শহরের আরো কজন বিখ্যাত মনীষী হলেন, ফকিহ বাহাউদ্দিন আবদুল আযিয। যিনি মালেকী মাদরাসার অধ্যাপক। অপরজন হলেন, ফকিহ বুরহানুদ্দিন ইবরাহিম আন্দালুসি। যিনি সুবিশাল খানকার পরিচালক।

আকসুর নগরীতে পদার্পণ ও পরিদর্শন

'কুস' নগরী থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম 'আকসুর' নগরীতে। ছবির সাজানো ছোট্ট জনপদ। বিখ্যাত মনীষী আবুল হাজ্জাজ আকসুরি এখানেই সমাহিত। তার মাজারকে কেন্দ্র করে বিশাল খানকা গড়ে উঠেছে।

সেখান থেকে রওনা হয়ে পৌঁছুলাম 'আরমান্ত' নগরীতে। এটিও ছোট্ট নগরী। তবে এখানে প্রচুর বাগ-বাগিচা রয়েছে। নীলনদের পাদদেশে অবস্থিত। এখানকার কাজি সাহেব আমাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যান এবং যথেষ্ট সমাদর করে; তবে এ মুহূর্তে তাঁর নামটি মনে করতে পারছি না।

আসনা ও উদফু নগরীতে

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা চলে এলাম 'আসনা' নগরীতে। একটি বিশাল নগরী হয়েও অন্য নগরীগুলোর সঙ্গে পার্থক্য হলো, এখানকার পথগুলো যথেষ্ট চওড়া। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে আদর্শ নগরী। এখানে প্রচুর খানকা, মসজিদ ও মাদরাসা রয়েছে। মাজারগুলো দৃষ্টিনন্দন। এখানকার সবগুলো বাগান সবুজ-শ্যামল ও উপভোগ্য। শিহাবুদ্দিন বিন মিসকিন হলেন এখানকার প্রধান বিচারপতি। তিনি আমাকে আন্তরিকভাবে আতিথেয়তা করেছেন। যথেষ্ট সমাদর করেছেন। তার অধীনস্থ সহকারীদের কাছে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন যে, আমাকে যথোচিত সম্মান দেখানো হয়।

এখানকার গুণীজনদের মাঝে রয়েছেন, শায়খ নুরুদ্দিন আলী, শায়খ আবদুল ওয়াহিদ মাকানিসি। তিনি এখন কুস নগরীর একটি খানকার পরিচালক।

আসনা থেকে রওনা হয়ে পুরো একদিন ও একরাত মরুপ্রান্তরের বুক চিরে এগিয়ে চললাম। অবশেষে আমরা পৌঁছুলাম 'উদফু' নগরীতে। সেখান থেকে নীলনদ ডিঙিয়ে চলে এলাম 'উতওয়ানি' নগরীতে। এখানে এসে একটি উট ভাড়া নিলাম এবং আরব বংশোদ্ভূত 'দাগিম' গোত্রের একটি কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রওনা হলাম। আমাদেরকে এমন একটি মরুপ্রান্তর অতিক্রম করতে হবে, যেখানে কোথাও কোনো জনবসতি নেই। সান্ত্বনার বিষয় হলো, এখানে দস্যুদলের আক্রমণের কোনো ভয় নেই। এক মনযিল পথ অতিক্রম করার পর আমরা এলাম 'হুমায়সারা' নামক স্থানে, যেখানে বিখ্যাত বুযুর্গ আবুল হাসান শাযেলি রহ. এর কবর অবস্থিত। তার ইন্তেকালের ঘটনা আমরা ইতিপূর্বে তাঁর কারামত শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছি। সমস্যা হলো, এ অঞ্চলে প্রচুর হায়েনার বসবাস। রাতভর হায়েনার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। যার ফলে আমরা কেউ ভয়ে বাহন থেকে মাটিতে অবতরণ করার সুযোগ পাইনি। নিরাপত্তার সকল সতর্ক ব্যবস্থা সত্ত্বেও একটি হায়েনা এসে আমাদের জিনিসপত্র ফেড়ে এক থলে খেজুর নিয়ে পালিয়ে যায়। সকালে উঠে দেখলাম যে, হায়েনা সেই থলে ছিঁড়ে ভেতরের সিংহভাগ খেজুর তার উদরে ভরেছে।

আইযাব নগরীতে

উদফু থেকে পনেরো দিনের দীর্ঘ যাত্রা শেষে আমরা এসে পৌঁছুলাম 'আইযাব' নগরীতে। বিশাল বড় নগরী। সবখানে মাছ আর দুধের

সমারোহ। মিসরের উঁচু এলাকা থেকে এখানে সব ধরনের খেজুর ও শস্য রপ্তানি হয়ে থাকে। বারবার বংশোদ্ভূত বাজাত গোত্র এখানকার প্রধান বাসিন্দা। গায়ের বর্ণ কুচকুচে কালো। সাধারণত তারা গায়ে হলুদ বর্ণের চাদর পরে থাকে। মাথায় হলুদ বর্ণের পট্টি থাকে, যা প্রায় এক আঙুল চওড়া। এখানকার রীতি হলো, নারীরা উত্তরাধিকার সম্পত্তি পায় না। উটের দুধ তাদের প্রধান খাদ্য। মাহারি জাতের আরব ঘোড়া তাদের একমাত্র বাহন। তারা ঘোড়াকে 'সহব' নামে ডাকে। এ অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ এলাকার ওপর সুলতান নাসিরের কর্তৃত্ব। আরেক এক তৃতীয়াংশ বাজাত রাজার অধীনে। যা 'হাদারবি' এলাকা নামে পরিচিত।

আইযাব নগরীতে এসে আমরা কুসতালানি নামে একটি মসজিদ পেলাম, যার বরকতের সুখ্যাতি দূরদূরান্তে বিস্তৃত। আমি সেই মসজিদের যিয়ারত করার সৌভাগ্য পেয়েছি। শায়খ সালিহ মুসা ও বৃদ্ধ তাপস মুহাম্মাদ মারাকেশি এখানে বাস করেন। সম্ভবত সেই মুহাম্মাদ মারাকেশি হলেন মারাকিশের সুলতান মুরতাযার ছেলে। তখন তিনি পঁচানব্বই বছরের বৃদ্ধ।

আমরা যখন আইযাব নগরীতে পৌঁছি, তখন হাদরাবির বাজাত রাজা তুর্কিদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তার সৈন্যরা তুর্কিদের নৌযানগুলো ডুবিয়ে দিয়েছে, যার ফলে তুর্কিরা রণক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছে। সেই যুদ্ধের কারণে আমাদের পক্ষে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে আমরা আমাদের সকল জিনিসপত্র বিক্রি করে দিই। যেই আরবদের কাছ থেকে উট ভাড়া নিয়েছিলাম, তাদের সহযাত্রী হয়ে আমরা মিসর প্রত্যাবর্তন করি।

ফেরার পথে সর্বপ্রথম কুস নগরীতে পৌঁছি, যার আলোচনা কিছুক্ষণ আগে করেছি। এখান থেকে নীলনদের নৌযানে অবতরণ করি। তখন ছিল নীলনদের জোয়ারকাল। আট দিনে আমরা কুস থেকে মিসরে পৌঁছে যাই।

মিসরে মাত্র এক রাত কাটিয়ে আমরা শামদেশের উদ্দেশে রওনা হই। তখন ছিল ৭২৬ হিজরির শাবান মাসের মধ্যভাগ। নতুন এই সফরে সর্বপ্রথম আমরা 'বালবাইস' নগরীতে এসে পৌঁছি। বিশাল নগরী। সর্বত্র ফলবাগানের ছড়াছড়ি। এখানে এসে কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি।

সালিহিয়্যা নগরীতে

বালবাইস থেকে যাত্রা করে আমরা পৌঁছুলাম সালিহিয়্যা নগরীতে। এখান থেকে শুরু হয়েছে বালুকাময় উপত্যকা। যত দূর দৃষ্টি যায়, শুধুই বালিয়াড়ি। তার ওপর দিয়েই আমরা আমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখি। পথিমধ্যে বিভিন্ন মনযিলে আমরা অবতরণ করে স্থানীয় সরাইখানায় অতিথি হয়েছি। যেমন, সাওয়াদা, ওয়ারিদা, তাইয়্যিব, আরিশ ও খারুবা। প্রতিটি মনযিলেই রেস্তোরাঁ রয়েছে। স্থানীয় জনগণ যাকে 'খান' বলে থাকে। সেসব সরাইখানায় মুসাফিরগণ অবতরণ করে থাকেন। কারো সঙ্গে বাহন থাকলে সেগুলোর জন্যেও পর্যাপ্ত দানাপানির ব্যবস্থা থাকে।

সরাইখানার বাইরে কুয়ো থাকে। মুসাফিরগণ সেখান থেকে নিজেদের জন্যে ও বাহনের পশুর জন্যে প্রয়োজনীয় পানীয়জল সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়াও কোথাও কোথাও দোকানপাট থাকে। যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। মুসাফিরগণ নিজেদের জন্যে ও বাহনের জন্যে দরকারি মনে করলে কিনে নিয়ে যায়।

শুল্কঘর ও কাস্টমস সিস্টেম

এখান থেকে অগ্রসর হয়ে আমরা পৌঁছুলাম প্রসিদ্ধ জনপদ 'কাতইয়া'-তে। এখানে ব্যবসায়ীদের থেকে বাণিজ্যিক শুল্ক ও মূল্যবান জিনিসপত্রের কর তোলা হয়ে থাকে। এজন্যে এখানে প্রত্যেকের কড়া তল্লাশি নেওয়া হয়। শুল্ক যথাযথভাবে গ্রহণের জন্যে এখানে সবসময় দেওয়ান, কর্মচারী, মুনশি, সাক্ষী, তথা শুল্ক গ্রহণ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত জনবল উপস্থিত থাকেন। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এখানে প্রতিদিন গড়ে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা শুল্ক তোলা হয়ে থাকে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে। তা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত ছাড়পত্র প্রদর্শন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি মিসর থেকে শামদেশে বা শাম থেকে মিসরে যেতে পারবে না। মূলত পথিকদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে এবং ইরাকি গুপ্তচরদের কবল থেকে রক্ষা পেতে এখানে সেই সতর্ক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এই গুরুত্বপূর্ণ পথের প্রহরার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আরবদেরকে। কেউ

যেন লুকিয়ে পারাপার হতে না পারে এবং বিনাশুল্কে কোনো পণ্য চোরাই পথে পাঠাতে না পারে, এজন্যে আরবরা সতর্ক থাকে।

এখানকার রীতি হলো, সন্ধ্যার সময় পুরো বালিয়াড়িকে এমনভাবে সমান করে দেওয়া হয় যে, কোথাও কোনো পদচিহ্ন বা দাগ-আলামত থাকে না। পরদিন সকালে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পরিদর্শনে বের হন। কোথাও পদচিহ্ন দেখতে পেলে সঙ্গে প্রহরায় নিয়োজিত আরবদেরকে পশ্চাদ্ধাবনে পাঠিয়ে দেন। যেকোনো মূল্যে অবশ্যই ধরে আনতে হবে। এরপর কর্মকর্তা অপরাধীকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করে থাকেন।

আমি যখন এখানে আগমন করি, তখন ইজ্জুদ্দিন নামক এক কর্মকর্তা এখানে দায়িত্ব পালন করতেন। তাকে আমি যথেষ্ট ভদ্র পেয়েছি। তিনি আমাকে বেশ সমাদর করেছেন। আমাকে ও আমার সঙ্গের লোকদেরকে বিনাশুল্কে পার হবার অনুমতি দিয়েছেন।

আবদুল জলিল মাগরিবি নামের একলোক ছিলেন তার সহকারী। মরক্কোর স্থানীয় হবার কারণে তিনি সেই অঞ্চল সম্পর্কে ভালোভাবে জানতেন। এজন্যে সেই অঞ্চলের কেউ এই পথ দিয়ে গেলে তিনি তাকে জেরা করতেন যে, তার নামধাম কী, কোন অঞ্চলের বাসিন্দা, ইত্যাদি। এভাবে জেরা করার কারণ হলো, এই কাস্টমস অফিসে সাধারণ মরক্কোর লোকদের থেকে শুল্ক নেওয়া হতো না।

শামদেশে

গাজা নগরীতে

অবশেষে আমরা গাজা নগরীতে এসে পৌঁছুলাম। মিসর সীমান্ত ঘেঁষে এটাই শামদেশের প্রথম বড় শহর। আয়তনে যথেষ্ট বড় এ শহরটিতে এত প্রচুর বাড়িঘর রয়েছে যে, যেকোনো পর্যটক বিস্মিত হবে। বাজারগুলো পরিষ্কার ও গোছানো। সবখানে মসজিদের ছড়াছড়ি। তবে শহরটির চারপাশে কোনো প্রাচীর নেই। শহরের কেন্দ্রস্থলে যেই প্রাচীন মসজিদ রয়েছে, তার সৌন্দর্য যেকোনো পর্যটককে বিস্মিত করবে। এখনো সেখানে জুমার নামায আদায় হয়। আমির মুয়াজ্জাম জাভিলি এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মজবুত স্থাপনার ওপর দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য মসজিদের সৌন্দর্যকে অনন্য করে তুলেছে। সাদা মর্মর পাথর দিয়ে মসজিদের মিম্বার নির্মিত।

বদরুদ্দিন হুরানি হলেন এই শহরের বিচারপতি। আলামুদ্দিন বিন সালিম হলেন এখানকার প্রধান অধ্যাপক। বনু সালিমের অভিজাত ব্যক্তিরাই এ শহরের সবচেয়ে প্রভাবশালী ঘরানা। বাইতুল মাকদিসের বিচারপতি শামসুদ্দিন এই বনু সালিমেরই বংশধর।

দিয়ারে খলিল

গাজা থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম সাইয়েদুনা ইবরাহিম আ.-এর স্মৃতি বিজড়িত দিয়ারে খলিল নগরীতে। যদিও আয়তনে বেশ ছোট্ট জনপদ; কিন্তু বিশ্ববাসীর কাছে শহরটির মূল্য অনেক। এখান থেকেই সারা পৃথিবীতে তাওহিদের আলো ছড়িয়েছে। ছবির মতো সাজানো গুছানো শহর। যার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের ধূসর আখ্যান। একটি উপত্যকার কোলে শহরটির অবস্থান। মসজিদের কারুকার্য দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছি। শক্ত প্রাচীর। পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে মসজিদের ভবন মজবুতভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। যার পাথর একটি পাথর এতটাই বিশাল যে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব প্রায় সাইত্রিশ বিঘত। কথিত আছে যে, সাইয়েদুনা সুলাইমান আ.-এর নির্দেশে জিন সম্প্রদায় মসজিদটি নির্মাণ করেছিল।

মসজিদের ভুগর্ভস্থ গুহা ও নবী-রাসূলদের কবরস্থান

মসজিদের অভ্যন্তরে একটি গুহা রয়েছে। যার মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা সম্পর্কে অনেক রেওয়ায়াত শোনা যায়। এখানেই হযরত ইবরাহিম, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুব আ.-এর কবর। এই তিন কবরের সামনেই আরো তিনটি কবর রয়েছে, যা তাঁদের পুণ্যবতী স্ত্রীগণের কবর।

মিম্বারের ডান পাশে, কেবলার প্রাচীর ঘেঁষে একটি ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। যেখান থেকে একটি চিকন সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। অত্যন্ত সংকীর্ণ সেই পথের শেষ প্রান্তে একটি চত্বর রয়েছে, যার মেঝেতে মর্মর পাথর বিছানো রয়েছে। সেই মেঝের ওপর তিনটি কবরের চিত্র আঁকা রয়েছে। যা উপরের তিন কবরের ঠিক নিচেই অবস্থিত। এখান থেকে গুহার দিকে আরেকটি রাস্তা রয়েছে, যা বর্তমানে বন্ধ। আমি সেই ঐতিহাসিক স্থানটিতে একাধিকবার অবতরণ করেছি।

হযরত ইবরাহিম আ.-এর কবর

আলোচিত তিনটি কবর যে তিনজন মহান নবীর কবর, সে ব্যাপারে সমর্থন প্রদানকারী উলামায়ে কেরামের দলিল হলো, আলী বিন জাফর রাযী রহ. একটি গ্রন্থ লিখেছেন। নাম, المسفر للقلوب عن صحة قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب। সেখানে তিনি সাইয়েদুনা আবু হুরায়রা রা. থেকে বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীস নকল করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন আমি মিরাজের রজনীতে বাইতুল মাকদিসে আগমন করি তখন জিবরিল আ. আমাকে হযরত ইবরাহিম আ.-এর কবরের পাশে নিয়ে আসেন। এরপর বলেন, 'আপনি নেমে দু' রাকাত নামায আদায় করুন। এখানে আপনার দাদা ইবরাহিম আ.-এর কবর।' এরপর আমাকে বেথেলহেমে (বাইতুল লাহমে) নিয়ে যান। এখানে এসে জিবরিল আমাকে বলেন, 'আপনি নেমে দু' রাকাত নামায আদায় করুন। এখানে আপনার ভাই ঈসা আ.-এর জন্ম।' এরপর তিনি আমাকে সখরার কাছে নিয়ে যান।[১]

এ নগরীতে এসে বিদগ্ধ আলেম ও খতিব বুরহানুদ্দিন জা'বারির সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি। তিনি একজন বুযুর্গ ইমাম হিসেবে সর্বত্র প্রসিদ্ধ। আমি তাকে

---

[১] আল হাদীস।

প্রশ্ন করেছিলাম যে, 'এখানে হযরত ইবরাহিম আ.-এর কবর দাবি করা হচ্ছে, এ কথা কতটুকু সত্য?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'আজ পর্যন্ত যতজন গবেষক আলেমের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই বলেছেন যে, এ কবরগুলো অবশ্যই হযরত ইবরাহিম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব আলাইহিমুস সালাম ও তাঁদের পুন্যবতী স্ত্রীগণের কবর। বিদআতি মহল ব্যতিরেকে অন্য কেউ এই দাবির ওপর আপত্তি তোলেনি। এই তথ্য পূর্বসূরিদের থেকে পরম্পরায় পর্ববর্তীগণ নকল করে আসছেন। অতএব, এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

কথিত আছে যে, একবার এক ইমাম এই গুহার ভেতরে প্রবেশ করেন এবং হযরত সারা রা.-এর কবরের সামনে দাঁড়ান। তখন জনৈক বয়স্ক লোক ভেতরে প্রবেশ করে ওই ইমামকে জিজ্ঞেস করেন, 'এই কবরগুলোর মধ্য হতে কোনটি হযরত ইবরাহিম আ.-এর কবর?' তখন ওই ইমাম আরেকটি কবরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'ওটি হযরত ইবরাহিম আ.-এর কবর?' এরপর এক যুবক প্রবেশ করে অনুরূপ প্রশ্ন করলে ইমাম সাহেব দেখিয়ে দেন। এরপর এক শিশু প্রবেশ করে অনুরূপ প্রশ্ন করলে এবারও ইমাম সাহেব পূর্বের কবরটি দেখিয়ে দেন। এরপর সেই ফকিহ ইমাম বলেন, 'আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই মাজার নিঃসন্দেহে হযরত ইবরাহিম আ.-এর মাজার।' এরপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করে ফজর নামায আদায় করেন। এরপর নিজ পথে ফিরে যান।

হযরত ইউসুফ ও লুত আ.-এর কবর

এই মসজিদের অভ্যন্তরে হযরত ইউসুফ আ.-এর করব অবস্থিত। খলিলের চৌহদ্দির পূর্বপ্রান্তে একটি ছোট্ট পর্বতের ওপর হযরত লুত আ.-এর কবর অবস্থিত। এখান থেকে শাম সীমান্ত দেখা যায়। কবরের ওপর দৃষ্টিনন্দন ভবন রয়েছে। সাদা ধবধবে ভবনটি যে কারো দৃষ্টি কাড়বে। তার ওপর কোনো আবরণ নেই। এর পাশেই সেই লুত সাগর অবস্থিত, যার পানি সীমাহীন লবণাক্ত। কথিত আছে, আজকের এই সাগরটিই একসময় লুত আ.-এর সম্প্রদায়ের আবাসস্থল ছিল।

লুত আ.-এর কবরের কাছে একটি মসজিদ রয়েছে। নাম, মাসজিদুল ইয়াকিন। এটি এটি উঁচু টিলার ওপর অবস্থিত। মসজিদ থেকে এক ধরনের

জ্যোতি বের হয়, যা আমি অন্য কোথাও দেখিনি। তার পাশে একটি ছোট্ট বসতভিটা রয়েছে। মসজিদের ব্যবস্থাপক সেখানে বসবাস করেন। মসজিদের দরজার কাছে একটি নিচু পাথুরে জায়গা রয়েছে। ওই জায়গাটি হলো একটি ছোট্ট মিহরাব। এতটাই ছোট্ট যে, স্রেফ একজন ব্যক্তিই নামায পড়তে পারবে। কথিত রয়েছে যে, যখন লুত আ.-এর সম্প্রদায় ধ্বংস হয় তখন ইবরাহিম আ. শুকরিয়া আদায় করে এখানে সেজদা দিয়েছিলেন। ওই মুহূর্তে সেজদা করার কারণ জায়গাটিতে মৃদু কম্পন সৃষ্টি হয় এবং খানিকটা নিচের দিকে ধসে যায়।

ফাতেমা বিনতে হুসাইন রহ. এর কবর

সেই ঐতিহাসিক মসজিদের কাছে একটি নিচু স্থান রয়েছে, সেখানে হুসাইন ইবনে আলী রা.-এর কন্যা ফাতেমার কবর অবস্থিত। ওই কবরের মাথা ও পায়ের দিকে দুটি এপিটাফ রয়েছে। মার্বেল পাথরের সেই এপিটাফের একটিতে এ কথা লেখা রয়েছে যে,

بسم الله الرحمن الرحيم

لله العزة والبقاء، وله ما ذرا وبرا، وعلى خلقه كتب الفناء، وفي رسول الله أسوة أحسنة، هذا قبر أم سلمة فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه.

'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

সম্মান ও চিরস্থায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর। যা প্রকাশ পেয়েছে ও অস্তিত্ব লাভ করেছে, তা শুধু তাঁরই। তিনি তাঁর সৃষ্টিজীবকে নশ্বর করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝেই অনুপম আদর্শ। এটি হযরত হুসাইন রা.-এর কন্যা ফাতেমা উম্মে সালামার কবর।'

অপর এপিটাফের ওপর এ কথাগুলো লেখা রয়েছে,

'এটি মিসরের চিত্রকর মুহাম্মাদ বিন আবি সাহল নির্মাণ করেছেন।'

তার নিচে এ পঙ্‌ক্তিগুলো লেখা রয়েছে,

أسكنت من كان في الأحشاء مسكنه بالرغم مني بين الترب والحجر
يا قبر فاطمة بنت ابن فاطمة بنت الأئمة بنت الأنجم الزهر

يا قبر ما فيك من دين ومن ورع ومن عفاف ومن صون ومن خفر

'আপনার স্থান ছিল আমার অন্তরে; কিন্তু ভাগ্যের লিপিতে আপনাকে পাথর ও মাটির ঘরে বাস করতে দিতে হলো।

ওহে ফাতেমার ছেলের কন্যা ফাতেমা, আপনি ইমামদের কন্যা, উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের কন্যা।

ওহে কবর, বলো– ধার্মিকতা, খোদাভীরুতা, সতিত্ব, শালীনতা ও লজ্জার মধ্য হতে কোন জিনিসটি তোমার মাঝে সমাহিত করা হয়নি।'

বাইতুল মাকদিস, বেথেলহেম ও ইউনুস আ.-এর মাজারে

ইতিহাসের আঁতুড়ঘর থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম পুণ্যভূমি কুদসে। যাওয়ার পথে হযরত ইউনুস আ.-এর কবর যিয়ারত করেছি। বর্তমানে সেখানে সুবিশাল ভবন ও মসজিদ রয়েছে।

পাশাপাশি হযরত ঈসা আ.-এর জন্মস্থান বেথেলহেম (বাইতুল লাহম)-ও পরিদর্শন করেছি। এখনো সেখানে খেজুরগুচ্ছের একটি নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। তিনি যেই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার ওপর প্রচুর বাড়িঘর গড়ে উঠেছে। খ্রিস্টানরা এ জায়গাটিকে সীমাহীন সম্মান করে থাকে। তারা প্রত্যেক দর্শনার্থীর আতিথেয়তা করে।

এখান থেকে রওনা হয়ে আমরা বাইতুল মাকদিসে পৌঁছুলাম। মুসলিম জনগোষ্ঠীর চোখে যেই তিনটি মসজিদ সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, তার একটি এই বাইতুল মাকদিস। এই তিন মসজিদ অন্য সকল মসজিদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখান থেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজ রজনীতে ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করেছিলেন। শহরটি বেশ প্রশস্ত। বাড়িঘর পাথর দিয়ে নির্মিত। আল্লাহ তাআলা মহান শাসক ও বিজেতা বীর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি রহ.-কে উম্মাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি যখন এ শহর জয় করেন তখন শহরের কিছু জায়গার আশ্রয়কেন্দ্র ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে ইউসুফ আল মালিকুয যাহির পিতার পথ ধরে আরো আরো কিছু অংশ ধ্বংস করেছিলেন। কারণ, শঙ্কা ছিল—যদি কখনো

রোমান ক্রুসেডার বাহিনী ফিরে এসে আক্রমণ করে তাহলে সেগুলো তাদের নিরাপত্তা ছাউনির ভূমিকা পালন করতে পারে। ইতিপূর্বে এ নগরীতে কোনো খাল ছিল না। দামেস্কের আমির সাইফুদ্দিন তুঙ্গুজ শহরের ভেতরে খালের মাধ্যমে পানি প্রবাহের বন্দোবস্ত করেছেন।

পৃথিবীর বৃহত্তম উপাসনালয় : আল মাসজিদুল মুকাদ্দাস

পৃথিবীর অন্যতম সুন্দরতম মসজিদ। কথিত আছে, এ যুগে গোটা পৃথিবীতে এরচেয়ে বড় মসজিদ আরেকটি নেই। পূর্বাংশ থেকে পশ্চিমাংশের পরিধি সাত শো বায়ান্ন গজ। আর কেবলার সামনের দিক থেকে অর্থাৎ উত্তরে-দক্ষিণে চারশ পঁয়ত্রিশ গজ। আমার জানামতে, কেবলার দিক থেকে একটা মাত্র দরজা, যেখান দিয়ে ইমাম সাহেব যাতায়াত করে থাকেন। অবশিষ্ট তিন দিকে অনেকগুলো দরজা রয়েছে। পুরো মসজিদ ছাদবিহীন ময়দান। তবে আকসার অংশটিতে ছাদ রয়েছে। যা অত্যন্ত মজবুত নির্মাণশৈলীতে গড়ে তোলা হয়েছে। স্বর্ণের প্রলেপে চকচক করে। পাশাপাশি বেশ কিছু স্থানে অত্যন্ত মূল্যবান রং ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েকটি ছোট ছোট ছাদযুক্ত স্থাপনা রয়েছে।

কুব্বাতুস সখরা

পৃথিবীতে যত সুন্দর স্থাপনা আছে, সেই তালিকায় কুব্বাতুস সখরাকে অবশ্যই শীর্ষদেশে রাখতে হবে। সৌন্দর্যের কারণে কেউ তার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারবে না। মসজিদের মধ্যখানে উঁচু জায়গার ওপর অবস্থিত। একটি মর্মরের সিঁড়ি বেয়ে সেখানে ওঠা যায়। এই গম্বুজের চারটি দরজা রয়েছে। ভেতরে ও বাইরে শৈল্পিকভাবে মর্মর বিছানো রয়েছে। এমনকি গম্বুজের নিচের মেঝেতেও চমৎকার শৈলীতে মর্মর পাতা রয়েছে। একবাক্যে গম্বুজের শতভাগ অংশই দৃষ্টিনন্দন। আমি আমার সীমিত ভাষা ও শব্দ দিয়ে তার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারব না।

গম্বুজের বৃহদাংশ সোনার প্রলেপে আবৃত। যার ফলে তার সৌন্দর্য এতটাই দৃষ্টিনন্দন যে, বিমোহিত না হয়ে পারা যায় না। কোনো গদ্যকার বা পদ্যকার তার সৌন্দর্যের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করতে পারবে না।

কুব্বাতুস সখরার মাঝখানে একটি পাথর রয়েছে, যার সঙ্গে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে। এখান থেকেই তিনি ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করেছিলেন। অত্যন্ত শক্ত পাথর। উচ্চতায় একজন মানুষের সমান। সেই পাথরের নিচের দিকে একটি গুহা রয়েছে, যা ছোট্ট খুপড়ির সমান হবে। এই খুপড়ির ভেতরটাও একজন মানুষের উচ্চতার সমান। সিঁড়ি বেয়ে সেখানে যেতে হয়। ভেতরে অনেকটা মেহরাবের মতো আকৃতি।

সখরার ওপর দুটি জানালা রয়েছে। অত্যন্ত মজবুতভাবে তৈরি। পাথরের কাছাকাছি অবস্থিত জানালাটি লোহার তৈরি। তার ওপর বিচিত্র কারুকার্যখচিত রয়েছে। অপরটি কাঠের তৈরি। যা লৌহনির্মিত জানালার উপর অবস্থিত। এই কুব্বাতুস সখরার ভেতরে একটি বিশাল লৌহঢাল রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে যে, হযরত হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব রা. সেই ঢাল ব্যবহার করতেন।

কুদসের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান

এখানে একটি ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। যার ব্যাপারে কথিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা আ. এখান থেকে আকাশে আরোহণ করেছিলেন। বাইতুল মাকদিস শহরের পূর্বপ্রান্তে একটি উঁচু টিলার ওপর উপত্যকার মতো একটি জায়গা আছে। 'জাহান্নামের উপত্যকা' নামে যা প্রসিদ্ধ।

রাবেয়া বাদাভিয়্যাহ নামের অতীতের এক বিদুষী নারীর একটি মাজার রয়েছে। বাদাভিয়্যাহ হলো, বাদিয়ার দিকে সম্বন্ধিত। তিনি কিন্তু সেই বিখ্যাত রাবেয়া নন।

সেই উপত্যকার মধ্যখানে একটি গির্জা রয়েছে, যা খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান। তারা বিশ্বাস করে, এখানেই হযরত মারইয়াম আ.-এর কবর। এখানে আরেকটি গির্জা রয়েছে, যার ব্যাপারে তারা মনে করে যে, সেটি হযরত ঈসা আ.-এর সমাধি। এটিও তাদের তীর্থস্থান। যদিও তাদের সেই দাবি ষোলোআনা মিথ্যা। এই গির্জাগুলো পরিদর্শনের জন্যে দূরদূরান্ত থেকে লোকজন আসে। এখানে প্রত্যেক খ্রিস্টান দর্শনার্থীকে ট্যাক্স প্রদান করতে হয়; যা মূলত তাদের বশ্যতার প্রতীক হিসেবে নেওয়া হয়।

এখানকার একটি জায়গা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস হলো যে, সেখানে হযরত ঈসা আ. জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কুদস অঞ্চলের শীর্ষ গুণীজন

বিদগ্ধ আলেম শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন সালিম গাজাবী এখানকার বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছেন। গাজা নগরীরই অধিবাসী। তাকে এ অঞ্চলের শীর্ষ গুণীদের একজন মনে করা হয়। এখানকার খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, আরেকজন গুণী ব্যক্তিত্ব ইমাদুদ্দিন নাবলুসি। গুণীদের তালিকায় আরো রয়েছেন, বিখ্যাত মুফতি ও হাদীসবিশারদ শিহাবুদ্দিন তাবারি, মালেকী মাযহাবের অধ্যাপক ও কারিমিয়া খানকার শায়খ আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুসবিত গারনাতি। যিনি হিজরত করে এখানে চলে এসেছেন।

শায়খ আবু আলী হাসান নামের একজন মহান বুযুর্গ এখানে বাস করেন, যাঁকে সবাই 'মাহজুব' নামে একবাক্যে চেনে। এখানকার আরো কজন বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব হলেন, শায়খ কামালুদ্দিন মারাগি, শায়খ আবু আবদির রহিম আবদুর রহমান বিন মুসতফা, যিনি মূলত রোম দেশের অধিবাসী ছিলেন। তার আরেকটি পরিচয় হলো, তিনি শায়খ তাজুদ্দিন রিফায়ি রহ.-এর শিষ্য। আমি কিছুদিন তার সংস্পর্শে অবস্থান করেছি এবং তার কাছ থেকে নিয়ে সুফিদের বিশেষ সূতি পোশাক পরিধান করেছি।

আসকালান নগরীতে

বাইতুল মাকদিস পরিদর্শন ও সেখানকার ঐতিহাসিক নিদর্শন, স্থাপনা ও মাজার যিয়ারতের কাজ সম্পন্ন করে আমরা রওনা হলাম আরেক ঐতিহাসিক নগরী আসকালান সীমান্ত অভিমুখে। যা বর্তমানে একটি বিধ্বস্ত নগরীর ধ্বংসাবশেষ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। কোথাও কোনো জনবসতি নেই, সবুজ শ্যামলিমা নেই, দৃষ্টিনন্দন বাড়িঘর নেই, উঁচু কেল্লা নেই। ঐতিহ্যের স্মৃতি হিসেবে স্রেফ কিছু ধ্বংসাবশেষই রয়েছে।

অথচ যখন এই আসকালান নগরীর যৌবনকাল ছিল; তখন তার সঙ্গে সৌন্দর্যে, সমৃদ্ধিতে আর ভবনের সৌকর্যে তুলনা করার মতো নগরী

পৃথিবীতে খুব কমই ছিল। এখানে জল ও স্থলভাগের সকল জীবনোপকরণ পাওয়া যেত।

অতীতের বিস্মৃত অধ্যায়

সাইয়েদুনা হুসাইন রা.-এর কর্তিত মস্তক কায়রোতে নিয়ে যাওয়ার আগে এই আসকালানের একটি উঁচু জায়গায় রাখা ছিল। এখন সেখানে একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ রয়েছে। পানি সরবরাহের জন্যে কুয়ো রয়েছে। মসজিদের দরজার হস্তলিপি থেকে বুঝে আসে যে, বনু উবাইদা রাজবংশের কোনো এক শাসকের নির্দেশে এই মসজিদ নির্মিত হয়।

স্মৃতিবিজড়িত সেই কবর থেকে আরেকটু সামনে একটি বিশাল মসজিদ রয়েছে, যা 'মসজিদে উমর রা.' নামে পরিচিত। যা এখন শতভাগ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। গুটিকয়েক প্রাচীর আর মর্মর পাথরের দু-চারটি স্তম্ভ কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কায়িম ও হাসিদ—এ দু অঞ্চলের মাঝখানে অবস্থিত সেই মসজিদের সৌন্দর্যের বিবরণ এখনো লোককথা হয়ে মানুষের মুখে মুখে চর্চিত হয়।

এই আসকালান নগরীর আরেকটি বিস্ময়কর বস্তু হলো, লাল স্তম্ভ। জনশ্রুতি রয়েছে যে, একবার একদল খ্রিস্টান সেই স্তম্ভগুলো তুলে নিজেদের রাষ্ট্রে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে কুদরতিভাবে হারিয়ে যায় এবং আসকালানের পূর্বের স্থানে যথারীতি পাওয়া যায়। এই মসজিদের কেবলার দিকে একটি কুয়ো রয়েছে, যা ইবরাহিম আ.-এর কুয়ো নামে বিখ্যাত। প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে নামলে প্রথমে কুয়োর ভেতরে কিছু ঘরবাড়ি দেখা যাবে। এই কুয়োর চারপাশে পাথরের ভেতরের সুরঙ্গ থেকে অবিরত পানির স্রোত ঝরছে। পানি অত্যন্ত মিষ্টি; অথচ কুয়োটি খুব বেশি গভীর নয়। এই কুয়োর পানির মাহাত্ম্য সম্পর্কে লোকমুখে গুজবের শেষ নেই।

আসকালান নগরীর বাইরে একটি স্থান রয়েছে, যা পিঁপড়ার উপত্যকা নামে বিখ্যাত। কথিত আছে যে, পিঁপড়ার এই উপত্যকা সম্পর্কেই কুরআন কারিমে আলোচনা করা হয়েছে। এই আসকালান নগরীতে এত প্রচুর শহীদ ও বুযুর্গানে দীনের মাজার রয়েছে যে, গুণে শেষ করা যাবে না। আমাদেরকে

সেগুলোর পরিচালকগণ ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছেন। তাদের জন্যে একদিকে সুলতানের পক্ষ থেকে ভাতার বন্দোবস্ত রয়েছে; অন্যদিকে আগত দর্শনার্থীরাও তাদের হাতে দান-অনুদান গুঁজে দেয়।

ফিলিস্তিনের মাটিতে

আসকালান থেকে রওনা হয়ে আমরা চলে আসি রামলা নগরীতে। এই গো ফিলিস্তিন অঞ্চল, যার আয়তন, সমৃদ্ধ কল্যাণ, সমৃদ্ধ বাজার-ঘাট আর সা মসজিদের সুখ্যাতি অজস্রবার শুনেছি। কথিত রয়েছে যে, এখানকার মাটি প্রায় তিনশ জন নবী-রাসূল কবরস্থ রয়েছেন। এখানকার ফকিহগণের ম হতে মাজদুদ্দিন নাবলুসির সুখ্যাতি সারা পৃথিবীতেই চর্চিত।

নাবলুস নগরীতে

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা চলে আসি নাবলুস নগরীতে। বিশা নগরীটিতে গাছপালার ছড়াছড়ি। সবুজ-শ্যামল নাবলুসের বুক চিরে এগি গেছে অজস্র নদী। শামদেশের মধ্য হতে এখানেই সবচেয়ে বেশি যাইতু উৎপাদিত হয়। এখান থেকে গোটা মিসর ও দামেস্কে যাইতুনের তেল রপ্তা হয়। এখানে খরনুবের বিশেষ মিষ্টান্ন তৈরি হয়। খরনুবকে ইংরেজিতে ব ক্যারব (Carob)। এই গাছে বারো মাস পাতা থাকে। এর ফল থেকে গু তৈরি হয়। তার জন্যে আগুনে জ্বালিয়ে রস নিংড়াতে হয়। এই মিষ্টান্ন গোটা মিসর ও শামদেশে রপ্তানি হয়। এই অঞ্চলে একটি বিশেষ প্রজাতি তরমুজের চাষ হয়, যা অত্যন্ত সুস্বাদু। এখানকার জামে মসজিদটিও বে দৃষ্টিনন্দন। মসজিদ কমপ্লেক্সের মধ্যভাগে সুমিষ্ট পানির হাউজ রয়েছে।

আজালুন নগরীতে

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম আজালুন নগরীতে। এটিও সাজানো গুছানো বড় নগরী। প্রচুর বাগ-বাগিচা রয়েছে। একটি সুবিশাল কেল্লা রয়েছে। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা মিষ্টি নদী শহরটিকে দু দিকে ভা করেছে।

কিছুদিন অবস্থান করে রওনা হলাম। লাজিকিয়্যা অঞ্চলের উদ্দেশে এবারে যাত্রা। পথিমধ্যে দু পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় অবস্থিত 'গাওর' নামে

একটি জায়গা পেরুলাম। ইসলামের ইতিহাসে যিনি 'আমিন' উপাধিতে চিরস্মরণীয়। আমরা তার মাজার যিয়ারত করলাম। তার পাশেই একটি সরাইখানা রয়েছে, যেখানে মুসাফিরদের জন্যে খাবার ও অবস্থানের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। এজন্যে আমরা সেখানে রাত্রিযাপন করলাম।

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম 'কুসাইর' এলাকায়। এখানে বিখ্যাত সাহাবি হযরত মুআয বিন জাবাল রা.-এর কবর অবস্থিত। আমরা তা যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

আক্কা[১] নগরীতে

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম আক্কা (Acre) নগরীতে। এটি এখন বিরান জনভূমিতে পরিণত হয়েছে। অথচ একসময় যখন শামদেশের ওপর খ্রিস্টানদের রাজত্ব ছিল; তখন তা ছিল সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী ও নৌবন্দর। অনেকটা কনস্ট্যান্টিনোপলের মতো। এই নগরীর পূর্বপ্রান্তে একটি ঝরনা রয়েছে, যা 'আইনুল বকর' নামে পরিচিত। কথিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-এর জন্যে এই ঝরনা থেকে গাভী সৃষ্টি করেছিলেন। নিচে নামার জন্যে সিঁড়ি রয়েছে। এক কালে এখানে একটি মসজিদ ছিল; যার স্মৃতি হিসেবে স্রেফ মেহরাবের ভগ্নাবশেষই অবশিষ্ট আছে। এই নগরীতেই হযরত সালিহ আ.-এর কবর অবস্থিত।

টায়ার[২] নগরীতে

আক্কা (عكة) নগরীর ভ্রমণ শেষে আমরা পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম। এবার এলাম টায়ার নগরীতে। এটিও এখন বিধ্বস্ত নগরী। অবশ্য নগরীর বাইরে একটি ছোট্ট গ্রাম রয়েছে, যার সিংহভাগ অধিবাসী রাফেযি শিয়া। আমি

---

[১] একর, (Acre) স্থানীয়ভাবে আক্কো বা আক্কা নামে পরিচিত। ইসরায়েলের উত্তর জেলার উপকূলীয় সমতল অঞ্চলের একটি শহর। ভূমধ্যসাগরের লেভানটাইন সাগরের উপকূলে হাইফা উপসাগরের প্রান্তে একটি প্রাকৃতিক বন্দর ঘেঁষে অবস্থিত শহরটি ভৌগলিক বিবেচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী। আরবিতে তার উচ্চারণ লেখা হয় عكة।–অনুবাদক

[২] টায়ার দক্ষিণ লেবাননের একটি শহর, বিশ্বের প্রাচীনতম ক্রমাগত বাসযোগ্য শহরগুলির মধ্যে একটি। অসংখ্য যুদ্ধ আর ক্ষমতা দখল কেন্দ্রিক সংঘাতের ইতিহাসের সঙ্গে এই নগরীর নাম জড়িত রয়েছে। আরবিতে উচ্চারণ লেখা হয় صور। ইংরেজিতে লেখা হয় **Tyre**।–অনুবাদক

সেখানকার একটি কুয়োর কাছে গেলাম। উদ্দেশ্য হলো, অযু করব। আমি সেখানে থাকাবস্থায় এক স্থানীয় লোক অযু করতে এলো। আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে, সে প্রথমে তার দু পা ধৌত করল। এরপর মুখ। এ সময় সে কুলি করেনি, নাকেও পানি দেয়নি। সবশেষে সে মাথার একাংশ মাসেহ করল। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এভাবে অযু করলে কেন?' উত্তরে সে বলল, 'যেকোনো ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ভিত্তিমূল থেকে।'

এই সেই টায়ার নগরী যার দুর্ভেদ্য প্রাচীর আর অজেয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুখ্যাতি বিশ্বজুড়ে। তিন দিক থেকে সাগর ঘেরা হওয়ায় প্রাকৃতিকভাবে নগরীটি সুরক্ষিত। শহররক্ষা প্রাচীরের মাত্র দুটি দরজা। একটি সাগরের দিকে, অন্যটি স্থলভাগের দিকে। যে দরজার সামনে দিয়ে স্থলভাগ শুরু হয়েছে, সেখানে চারটি দেয়াল রয়েছে, যা শহররক্ষা প্রাচীরের চেয়ে একটু ছোট। প্রতিটি দেয়ালের জন্যে স্বতন্ত্র খিল রয়েছে। অন্যদিকে যে দরজাটি সমুদ্রের দিকে খুলেছে, তার সুরক্ষার জন্যে দুটি বিশাল গম্বুজ রয়েছে। মোটকথা হলো, নিজস্ব ভিত্তি, নিরাপত্তা, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার কারণে এই টায়ার নগরী অদ্বিতীয়। কারণ, তিন দিক থেকে সমুদ্র দিয়ে বেষ্টিত এবং চতুর্থ দিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। সমুদ্রে ভেসে যতগুলো নৌযান আসে, সবগুলো সেই প্রাচীর নিচে নোঙর ফেলে।

গম্বুজের টাওয়ার থেকে পুরো বন্দর পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই দুই গম্বুজের মাঝখানে এই লৌহনির্মিত শেকল প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই শেকল নিচে নামানো না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ভেতর থেকে বাহিরে, বা বাহির থেকে ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না। স্বশস্ত্র প্রহরী চব্বিশ ঘণ্টা প্রহরা দেয়। তাদের না জানিয়ে কেউ যাতায়াত করতে পারবে না। আক্কা নগরীর নৌবন্দরও অনেকটা এ ধরনের। পার্থক্য হলো, সেখানে পানির গভীরতা কম থাকায় বড় আয়তনের নৌযান ভিড়তে পারে না। স্রেফ অল্প কিছু ছোট নৌযান নোঙর ফেলতে পারে।

সিডোন[১] ও তাবারিয়া নগরীতে

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম সিডোন নগরীতে। এটিও চমৎকার শহর। সাগরের তীরে অবস্থিত। প্রচুর ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়। এখান থেকে গোটা মিসরে ত্বিন, কিশমিশ ও যাইতুন রপ্তানি হয়। আমি স্থানীয় বিচারপতি কামালুদ্দিন আশমুনি মিশরির অতিথি হলাম। অভিজাত উদার মানুষ।

আমরা সেখান থেকে রওনা হয়ে তাবারিয়া নগরীতে পৌঁছি। শত বছরের প্রাচীন নগরী। অতীতে এটি বিশাল নগরী ছিল; যদিও এখন ভগ্নস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নেই। কালের সাক্ষী হয়ে বিধ্বস্ত দালানগুলো দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে এসে আমি ভিন্ন ধরনের গোসলখানা দেখলাম। একটি পুরুষদের জন্যে, অন্যটি নারীদের জন্যে। গোসলখানার পানি অত্যন্ত গরম। বিখ্যাত তাবারিয়া উপসমুদ্রের তীরে এ নগরী গড়ে উঠেছে। যার দৈর্ঘ্য ছয় ফারসাখ এবং প্রস্থ তিন ফারসাখের চেয়ে কিছুটা বেশি।

তাবারিয়া এলাকার অন্যতম প্রসিদ্ধ স্থান হলো, এখানকার আম্বিয়া মসজিদ। এখানেই আল্লাহর মহান নবী শুয়াইব আ. ও তাঁর সেই কন্যার কবর অবস্থিত, যিনি হযরত মুসা আ.-এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও এখানে হযরত সুলাইমান আ.-এর কবর রয়েছে। ইহুদা, রুবেল প্রমুখ মনীষীদের কবরও এখানে অবস্থিত।

এখান থেকে আমরা সেই ঐতিহাসিক কুয়ো পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, যার মাঝে হযরত ইউসুফ আ.-কে ফেলা হয়েছিল। এখন সেই কুয়োর পাশে একটি ছোট্ট মসজিদ ও খানকা গড়ে উঠেছে। বেশ গভীর কুয়ো। তার মাঝে বর্ষার কিছু পানি জমে ছিল। আমরা সেই পানি পান করলাম। কুয়োর তত্ত্বাবধায়ক জানালেন যে, এখনো ভেতরের উৎস থেকে পানি বের হয়।

---

[১] সিডন, স্থানীয়ভাবে সাইদা বা সাইদা নামে পরিচিত। লেবাননের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। এটি দক্ষিণ গভর্নরেটে অবস্থিত, যার মধ্যে এটি রাজধানী, ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে। দক্ষিণে টায়ার এবং উত্তরে লেবাননের রাজধানী বৈরুত উভয়ই প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে। আরবিতে উচ্চারণ লেখা হয়, صيدا। আর ইংরেজিতে **Sidon**।–অনুবাদক

ঐতিহ্যের জনপদ বৈরুতে

তাবারিয়া থেকে রওনা হয়ে আমরা বৈরুতে এসে পৌঁছুলাম। ছোট্ট নগরী, দোকানপাটগুলো বেশ সাজানো গুছানো। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত জামে মসজিদটি দৃষ্টিনন্দর। এখান থেকে মিসরের বিভিন্ন নগরীতে ফল-ফলাদি রপ্তানি হয়। এখান থেকে আমরা রওনা হলাম আবু ইয়াকুব ইউসুফের মাজার পরিদর্শনে। তাঁর ব্যাপারে কথিত রয়েছে যে, তিনি আফ্রিকার কোনো এক অঞ্চলের রাজা ছিলেন। তাঁর মাজার নূহ মহাসড়ক নামে প্রসিদ্ধ একটি জনপদে অবস্থিত। আশপাশের লোকেরা জায়গাটিকে বেশ সমীহ করে।

মাজারের পাশে একটি খানকা রয়েছে, যেখানে আগন্তুকদের জন্যে খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত রয়েছে। কথিত রয়েছে যে, সেই খানকার জন্যে সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবি রহ. কিছু সম্পত্তি ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। কারো কারো মতে, সুলতান নুরুদ্দিন যেনগি রহ. ওয়াকফ করেছিলেন। তবে দুজনই মহান মানুষ ছিলেন বিধায়, যে কেউ সেই মহতী কাজটি করতে পারেন।

আমরা মানুষের কাছ থেকে শুনেছি যে, তিনি নিজ হাতে মাদুর বানাতেন। সেই মাদুর বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

আবু ইয়াকুব ইউসুফের জীবনকাহিনি

তার এই জীবনকাহিনি লোকমুখে প্রচলিত যে, একবার তিনি দামেস্ক নগরীতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এখানে কেউ তাকে চিনত না। মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। বাজারের অলি-গলিতে পড়ে থাকতেন। কিছুদিন পর তিনি সুস্থ হলেন। তখন শহরের বাইরে বিভিন্ন বাগানে গেলেন এ আশায় যে, কেউ তাকে প্রহরীর দায়িত্ব দিলে জীবিকার সংস্থান হবে। সুলতান নুরুদ্দিনের সেখানে অনেকগুলো বাগান ছিল। সেগুলোর কোনো একটিতে তিনি প্রহরীর চাকরি পেলেন। এভাবে ছয় মাস কেটে গেল। ফল পাকার মৌসুমে সুলতান নুরুদ্দিন সেই বাগানে এলেন। বাগানের ম্যানেজার আবু ইয়াকুবকে আদেশ

করলেন যে, 'সুলতানের জন্যে আনার পেড়ে আনো।' আদেশ পালন করে তিনি গাছ থেকে পাকা আনার ছিঁড়ে আনলেন। দেখা গেল, সেই আনার বেশ টক। আরেকটি আনার নিয়ে আসতে বললেন। এবারও তা টক বেরুলো। তৃতীয়বারও নতুন কোনো গাছ থেকে আনার ছিঁড়ে আনতে বললেন। এবারের আনারও টক পড়ল। তখন ম্যানেজার বলল, 'তুমি ছয় মাস ধরে এই বাগান প্রহরার দায়িত্বে আছো। এতদিনেও জানলে না যে, কোন গাছের আনার কেমন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আপনি আমাকে প্রহরার চাকরি দিয়েছেন; এখানে তো খাবারের দায়িত্ব দেননি।'

উত্তর শুনে ম্যানেজার সুলতানের কাছে এসে পূর্ণ বৃত্তান্ত অবহিত করল। সুলতান বললেন, 'তাকে ডেকে নিয়ে আসো।' ওদিকে এ ঘটনার কিছুদিন আগে সুলতান স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, আবু ইয়াকুবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে এবং তার মাধ্যমে প্রভূত উপকার সাধিত হবে।

আবু ইয়াকুবকে সামনে দেখতে পেয়ে সুলতান বুঝতে পারলেন যে, এ ব্যক্তির কথাই আমাকে স্বপ্নে বলা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিই কি আবু ইয়াকুব?' তিনি উত্তর করলেন, 'জি, আমিই আবু ইয়াকুব'। সুলতান তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন। নিজের পাশে বসিয়ে সম্মান জানালেন।

এরপর তাকে রাজদরবারে নিয়ে গেলেন। নিজের হাত দিয়ে মেহনত করে তিনি যেই হালাল অর্থ উপার্জন করতেন, সেখান থেকে ব্যয় করে আবু ইয়াকুবের আতিথেয়তা করলেন। আবু ইয়াকুব কিছুদিন সুলতানের সঙ্গে থাকলেন। এরপর শীত মৌসুমের শুরুতে কাউকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে গেলেন এবং একটি প্রত্যন্ত গ্রামে আশ্রয় নিলেন।

ওই গ্রামে এক দরিদ্র লোক বাস করত। তার কাছে হাজির হয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই দিলেন। দরিদ্র লোকটি উদারচিত্তে তাকে গ্রহণ করে নিলেন। তার সম্মানে মুরগি যবেহ করে গোস্ত রান্না করলেন, সঙ্গে জবের রুটি পরিবেশন করলেন। আবু ইয়াকুব সেই খাবার খেয়ে তার জন্যে প্রাণ খুলে দোয়া করলেন।

ওই সময় দরিদ্র লোকের বাড়িতে সব কজন সন্তানসন্ততি ছিল। তাদের মাঝে একজন ছিল বিয়ের উপযুক্ত কন্যা। এক জায়গায় সম্বন্ধের কথা হয়েছে। ওই

অঞ্চলের রীতি হলো, মেয়ে বিয়ে দেবার সময় যৌতুক দিতে হয়। যৌতুক হিসেবে তামার বাসন-কোসন দেওয়াকে তারা আভিজাত্যের প্রতীক মনে করত। ওই অঞ্চলে তামার বাসন এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে, লেনদেনে নগদ অর্থের পরিবর্তে এই বাসন দিয়েও মূল্য পরিশোধ করা যেত। আবু ইয়াকুব জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাড়িতে কি তামার বাসন আছে?' লোকটি জানাল, 'জ্বি হ্যাঁ, মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে আমি কিছু বাসন জোগাড় করে রেখেছি।'

আবু ইয়াকুব বললেন, 'সেগুলো নিয়ে আসো।' লোকটি সমস্ত বাসন-কোসন এনে হাজির করল। তখন বললেন, তোমার প্রতিবেশীদের কাছে যতগুলো তামার বাসন আছে, সেগুলোও নিয়ে আসো।' গরিব লোকটি বেরিয়ে গিয়ে তাদের কাছ থেকে ধার নিয়ে এলো।

তখন আবু ইয়াকুব আগুন জ্বালালেন। তার মাঝে বাসন-কোসনগুলো ফেললেন। এরপর সঙ্গে থাকা থলের ভেতর থেকে কিছু রাসায়নিকদ্রব্য বের করে সেই বাসনগুলোর ওপর নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো তামার পাত্র স্বর্ণে রূপান্তরিত হলো। তিনি সেগুলো তুলে এনে একটি ঘরে রেখে বাহির থেকে তালা দিলেন। এরপর দামেস্কের সুলতান নুরুদ্দিনের কাছে পত্র লিখে পূর্ণ বৃত্তান্ত জানালেন। শেষে বললেন, 'আপনি এই স্বর্ণ দিয়ে দরিদ্রদের জন্যে একটি দাতব্য হাসপাতাল নির্মাণ করবেন। হাসপাতালের ব্যয় নির্বাহের জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পত্তি কিনে ওয়াকফ করবেন। রাস্তার পথিকদের মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের জন্যে মুসাফিরখানা নির্মাণ করবেন। আর এখানে যতজন লোকের তামার বাসন ছিল, তাদের প্রত্যেককে এবং এই বাড়ির মালিককে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দেবেন।'

চিঠির শেষ প্যারায় লিখেন, 'ইবরাহিম ইবনে আদহাম খোরাসানের রাজত্ব বিসর্জন দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তার মতো আমিও আফ্রিকার রাজত্ব ত্যাগ করে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়েছি। সালাম জানবেন।'

এরপর দ্রুত আবু ইয়াকুব ঘটনাস্থল ত্যাগ করলেন। তার পত্র নিয়ে ওই দরিদ্র বাড়িওয়ালা সুলতান নুরুদ্দিনের দরবারে হাজির হলো। তখন সুলতান নিজেই সেই গ্রামে এলেন। যাদের কাছ থেকে তামার বাসন নেওয়া হয়েছিল, তাদের প্রত্যেককে সন্তোষজনক অর্থ দিলেন। আবু ইয়াকুবের সন্ধানে আশপাশ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কোথাও কোনো চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে

পেলেন না। অবশিষ্ট স্বর্ণ নিয়ে দামেস্কে ফিরে এলেন এবং আবু ইয়াকুবের নামে একটি সমৃদ্ধ হাসপাতাল নির্মাণ করলেন, যার সমকক্ষের দাতব্য চিকিৎসালয় পৃথিবীতে আরেকটি নেই।

ঐতিহ্যের জনপদ ত্রিপোলিতে

আমাদের যাত্রা আবারও শুরু হলো। এবার আমরা ত্রিপোলিতে এসে পৌঁছুলাম। শামদেশের গুরুত্বপূর্ণ এই শহরে প্রচুর জনবসতি রয়েছে। শহরের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে অনেকগুলো জলাধার। ফুল-ফলে সুশোভিত গাছ আর দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের সমারোহ দেশটিকে পর্যটকের চোখে রাঙিয়ে তুলেছে। যেন সে সমুদ্রের স্নেহ আর জমিনের আদরের কোলে প্রতিপালিত হচ্ছে। দোকানগুলো পণ্যে টইটম্বুর। সমুদ্র থেকে মাত্র দু মাইল দূরত্বে অবস্থিত এই শহরের শষ্যক্ষেতগুলো সবুজে আচ্ছাদিত।

এই ত্রিপোলি হচ্ছে নতুন করে গঠিত। আদি ত্রিপোলি ছিল সমুদ্রের পাড়ে। যা রোমানদের শাসনাধীন ছিল। আল মালিকুয যাহির রোমান খ্রিস্টান বাহিনীকে পরাজিত করে এই অঞ্চলকে মুসলিম জাহানের সঙ্গে যুক্ত করেন। তখন তিনি প্রাচীন ত্রিপোলিকে উচ্ছেদ করে এই নতুন ত্রিপোলি গড়ে তোলেন।

এই নগরীতে প্রায় চল্লিশজন উচ্চপদস্থ তুর্কি আমির বসবাস করেন। তাদের প্রধান হলেন, তয়লান আল হাজিব। যিনি 'প্রধান আমির' হিসেবে পরিচিত। 'দারুস সাআদাহ' নামের একটি রাজপ্রাসাদে তিনি বাস করেন। তাঁর রীতি হলো, তিনি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বাহনে আরোহণ করে রাজপ্রাসাদের বাইরে আসেন। সমস্ত আমির ও সৈন্যদলও তখন বাহনে আরোহণ করে জৌলুস সহকারে বের হয়। এভাবে তারা সাড়ম্বরে যাত্রা করে নগরীর বাইরে যান। এরপর যখন ফিরে এসে প্রাসাদের নিকটবর্তী হন তখন সমস্ত আমির বাহন থেকে মাটিতে নেমে আসে এবং আমিরের সামনে পদব্রজে হাঁটতে থাকে। প্রধান আমিরের প্রাসাদে প্রবেশের আগপর্যন্ত সবাই মাটিতে পায়চারি করতে থাকে। তার প্রবেশ সম্পন্ন হলে সবাই নিজ নিজ বাহনে চড়ে বাড়ি ফিরে যায়। এখানকার আরেকটি রীতি হলো, প্রতিদিন মাগরিব নামাযের পর প্রত্যেক আমিরের বাড়ির সামনে ঢোল বাজানো হয় এবং মশাল প্রজ্বলিত হয়।

ত্রিপোলির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ

আমার ভ্রমণের দিনগুলোতে এখানে যে কজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ছিলেন, তন্মধ্য হতে একজন হলেন বাহাউদ্দিন বিন গানিম। তার আভিজাত্য, ধনাঢ্যতা ও বদান্যতা সবার মুখে মুখে মুখে চর্চিত। তাঁর ভাই হুসামুদ্দিন কুদস শরিফের শীর্ষ বুযুর্গ। যার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। তাঁর আরেক ভাই আলাউদ্দিন দামেস্কের প্রধান মুনশি। ত্রিপোলির আরেকজন উল্লেখযোগ্য মনীষী হলেন, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের যিম্মাদার কিওয়ামুদ্দিন বিন মাকিন। তাঁকে এ অঞ্চলের অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তিত্ব মনে করা হয়।

ত্রিপোলির প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছেন শামসুদ্দিন ইবনুন নকিব। যিনি শুধু ত্রিপোলিরই নন; গোটা শাম অঞ্চলের অন্যতম শীর্ষ আলেম।

এই নগরীতে অনেকগুলো গণগোসলখানা রয়েছে। তন্মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য হলো কাযি কওমির গোসলখানা, সিন্দামুরের গোসলখানা। সিন্দামুর হলেন এখানকার এক সময়ের আমির। যিনি নিজ শাসনামলে অপরাধীদেরকে শক্ত হাতে দমন করতেন। তার সেসব কঠোর পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে অনেক মুখরোচক ঘটনা লোকমুখে বেশ প্রচলিত। যেমন, একবার এক মহিলা এসে অভিযোগ করল যে, প্রশাসনের জনৈক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা তার ওপর জুলুম করেছে। মহিলা যেই দুধ বিক্রি করে সংসার নির্বাহ করত, তা কেড়ে নিয়ে পান করে ফেলেছে। কিন্তু এই অভিযোগের স্বপক্ষে মহিলার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। তখন সুলতান বললেন, ওই কর্মকর্তার পেট কেটে যাচাই করা। যথারীতি তাই করা হলো। লোকটির আঁতুড়ি থেকে দুধ গড়িয়ে পড়ল। একই ধরনের ঘটনা আল মালিকুন নাসির কর্তৃক আইযাব অঞ্চলের জন্যে নিয়োগকৃত গভর্নর 'ইতরিস' সম্পর্কেও শোনা গেছে।

কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসনুল আকরাদে

ত্রিপোলি থেকে রওনা হয়ে আমরা এলাম কুর্দিদের কেল্লায়। টিলার ওপর ছোট্ট জনপদ। প্রচুর গাছপালা ও জলাধার রয়েছে। ইবরাহিমি খানকা নামে একটি খানকা রয়েছে, যা স্থানীয় একজন আমিরের দিকে সম্বন্ধিত। আমি স্থানীয় বিচারপতির বাড়িতে অতিথি হই। তার নাম স্মরণ পড়ছে না।

ঐতিহাসিক জনপদ হিমস নগরীতে

কুর্দিদের কেল্লা থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম ঐতিহাসিক জনপদ হিমস নগরীতে। এখানকার অকৃত্রিম সৌন্দর্য যেকোনো পর্যটককে মুগ্ধ করবে। সর্বত্র সবুজ-শ্যামল গাছপালার ছড়াছড়ি। কুলকুল রবে বয়ে যাচ্ছে নহর। রাস্তাগুলোও বেশ প্রশস্ত। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হিমস জামে মসজিদের স্থাপত্য দেখে কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারবে না। মসজিদের মধ্যভাগে বেশ বড় হাউজ রয়েছে। হিমসের নাগরিকদের সবাই আরব বংশোদ্ভূত। বদান্যতা, আভিজাত্য ও উদারতা তাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। নগরীর বাইরে অকুতোভয় বীরসেনানী, আল্লাহর তরবারি হযরত খালিদ রা.-এর কবর। তার পাশেই একটি খানকা ও একটি মসজিদ রয়েছে। কবরের ওপর কালো চাদর পাতা রয়েছে।

এ নগরীর বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছেন জামালুদ্দিন শুরাইসি। দেখতেও যেমন সুদর্শন, তেমনি আচরণেও মুগ্ধকর।

হামা : হিমসের ভুস্বর্গ

হিমস নগরী থেকে বেরিয়ে আমরা পৌঁছুলাম হামা[১] নগরীতে। শামদেশের মধ্যে যতগুলো বৃহৎ ও দৃষ্টিনন্দন নগরী রয়েছে, সেগুলোকে একবাক্যে বলা হয় أمّهات الشام 'শামদেশের জননী'। সেই তালিকার অন্যতম শীর্ষ নগরী হলো এই হামা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাজানো গুছানো নগরী। আপনি যেদিকে তাকাবেন, শুধু ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ বাগান দেখতে পাবেন। মনে হবে, আপনি ভূস্বর্গের কোনো ভূখণ্ডে এসেছেন। বাগানে পানি সরবরাহের জন্যে বড় বড় চাক্কি ঘুরছে। নগরীর মধ্যভাগ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলে, যার নাম, 'আসি।

---

[১] হামা হচ্ছে সিরিয়ার একটি শহর যা দেশটির পশ্চিমে অবস্থিত এবং অরন্তস নদীর তীরে অবস্থিত। দামেস্ক থেকে ২১৩ কি.মি. উত্তরে এবং হিমস থেকে ৪৬ কি.মি. উত্তরে এর অবস্থান। শহরটি হামা প্রদেশের রাজধানী। ২০০৯ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৮,৫৪,০০০ মানুষ এখানে বসবাস করে। দামেস্ক, আলেপ্পো এবং হিমসের পর হামা সিরিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম শহর।–অনুবাদক

শহরের বাইরে যেই বিশাল শহরতলী গড়ে উঠেছে, তার নাম, মানসুরিয়া এই শহরতলী আয়তনে মূল শহরের চেয়েও বড়। সেখানে সব ধরনের প সুলভে পাওয়া যায়। অনেকগুলো রুচিশীল গোসলখানা রয়েছে। হ নগরীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে সব ধরনের ফল-ফলাদি পাও যায়। বিশেষ করে 'মিশমিশ লুযি' নামের একটি ফল পাওয়া যায়, যার বি ভাঙলে অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার বেরিয়ে আসে।

আবুল উলা মুআররির স্মৃতি বিজড়িত মুআররা নগরীতে

হামা থেকে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো। এবার পৌঁছুলাম মুআর নগরীতে। আরবের বিখ্যাত কবি আবুল আলা মুআররি এ নগরীরই কৃ সন্তান। তিনি একা নন; যুগে যুগে এ নগরী আরো অনেক বিশ্বমানের ক উপহার দিয়েছে। সুন্দর সুবিশাল নগরী। এখানে প্রচুর পরিমাণে ত্বিন ও পেস্তা গাছ রয়েছে। যা গোটা মিসর ও শামদেশে রপ্তানি হয়।

মূল নগরীর বাইরে, এক ফারসাখ দূরত্বে আমিরুল মুমিনিন উমর বি আবদুল আজিজ রহ.-এর কবর অবস্থিত। তার কবর কেন্দ্র করে কোনো খানকা নেই। জীবনের কোনো চাঞ্চল্য নেই। কারণ হলো, মুআররা নগরীর সিংহভাগ অধিবাসী হলো শিয়া ধর্মাবলম্বী। এই রাফেযি শিয়াগুলো অত্যন্ত উগ্র এবং জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবির ওপর সীমাহীন আক্রোশ লালন করে থাকে। এই মহান লোকদেরকে তারা দিনভর অভিশাপ দিয়ে থাকে। তারা এ পরিমাণ সাহাবি বিদ্বেষী যে, উমর নামের কাউকেই তারা পসন্দ করে না। শুধু এ কারণেই তারা উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.-কে দু চোখে দেখতে পারে না; অথচ তিনি তাঁর খেলাফতকালে হযরত আলী রা.-এর সম্মান রক্ষায় অনেকগুলো কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

সারমিন নগরীতে

আমাদের যাত্রা আবারও শুরু হলো। এবার আমরা পৌঁছুলাম প্রাচীন জনপদ সারমিন নগরীতে। প্রচুর বাগ-বাগিচা সমৃদ্ধ মনোরম নগরী। এখানে প্রচুর পরিমাণে যাইতুল গাছ দেখতে পেয়েছি। এখানে 'আজরি' নামের একটি উন্নত সাবান তৈরি হয়, যা গোটা মিসর ও শামদেশে রপ্তানি হয়। এছাড়াও হাত ধোয়ার জন্যে বিশেষ ধরনের সুগন্ধি সাবানও তৈরি হয়। যেখানে হলুদ

ও লাল রঙের চমৎকার সমন্বয় থাকে। এখানকার উৎকৃষ্ট সুতি কাপড়ের সুখ্যাতি গোটা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত।

এখানকার অধিবাসীরাও প্রচণ্ড সাহাবাবিদ্বেষী শিয়া। তারা কথায় কথায় 'আশারায়ে মুবাশশারা' তথা জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন মহান সাহাবিকে গালিগালাজ করে থাকে। তাদের সেই বিদ্বেষ এতটাই প্রকট যে, ঘৃণায় তারা 'দশ' সংখ্যা পর্যন্ত উচ্চারণ করে না। বাজারে কোনো পণ্যের নিলাম চলাকালে যখন দশ সংখ্যা বলার সময় ঘনিয়ে আসে, তখন বলে, 'নয় ও এক'।

একদিনের ঘটনা। বাজারে নিলাম চলছে। ঘটনাক্রমে সেখানে একজন তুর্কি কর্মকর্তা ছিলেন। দালাল যখন তার অভ্যাস অনুসারে বলল, 'নয় ও এক' তখন সেই কর্মকর্তা তার হাতে থাকা কাঁটাযুক্ত লাঠি দিয়ে দালালের মাথায় আঘাত করে বলল, 'লাঠির প্রহার খেয়ে 'দশ' সংখ্যা বল।'...

শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি সুদৃশ্য মসজিদ রয়েছে, যার মাঝে নয়টি গম্বুজ। দশ সংখ্যার প্রতি স্বভাবজাত ঘৃণার কারণে তারা দশম গম্বুজ যুক্ত করেনি।

আলেপ্পো নগরীতে

আমাদের বিশ্বভ্রমণ আবারও শুরু হলো। এবার আমরা পৌঁছুলাম শামদেশের আরেকটি বৃহৎ নগরী আলেপ্পোতে। প্রধান কেন্দ্রীয় নগরী। বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে জুবাইর আন্দালুসি এ নগরীর বর্ণনা দিয়ে তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে লিখেছেন,

قدرها خطير، وذكرها في كل زمان يطير، خطابها من الملوك كثير...

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরী। প্রতিটি যুগেই এ নগরীর সুখ্যাতি লোকমুখে চর্চিত ছিল। এখানকার সৌন্দর্য পৃথিবীর অজস্র রাজা-মহারাজাকে প্রলুব্ধ করে ডেকে এনেছে। সম্মান ও মর্যাদায় শহরটি সবার হৃদয়ে অবস্থান করে নিয়েছে। এখানে সংঘটিত হয়েছে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ঝরেছে অনেক তাজা রক্ত। এখানকার দুর্গ দুর্ভেদ্য ও উঁচু। অনেক দূর থেকে দুর্গের প্রাচীর দেখা যায়। এমন দুর্গ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। দুর্ভেদ্যতা ও মজবুত কাঠামোর কারণে যা প্রায় অজেয়। দুর্গের বিশাল স্তম্ভগুলোকে মনে হবে, মাটি থেকে উপরের দিকে ওঠা গোলাকার টেবিল। প্রাচীরের সবগুলো প্রান্তে সুষমভাবে পাথর বসানো।

সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমা পেরিয়ে আলেপ্পো এখনো পৃথিবীর বুকে টিকে আছে। অথচ তাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেছে অনেক রথি-মহারথি। শহরের ঘর-বাড়িগুলো এখনও অক্ষত দেখা যায়; কিন্তু কোথায় এখানকার প্রাচীন বাসিন্দারা, যারা এসে এখানে বসতি গড়েছিল? ঐ তো দেখা যাচ্ছে রাজপ্রাসাদ ও বিস্তীর্ণ আঙিনা। কিন্তু কোথায় এখানকার হামদানি সাম্রাজ্যের শাসক ও তাদের রাজকবি? কালের পরিক্রমায় তারা সবাই পৃথিবী থেকে চলে গেছে। কিন্তু এখনও আসেনি এই শহরের বিদায়ের সময়।

বিস্ময়ে ভরা শহর এই আলেপ্পো। যার বুকে প্রতাপ দেখিয়ে বেড়ানো অনেক শাসক আজ অতীতের পাতায় হারিয়ে গেছে। সময়ের ইতিহাস মুছে গেলেও তখনকার ঘরবাড়ি আজও অক্ষত আছে।

এ শহরের নাম আরবি ব্যাকরণে মেয়েলি শ্রেণিভুক্ত; এজন্যে সে নিজেকে সজ্জিত করেছিলে কুমারী যুবতীর অলংকারে। বিশ্বাসঘাতকদের থাবা থেকে সে নিজেকে সবসময় এড়িয়ে রেখেছে। আমির সাইফুদ্দৌলা বিন হামাদানের তরবারির কাছে সে নিজেকে সজ্জিত করেছিল নববধূর সাজে। হায় আফসোস! অচিরেই তার যৌবন বার্ধক্যের রূপ নেবে। তখন কেউ আর তাকে বিয়ে করতে প্রস্তাব পাঠাবে না। একদিন এ নগরী পরিণত হবে মৃতপ্রায় বৃদ্ধায়।'[১]

আলেপ্পোর ঐতিহাসিক কেল্লা

আলেপ্পোর কেল্লাকে বলা হয় 'শাহবা'। কেল্লার ভেতরে এমন দুটি পাহাড় রয়েছে, যার ভেতর থেকে পানি উৎসারিত হয়। যার কারণে কেল্লার ভেতরে কখনই পানির সংকট হয় না। কেল্লার প্রাচীর একাধিক স্তরবিশিষ্ট আর প্রাচীরের নিচে রয়েছে গভীর পরিখা। সেই পরিখায় সবসময় স্রোতের মতো পানি বইতে থাকে। প্রাচীরের নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি করে গম্বুজ রয়েছে। প্রতিটি গম্বুজে দ্বিতল দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজার খিলানের ওপর চমৎকার কারুকার্য রয়েছে। প্রতিটি গম্বুজে সবসময় প্রহরী থাকে। কেল্লার ভেতরের আবহাওয়া এতটাই স্বাস্থ্যকর যে, দীর্ঘ দিনেও খাবার বিনষ্ট হয় না। এখানে একটি জায়গা রয়েছে, যা দেখার জন্যে লোকজন দূরদূরান্ত থেকে আসে। জনশ্রুতি রয়েছে যে, সাইয়িদুনা ইবরাহিম আ. সেখানে ইবাদত করতেন।

শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি জায়গায় ফোরাত নদীর তীরে মালিক বিন তুক একটি দৃষ্টিনন্দন কেল্লা তৈরি করেছিলেন। আলেপ্পোর কেল্লা দেখতে অনেকটা সেই কেল্লার মতো। তাতারি শোষক কাযান একবার এই আলেপ্পো কেল্লা অবরোধ করেছিল। বাহির থেকে খাদ্য-পানি বন্ধ করে দীর্ঘ দিন এখানকার অধিবাসীদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হয়েছিল।

আলেপ্পোকে আরবিতে 'হালাব' বলা হয়। কারণ হলো, সাইয়েদুনা ইবরাহিম আ. এই নগরীতে বাস করতেন। তার কাছে একদল বকরি ছিল। তিনি সেই

---

[১] রিহলাহ ইবনে জুবাইর : ২২৫-২২৬

বকরিপালের দুধ দোহন করে ফকির, মিসকিন ও আগন্তুক অতিথিদের পান করাতেন। তার সেই মহতী উদ্যোগের সুখ্যাতি এত বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল যে, দলে দলে মানুষ এসে জিজ্ঞেস করত, 'ইবরাহিম আ.-এর হালাব (স্তন থেকে নির্গত দুগ্ধ) কোথায় বণ্টন করা হয়?' সেখান থেকে নগরীটিতে 'ইবরাহিম আ. এর হালাব' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আলেপ্পোর দোকানপাট, মাদরাসা, চিকিৎসালয় ও জামে মসজিদ

আলেপ্পো হলো পৃথিবীর সেই অল্পকটি সুন্দর নগরীগুলোর একটি, যার বিন্যস্ত বাড়িঘর ও পরিকল্পিত স্থাপনা প্রত্যেক পর্যটককে মুগ্ধ করে। বাজারগুলো সুবিন্যস্ত। সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাজারগুলো যেন একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। প্রতিটি দোকানের ওপর ছাদ রয়েছে। সাধারণ ছাদগুলো কাঠনির্মিত হয়ে থাকে। দোকানের কর্মচারীরা সবসময় গ্রাহকের সেবায় ব্যস্ত থাকে। এই শহরের চৌরাস্তাগুলোও বেশ সুবিন্যস্ত, পরিকল্পিত ও দৃষ্টিনন্দন। শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি জামে মসজিদ রয়েছে। শহরের প্রতিটি সড়ক সেই মসজিদের কোনো না কোনো ফটকের সামনে এসে শেষ হয়েছে।

মসজিদের ভবন অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। প্রতিটি স্থাপনাতে আভিজাত্য ফোটে উঠেছে। মাঝখানে একটি হাউজ রয়েছে। হাউজের চতুর্পাশে বিস্তৃত সমতল চত্বর। মিম্বারের কারুকার্য দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। হাতের দাঁত আর আবলুস গাছের কাঠের সমন্বয়ে সেই মিম্বার নির্মিত।

জামে মসজিদ ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে এখানকার প্রধান মাদরাসা। যার ভবনগুলোর সৌন্দর্য মসজিদের সৌন্দর্য থেকে কোনো অংশে কম নয়। কথিত রয়েছে যে, হামাদান রাজবংশের সুলতানগণ এই মাদরাসা ভবন নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়াও শহরের ভেতরে আরো তিনটি উল্লেখযোগ্য মাদরাসা রয়েছে। এর পাশাপাশি একটি বিশাল চিকিৎসালয় রয়েছে।

আলেপ্পোর বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য ও কল্যাণ

আলেপ্পোর চতুর্পাশে যেই উপশহরগুলো গড়ে উঠেছে, সেগুলোও আয়তনে বিশাল। পুরোটাই সমতল। সেখানে অজস্র সুবিশাল শষ্যক্ষেত রয়েছে। সারি সারি আঙুর গাছ রয়েছে। জলাধারগুলোর পাড়ে অনেকগুলো ফলবাগান

রয়েছে। আমরা হামা নগরীর আসী নদীর কথা আপনাদের বলেছিলাম, সেই আসী নদী এই শহরের ভেতর থেকেই বেরিয়ে গেছে। আরবিতে আসী শব্দের অর্থ হলো, অবাধ্য। এই নদীকে অবাধ্য বলার কারণ হলো, কেউ যদি নদীর সামনে এসে দাঁড়ায় তাহলে তার কাছে মনে হবে, নদীর পানি যেন নিচ থেকে উপরের দিকে উঠছে। এই অস্বাভাবিক কল্পনার কারণে নদীটিকে 'আসি' বলা হয়।

আলেপ্পোর শহরের বাইরে বেরুলে সতেজ আবহাওয়ায় আপনার তনুমন চাঙা হয়ে উঠবে। আমি এ ধরনের সতেজ আবহাওয়া অন্য কোথাও অনুভব করিনি। সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের কারণে আলেপ্পো নগরী রাজধানী হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

আলেপ্পোর শাসক ও বিচারক

আলেপ্পোর শাসকের দায়িত্ব পালন করছেন, প্রধান আমির উরগুন আদ-দাওয়াদার। তিনি হলেন সুলতান আল মালিকুন নাসিরের সবচেয়ে কাছের আমির। একদিকে তাঁর গুণ হলো, তিনি ন্যায়পরায়ণ ফকিহ। অন্যদিকে, তার দুর্নাম হলো, তিনি বেশ কৃপণ। আলেপ্পোতে চার মাযহাবের অনুসারীদের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন বিচারপতি রয়েছে। কাজি কামালুদ্দিন হলেন শাফেয়ী মাযহাবের বিচারক। উচ্চ মনোবল সম্পন্ন এই গুণী সবার চোখে সম্মানিত। ব্যক্তিগতভাবে বেশ সজ্জন ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাস্ত্রে তার দক্ষতা বিখ্যাত। আল মালিকুন নাসির তাঁকে রাজধানীতে এসে কাযিউল কুযাত পদ অলংকৃত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন; কিন্তু সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাত্রাকালে পথিমধ্যে তিনি বালবেস নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি যখন আলেপ্পোর বিচারক পদে সমাসীন হন তখন দামেস্ক ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের কবিরা তার সুনাম গেয়ে প্রচুর কবিতা রচনা করেছিল। তাদেরই একজন তরুণ কবি শিহাবুদ্দিন। তিনি তার প্রশংসামূলক দীর্ঘ কবিতা শুরু করেছিলেন এই চরণ দিয়ে–

وأسفت لفقدك جلق الفيحاء وتباشرت لقدومك الشهباء

সেই প্রশংসামূলক কবিতায় পঞ্চাশের অধিক চরণ ছিল। কাজি শামসুদ্দিন খুশি হয়ে তাকে উন্নত পোশাক ও স্বর্ণমুদ্রার থলে উপহার দিয়েছিলেন। যদিও রাজ্যের অন্যান্য কবিরা সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, যেই কবিতা

আফসোসব্যঞ্জক শব্দ দিয়ে শুরু হয়, তা কখনই মানোত্তীর্ণ হতে পারে না।

আলেপ্পোর হানাফি মাযহাবের বিচারক হলেন অধ্যাপক ইমাম নাসিরুদ্দিন ইবনুল আদিম। চেহারাও যেমন অনিন্দ্য সুন্দর, তেমনই আচরণেও তিনি অনন্য মানুষ। আলেপ্পোর প্রাচীন অধিবাসী ঘরানার সন্তান। তাঁর প্রশংসা করে জনৈক কবি বলেছিলেন,

تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله

'যখনই আপনি তার কাছে যাবেন হাস্যোজ্জ্বল দেখতে পাবেন,
মনে হবে, আপনি তাকে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি প্রদান করেছেন।'

এখানে মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের জন্যেও পৃথক বিচারক রয়েছে। এ মুহূর্তে তার নাম স্মরণ পড়ছে না। তবে এতটুকু মনে পড়ছে যে, মিসরের লোকজনও তাকে সম্মান করতেন। তিনি নিজ থেকে আবেদন না করেই উপর্যুক্ত পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। হাম্বলি মাযহাবের অনুসারীদের জন্যে যেই ভিন্ন বিচারপতি ছিলেন, তার নামও মনে পড়ছে না। শুধু এতটুকু বলতে পারব যে, তিনি দামেস্কের সালেহিয়া অঞ্চলের অধিবাসী।

আলেপ্পোর নকিবুল আশরাফ[১] হলেন বদরুদ্দিন ইবনুয যাহরা। এখানকার যেসব ফকিহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শারফুদ্দিন ইবনুল আজমি। তাঁর আত্মীয়স্বজনরাই আলেপ্পো নগরীর প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ।

---

[১] নকিব আল আশরাফ হলো, বিভিন্ন মুসলিম সাম্রাজ্যের একটি সরকারি পদ যা প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের প্রধান বা তত্ত্বাবধায়ককে নির্দেশ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধররা আশরাফ নামে পরিচিত ছিল। ইসলামের ইতিহাস জুড়ে, আশরাফরা নিজেদেরকে বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চল জুড়ে কর্পোরেশনের মতো বড় দলে সংগঠিত করেছিল।–অনুবাদক

আলেপ্পো থেকে জাবালা অভিমুখে

আবারও আমরা বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা ঐতিহাসিক জনপদ কিন্নাসরিন[১] অভিমুখে যাচ্ছি। পথিমধ্যে সর্বপ্রথম যে নগরীতে আসি, তার নাম তিযিন। কিছুদিন আগে তুর্কিমান জাতিগোষ্ঠীর লোকজন শহরটি গড়ে তুলেছে। বাজার-ঘাটগুলো বেশ পরিকল্পিত ও সুন্দর। মসজিদগুলো দেখতে যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনি মজবুত। কাজি বদরুদ্দিন আসকালানী এখানকার বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন। সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম ঐতিহাসিক জনপদ কিন্নাসরিনে। এক সময়কার সমৃদ্ধ বিশাল নগরী আজ বিরান। কালের সাক্ষী হয়ে ভগ্নস্তূপগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও জীবনের চাঞ্চল্য নেই।

আন্তাকিয়া নগরীতে

এবার আমাদের যাত্রা শুরু হলে ইতিহাসের আরেকটি সমৃদ্ধ ও বিখ্যাত নগরী আন্তাকিয়া অভিমুখে। এখানকার শহররক্ষা প্রাচীর এতটাই মজবুত ও দুর্ভেদ্য যে, শামদেশের অন্য কোনো নগরীর প্রাচীর তার সমকক্ষ নয়। সুলতান আল মালিকুয যাহির এই নগরী জয় করার পর সম্পূর্ণ প্রাচীর ধ্বংস করেন। আন্তাকিয়া নগরীতে প্রচুর মানুষ বসবাস করে থাকে। বাড়িগুলো বেশ সুন্দর ও সাজানো-গুছানো। শহর জুড়ে প্রচুর গাছপালা ও নদীনালা রয়েছে। এই শহরের পাশ দিয়েই বিখ্যাত আসী নদী বয়ে গেছে। বিখ্যাত তাপস হাবিব নাজ্জার রহ.-এর কবর এখানেই অবস্থিত। কবরস্থানের পাশে একটি খানকা রয়েছে। সেখানে আগন্তুকদের জন্যে বিনামূল্যে খাবার পরিবেশন করা হয়। অতিশীপর বুযুর্গ মুহাম্মাদ বিন আলী সেই খানকার প্রধান শায়খের দায়িত্ব পালন করছেন। যদিও তাঁর বয়স একশ পেরিয়ে গেছে; কিন্তু শরীর এখনো বেশ বলবান। প্রথমবার যখন তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি

---

[১] কিন্নাসরিন, যা চ্যালসিস অন বেলাস নামে পরিচিত। উত্তর সিরিয়ার একটি ঐতিহাসিক শহর। যা কুইক নদীর পশ্চিম তীরে আলেপ্পোর ২৫ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। রোমান আমলে আলেপ্পোর সাথে একটি প্রধান রাস্তা যুক্ত ছিল।–অনুবাদক

একটি বাগানে ছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি প্রথমে নিজ হাতে এক আঁটি কাঠ বাঁধলেন। এরপর তা কাঁধে তুলে শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করলেন।

তার আশি বছর বয়সী ছেলের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। তবে বার্ধক্যের কারণে কুঁজো হয়ে পড়েছেন। কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারেন না। কেউ যদি তাদের দুজনকে দেখে, তাহলে ছেলেকে মনে করবে বাবা, আর বাবাকে মনে করবে—ছেলে।

অজেয় কেল্লার পরিদর্শনে

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম বুগরাস কেল্লায়। দৈত্যাকৃতির মজবুত কেল্লা। কেউ এই কেল্লা জয় করতে পারবে, তা ঘুণাক্ষরে কল্পনাতেও আসে না। ভেতরে প্রচুর বাগ-বাগিচা ও শস্যক্ষেত রয়েছে। এখান থেকে সিস অঞ্চলের দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে, যদিও তা আর্মেনীয় কাফেরদের স্বায়ত্বশাসনাধীন; তবে এখানকার সবাই সুলতান আল মালিকুন নাসিরের প্রজা। প্রতি বছর সুলতানের কাছে তারা কর পাঠিয়ে দেয়। এখানে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন রয়েছে। যা বাগালিয়্যা নামে প্রসিদ্ধ। এই বুগরাস অঞ্চলের উৎপাদিত 'দাবিলিয়্যা'[১] পোশাক বিখ্যাত। সারিমুদ্দিন ইবনুশ শায়বানি হলেন এই কেল্লার প্রধান। তার গুণী ছেলের নাম আলাউদ্দিন। আর তার ভাতিজার নাম হলো, হুসামুদ্দিন। ব্যক্তি হিসেবে তিনি বেশ সজ্জন ও নীতিবান। 'রদসিস' নামে পরিচিত একটি এলাকায় বাস করেন। তাঁর দায়িত্ব হলো, বুগরাস থেকে আর্মেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত সড়কের নিরাপত্তা বিধান করা।

একবার এক কাণ্ড ঘটে যায়। আর্মেনীয় খ্রিস্টানরা আমির হুসামুদ্দিনের বিরুদ্ধে কিছু বানোয়াট অভিযোগ দাঁড় করে এবং সোজা আল মালিকুন নাসিরের দরবারে হাজির হয়ে নালিশ ঠুকে দেয়। তাদের প্রতারণার জ্বালে ফেঁসে গিয়ে সুলতান আলেপ্পোর প্রধান আমিরের কাছে ফরমান জারি করে যে, আপনি আমির হুসামুদ্দিনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিন। ওদিকে হুসামুদ্দিনের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন সুলতানের রাজদরবারের অন্যতম শীর্ষ আমির।

---

[১] দাবিলিয়্যা এটি দাবেল শহরের দিকে সম্পৃক্ত। এটি আর্মেনিয়ার একটি শহর। উসমান ইবনে আফফান রা.-এর যুগে হাবিব ইবনে মাসলামা এটি জয়লাভ করেন।

তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, আলেপ্পোর প্রধান আমির সুলতানের ফরমান কার্যকর করতে চলেছেন তখন দ্রুত সুলতানের কাছে হাজির হয়ে নিবেদন করেন, হে মহান সুলতান, আমির হুসামুদ্দিন হলেন আপনার রাজ্যের অন্যতম ন্যায়পরায়ণ গভর্নর। তিনি মুসলমানদের কল্যাণকামী। একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কের নিরাপত্তার গুরুদায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছেন। তার বীরত্বের কারণে ওই অঞ্চলের দস্যুরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। ওদিকে আর্মেনীয়দের লক্ষ্য হলো, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে একের পর এক ফ্যাসাদ ছড়িয়ে দেওয়া। আমির হুসামুদ্দিন তাদেরকে সেই সুযোগ দিচ্ছেন বলে, তারা তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা তাকে হত্যা করার মাধ্যমে মূলত মুসলিম শক্তিকে দুর্বল করতে চাচ্ছে।'

তার শক্ত উপস্থাপনের কারণে সুলতান পূর্বের ফরমান প্রত্যাহার করেন এবং তাকে মুক্ত করে দেওয়ার দ্বিতীয় ফরমান জারি করেন যে, আমিরকে পূর্বের পদে বহাল করা হোক। 'আফরুশ' নামে সুলতানের একজন পত্রবাহক ছিল, যাকে শুধু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রেরণের কাজেই পাঠানো হতো। তার হাতে দ্বিতীয় ফরমান তুলে দিয়ে বললেন, 'যত দ্রুত সম্ভব তুমি সেখানে চলে যাও।' তখন সে মাত্র পাঁচ দিনে মিসর থেকে আলেপ্পোতে পৌঁছে গেল, যে পথ সাধারণত পাড়ি দিতে এক মাস লেগে থাকে। সে দেখতে পেল, ইতিমধ্যে আলেপ্পোর প্রধান আমির হুসামুদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে এবং ফাঁসিতে ঝোলানোর স্থানে নিয়ে গেছে। যথাসময়ে পৌঁছানোর কারণে আমির হুসামুদ্দিন প্রাণে বেঁচে গেল এবং নিজের পূর্বের পদ ফিরে পেল।

আমির হুসামুদ্দিনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। ওই সময় তার সঙ্গে ছিলেন বুগরাসের বিচারপতি শরিফুদ্দিন আল হামাবী। আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল 'উমুক' নামক স্থানে, যা আন্তাকিয়া, তিযিন ও বুগরাসের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। সাধারণত তুর্কমান গোত্রের লোকেরা এখানে তাদের পশু চরাতে নিয়ে আসে। বিস্তৃত এই চারণভূমিতে গোখাদ্যের অভাব নেই।

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম 'কুসাইর' কেল্লায়। এটিও বেশ সুন্দর কেল্লা। আলাউদ্দিন কুর্দি সেই কেল্লার গভর্নর। শিহাবুদ্দিন আর্মিনাতি এখানকার বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি মিসরের অধিবাসী।

আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। এবার পৌঁছুলাম শুগরু বুকাস কেল্লায়, যা একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। সাইফুদ্দিন তনতাশ হলেন সেই কেল্লার

গভর্নর। গুণী মানুষ। জামালুদ্দিন ইবনে শাজারাহ নামের এক লোক এখানকার বিচারপতি, যিনি ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র।

সাহয়ুন নামের ভূস্বর্গে

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম 'সাহয়ুন' নগরীতে। ছবির মতো সাজানো গুছানো নগরী। এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে অসংখ্য নদী ও ঝরনা। যতদূর দৃষ্টি যায়, সবুজ শ্যামল বৃক্ষরাজি। এখানেও একটি সুবিশাল কেল্লা রয়েছে। এখানকার গভর্নরের নাম ইবরাহিমি। আর বিচারপতি হলেন মুহিউদ্দিন হিমসি। শহরের বাইরে পথিকদের জন্যে একটি খানকা রয়েছে, যেখানে সকল আগন্তুককে বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হয়। এটি একটি বাগানের মধ্যখানে অবস্থিত। পাশেই প্রখ্যাত বুযুর্গ ঈসা বাদাবি রহ.-এর কবর। আমরা কবর যিয়ারত সেরে নিলাম।

একের পর এক নগরীতে

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম 'কাদমুস' কেল্লায়। সেখান থেকে গেলাম 'মাইনাকা' কেল্লায়। সেখান থেকে গেলাম আরেকটি কেল্লায়, যার নাম 'উলাইকা'। সেখান থেকে যাত্রা করে গেলাম 'মিসয়াফ' কেল্লায়। এখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে আবার যাত্রা শুরু করলাম। পৌঁছুলাম 'কাহফ' কেল্লায়। এই সবগুলো কেল্লাতে বাস করে ইসমাইলি ফেরকার অনুসারীরা। স্থানীয়ভাবে এদেরকে 'ফিদাবিয়্যা' (আত্মঘাতী) বলা হয়। এখানকার নিয়ম হলো, অন্য ধর্মের অনুসারীদের জন্যে এখানে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। যুদ্ধবাজ গোত্র হওয়ার কারণে সুলতান মালিকুন নাসির এদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। ইরাক বা অন্য কোনো অঞ্চলে কোনো শত্রু মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে এদের মাধ্যমে শায়েস্তা করেন। সুলতানের পক্ষ থেকে তাদের জন্যে ভাতা নির্ধারিত রয়েছে। সুলতান যখন কোনো শত্রুকে গোপনে হত্যা করার জন্যে এদের কাউকে প্রেরণ করেন, তখন তার হাতে মুক্তিপণ দিয়ে দেন। যদি সফল হয়ে ফিরে আসে তাহলে সে অর্থ তার। আর যদি সেই গুপ্ত মিশনে মারা পড়ে তাহলে মুক্তিপণের অর্থ তার সন্তানরা পেয়ে থাকে। তাদের হাতে সবসময় বিষমিশ্রিত খঞ্জর থাকে। শত্রুকে তারা সেই খঞ্জরের আঘাতে হত্যা করে। কখনো যদি ব্যর্থ হয়ে ধরা পড়ার উপক্রম হয় তখন সেই খঞ্জরের মাধ্যমে আত্মহত্যা করে। আমির কারাসিঙ্গুরের সঙ্গে এ

ধরনের একটি কাণ্ড ঘটেছিল। তিনি যখন ইরাকের উদ্দেশে পালিয়ে যান তখন সুলতান মালিকুন নাসির তাকে হত্যা করার জন্যে একদল ইসমাইলিকে পাঠিয়েছিলেন। তাদের গুপ্ত আক্রমণ কারাসিঙ্গুর সফলভাবে ঠেকিয়ে দেন। কারণ, তিনি সবসময় সতর্ক থাকতেন।

কারাসিঙ্গুরের সংগ্রামী জীবন

কারাসিঙ্গুর ছিলেন সবচেয়ে অভিজাত ও শীর্ষপদস্থ গভর্নরদের একজন। সুলতান আল মালিকুন নাসিরের ভাই আল মালিকুল আশরাফের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তিনিও যুক্ত ছিলেন। আল মালিকুন নাসির ক্ষমতায় বসার পর ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হওয়ার নীতি গ্রহণ করেন। এজন্যে তিনি খুনিদের সঙ্গে প্রথমেই বিবাদে জড়াননি। প্রথমে নিজের ক্ষমতাকে সুসংহত করেছেন। রাজত্বের সিংহাসনে পুরোপুরি সুস্থির হওয়ার পর তিনি একে একে সকল খুনিকে খুঁজে বের করার মিশন শুরু করেন। একে তো ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে, দ্বিতীয়ত তার সঙ্গেও যেন অনুরূপ নৃশংসতা না ঘটে– এজন্যে তিনি কৌশলে একেকজন করে সকল খুনিকে হত্যা করার মিশন শুরু করেন।

ওই সময় কারাসিঙ্গুর ছিলেন আলেপ্পোর গভর্নর। সুলতান আল মালিকুন নাসির সকল গভর্নরের নামে এই রাজকীয় ফরমান জারি করেন যে, সবাই যেন নির্দিষ্ট তারিখে নিজের সকল সৈন্যকে নিয়ে আলেপ্পোতে জড়ো হয়। এভাবে তিনি কারাসিঙ্গুরকে গ্রেফতার করার কৌশল নিয়েছিলেন। ধূর্ত কারাসিঙ্গুর বিষয়টি বুঝে ফেলে। তার অধীনে তখন আটশ দাস ছিল। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে একদিন প্রত্যুষে তিনি বেরিয়ে পড়েন। সুলতানের অধীনে তখন বিশ হাজার সৈন্য ছিল। তাদের বেষ্টনি ভেদ করে কারাসিঙ্গুর বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

দ্রুত সে আরব গভর্নর মুহান্না বিন ঈসার বাড়িতে চলে আসে, যা আলেপ্পো থেকে দু দিনের দূরত্বে অবস্থিত। মুহান্না তখন শিকারে ছিল। কারাসিঙ্গুর যখন তার বাড়ির সামনে অবতরণ করেন তখন ভেতরে মুহান্নার স্ত্রী উম্মুল ফযল ও চাচাতো বোন ছিল। কারাসিঙ্গুর মাথা থেকে পাগড়ি খুলে গলায় জড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করে বলে, 'হে আরবের গভর্নর, আমাকে আশ্রয় দিন।' তখন মুহান্নার স্ত্রী বলেন, 'আমরা আপনাকে ও আপনার সঙ্গের লোকদের আশ্রয় দিলাম।'

তখন কারাসিঙ্গুর বললেন, 'আমি আমার সন্তান ও সম্পদকে ভালোবাসি।'

উম্মুল ফযল উত্তরে বলেন, 'আপনি আপনার প্রিয় জিনিসগুলো পেয়ে যাবেন। এখন আমাদের আশ্রয়ে অবতরণ করুন।' তিনি তাই করলেন। ততক্ষণে মুহান্না শিকার থেকে ফিরে এলেন। তিনি যথাযোগ্য আতিথেয়তা করলেন। তখন কারাসিঙ্গুর বললেন, 'আলেপ্পোতে রেখে আসা আমার পরিবার ও সম্পদের জন্যে হৃদয় ছটফট করছে।'

মুহান্না তখন নিজের আপন ও চাচাতো ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ ডাকলেন। কেউ তাকে সমর্থন দিলেন। আবার কেউ বললেন, 'আমরা সুলতান আল মালিকুন নাসিরের নিয়ন্ত্রণাধীন শামে বসবাস করে কী করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ানোর দুঃসাহস দেখাই?'

উত্তরে মুহান্না বলেন, 'অতিথি যা চান, তার জন্যে আমি আমার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাব। আমি তাকে ইরাকের সুলতানের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

পরামর্শসভা চলাকালে সংবাদ এলো যে, কারাসিঙ্গুরের সন্তানদেরকে রাষ্ট্রীয় ডাক মারফত মিসরের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন মুহান্না বললেন, 'এখন আর আপনার সন্তানদেরকে উদ্ধার করার কোনো সুযোগ নেই। তবে আপনার সম্পদ উদ্ধারের জন্যে আমরা চেষ্টা করতে পারি।' একথা বলে তিনি অনুগত লোকদেরকে অভিযানের প্রস্তুতি নিতে বললেন। আরবদের থেকে পনেরো হাজার সৈন্য নিয়ে আলেপ্পোর উদ্দেশে রওনা হলেন। তারা প্রথমে কেল্লার ফটকে আগুন ধরিয়ে দিলেন। এরপর শহর জয় করে কারাসিঙ্গুরের সম্পদ ও রয়ে যাওয়া আত্মীয়স্বজনকে উদ্ধার করলেন। এর বাইরে বিন্দু পরিমাণ বাড়াবাড়ি করলেন না।

এরপর তিনি ইরাকের সুলতানের উদ্দেশে রওনা হলেন। এ সময় হিমসের আমির 'আফরাম' তাদের সহযাত্রী হলেন। সবাই একসঙ্গে ইরাকের সুলতান মুহাম্মাদ খোদাবান্দার কাছে পৌঁছুলেন। সুলতান সেসময় 'কুরাবাগ' অঞ্চলে ছিলেন। যা সুলতানিয়া ও তিবরিয নগরীদ্বয়ের মাঝখানে অবস্থিত। সুলতান সাধারণত গ্রীষ্মের অবকাশ যাপনের জন্যে এখানে এসে থাকেন। তিনি সবাইকে সানন্দে বরণ করে নেন এবং একেকজনকে একেক এলাকার গভর্নর বানিয়ে প্রেরণ করেন। মুহান্নাকে দেন ইরাকের আরব ভূখণ্ডকে। আর কারাসিঙ্গুরকে দান করেন ইরাকের অনারব অংশের ভুখণ্ড মারাগা। যা ছোট দামেস্ক নামে বিখ্যাত। আর আফরামকে দান করেন হামাদান অঞ্চল।

এই তিনজন তাঁর অধীনে দীর্ঘ দিন সেসব অঞ্চলে বাস করেন। এক পর্যায়ে আফরামের মৃত্যু হয়। ওদিকে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পর মুহান্না পুনরায় সুলতান আল মালিকুন নাসিরের বশ্যতার অধীনে ফিরে যান। শুধুমাত্র কারাসিঙ্গুর নিজের অবস্থায় থেকে যান। এজন্যে তাকে গোপনে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সুলতানের একের পর এক বেশকটি আত্মঘাতী ইসমাইলি কমান্ডোকে প্রেরণ করেছেন। তাদের একদল তার ঘরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয় বটে; কিন্তু তার স্থলে অন্যজনকে হত্যা করে। আর কেউ তাকে বাহনে থাকাবস্থায় আক্রমণ করে; কিন্তু তাদের সেই আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এভাবে একের পর এক আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় কারাসিঙ্গুরের কারণে প্রচুর ইসমাইলি মারা পড়ে। কারাসিঙ্গুর এতটাই চৌকান্না থাকত যে, এক মুহূর্তের জন্যে নিজের শরীর থেকে বর্ম খুলত না। পাশাপাশি সে কখনো কাঠ বা লোহার তৈরি ঘর ব্যতিরেকে অন্য কোথাও রাত্রিযাপন করত না।

আত্মহত্যার মাধ্যমে সংগ্রামী জীবনের অবসান

এভাবে অনেক দিন কেটে যায়। ইরাকের সুলতান মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তার ছেলে আবু সাঈদ মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তার শাসনামলে 'জওবান' নামক একজন গভর্নর ছিল। যার আলোচনা সামনে আসবে। তার ছেলে 'দামারতাশ' পালিয়ে সুলতান আল মালিকুন নাসিরের কাছে চলে যায়। এ নিয়ে দুই সুলতানের মাঝে বেশ কিছু চিঠি চালাচালি হয়। তখন দুজনে একমত হন যে, আবু সাঈদ কারাসিঙ্গুরকে হত্যা করে তার মাথা আল মালিকুন নাসিরের কাছে পাঠাবে, এর বিনিময়ে আল মালিকুন নাসির পালিয়ে যাওয়া গভর্নরপুত্র দামারতাশকে হত্যা করে তার মাথা আবু সাঈদের কাছে পাঠাবে।

চুক্তি অনুসারে আবু সাঈদের কাছে তিনি দামারতাশের কর্তিত মুণ্ড প্রেরণ করেন। কারাসিঙ্গুর যখন বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। তার হাতের আংটির মুক্তার ভেতরে বিষ ছিল, তিনি তা চুষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সুলতান আবু সাঈদ তার আত্মহত্যার সংবাদ আল মালিকুন নাসিরের কাছে প্রেরণ করেন। যার ফলে তার কর্তিত মস্তক প্রেরণের প্রয়োজন পড়েনি।

নতুন জনপদ জাবালায়

আত্মঘাতী কমান্ডোদের জনপদ থেকে আমরা রওনা হলাম নতুন দেশের সফরে। জাবালা নামের প্রচুর নহরসমৃদ্ধ একটি জনপদে পৌঁছুলাম। চারপাশে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের হাতছানি। এখান থেকে এক মাইল দূরত্বে সাগর। বিখ্যাত বুযুর্গ ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ.-এর মাজার অবস্থিত।

ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ.-এর মাজার পরিদর্শন

ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. সম্পর্কে প্রচলিত রয়েছে যে, তিনি রাজত্ব ত্যাগ করে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তিনি কোনো রাজার ঘরের সন্তান ছিলেন না। অথচ মানুষ তেমন ধারণা করে বসে আছে। বরং তার বাবা আদহাম রহ.-ও দুনিয়াবিবাগি নির্লোভ নেককার বুযুর্গ ছিলেন। পৃথিবীর সকল কর্মযজ্ঞ থেকে নিজেকে আড়াল করে দীনের দাওয়াত নিয়ে দেশে দেশে ঘুরতেন। অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন। হ্যাঁ, তার মায়ের বংশ রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেই সূত্রে তাঁকে রাজবংশের সন্তান বলা যেতে পারে।

কথিত রয়েছে যে, একবার হযরত আদহাম রহ. বোখারা নগরীর একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই বাগানের পাশে একটি স্রোতস্বিনী খাল ছিল। তিনি সেখানে অযু করলেন। তখন দেখতে পেলেন, পানির স্রোত ধরে একটি আপেল ভেসে আসছে। তিনি ভাবলেন, এই আপেল খাওয়াটা অবৈধ হবে না। খাওয়ার পর মনে হলো, আরে! আমি তো ফলবাগানের মালিকের কাছ থেকে অনুমতি নিইনি। কাজটি আমার জন্যে বৈধ হলো না। এজন্যে তিনি ভাবলেন, বাগানের মালিককে জানিয়ে অনুমতি নিয়ে নেবেন। তাহলে বৈধ হয়ে যাবে।

সেমতে তিনি বাগানের দরজার সামনে এসে কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে একজন বাঁদি বেরিয়ে এলো। বললেন, 'তুমি বাড়ির মালিককে আসতে বলো।' বাঁদি বলল, 'এ বাগানের মালিক একজন মহিলা।' তখন বললেন, 'তাহলে তার কাছে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে এসো।' বাঁদি তাই করল। মহিলার কাছে গিয়ে তিনি বিষয়টি অবহিত করলেন। তখন মহিলা বলল, 'এই বাগানের অর্ধেকটার মালিক আমি। আর বাকি অর্ধেক সুলতানের। তিনি বলখে গেছেন।' বোখারা থেকে দশ দিনের দূরত্বে বলখ অবস্থিত।

মহিলা আপেলের অর্ধেক হিস্যা মাফ করে দিলেন। বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে আদহাম রহ. বলখের উদ্দেশে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন, সুলতান একটি বাহনের ওপর চড়ে পাইক-পেয়াদাসহ কোথাও যাচ্ছেন। চলন্ত অবস্থাতেই আদহাম রহ. সুলতানকে পূর্ণ বৃত্তান্ত জানিয়ে অর্ধেক আপেলের ব্যাপারে মাফ চাইলেন।

সুলতানের শর্ত

সুলতান তখন বললেন, 'এখন আমি কিছু বলতে পারছি না। কাল এসে আমার সঙ্গে দেখা করো।' সুলতানের এক মেয়ে ছিল অত্যন্ত সুন্দরী ও গুণবতী। তাঁকে বিয়ে করার জন্যে অনেক রাজপুত্র প্রস্তাব পাঠিয়েছে; কিন্তু তাদের প্রত্যেককেই সুলতান নাকচ করেছেন। কারণ হলো, মেয়েটি প্রচুর ইবাদত করে। দিন-রাত ইবাদতে মগ্ন থাকে। বুযুর্গ লোকদের ভালোবাসে। এজন্যে তার ইচ্ছে হলো, কোনো দুনিয়াবিবাগি আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের কাছে বিয়ে বসে বাকিটা জীবন ইবাদতে কাটিয়ে দেবে।

সুলতান প্রাসাদে ফিরে আদরের কন্যাকে ডেকে বললেন, 'আজ এমন এক যুবকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, যার মতো আল্লাহভীরু আমি আরেকজন দেখিনি। সে পরিত্যক্ত অর্ধেক আপেলের ব্যাপারে ক্ষমা চাইতে সেই বোখারা থেকে এই বলখে এসেছে।' মেয়েটি তখন আদহাম রহ. এর ব্যাপারে কৌতূহলী হলো।

পরদিন আদহাম রহ. রাজদরবারে এলেন। তখন তিনি বললেন, 'আপনি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে না করেন তাহলে আপনাকে আমি অর্ধেক আপেলের ব্যাপারে মাফ করব না।' আদহাম রহ. নানাভাবে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলেন; কিন্তু সুলতান কিছুতেই তার শর্ত শিথিল করলেন না। অগত্যা তিনি সুলতানের মেয়েকে বিয়ে করলেন।

বাসরঘরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, রূপ-লাবণ্যে টইটম্বুর একটি মেয়ে তার বধূ হয়ে বসে আছে। বাহারি জিনিসপত্র দিয়ে পুরো ঘর ঠাসা। মেঝেতে মার্বেল পাথরের ফ্লোর। তিনি সবকিছু এড়িয়ে ঘরের এক কোণে চলে গেলেন এবং ফজর পর্যন্ত তাহাজ্জুদ পড়তে লাগলেন। এভাবে একে একে সাতটি রাত তিনি নববধূকে বিছানায় রেখে নামায পড়ে গেলেন। তখনো সুলতান তাকে ক্ষমা করেননি। তিনি পুনরায় সুলতানের কাছে হাজির

হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। উত্তরে বললেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলি হলেই আমি তোমাকে মাফ করব।' সেই রাতে তিনি স্ত্রীর কাছে গেলেন মিলিত হলেন। এরপর গোসল করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযের ভেতরে হঠাৎ তিনি একটি চিৎকার দিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। এ অবস্থাতেই তার ইন্তেকাল হলো।

সেদিনের মিলনের ফলে সুলতানের বিদুষী কন্যা গর্ভবতী হন। এভাবে জন্ম গ্রহণ করেন হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ.। যেহেতু তার নানার কোনো ছেলেসন্তান ছিল না; এজন্যে ইবরাহিম রহ. সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি হন। সেখান থেকেই তার সিংহাসন বিসর্জন দেওয়ার ঘটনা সারা বিশ্বের লোকমুখে ছড়িয়েছে।

ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. এর মাজারে একটি দৃষ্টিনন্দন খানকা রয়েছে। সেখানে পানির একটি হাউজ আছে। আগন্তুক ও দর্শনার্থীদের জন্যে খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত রয়েছে। ইবরাহিম জুমাহি নামের একজন বুযুর্গ ব্যক্তি খানকাটির তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করছেন। শাবানের পনেরো তারিখে গোটা শামদেশ থেকে শত সহস্র মানুষ এই খানকায় জড়ো হয়। এরপর তিন দিন অবস্থান করে দীনি খোরাক অর্জন করে। নগরীর বাইরে একটি সুবিশাল বাজার রয়েছে, যেখানে সব ধরনের পণ্য পাওয়া যায়। সেই মৌসুমে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে শত শত দুনিয়াবিবাগী দরিদ্র ও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী এখানে সমবেত হয়। এখানকার রীতি হলো, যত লোক মাজার পরিদর্শন করতে আসে, তাদের প্রত্যেকে খানকার সেবকের হাতে কিছু মোমবাতি তুলে দেয়। যার ফলে এখানে মোমবাতির বিশাল স্তূপ জমে যায়।

এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ নাসিরিয়া ফেরকার অনুসারী। তাদের ধর্মবিশ্বাস হলো, সাইয়েদুনা আলী বিন আবি তালিব রা. খোদা। (নাউযুবিল্লাহ)। এরা কখনই নামায পড়ে না, পবিত্রতা অর্জন করে না। এমনকি রোযাও রাখে না। যখন সুলতান আল মালিকুয যাহির এই ফরমান জারি করেন যে, এখানকার প্রতিটি গ্রামে একটি করে মসজিদ তৈরি করতে হবে, তখন বাধ্য হয়ে তারা মূল জনপদের বাইরে পরিত্যক্ত জায়গাতে মসজিদ নির্মাণ করে। সেখানে তারা কখনই যায় না। কেউ গিয়ে সেসব মসজিদ আবাদও করে না। অধিকাংশ মসজিদ এখন আস্তাবল ও গোয়ালঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যদি বাইরের কোনো আগন্তুক সেসব মসজিদে

অবতরণ করে এবং নামায পড়ার আহ্বান জানিয়ে আযান দেয়, তখন স্থানীয় লোকেরা ভেংচি কেটে বলে, لا تنهق، علفك يأتيك 'গরুর মতো হাম্বা ডেকো না। তোমার ঘাস তুমি পেয়ে যাবে।' এই অঞ্চলে এসব নাসিরিয়া ধর্মাবলম্বীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এ অঞ্চলে এসে আমি এ ঘটনাও শুনেছি যে, একবার এখানকার এক লোক নিজেকে ইমাম মাহদি দাবি করেছিল। তখন সবাই তার ভক্ত হয়ে যায়। কারণ, ওই লোক তাদের প্রলুব্ধ করেছিল যে, একদিন সমস্ত দেশ তার হাতে বিজিত হবে। যারা সহযোগিতা করবে, তাদের মাঝে সে গোটা শামদেশের মালিকানা বণ্টন করে দেবে। এভাবে লোকটি নিজস্ব বাহিনী গড়ে তোলে। সে একেক সময় একেক দেশ হামলা করার আদেশ করত। এভাবে একদিন তারা সম্মিলিতভাবে জাবালা নগরীতে আক্রমণ করে। আক্রমণের জন্যে তারা জুমার সময়টিকে বেছে নিয়েছিল। অকস্মাৎ অনুগত বাহিনী বাড়িঘরে আক্রমণ করে। সম্পদ লুণ্ঠন ও ইজ্জত হননের মাধ্যমে তারা তাদের পৈশাচিক মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। তখন পুরুষ মুসলিমগণ মসজিদ থেকে বেরিয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সংবাদ শুনে লাজিকিয়া নগরীর গভর্নর নিজ বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে তারা পালিয়ে যায়। এ সময় তাদের অন্তত বিশ হাজার সদস্য নিহত হয়। অবশিষ্ট লোকেরা যদিও পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিল; কিন্তু সেখান থেকে তাদের ধরে আনা হয়। সেদিন তাদেরকে প্রাণভিক্ষা দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন শষ্যক্ষেতে দাস হিসেবে কাজে লাগানো হয়।

প্রাচীন জনপদ লাযিকিয়া নগরীতে

জাবালা নগরী থেকে বেরিয়ে আমরা রওনা হলাম লাযিকিয়া নগরীর উদ্দেশে। সাগরের তীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন জনপদ। কথিত রয়েছে যে, এই নগরীর লুটেরা শাসক সম্পর্কেই কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে যে, يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ' লাকটি মানুষের নৌযান গ্রাস করত।' এ নগরীতে আমার আগমনের মূল কারণ হলো, এখানকার বিখ্যাত বুযুর্গ শায়খ আবদুল মুহসিন ইস্কান্দারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এখানে এসে জানতে পারলাম যে, তিনি বর্তমানে পুণ্যভূমি হিজাযে অবস্থান করছেন। তখন আমি তার দুজন গুণী শিষ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সাঈদ আল বাজায়ি ও ইয়াহইয়া সিলাবি। তাঁরা তখন এখানকার আরেক বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব আলাউদ্দিন আল বাহা-এর মসজিদে অবস্থান করছিলেন। যিনি প্রচুর দান-খয়রাত করে থাকেন। তিনি মসজিদের কাছে একটি খানকা করেছেন। যেখানে সকল আগন্তুকদের জন্যে খাবারের বন্দোবস্ত রয়েছে। এ শহরের বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছেন, জালালুদ্দিন আবদুল হক মিসরি মালেকী। তিনিও গুণী মানুষ। আচার-আচরণে বেশ আন্তরিক। প্রধান গভর্নর তয়লানের সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তিনিই তাকে এ দায়িত্ব পালনের জন্যে মনোনীত করেছেন।

নাস্তিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

এই লাযিকিয়া নগরীতে 'ইবনুল মুয়াইয়িদ' নামের এক লোক বাস করত। বিদ্রুপাত্মক মনোভাবের লোক। যার কারণে তার কণ্ঠের আঘাত থেকে কেউ বাঁচতে পারত না। যদিও সে নিজের নাস্তিকতা জনসম্মুখে প্রকাশ করত না; তবে কোনো দীনি বিধান পালন করত না; সুযোগ পেলে অন্যের বরাতে নাস্তিকতাধর্মী কথা নকল করত। ঘটনাক্রমে একদিন প্রধান গভর্নর তয়লানের কাছে সে নিজের কিছু প্রয়োজন পেশ করল; কিন্তু তিনি সেগুলো পূরণ করলেন না। তখন সে মিসরে চলে গেল এবং তার নামে কিছু বাজে কথা রটিয়ে মিসরে ফিরে এলো। তখন কাজি জালালুদ্দিনের কাছে তয়লান পত্র লিখে জানাল যে, আপনি তাকে নির্দিষ্ট কোনো শারয়ী কারণ দেখিয়ে গ্রেফতার করুন।

তখন কাজি সাহেব তাকে নিজ বাড়িতে ডেকে পাঠালেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলাপ তুললেন। কথায় কথায় তার মনের ভেতরের নাস্তিকতা বাইরে বের করে নিয়ে এলেন। সে এমন কিছু গুরুতর কথা বলল, যার সর্বনিম্নটির কারণেই মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত হয়ে যায়। ওদিকে কাজি সাহেব পর্দার আড়ালে কয়েকজন সাক্ষীকে বসিয়ে দিয়েছিলেন, যারা তার মারাত্মক কথাগুলো লিখে রাখে। পর্যাপ্ত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কাজি সাহেব তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। এবং ঘটনার আদ্যোপান্ত প্রধান গভর্নরকে অবহিত করলেন। এরপর আইনি আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

যুগের পালাবদল

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই প্রধান গভর্নর তয়লানকে ত্রিপোলির গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত করা হয়। তদস্থলে অপর শীর্ষ গভর্নর আলহাজ কুরতিয়া ত্রিপোলির গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন। তয়লানের আগেও তিনি এই ত্রিপোলির গভর্নর ছিলেন। নানা কারণে তাদের দুজনের মাঝে প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল। এজন্যে তিনি শায়েস্তা করার জন্যে তয়লানের দোষ খুঁজছিলেন।

নিহত ইবনে মুয়াইয়িদের ভাইয়েরা গভর্নর কুরতিয়ার কাছে তয়লানের বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকে দেয়। তখন তিনি কাজি জালালুদ্দিন ও তার সঙ্গে জড়িত সাক্ষীদেরকে তলব করেন। দু পক্ষের বক্তব্য শুনে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন।

শহরের বাইরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো। সেমতে তাদের সবাইকে ধরে নিয়ে সেই স্থানে বসানো হয়। মাথা থেকে পাগড়ি খুলে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হয়। লাযিকিয়া অঞ্চলের রীতি হলো, যখনই গভর্নর কোনো ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন, তখন প্রথমে সেই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের স্থলে নিয়ে যাওয়া হতো। এরপর গভর্নরের মজলিস থেকে ফাঁসির পরোয়ানা নিয়ে হাকিম সাহেব ঘোড়া দৌড়িয়ে সেই স্থানে যেত। এরপর আবার গভর্নরের কাছে ফিরে এসে অনুমতি চাইত। এভাবে তাকে তিনবার অনুমতি চাইতে হয়। তৃতীয়বারের আনুষ্ঠানিক অনুমতি গ্রহণ শেষে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো। সেই ধারাবাহিকতা অনুসারে হাকিম যখন তৃতীয়বার অনুমতি চাইতে আসে তখন দরবারে উপস্থিত সবাই নিজ আসন ছেড়ে

দাঁড়িয়ে যায়। নিজেদের মাথা থেকে পাগড়ি খুলে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে যে, 'আপনি যদি এভাবে কাজি ও সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের হত্যা করেন, তাহলে তা ইসলামি বিধানের অবমাননা হবে।' তখন কুরতিয়া তাদের সুপারিশ গ্রহণ করে সবার মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহার করে নেন।

ফারুস গির্জা

লাযিকিয়্যার মূল শহরের বাইরে একটি বিশাল গির্জা রয়েছে। যা ফারুস গির্জা নামে একবাক্যে পরিচিত। এটাই শামদেশের সবচেয়ে বড় গির্জা। এখানে অনেক বড় বড় সন্ন্যাসী বাস করে থাকেন। এই গির্জা পরিদর্শনের জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে খ্রিস্টানরা এসে থাকে। কখনো কোনো মুসলিম এই গির্জা পরিদর্শনে এলে খ্রিস্টানদের তরফ থেকে যথাযোগ্য আতিথেয়তা করা হয়। রুটি, পনির, যাইতুন, সিরকা ও ক্ষির পরিবেশন করে।

শামদেশে যতগুলো নৌবন্দর আছে, তন্মধ্য হতে এই লাযিকিয়া নৌবন্দর সবচেয়ে সুশৃঙ্খল। দু পাশে দুটি বিশাল গম্বুজ রয়েছে। যার মধ্যখানে অনেক বড় শেকল রয়েছে। সেই শেকল না সরানো পর্যন্ত কেউ এখান থেকে বের হতে পারবে না, তদ্রূপ প্রবেশও করতে পারবে না।

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা এলাম 'মারকাব কেল্লায়'। সুবিশাল কেল্লা। কার্ক নগরীর কেল্লার সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে। যা পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায় অবস্থিত। শহরের বাইরে একটি সরাইখানা রয়েছে। আগন্তুকরা সাধারণত সেই সরাইখানাতেই অবতরণ করে থাকে। তাদেরকে সরাসরি কেল্লার ভেতরে যেতে দেওয়া হয় না। আল মালিকুল মানসুর রোমানদের পরাজিত করে এই ঐতিহাসিক কেল্লা জয় করেছিলেন। এখন তার ছেলে আল মালিকুন নাসিরের শাসনাধীন। বুরহানুদ্দিন মিসরি নামের একজন সম্মানিত গুণী মানুষ এই নগরীর বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

আকরা' অঞ্চলে

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা এলাম আকরা এর পার্বত্যাঞ্চলে। যা শামদেশের সবচেয়ে উঁচু পর্বতমালা। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে অসংখ্য পাহাড়ি নদনদী এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে। তুর্কমান জনগোষ্ঠী এখানকার প্রধান বাসিন্দা।

লেবানন ও বা'লাবাক্কুর পর্বতমালা

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম লেবাননের পার্বত্যাঞ্চলে। সারি সারি দীর্ঘ পাহাড়। পৃথিবীর সবচেয়ে সবুজ-শ্যামল পর্বতমালা এখানেই অবস্থিত। গাছে গাছে বিচিত্র ফুল-ফলের সমাহার। কুলকুল রবে ঝরনা বয়ে যায়। সুবিশাল গাছগুলো যত্নের সাথে ছায়া বিছিয়ে রেখেছে। যুগে যুগে আল্লাহর অসংখ্য বান্দা পৃথিবীর সকল ব্যস্ততা ও স্বাদ-আহ্লাদকে বিসর্জন দিয়ে এই পার্বত্যাঞ্চলে এসে ধ্যান-তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছে। তার ধারাবাহিকতায় একদল দুনিয়াবিবাগি সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার দেখা হলো, যাদের নামধাম পৃথিবীর কেউ জানে না।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

এখানে যেসকল সন্ন্যাসী বুযুর্গের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাদের একজনের কাছ থেকে আমি একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনেছি। তিনি বলেন, 'প্রচণ্ড শীতের দিনগুলোতে আমি একদল দরিদ্র তাপসের সঙ্গে এই পাহাড়ের ওপর ছিলাম। শীতের তীব্রতা থেকে রক্ষা পেতে আমরা আগুন জ্বালালাম এবং সেখান থেকে উষ্ণতা গ্রহণ করছিলাম। একজন বলল, 'এই আগুন দিয়ে অনায়াসে গোশত পুড়িয়ে খাওয়া যাবে।'

আমাদের সেই দলে একজন ছিল খুবই সাধারণ সদস্য। কারো চোখে তার কোনো মূল্য ছিল না। কেউ তাকে দু' পয়সার দামও দেবে না। সে লোকটিই তখন বলল, 'আমি আজ আসর নামাযের সময় ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. এর মাজার সংলগ্ন খানকায় ছিলাম। (যা এখান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। বাহ্যিকভাবে এত দ্রুত সেখান থেকে আসা অসম্ভব।) আমি তখন দেখেছিলাম যে, একটি বন্য গাধা তার কবরের পাশে বরফের স্তূপের নিচে আটকে পড়েছে। চারদিক থেকে বরফ এমনভাবে ধরে রেখেছে যে, সেটি ছুটতে পারছে না। যদি তোমরা সেখানে যাও তাহলে অনায়াসে ধরে নিয়ে আসতে পারবে এবং এই আগুনে পুড়িয়ে মজা করে খেতে পারবে।'

তার কথা শুনে আমাদের দলের পাঁচ সদস্য দাঁড়িয়ে গেলাম। সেই স্থানে পৌঁছে ওই লোকটির বিবরণের সত্যতা পেলাম। তখন বন্যগাধাটিকে ধরে সঙ্গীদের কাছে নিয়ে এলাম। এরপর এই আগুনে তার গোশত পুড়িয়ে প্রস্তুত করলাম। যে লোকটি আমাদেরকে এই বন্যগাধার হদিস দিয়েছিল, তাকে

আশপাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম; কিন্তু কোথাও পেলাম না। এমনকি তার পূর্বের অবস্থানের কোনো চিহ্নও খুঁজে পেলাম না। বিস্ময়ে সবাই অবাক হয়ে গেলাম।

বা'লাবাক্কুর পথে

সেখান থেকে আমরা নতুন পথের সফরে বেরিয়ে পড়লাম। এবার এলাম আরেক ঐতিহাসিক জনপদ বা'লাবাক্কু[১] নগরীতে। শামদেশের অন্যতম সুন্দরতম নগরী। চারদিকে অসংখ্য বাগ-বাগিচা আর দৃষ্টিনন্দন ঝরনাধারা। কেউ যদি বলে, এ নগরীটি দামেস্কের মতো ঈর্ষণীয় সুন্দর নগরী, তাহলে অতিরঞ্জন হবে না। এ কারণে যুগে যুগে সকল রাজা-মহারাজা এ নগরীকে ভালোবাসতেন। এই বা'লাবাক্কুর বিশেষ গুড়ের সুনাম গোটা বিশ্বজুড়েই। যা মূলত আঙুরের রস দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। এর মাঝে তারা এখানকার একটি বিশেষ মাটি ঢেলে দেয়, যার ফলে সেই আঙুরের রস জমে শক্ত হয়ে যায়। এরপর তারা তার মাঝে পেস্তা ও বাদাম ঢেলে মজাদার, সুঘ্রাণযুক্ত গুড় তৈরি করে। স্থানীয় নাম, মালবান মিষ্টান্ন। আরেক নাম, জিলদুল ফারাস।

এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। যা এখান থেকে বাণিজ্যিকভাবে দামেস্কে রপ্তানি হয়। একজন দ্রুতগামী ব্যক্তি একদিনে বা'লাবাক্কু থেকে দামেস্ক যেতে পারবে। তবে কেউ যদি ধীর গতিতে যায়, তাহলে তাকে পথিমধ্যে 'যাবদানি' নামের একটি ছোট্ট নগরীতে রাত্রিযাপন করতে হবে।

যাবদানি হলো প্রচুর ফলমূল সমৃদ্ধ গ্রামীণ জনপদ। মুসাফিরগণ সাধারণত রাত্রিযাপনের উদ্দেশে এখানে অবতরণ করে থাকেন। পরদিন এখান থেকে

---

[১] মূল নাম বালবেক। আরবিতে উচ্চারণ হলো بعلبك, Ba'labakk, প্রতিবর্ণ: বা'লাবাক্কু। লেবাননের বেকা উপত্যকায় লিতানি নদীর পূর্বে অবস্থিত। বৈরুতের প্রায় ৬৭ কি.মি. (৪২ মাইল) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এটি বালাবেক-হারমেল গভর্নরেটের রাজধানী। গ্রিক ও রোমান শাসনামলে বালবেক হেলিওপোলিস নামেও পরিচিত ছিল। (প্রাচীন গ্রিক: Ἡλιούπολις, অনুবাদ: সূর্য শহর)। ১৯৯৮ সালে বালবেকের জনসংখ্যা ছিল ৮২,৬০৮ জন। বেশিরভাগই শিয়া মুসলিম, তারপরে সুন্নি মুসলিম এবং খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী।

বালবেক মন্দির কমপ্লেক্সের বাড়িতে দুটি বৃহত্তম এবং মহান রোমান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে: বাখুসের গির্জা এবং জুপিটারের গির্জা। যা ১৯৮৪ সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।–অনুবাদক

দামেস্কের উদ্দেশে রওনা হয়ে থাকেন। বা'লাবাক্কুর আরো কিছু পণ্যের সুনাম বিশ্বজুড়ে। যেমন, এখানে এক ধরনের বিশেষ কাপড় তৈরি হয়। যা ইহরাম ইত্যকার কাজে পরিধান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সেখানকার তৈরি কাঠের বরতন ও চামচের সবখানেই বিশেষ কদর রয়েছে। যার সঙ্গে তুলনীয় পণ্য বিশ্বের কোথাও নেই। এখানকার লোকেরা পেয়ালাকে 'দাসুত' বলে থাকে। আমি এখানকার অনেক কারিগরকে দেখেছি যে, তারা এমনভাবে দশ পিস পেয়ালার একটি সেট তৈরি করে যে, একটার ভেতরে বাকিগুলো অনায়াসে ঢুকে যায়। যে কেউ দেখলে মনে করবে, সেখানে একটি পেয়ালাই রয়েছে। চামচ তৈরির সময়ও তারা অনুরূপ কারিগরি নৈপুণ্য প্রদর্শন করে থাকে। এজন্যে তারা চামড়ার তৈরি একটি গিলাফ তৈরি করে। সেই গিলাফের মাঝে একটি চামচের ভেতরে অন্য চামচগুলো রেখে দিলে অল্প জায়গাতেই সবগুলো এঁটে যায়। যার ফলে একজন ব্যক্তি অনায়াসে নিজ কোমরের বেল্টের মাঝে সেই চামড়ার থলে বহন করতে পারবে।

যখন কোথাও খাবারের জন্যে দস্তরখানা পাতা হয়, তখন সে কোমরের বেল্ট থেকে সেই চামড়ার থলে বের করে চামচগুলো বের করে দেয়। অথচ তাকে দেখলে যে কেউ মনে করবে যে, সে একটি মাত্র চামচ নিয়ে এসেছে। যখন সে একটির ভেতর থেকে বাকি নয়টি বের করে তখন সবাই বিস্মিত হয়ে যায়।

আমি যখন বা'লাবাক্কু পৌঁছি তখন ছিল পড়ন্ত সূর্যের অস্তমিত হবার সময়। চারদিকে ক্রমশ সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। যেহেতু দামেস্কে পৌঁছানোর আগ্রহ আমাকে প্রতিমুহূর্তে তাড়া দিয়ে যাচ্ছিল, এজন্যে পরদিন প্রত্যুষেই দামেস্কের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি।

প্রাচ্যের স্বর্গ দামেস্ক নগরীতে

৭২৬ হিজরির রমযান মাসের ৯ তারিখে (মুতাবেক ১৩২৬ ঈসাব্দে) আমি দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করি। এখানে 'শারাবাশিয়্যা' নামে মালেকী মাযহাবের একটি বিখ্যাত মাদরাসা রয়েছে। সেই মাদরাসার অতিথিশালায় আমি অবতরণ করি।

আমি যদি বলি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, চাকচিক্য, ভুবনমোহিনী মুগ্ধতার বিচারে দামেস্ক পৃথিবীর অন্য সকল নগরীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহলে তা তিল পরিমাণ বাহুল্য হবে না। এ নগরীর সৌন্দর্যের বয়ানে আমি যদি দীর্ঘ আলাপও করি, তবুও সেটা বাস্তবতার বিচারে যথাযোগ্য হবে না।

আমার অগ্রজ বিশ্বপরিভ্রমক ইবনে জুবাইর আন্দালুসি রহ. এই দামেস্ক নগরীর বিবরণ তুলে ধরে লিখেছেন, 'দামেস্ককে বলা হয় প্রাচ্যের স্বর্গ। এখান থেকেই উদিত হয়েছে প্রাচ্যের সৌন্দর্যের আলোকিত সূর্য। যতগুলো মুসলিম অধ্যুষিত নগরীতে আমরা আতিথেয়তা গ্রহণ করেছি, দামেস্ক তন্মধ্যে সর্বশেষ। পৃথিবীর যতগুলো নগরীতে গিয়েছি, সেগুলোর মাঝে সৌন্দর্যের বিচারে এই দামেস্ক হলো নববধূ। আপনার কাছে মনে হবে, নববধূর মতো এ নগরীটিও বাহারি ফুল, মূল্যবান গয়না আর বিলাসী পোশাক পরে সেজে আছে। এখানকার অভিজাত নাগরিকগণ নগরীটির সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছেন, বহুলাংশে। তাদের উন্নত রুচিবোধের প্রকাশ ঘটেছে এখানকার স্থাপত্যে।

তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এ নগরী হলো ঈসা আ. এবং তাঁর মা মারইয়ামের আবাসস্থল। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তার ফযিলত বহুলাংশে বেড়ে গেছে। এখানে শস্যশ্যামল ঝরনাবিশিষ্ট এক পাহাড়ের বুকে তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন। যেখানে ছিল নিবিড় ছায়া আর সুমিষ্ট পানির সম্ভার। যেখান থেকে বিভিন্ন দিকে বয়ে গেছে নির্ঝরের ধারা। সেখানে আরো ছিল হৃদয়কে প্রশান্ত করে দেওয়া আকর্ষণীয় বাগান। যেন তা নববধূর সাজে সজ্জিত হয়ে দর্শকদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে তাকে নিবিড়ভাবে অবলোকন

করতে। তাদের ডেকে ডেকে বলছে, 'এসো, দেখে যাও। সৌন্দর্য এখানে নিজ পেখম মেলে দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম নিতে বসেছে।'

কখনো যদি প্রাচ্যে পানির হাহাকার দেখা দেয়, প্রচণ্ড পিপাসায় সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তখন এই দামেস্ক ডেকে বলবে, 'আমার বুকে এসো। এখানে পদাঘাত করো। পেয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত জলধারার সন্ধান। যার মাধ্যমে একদিকে নিজেকে পবিত্র করে নিতে পারবে। অন্যদিকে করতে পারবে আকণ্ঠ পান।'

ঘন ঘন বাগান ও উদ্যান শহরটিকে ঘিরে রেখেছে। যেভাবে জ্যোতিশ্চক্র চাঁদকে আর খোলস ফলকে ঘিরে রাখে। শহরের পূর্বদিকে যতদূর চোখ যায়, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ-শ্যামল নিম্নাঞ্চল (গাওতা)। দামেস্কের চতুর্দিকে আমি যেখানেই তাকিয়েছি, দৃষ্টির শেষসীমা অবধি এমন অসংখ্য নয়নাভিরাম স্থান দেখেছি। দামেস্কের মূল্যায়ন করে জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, 'পৃথিবীতে যদি কোনো স্বর্গ থাকে, তবে নিঃসন্দেহে সেটি দামেস্ক। আর যদি আকাশে কোনো স্বর্গ থাকে, তবে সেটি দামেস্ক থেকে সোজা উর্ধ্ব বরাবর আকাশে।'[১]

ইবনে জুযাই বলেন, আমাদের শায়খ, বিশ্ববিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও পর্যটক আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন জাবির বিন হাসসান কয়সি ওয়াদি রহ. ইবনে জুবাইরের সেই বিবরণ নকল করে মন্তব্য করেন যে, 'ইবনে জুবাইর যেই আবেগমথিত বিবরণ দিয়ে দামেস্কের বিবরণ তুলে ধরেছেন, তা পড়লে যে কারো মনে দামেস্ক দেখার শখ উথলে উঠবে। আদতেই তিনি সত্যিকারের চিত্র তুলে ধরেছেন। আর যদি কেউ একবার দামেস্কে অবস্থানের সুযোগ পায়, তাহলে সে তার কথার সততা নিজেই দেখতে পাবে। একব্যক্তি দামেস্ক পরিদর্শন করে এসে স্বীকার করেছেন,

ألقيتها كما تصف الألسن، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.

> 'মানুষ দামেস্কের যেই বিবরণ দিয়ে থাকে, আমি তেমনই পেয়েছি। দামেস্কের অলিগলিতে এত প্রচুর বিনোদনের সমাহার রয়েছে যে, আনন্দে আপনার মন ধিন ধিন নেচে উঠবে। আপনার চোখ বিমোহিত হবে।'

---

[১] ইবনে জুবাইরের বিশ্বভ্রমণ। পৃষ্ঠা : ২৩৪-২৩৫

দামেস্কের ইবনে উমাইয়া জামে মসজিদ

বর্তমানে পৃথিবীর বুকে যতগুলো মসজিদ রয়েছে, সেগুলোর মাঝে জনসমাবেশের বিচারে এটিই সবচেয়ে বড় মসজিদ। এই মসজিদের স্থাপত্য সৌন্দর্য বিশ্বসেরা। অতুলনীয় কারুকার্য ও নির্মাণশৈলী সবাইকে মুগ্ধ করবে। এ মানের বা এ ধরনের আরেকটি মসজিদ কেউ দেখাতে পারবে না। আমিরুল মুমিনিন ওয়ালিদ বিন আবদিল মালিক বিন মারওয়ান নিজেই এই মসজিদ নির্মাণের দায়িত্বভার তুলে নিয়েছিলেন। নির্মাণকাজের শুরুর আগে তিনি তখনকার কনস্ট্যান্টিনোপলে অবস্থানরত রোম সম্রাটকে চিঠিতে আদেশ করেন যে, 'আপনার শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ও দক্ষ কারিগরদেরকে আমার কাছে প্রেরণ করুন।' তখন তিনি তার কাছে বারো হাজার নির্বাচিত দক্ষ কারিগর প্রেরণ করেন। মসজিদটি বর্তমানে যে স্থানে অবস্থিত, আগে সেখানে খ্রিস্টানদের একটি গির্জা ছিল। মুসলিমদের হাতে দামেস্ক বিজিত হওয়ার সময় একটি বিরল ঘটনা ঘটেছিল।

দামেস্কের একদিক থেকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তরবারির সাহায্যে বিজয় করে করে ঢুকছিলেন। এমনকি তিনি সেই গির্জার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যান। দামেস্কের অন্য প্রান্ত অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. সন্ধির মাধ্যমে জয় করে প্রবেশ করেন। তিনিও একই সময়ে গির্জার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছেন। যার ফলে গির্জার যতটুকু অংশ যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়, সেখানে মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণ করেন। বাকি অর্ধেক যেহেতু সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়, এজন্যে যেখানে পূর্বের মতো গির্জা রয়ে যায়।

পরবর্তীকালে যখন ওয়ালিদ শাসক হন তখন তিনি মসজিদের চৌহদ্দি সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেন। এজন্যে রয়ে যাওয়া অর্ধেকাংশ মসজিদের ভেতরে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রোমান সম্রাটকে চিঠি লিখে জানান যে, 'আপনি সেই অর্ধেকাংশ আমার কাছে বিক্রি করুন। আপনি যেই মূল্য হাকাবেন, আমি দিয়ে দেব।' রোমান সম্রাট ওয়ালিদের সেই ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করে। যখন ওয়ালিদ দেখলেন যে, সোজা আঙুলে ঘি উঠছে না তখন তিনি বলপ্রয়োগ করে অধিগ্রহণ করেন। ওদিকে খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাস ছিল, যে ব্যক্তি এই গির্জা ধ্বংস করবে উন্মাদ হয়ে যাবে। লোকেরা বিষয়টি ওয়ালিদের কানে দিয়ে বলল, কেউ তা ভাঙার সাহস করছে না। উত্তরে

ওয়ালিদ কুঠার হাতে নিয়ে বলল, 'আমিই সর্বপ্রথম আল্লাহর রাস্তায় উন্মাদ হতে চাই।' এ কথা বলে গির্জা ভাঙা শুরু করলেন। তাঁর দেখাদেখি অন্য মুসলিমরাও কুড়াল চালাতে শুরু করলেন। এভাবে তারা শত বছরের কুসংস্কার ভুল প্রমাণিত করলেন। মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হলে ওয়ালিদ স্বর্ণের তরল জল দিয়ে পুরো মসজিদ প্রলেপ করেন। মসজিদের অবকাঠামো সাজাতে ওয়ালিদ বিন্দু পরিমাণ কার্পণ্য করেননি।

পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত মসজিদের দৈর্ঘ্য দুশো কদম। যা প্রায় তিনশো গজ। আর কেবলার দিক থেকে মসজিদের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রস্থ হলো একশ পঁয়ত্রিশ কদম। যা প্রায় দুশো গজ। মসজিদের বিভিন্ন স্থানে রঙিন কাঁচে আবৃত্ত চুয়াত্তরটি রোদজানালা রয়েছে। এখানে পূর্ব-পশ্চিম করে পাতা তিনটি দীর্ঘ কার্পেট রয়েছে। প্রতিটি কার্পেটের প্রস্থ আঠারো কদম। চুয়ান্নটি স্তম্ভের ওপর মসজিদ নির্মিত। স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে মর্মর পাথরের অনিন্দ্যসুন্দর নকশা। যার মাঝে মেহরাব ইত্যাদির অবয়ব ফুটে উঠেছে।

ইঞ্জিনিয়ারগণ মসজিদের মূল ভবন এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যে, কেউ যদি পুরো ভবনের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহলে মনে হবে, এ ভবনটি অনেকটা রাতের আকাশের উজ্জ্বলতম শ্রাবণ নক্ষত্রের মতো। এই শ্রাবণ নক্ষত্রকে আরবিতে বলে 'আন নাসরুত তায়ির'। আর গম্বুজটিকে মনে হবে সেই নক্ষত্রের মস্তক। এই গম্বুজটিও স্থাপত্যশিল্পের বিচারে পৃথিবীর বিস্ময়কর বিরল স্থাপনা। দামেস্কের সবচেয়ে উঁচু স্থাপনা। মজার বিষয় হলো, আপনি যে প্রান্ত থেকেই তাকান না কেন, আপনার কাছে মনে হবে, একটি শ্রাবণ নক্ষত্র ভেসে বেড়াচ্ছে।

মসজিদের চত্বরে তিনটি পাথুরে কার্পেট রয়েছে, যা পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘুরছে। প্রতিটি কার্পেটের প্রস্থ দশ কদম। পুরো চত্বরের আয়তন হলো, একশ গজ। চত্বরের বিভিন্ন স্থানে দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য দেখা যায়। সন্ধ্যার পর স্থানীয় নাগরিকগণ এই চত্বরে জমায়েত হয়ে থাকে। সাধারণ জনতার পাশাপাশে প্রচুর কারী ও মুহাদ্দিস এখানে জড়ো হন। ইশার নামায পর্যন্ত এখানে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা চলতে থাকে। এখানকার রীতি হলো, কখনো যদি কোনো সিনিয়র জ্ঞানী এখানে আগমন করেন, তাহলে অপেক্ষাকৃত কমবয়সী জ্ঞানীরা তার দিকে ছুটে যান এবং সম্মান জানিয়ে মাথায় চুমু খান।

আয়েশা গম্বুজ ও যাইনুল আবিদিন গম্বুজ

এই চত্বরে মোট তিনটি গম্বুজ রয়েছে। পশ্চিম দিকের গম্বুজটি আকৃতিতে সবচেয়ে বড়। যা আয়েশা গম্বুজ নামে পরিচিত। মর্মর পাথরের আটটি স্তম্ভের ওপর নির্মিত। প্রতিটি স্তম্ভের মাঝে রং-বেরংয়ের মূল্যবান মুক্তা খচিত রয়েছে। গম্বুজের ছাদে কাঁচ বসানো রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে যে, এই মসজিদের অর্থভান্ডার সেই গম্বুজের মাঝে রাখা থাকে। কিছু লোক আমাকে এ তথ্যও দিয়েছেন যে, মসজিদের নিয়ন্ত্রণে যতগুলো স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে, সেগুলোর বাৎসরিক আয় পঁচিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

চত্বরের পূর্বপ্রান্তে আরেকটি গম্বুজ রয়েছে, যা পশ্চিম প্রান্তের আয়েশা গম্বুজ থেকে খানিকটা ছোট। তবে গঠন ও সৌন্দর্যে প্রায় অনুরূপ। এটিও মর্মর পাথর দিয়ে নির্মিত আটটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যাইনুল আবিদিন গম্বুজ নামে লোকমুখে পরিচিত।

তৃতীয় গম্বুজটি চত্বরের ঠিক মধ্যখানে অবস্থিত। যা পূর্বের দুটি গম্বুজ থেকে বেশ ছোট। শক্ত মর্মর পাথরের তৈরি। তবে এটি মর্মরের তৈরি চারটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই গম্বুজের নিচে একটি লোহার কুঠুরি রয়েছে। তার মাঝে পিতলের একটি নল বসানো রয়েছে। সেখান থেকে তীব্র স্রোতে একটি ফোয়ারা প্রবাহিত হয়ে থাকে। ফোয়ারা থেকে নির্গত স্বচ্ছ জলধারা বেশ জোরে উপরের দিকে বিচ্ছুরিত হয়। উপর থেকে যখন জলধারা নিচের দিকে নামতে শুরু করে, তখন এটাকে চাঁদের মতো আলোর বৃত্ত মনে হয়। মানুষ এই ফোয়ারার নাম দিয়েছে 'পানির পিঞ্জিরা'। তারা ফোয়ারার নলে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে ভালোবাসে। এই চত্বরের পূর্বদিকে একটি দরজা রয়েছে।

মাশহাদে আলী বিন আবি তালিব

কেউ যদি সেই দরজা দিয়ে বের হয় তাহলে আরেকটি মসজিদের দেখা পাবে। সে মসজিদের স্থাপনাও ভারি সুন্দর। মানুষ সেই মসজিদের নাম দিয়েছে, মাশহাদে আলী বিন আবি তালিব। এর ঠিক বিপরীত দিকে আরেকটি দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা রয়েছে। যেখানে পশ্চিমমুখী ও মধ্যবর্তী গালিচা মিলিত হয়েছে, সেই স্থানটির ব্যাপারে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, হযরত আয়েশা

রা. এখানে বসে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। মসজিদের কেবলার দিকে একটি খাস কামরা রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী রহ. সেখানে ইমামতি করতে।

সাইয়িদুনা উসমান রা.-এর মুসহাফ

সেই দরজার পূব কোণে, অর্থাৎ মেহরাবের বিপরীত প্রান্তে একটি বিশাল কামরা রয়েছে। সেই কামরার মাঝে কুরআন কারিমের একটি ঐতিহাসিক অনুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে, যা সাইয়িদুনা উসমান রা. শামঅঞ্চলের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন।

প্রতি শুক্রবার জুমার নামাযের পর সেই কামরার ফটক খুলে দেওয়া হয়। তখন সেই ঐতিহাসিক মুসহাফ নিজ চোখে দেখার জন্যে জনতার প্রচণ্ড ভিড় লেগে যায়। সবাই মুসহাফে চুমু খায়। মানুষ ঋণগ্রহীতা ও বিবাদীর নিয়ে এসে এখানে কসম গ্রহণ করে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর স্মৃতি বিজড়িত খাস কামরার বাম দিকে একটি মেহরাব রয়েছে, যা 'সাহাবায়ে কেরামের মেহরাব' নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকদের দাবি হলো, এটাই ইসলামে যুগে নির্মিত প্রথম মেহরাব। মালেকী মাযহাবের আলেমগণ এখানে ইমামতি করে থাকেন।

এই দরজার ডান দিকে হানাফিদের মেহরাব রয়েছে। সেখানে হানাফি ইমামগণ ইমামতি করে থাকেন।

তার কাছে আরেকটি মেহরাব রয়েছে, যা হাম্বলি মাযহাবের অনুসারীরা ব্যবহার করে থাকে। সেখানে হাম্বলি মাযহাবের ইমাম নামায পরিচালনা করে থাকেন।

মসজিদের দৃষ্টিনন্দন মিনার

এই ঐতিহাসিক উমাইয়া মসজিদের তিনটি মিনার রয়েছে। প্রথম মিনারটি পূর্বদিকে অবস্থিত। যা রোমান রীতিতে নির্মিত। এই মিনারের দরজা মসজিদের ভেতরে অবস্থিত। এর নিচে পবিত্র হওয়ার জায়গা অবস্থিত। বিস্তৃত জায়গা জুড়ে অযুখানা রয়েছে। মসজিদের দায়িত্বশীলগণ ও ইতিকাফকারীগণ এখানে এসে অযু-গোসল সম্পন্ন করে থাকেন। দ্বিতীয় মিনারটি পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। এটিও রোমান স্থাপনাশিল্পের অনুকরণে

নির্মিত। তৃতীয় মিনারটি উত্তর দিকে অবস্থিত, যা মুসলিম স্থাপনারীতি অনুসারে নির্মিত। সত্তরজন মুয়াযযিন এই মসজিদে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

ঐতিহাসিক উমাইয়া মসজিদের পূর্ব দিকে একটি ছোটখাটো প্রাসাদ রয়েছে, যার ভেতরে পানির পুকুর রয়েছে। সুদানের যায়ালিয়া গোষ্ঠীর অনুসারীরা সেখানে নিজ ধর্ম পালন করে থাকে।

সাইয়িদুনা যাকারিয়া আ.-এর মাজার

মসজিদের মধ্যখানে হযরত যাকারিয়া আ.-এর কবর অবস্থিত। যা দুটি স্তম্ভের মাঝখানে একটি বাঁকা সিন্দুকের মতো। কালো রেশমের গেলাফ দিয়ে পুরো কবর আবৃত। গেলাফের ওপর সাদা রেশম দিয়ে এই আয়াত চিত্রিত রয়েছে,

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ۖ اسْمُهُ يَحْيَىٰ.

'হে যাকারিয়া, আমি আপনাকে ইয়াহইয়া নামের একটি ছেলেসন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি।'

দামেস্ক মসজিদের বৈশিষ্ট্য, বরকত ও ফযিলত

এই মসজিদের অনেকগুলো ফযিলত রয়েছে। আমি হযরত সুফিয়ান সাওরি রহ. এর সূত্রে দামেস্ক মসজিদের ফযিলত সম্পর্কে এই বর্ণনা পড়েছি যে, 'দামেস্ক মসজিদে এক ওয়াক্তের নামায আদায় করলে সত্তর নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরেকটি বর্ণনা শুনেছি যে, 'পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার চল্লিশ বছর পরেও এই মসজিদে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইবাদত চলবে।'

কথিত রয়েছে যে, এই মসজিদের কেবলার দিকে যেই দেয়াল রয়েছে, তা আল্লাহর মহান নবী হযরত হুদ আ. নির্মাণ করেছিলেন। এখানেই তার কবর অবস্থিত। এর বিপরীতে আমি যখন ইয়েমেন দেশে ভ্রমণ করি, তখন সেখানকার 'আহকাফ' নামক অঞ্চলে একটি কবর দেখেছিলাম, যার ওপর পরিষ্কার লেখা রয়েছে যে, এটি হযরত হুদ ইবনে আবির আ.-এর কবর।'

দামেস্ক জামে মসজিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে একটি মুহূর্তও কুরআন তেলাওয়াত ও নামায আদায় বন্ধ থাকে না। সর্বক্ষণ ইবাদতগুজার বান্দায় টইটম্বুর থাকে। তার বিবরণ আমি কিছুক্ষণ পরে দিচ্ছি।

এখানকার রীতি হলো, প্রতিদিন ফজর নামাযের পর মুসল্লিগণ একসঙ্গে বসেন। এরপর কুরআন কারিম থেকে অন্তত এক মনযিল তেলাওয়াত করেন। আসর নামাযের পর তারা অনুরূপ বসে পড়েন। এ সময় তারা 'কাউসারিয়া তেলাওয়াত' শোনেন। কাউসারিয়া হলো, সূরা কাউসার থেকে কুরআন কারিমের শেষ পর্যন্ত। যারা সেই তেলাওয়াতের মজলিসে অংশগ্রহণ করেন, তাদেরকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ভাতা দেওয়া হয়। অন্তত ছয়শ লোক এই তেলাওয়াত কার্যক্রমের জন্যে ভাতা পেয়ে থাকেন। পুরো কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্যে গোপন পুলিশ রয়েছে। কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে তার নাম রেজিস্টারে টুকে রাখা হয়। ভাতা বণ্টনের সময় সেদিনের ভাতা কেটে রাখা হয়।

এই মসজিদে আরেকটি জামাত নিয়মিত অবস্থান করে থাকে। তাদেরকে 'মুজাভির' বলা হয়। তারা কখনই মসজিদ থেকে বের হন না। সবসময় নামায, তেলাওয়াত ও যিকির-আযকার পড়তে থাকেন। এই কার্যক্রম থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও বিচ্ছিন্ন হন না। পূর্ব প্রান্তের গির্জার ওপর নির্মিত মিনারের নিচে যেই 'ইস্তিঞ্জা ও গোসলখানা' রয়েছে, তারা সেখানেই নিজেদের পবিত্রতা অর্জন করে থাকেন। শহরবাসীগণ তাদেরকে সবসময় খাবার ও পোশাক-আশাক দিয়ে সহযোগিতা করে থাকে। একটি বারও চাইতে হয় না।

মসজিদের ফটক ও খালিদ রা.-এর পতাকা

এই মসজিদের চারটি দরজা রয়েছে। পশ্চিমপ্রান্তে কেবলার দিকে যেই দরজা অবস্থিত, তার নাম 'যিয়াদাহ ফটক'। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর ঐতিহাসিক পতাকাটি যেই বর্মের মাথায় শোভা পেত, সেই বর্মের এক টুকরো অংশ এই দরজার ওপর স্থাপিত রয়েছে। এই দরজার সামনে বিশাল বড় চত্বর রয়েছে। নানা পেশার লোকজন এখানে দোকান বসিয়েছে। এই দরজা দিয়ে 'দারুল খলিল' মহল্লায় যাওয়া যায়। এই দরজা দিয়ে বেরুলে হাতের বাম দিকে পিতলের কারিগরদের বাজার অবস্থিত। অনেক

বড় বাজার। মসজিদের পশ্চিম প্রান্তের দেয়াল অবধি সারি সারি দোকানপাট। দামেস্কের বুকে যতগুলো বাজার রয়েছে, তন্মধ্যে এটিই সবচেয়ে সুন্দর বাজার। পূর্বে এ জায়গাটি ছিল হযরত মুআবিয়া বিন আবি সুফিয়ান রা. ও তার পরিবারের সদস্যদের বাড়ি। তখন তার নাম ছিল, 'খাদরা'। পরবর্তীকালে বনু আব্বাস রাজবংশ ক্ষমতায় এলে তারা সমুদয় বাড়িঘর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় এবং স্থানটিকে বাজারে পরিণত করে।

দ্বিতীয় দরজা

দ্বিতীয়টি হলো পূর্বপ্রান্তের দরজা। সবগুলো দরজার মাঝে এটিই সবচেয়ে বড়। নাম, 'জিরুন ফটক'। এখানেও অনেক বড় দহলিজ রয়েছে। এই দহলিজ ধরে এগিয়ে গেলে একটি বিশাল চত্বরের দেখা মিলবে। সেই চত্বরের সামনে পাঁচটি দরজা ও ছয়টি বড় বড় স্তম্ভ রয়েছে। দরজার বাম দিকে একটি সুবিশাল গোরস্থান রয়েছে। এখানে হযরত হুসাইন রা.-এর মুবারক মস্তক দাফন করা হয়েছিল। যার বিপরীত দিকে একটি ছোট্ট মসজিদ রয়েছে। নাম, উমর বিন আবদুল আজিজ মসজিদ।

এখানে একটি প্রবাহিত ঝরনা রয়েছে। পাথর দিয়ে নির্মিত মেঝে বিশিষ্ট বাড়ির ঠিক সামনে একটি সুবিন্যস্ত সিঁড়ি রয়েছে, যা একটি দহলিজ বরাবর নেমে গেছে। দূর থেকে দহলিজটিকে মনে হবে সুবিশাল পরিখা। ওই দহলিজের উপর দিকে উঁচুতে একটি বিশাল দরজা রয়েছে, যার নিচে খেজুর গাছের মতো লম্বাটে স্তম্ভ রয়েছে, অনেকগুলো। এই দহলিজের দুদিকেও অনেকগুলো স্তম্ভ রয়েছে। যেগুলোকে কেন্দ্র করে গোলাকার রাস্তা রয়েছে। রাস্তার পাশে স্বর্ণকার, কিতাববিক্রেতা, কাঁচবিক্রেতা ও অন্যান্য পেশার অনেকগুলো দোকান।

প্রথম ফটকের সঙ্গে যেই বিস্তৃত চত্বর রয়েছে, সেখানে অনেকগুলো বৈঠকখানা রয়েছে। পেশাদার সাক্ষীরা সেসব বৈঠকখানায় উপস্থিত থাকে। প্রতিটি মাযহাবের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষীর সুবন্দোবস্ত রয়েছে। এখানে সবসময় পাঁচ-ছয়জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী ও প্রধান বিচারপতির তরফ থেকে নিযুক্ত বিয়ে পড়ানোর কাজি উপস্থিত থাকে। শহরের বিভিন্ন স্থানে এমন পেশাদার সাক্ষী পাওয়া যায়।

এই দোকানপাটগুলোর কাছে আরেকটি বাজার রয়েছে, যেখানে মূলত কাগজ বিক্রেতারা বসে। তাদের দোকানগুলোতে সুলভে কাগজ, কলম ও কালি-দোয়াত পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত দহলিজের মাঝখানে মর্মর পাথরের একটি হাউজ রয়েছে। তার ওপর মর্মরের স্রেফ স্তম্ভের ওপর স্থাপিত একটি গম্বুজ রয়েছে, যার তলদেশে কোনো ছাদ নেই। হাউজের ঠিক মধ্যখানে একটি পানির নল রয়েছে, যার মুখ থেকে সজোরে পানি উথলে বের হয়। একজন মানুষের সমান উচ্চতায় পানির উচ্ছল ধারা শূন্যে ওঠে। এই দৃশ্য দেখার জন্যে দূরদূরান্ত থেকে কৌতূহলী পর্যটকরা আসে। সবাই একবাক্যে 'ফোয়ারা' নামে চেনে।

ঘড়িবিশিষ্ট ফটক

জিরুন ফটক দিয়ে বের হলে হাতের ডান পাশে আরেকটি ফটকের দেখা মিলবে, যা ঘড়িওয়ালা ফটক নামে পরিচিত। এই ফটকে এমন একটি কক্ষ রয়েছে, যার গায়ে ঘড়ির আকৃতিতে অনেকগুলো ছোট ছোট খিলান রয়েছে। সেগুলোর মাঝে অনেকগুলো জানালা রয়েছে। দিনে যতগুলো ঘণ্টা হয়, তার সমপরিমাণ জানালা সেখানে রয়েছে। প্রতিটি জানালার কপাটের ভেতরের দিকে সবুজ রং করা। আর বাইরের দিকে হলুদ রং করা। যখনই দিনের একটি করে ঘণ্টা অতিবাহিত হয় তখন ভেতরের সবুজ রং করা দিকটি বাইরে প্রদর্শন করা হয় আর বাইরের হলুদ রং করা দিকটি ভেতরের দিকে মুড়িয়ে দেওয়া হয়। কথিত রয়েছে যে, ভেতরে একজন ব্যক্তি নিযুক্ত রয়েছে। তার দায়িত্ব হলো, প্রতি ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পর নিজ হাতে এই পরিবর্তনটুকু করে দেবে।

দামেস্ক জামে মসজিদের তৃতীয় ফটক

মসজিদের পশ্চিম প্রান্তে তৃতীয় ফটক অবস্থিত। নাম, বাবুল বারিদ বা ডাক ফটক। এই ফটক দিয়ে বেরুতেই হাতের ডান দিকে শাফেয়ী মাদরাসা অবস্থিত। সামনে বিশাল দহলিজ। পাশ ঘেঁষে প্রদীপবাতি বিক্রেতা ও ফল বিক্রেতাদের সারি সারি দোকানপাট। দহলিজের উপর দিকে একটি বিশাল ফটক রয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। এই ফটকের পিলারগুলো যথেষ্ট উঁচু। যার ডান ও বাম দিকে দুটি পানি বিতরণকেন্দ্র রয়েছে।

চতুর্থ ফটক

এই ফটকের অনেকগুলো নাম রয়েছে। কেউ বলে, আল বাবুল জাওফি (মধ্যফটক)। কেউ বলে, বাবুন নিতফানিয়্যিন। এই ফটকের সামনেও অনেক বড় দহলিজ রয়েছে। এই ফটক দিয়ে বেরুতেই হাতের ডান দিকে একটি খানকাহ অবস্থিত। যা 'শামিয়ানিয়া' নামে প্রসিদ্ধ। এর মধ্যভাগে একটি জলাশয় রয়েছে। এখানে পবিত্র হবার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। সর্বক্ষণ স্বচ্ছ পানি প্রবাহিত হয়। কথিত রয়েছে যে, এখানে হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. এর বাড়ি ছিল। মসজিদের চার ফটকের প্রতিটিতেই অযুর সুবন্দোবস্ত রয়েছে। প্রতিটি অযুখানায় অন্তত একশটি করে ছোট ছোট কক্ষ রয়েছে, যেখানে সর্বক্ষণ পানি পাওয়া যায়।

দামেস্ক জামে মসজিদে কর্মরত ইমামগণ

এই ঐতিহাসিক জামে মসজিদে তেরোজন ইমাম কর্মরত রয়েছে। প্রধান ইমাম হন, শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম। আমি যখন প্রথমবার এই দামেস্ক জামে মসজিদ পরিদর্শনে আসি তখন এখানে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন প্রধান বিচারপতি জালালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল কাযবিনি। দেশের অন্যতম শীর্ষ ফকিহ। মসজিদের খতিবের দায়িত্ব পালন করছেন। 'দারুল খিতাবাহ' অঞ্চলে তার বাসভবন। ছোট প্রাসাদের পাশ ঘেঁষে যেই লৌহ নির্মিত ফটক রয়েছে, তা দিয়ে যাতায়াত করে থাকেন। ইতিহাসের একটা সময়ে হযরত মুআবিয়া রা. এই ফটক দিয়ে যাতায়াত করতেন।

জালালুদ্দিন কাযবিনি সাহেব পরবর্তীতে মিসরের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি দামেস্ক থাকাকালে এক লক্ষ দিরহাম ঋণী হয়ে পড়েছিলেন। আল মালিকুন নাসির তার হাতে মিসরের বিচারপতির দায়িত্বভার তুলে দেবার সময় ঋণের সমুদয় টাকা শোধ করে দেন।

ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের ইমামদের নামায পরিচালনার পদ্ধতি

এখানকার রীতি হলো, যখন শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম সালাম ফেরাবেন, তখন আলী কবরস্থানের ইমাম নামায শুরু করবেন। তিনি নামায সম্পন্ন করলে হুসাইন কবরস্থানের ইমাম নামায শুরু করবেন। তার নামায শেষ

হলে কালাসা কবরস্থানের ইমাম নামায শুরু করবেন। তার নামায শেষ হলে আবু বকর কবরস্থানের ইমাম নামায শুরু করবেন। তার নামায শেষ হলে উসমান কবরস্থানের ইমাম নামায শুরু করবেন। সবশেষে মালেকী মাযহাবের ইমাম নামায শুরু করবেন।

আমি যখন দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করি তখন মালেকী মাযহাবের ইমামের দায়িত্ব পালন করতেন আবু উমর ইবনুল ওয়ালিদ ইবনুল হাজ তাজেহি। যিনি মূলত কুর্ডোবা অঞ্চলের মানুষ। জন্ম হয়েছিল গ্রানাডায়। পরবর্তী জীবনে দামেস্কে থিতু হয়েছেন। তিনি ও তার আরেক ভাই পালাবদল করে এই ইমামতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

পদমর্যাদায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন হানাফি মাযহাবের ইমাম। আমার দামেস্কে আগমনের সময় ইমাদুদ্দিন হানাফি নামের একজন ফিকাহবিদ হানাফি মাযহাবের ইমাম ছিলেন। যিনি 'ইবনুর রুমি' নামে পরিচিত। দেশের শীর্ষস্থানীয় সুফি বুযুর্গ। অনেকগুলো খানকা পরিচালনা করতেন। খানুতিয়া খানকার প্রধান শায়খ। এর বাইরে তার নিজের ব্যক্তিগত আরো অনেকগুলো খানকা রয়েছে।

পদমর্যাদায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন হাম্বলি মাযহাবের ইমাম। আমার দামেস্ক আগমনের সময় এ দায়িত্বে ছিলেন শায়খ আবদুল্লাহ আল কাফিফ। দামেস্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারি।

উপরে আমরা যেই পাঁচজন ইমামের পরিচয় তুলে ধরেছি, তাদের বাইরে আরো কজন ইমাম নিযুক্ত রয়েছেন, যাদের দায়িত্ব জামাতে অনুপস্থিত মুসল্লিদের নামায পরিচালনা করা। যার ফলে দেখা যায়, দিবসের প্রথম প্রহর থেকে শুরু করে রাতের তিনভাগের প্রথমাংশ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে এখানে নামায চলতে থাকে। পাশাপাশি সমানতালে কুরআন কারিমের তেলাওয়াতও চলে। নিঃসন্দেহে এটি দামেস্ক জামে মসজিদের একক গৌরব।

মাদরাসা, শিক্ষকমণ্ডলী ও পাঠদান পদ্ধতি

দামেস্ক জামে মসজিদের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে অনেকগুলো শাস্ত্র ও জ্ঞানচর্চার জন্যে সম্মিলিতভাবে গোলাকার বৈঠক

(হালাকাহ) বসে। উঁচু চেয়ারে বসে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের কিতাব পাঠ করে শোনান। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় কারীগণ সুললিত কণ্ঠে কুরআন কারিমের তেলাওয়াত চর্চা করে থাকেন। স্রেফ কুরআনের পাঠ গ্রহণের জন্যে এখানে একসঙ্গে অনেকগুলো আসর বসে। উস্তাদগণ একেকটি পিলারে হেলান দিয়ে আসন গ্রহণ করেন। তাদের সামনে বসে শিশুরা কুরআন কারিমের পাঠ গ্রহণ করে। এখানকার বৈশিষ্ট্য হলো, কুরআন কারিমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তারা শ্লেটের ওপর লেখান না; বরং সরাসরি মৌখিকভাবে পড়ান। আর যেসব উস্তাদ হাতের লেখা শেখান, তারা সাধারণত বিভিন্ন কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে হাতের লেখা শিখিয়ে থাকেন। এর ফলে শিশুরা প্রথমে কুরআন কারিমের শিক্ষা অর্জন করে, এরপর মুনশির শরণাপন্ন হয়ে হস্তলিপি শেখে। এই নিয়ম অনুসরণের ফলে শিশুরা সুন্দর হস্তলিপি শিখতে পারে; কারণ, হস্তলিপির শিক্ষক এই বিদ্যা ব্যতিরেকে অন্য কোনো কিছু শেখান না।

দামেস্ক জামে মসজিদের বিশিষ্ট শিক্ষকমণ্ডলীর তালিকায় রয়েছেন, বিখ্যাত বুযুর্গ বুরহানুদ্দিন ইবনুল ফারকাহ শাফেয়ী ও নুরুদ্দিন আবুল ইউসর। যখন জালালুদ্দিন আল কাযবিনি মিসরের প্রধান বিচারপতির আসনে সমাসীন হন, তখন এই আবুল ইউসরকে দামেস্কের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সেই পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এখানকার আরেকজন শীর্ষ শিক্ষক হলেন শিহাবুদ্দিন বিন জুহাইল। যখন আবুল ইউসর বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তখন তিনি এই ভয়ে দামেস্ক থেকে পলায়ন করেছিলেন যে, এবার তাকে সেই পদে বসানো হতে পারে। সুলতান আল মালিকুন নাসির সেই সংবাদ জানতে পেরে মিসর অঞ্চলের প্রধান শায়খ, বিখ্যাত বুযুর্গ, দক্ষ বিতার্কিক আলাউদ্দিন কোনোবিকে সেই পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনিও অনেক বড় ফকিহ। এখানকার আরেকজন শীর্ষ শিক্ষক হলেন, বদরুদ্দিন আলী সাখাবি। মহান আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

এতদাঞ্চলের শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের প্রধান বিচারপতি জালালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল কাযবিনির কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আরেকজনের কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তিনি হলেন, মালেকী মাযহাবের বিচারপতি শায়খ শারফুদ্দিন। একদিকে তার চেহারা-সুরত ভারি সুন্দর, অন্যদিকে তার জ্ঞানগভীরতাও

অতুলনীয়। সুফি ভাবধারার শীর্ষ ব্যক্তিত্ব। তার সহকারী হিসেবে সঙ্গ দেন শামসুদ্দিন ইবনুল কাফাসি। সমসামিয়া মাদরাসায় তার বিচারালয় বসে।

অন্যদিকে হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের বিচারকার্য পরিচালনা করেন ইমাদুদ্দিন আল হাওরানি। তিনি কঠোর হস্তে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন, বলে সবাই তাকে ভীষণ সমীহ করে চলে। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহগুলো তিনি দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিয়ে থাকেন। তার সম্পর্কে এই জনশ্রুতি রয়েছে যে, কেউ যদি শোনে যে, তাকে এই হানাফি বিচারপতির কাঠগড়ায় তোলা হবে তাহলে আগে-ভাগে আত্মসমর্পণ করে হকদারকে যথাযথ পাওনা বুঝিয়ে দেয়।

হাম্বলি মাযহাবের অনুসারীদের বিচারকার্য পরিচালনা করেন সজ্জন ইমাম ইয্যুদ্দিন বিন মুসলিম। তাঁকে আদর্শ বিচারক হিসেবে সবাই সম্মান করেন। সাধারণত তিনি নিজ গাধার পিঠে চড়ে আদালতকক্ষ থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে থাকেন। হিজায সফরে মদিনা মুনাওয়ারায় তার ইন্তেকাল হয়েছিল।

এই দামেস্কের হাম্বলি ঘরানার সর্বশ্রেষ্ঠ ফকিহ হলেন তাকিউদ্দিন বিন তাইমিয়া। শাম অঞ্চলের শীর্ষ আলেম। ইলমের নানা শাস্ত্রে তার গভীর ব্যুৎপত্তি রয়েছে। সমস্যা হলো, তার মস্তিষ্কের মাঝে খানিকটা ত্রুটি রয়েছে। এরপরও দামেস্কবাসী তাঁকে সীমাহীন শ্রদ্ধা ও সম্মান করে থাকেন। তাঁর অভ্যাস হলো, তিনি মিম্বারে বসে জনগণকে নসিহত করেন। একদিনের ঘটনা। যথারীতি তিনি মিম্বারে বসে আলোচনা করছেন; কিন্তু এদিন স্থানীয় আলেম ও ফকিহগণ তার কিছু বক্তব্যের তীব্র আপত্তি জানালেন এবং সুলতান আল মালিকুন নাসিরের কাছে তার বিবরণ জানিয়ে নালিশ ঠুকলেন।

সুলতান তখন তাকে মিসরে হাজির হওয়ার আদেশ দিলেন। দেশের গণ্যমান্য বিচারক ও ফকিহদেরকে সুলতানের দরবারে আহ্বান জানানো হলো। সবার আগে শরফুদ্দিন মালেকী সাহেব কথা শুরু করলেন। বললেন, এই ইবনে তাইমিয়া অমুক অমুক বক্তব্য দিয়েছে।' এ কথা বলে তিনি ধারাবাহিক সংখ্যায় সকল আপত্তিকর বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক দলিলসমূহ উপস্থাপন করলেন। এরপর তার সত্যায়িত লিখিত কপি প্রধান বিচারপতির সামনে তুলে ধরলেন। তখন প্রধান বিচারপতি ইবনে তাইমিয়াকে বললেন, 'এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া

কোনো উপাস্য নেই।' তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন। এবারও ইবনে তাইমিয়া অনুরূপ উত্তর দিলেন।

তখন সুলতান আল মালিকুন নাসির তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। যার ফলে তাকে অনেক বছর কারাগারে অতিবাহিত করতে হয়। সেই কারারুদ্ধ জীবনে তিনি কুরআন কারিমের ওপর ঐতিহাসিক তাফসির গ্রন্থ 'আল বাহরুল মুহিত' রচনা করেন। যা চল্লিশ খণ্ডে সমাপ্ত।

ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর কিছু বিতর্কিত ইজতিহাদ

কিছু দিন পর ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর মা সুলতানের দরবারে হাজির হন এবং সন্তানকে ছেড়ে দেবার আর্জি পেশ করেন। সুলতান সেই আবেদন মঞ্জুর করে মুক্ত করে দেন। কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি পুনরায় আগের মতো একটি ঘটনা ঘটান। ঘটনাক্রমে এবারও আমি দামেস্কে উপস্থিত ছিলাম। সেদিন ছিল শুক্রবার। আমি তার কাছে হাজির হলাম। তিনি তখন দামেস্কের জামে মসজিদের মিম্বারে বসে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি তার ভাষণের একপর্যায়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা দুনিয়াসংলগ্ন আসমানে অবতরণ করেন এভাবে, যেভাবে আমি এই মিম্বার থেকে নিচে অবতরণ করি।' এ কথা বলে তিনি এক সিঁড়ি নিচে নেমে সবাইকে প্রদর্শন করেন। ইবনুয যাহরা নামের একজন মালেকী ফকিহ সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গিয়ে এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান।

ওই সময় ইবনে তাইমিয়ার অনুগত লোকজন সেই ফকিহকে ধরে মারধর শুরু করে। কেউ ঘুষি মারে। কেউ পা থেকে জুতা খুলে প্রহার করতে থাকে। যার ফলে তার মাথা থেকে পাগড়ি পড়ে যায়। ভেতরের রেশমি টুপি বেরিয়ে এলে মানুষ বলে, তুমি নিজেই তো অবৈধ টুপি পড়েছো।

এ কথা বলে সবাই তাকে হাম্বলি মাযহাবের বিচারপতি ইয্যুদ্দিন বিন মুসলিমের বাড়িতে নিয়ে যায়। তিনি তাকে কারাবন্দি করার আদেশ দেন এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা করেন। এই সংবাদ যখন মালেকী ও শাফেঈ মাযহাবের ফকিহদের কাছে পৌঁছে, তখন তারা সেই শাস্তির তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং প্রধান গভর্নর সাইফুদ্দিন তুঙ্গুজের আদালতে মামলা দায়ের করেন। সাইফুদ্দিন তুঙ্গুজ ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও গ্রহণযোগ্য গভর্নর। তিনি ঘটনার আদ্যোপান্ত লিপিবদ্ধ করে সুলতান আল মালিকুন নাসিরের

কাছে প্রেরণ করেন। পাশাপাশি ইবনে তাইমিয়ার আপত্তিকর বক্তব্যগুলোর একটি তালিকা পাঠিয়ে দেন। তন্মধ্য হতে একটি হলো, কেউ যদি একসঙ্গে তিন তালাক দেয় তাহলে একটি মাত্র তালাক হবে। আরেকটি আপত্তিকর বক্তব্য হলো, কেউ যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারতের উদ্দেশে সফর করে তাহলে সে কসর নামায পড়তে পারবে না। এ রকম আরো অনেকগুলো প্রান্তিক বক্তব্য তিনি দিয়েছেন।

যার পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান আল মালিকুন নাসির তাকে একটি কেল্লায় বন্দি করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেই কেল্লাতেই অন্তরীণ ছিলেন।

দামেস্কের উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

দামেস্কের মাটিতে শাফেয়ী মাযহাবের অনেকগুলো বিদ্যাপীঠ রয়েছে। তন্মধ্য হতে সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানটি হলো, আল আদিলিয়্যাহ। এখানেই প্রধান বিচারপতির এজলাস বসে। এর বিপরীত প্রান্তে যাহিরিয়া মাদরাসার অবস্থান। সেখানে সুলতান আল মালিকুয যাহিরের কবর অবস্থিত। সহকারী বিচারপতির এজলাস সেখানে বসে। ফখরুদ্দিন কিবতি হলেন এখানকার অন্যতম সহকারী বিচারপতি। তার পিতা ছিলেন কিবত অঞ্চলের মুন্সী। পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আরেকজন সহকারী বিচারপতি হলেন জামালুদ্দিন বিন জামালাহ। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের বিচারপতি নির্বাচিত হবার কিছুদিন পর একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার শিকার হয়ে পদচ্যুত হন।

ঘটনাটি হলো, দামেস্কে জহিরুদ্দিন আজমি নামের একজন বুযুর্গ বাস করতেন। প্রধান গভর্নর সাইফুদ্দিন তুঙ্গুজ তাকে সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন এবং তার কাছ থেকে নানা বিদ্যা অর্জন করতেন। একদিন তিনি তার বাসায় আগমন করেন। ঘটনাক্রমে সেসময় চার মাযহাবের চার বিচারক আগমন করেন। কথাবার্তা চলছে। এ সময় জামালুদ্দিন বিন জামালাহ বেশ কটি ঘটনা শোনান। তখন জহিরুদ্দিন মন্তব্য করে বলেন, 'আপনি ঘটনাগুলো বানিয়ে বলছেন।' তার সেই মন্তব্য জামালুদ্দিন হজম করতে পারেননি। তিনি গভর্নরকে বললেন, 'আপনার উপস্থিতিতে তিনি আমাকে কীভাবে মিথ্যাবাদী বলেন?'

তখন গভর্নর বলেন, 'ঠিক আছে, আপনিই এর বিহিত করুন।' তিনি ভেবেছিলেন, দুজন আন্তরিকতার সঙ্গে বিষয়টি নিষ্পন্ন করবেন; কিন্তু

আদতে তা ঘটেনি। বিচারপতি সাহেব তাকে আদিলিয়া মাদরাসার এজলাসে ডেকে পাঠান এবং দুশো বেত্রাঘাত করেন। এরপর একটি গাধার উপর বসিয়ে গোটা দামেস্ক নগরীতে প্রদক্ষিণ করান। সঙ্গে একজন ঘোষক দেন। যতবার সেই ঘোষক ঘোষণাবাক্য বলা শেষ করত, সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিত। দামেস্কে এই রীতি প্রচলিত ছিল।

এ ঘটনা প্রধান গভর্নরের কাছে পৌঁছুলে তিনি সীমাহীন মর্মাহত হন। সকল বিচারক ও ফকিহদের ডেকে বৈঠকে বসেন। সবাই একমত হন যে, এ ঘটনায় বিচারপতি জামালুদ্দিন বাড়াবাড়ি করেছেন এবং নিজের মাযহাবের বাইরে গিয়ে রায় দিয়েছেন। কেননা শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে, অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো সাধারণ দণ্ড অনিবার্য হলে শাস্তির পরিমাণ 'হদ্দ' এর সমপরিমাণ হতে পারে না। মালেকী মাযহাবের বিচারক শরফুদ্দিন মন্তব্য করে বলেন, 'এই রায়ের কারণে আমি তাকে ফাসেক মনে করি।' পুরো ঘটনা সুলতানকে অবহিত করা হলে তিনি তাকে এই পদ থেকে অপসারণ করেন।

দামেস্কের মাটিতে হানাফি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

দামেস্কের মাটিতে হানাফি মাযহাবের অনেকগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। সবচেয়ে বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করেছিলেন সুলতান নুরুদ্দিন রহ.। মালেকী মাযহাবের অনুসারীদেরও অনেকগুলো মাদরাসা রয়েছে। যার একটিতে এই মাযহাবের প্রধান বিচারপতির এজলাস বসে। তাদের বিখ্যাত মাদরাসাগুলোর মধ্যে রয়েছে, সামসামিয়া, নূরিয়া ও শারাবিসিয়্যা। নুরুদ্দিন জেনকি রহ. নূরিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। শিহাবুদ্দিন শারাবিসি নামের জনৈক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠা করেছেন শারাবিসি মাদরাসা। তদ্রূপ হাম্বলি মাযহাবের অনুসারীদেরও অনেকগুলো মাদরাসা রয়েছে। তন্মধ্য হতে সবচেয়ে বড় হলো নাজমিয়া মাদরাসা।

দামেস্কের রাজফটক

দামেস্ক নগরীর মোট আটটি ফটক। ১. বাবুল ফারাদিস ২. বাবুল জাবিয়া ৩. আল বাবুস সগির। শেষোক্ত দুটি দরজার মাঝখানে একটি গোরস্থান রয়েছে। যেখানে অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম, শহীদগণ ও পরবর্তী সময়ের

নামা মানুষ সমাহিত। এখানে উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে হাবিবা রা. ও তার ভাই আমিরুল মুমিনিন মুআবিয়া রা. শায়িত রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় মুয়াযযিন হযরত বিলাল রা.-এর কবরও এখানে অবস্থিত। বিখ্যাত তাবেঈ উয়াইস করনি ও কাব আহবার রা.-ও এখানে সমাহিত।

কুরতুবি রহ. সহিহ মুসলিম গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। নাম, আল মু'লিম। আমি সেই গ্রন্থে পড়েছি যে, একবার সাহাবায়ে কেরামের একটি কাফেলা মদিনা থেকে শামদেশের উদ্দেশে রওনা হন। সেই কাফেলায় হযরত উয়াইস কারনি রহ.-ও ছিলেন। পথিমধ্যে তারা এমন একটি প্রান্তরে পৌঁছেন, যেখানে কোথাও কোনো বাড়িঘর নেই। চতুর্দিকে কোথাও পানি নেই। সেই প্রান্তরে হযরত উয়াইস কারনি রহ. ইন্তেকাল করেন। সবার কপালে উদ্বেগের ভাঁজ পড়ল যে, কীভাবে এই জলহীন রুক্ষ প্রান্তরে দাফন-কাফনের কাজ সম্পন্ন করেন। হঠাৎ দেখা গেল, সামনেই কর্পুর, কাফন ও পানির যাবতীয় আয়োজন বিদ্যমান রয়েছে। সবাই প্রচণ্ড বিস্মিত হলেন। এরপর সবাই মিলে গোসল, কাফন, জানাযা ও দাফনের আনুষ্ঠানিকতা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করলেন। এরপর কাফেলা যাত্রা শুরু করল। কিছুদিন যাওয়ার পর সাথীদের মনে হলো, আমরা কেন কবরের জায়গাটি চিহ্নিত করার জন্যে কোনো আলামত দিয়ে এলাম না? পরামর্শ করে সবাই পূর্বের জায়গায় ফিরে এলেন। ওই জায়গাতে এসে দেখলেন, কোথাও কবরের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই।

বাবুল জাবিয়ার পাশেই 'আল বাবুশ শারকি' অবস্থিত। এই ফটকের কাছে একটি তেপান্তর রয়েছে। সেখানে বিখ্যাত সাহাবি হযরত উবাই বিন কাব রা.-এর কবর অবস্থিত। ইতিহাসের বিখ্যাত বুযুর্গ আরসালান ওরফে 'বায আশহাব' রহ.-এর কবর অবস্থিত। তার কারামাতের একটি ঘটনা তুলে ধরছি।

আহমদ রিফায়ি রহ. নামের সেই যুগের একজন মহান বুযুর্গ উম্মু উবাইদা মহল্লাতে বাস করতেন, যা ওয়াসিত নগরীর কেন্দ্রীয় গোরস্থানের পাশে অবস্থিত। তার সঙ্গে আরেক বুযুর্গ আবু মাদইয়ান শুয়াইব ইবনুল হুসাইন রহ.-এর গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। নিয়মিত একে অপরকে চিঠি লিখতেন। সবাই বলাবলি করে যে, তারা নিয়ম করে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় একজন

অপরজনকে সালাম জানিয়ে চিঠি লিখেন। একজনের সালামের উত্তরে অন্যজনও জবাবি চিঠি লিখতেন। শায়খ আহমাদ তার খানকার পাশে কয়েকটি খেজুর গাছ চাষ করতেন। এক বছরের ঘটনা। যথারীতি তিনি কিছু গাছ থেকে খেজুর পারলেন। আর কয়েকটি গাছে খেজুর রেখে দিলেন। বললেন, 'এগুলো আমার ভাই শুয়াইবের জন্যে রাখলাম।' সে বছর শায়খ আবু মাদইয়ান শুয়াইব হজে গেলেন। আরাফার ময়দানে বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হলেন। আরসালান খাদিম হিসেবে শায়খ আহমাদের সঙ্গে ছিলেন। বন্ধুকে কাছে পেয়ে শায়খ আহমাদ ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতা শুরু করে দিলেন। এক পর্যায়ে তার জন্যে খেজুর গাছে যে কয়েক থোকা খেজুর রেখে দিয়েছেন, সে ঘটনাও শোনালেন। তখন আরসালান বললেন, 'শায়খ, আপনি অনুমতি দিলে আমি এখনই সেই থোকাগুলো হাজির করছি।' শায়খ অনুমতি দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং মুহূর্তে খেজুরের থোকা নিয়ে প্রবেশ করলেন। দু' বুযুর্গের সামনে পেশ করলেন।

খানকার লোকজন পরবর্তীতে জানিয়েছিল যে, তারা আরাফার রাতে বায আশহাব আরসালানকে খেজুর গাছের ডগায় দেখেছিলেন। গাছ থেকে খেজুরের থোকা কেটে বাতাসে উড়ে ভেসে গেছেন।

কিছু উল্লেখযোগ্য কবরস্থান

দামেস্কের পশ্চিমাঞ্চলে আরেকটি তেপান্তর রয়েছে। সেখানে শহীদদের একটি বিখ্যাত কবরস্থান রয়েছে। সাইয়েদুনা আবু দারদা ও তাঁর মহীয়সী স্ত্রী উম্মে দারদা, ফুযালা বিন উবাইদ, ওয়ায়িলা ইবনুল আসকা', সাহল বিন হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের বিখ্যাত সাহাবি এই কবরস্থানে শায়িত রয়েছেন। বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের মধ্য হতে একদল মহান সাহাবির কবর এখানেই অবস্থিত।

দামেস্কের পূর্বাঞ্চলে আরেকটি জায়গা আছে। নাম, মানিহা। সেখান থেকে চার মাইল দূরত্বে হযরত সাদ বিন উবাদা রা.-এর কবর অবস্থিত। মাকবারাকে কেন্দ্র করে একটি দৃষ্টিনন্দন ছোট মসজিদ গড়ে উঠেছে। কবরের পাশে এপিটাফে লেখা রয়েছে, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি, খাযরাজ গোত্রপতি সাদ বিন উবাদা রা.-এর কবর।'

সেই মানিহা নগরী থেকে কিবলার দিকে এক ফারসাখ এগুলে হযরত আলী রা.-এর মেয়ে উম্মে কুলসুম রা.-এর কবর। কথিত রয়েছে যে, তার মূল নাম ছিল, যয়নাব। কিন্তু খালা, নবীজির মেয়ে উম্মে কুলসুম রা.-এর সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য থাকায় নবীজি সা. তাকে 'উম্মে কুলসুম' উপনাম দেন। বর্তমানে সেখানে একটি সুবিশাল মসজিদ রয়েছে। চতুর্দিকে অনেকগুলো বাড়িঘর। মসজিদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্যে বেশ কিছু ওয়াকফ সম্পত্তিও রয়েছে। দামেস্কবাসী জায়গাটির নাম দিয়েছেন, 'কবরুস সিত উম্মে কুলসুম রা.।

তার পাশেই আরেকটি কবর রয়েছে। লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে যে, এটি হুসাইন বিন আলী রা.-এর মেয়ে সাকিনার কবর।

দামেস্কের একটি গ্রামের নাম, নাইরাব। তার পশ্চিম দিকে একটি বাড়ির ভেতরে আরেকটি কবর রয়েছে। লোকজন বলে, এটি উম্মে মারইয়াম আ. এর কবর।

সেই নগরীর পশ্চিম দিকে চার মাইল দূরত্বের একটি জায়গার নাম, 'দারিয়া'। এখান থেকে চার মাইল দূরত্বে হযরত আবু মুসলিম খাওলানি রহ.-এর কবর অবস্থিত। এখানে আবু সুলাইমান দারানি রহ. এর কবরও অবস্থিত।

আরো কিছু ঐতিহাসিক কবর ও স্থাপনা

দামেস্কের অন্যতম ঐতিহাসিক বরকতময় স্থান হলো, 'মাসজিদুল আকদাম'। দামেস্ক থেকে কেবলার দিকে দুই মাইল দূরত্বে মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। এই মহাসড়ক পুণ্যভূমি হিজায, বাইতুল মাকদিস ও মিসর অঞ্চলের দিকে এগিয়ে গেছে। এই মসজিদের বরকতের সুনাম লোকমুখে বহুল চর্চিত। মসজিদের নামে প্রচুর ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে। দামেস্কের জনগণ মসজিদকে অত্যন্ত বরকতময় মনে করে থাকে। এই মসজিদের নাম 'আকদাম' রাখার কারণ হলো, এখানকার একটি কামরার গায়ে একাধিক পদচিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। কথিত রয়েছে যে, এটি সাইয়েদুনা মুসা আ.-এর পদচিহ্ন।

এই মসজিদের ভেতরে একটি ছোট্ট ঘর রয়েছে। যার দেয়ালে এ কথা লেখা রয়েছে যে,

كان بعض الصالحين يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم في النوم، فيقول له : ها هنا قبر أخي موسى عليه السلام.

'কয়েকজন বুযুর্গ স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন যে, তিনি বলছেন, এখানে আমার ভাই মুসা আ.-এর কবর।'

এই মসজিদ সংলগ্ন গোরস্থানের একটি জায়গার নাম 'আল কুসাইবুল আখদার'। বাইতুল মাকদিস ও আরিহার নিকটবর্তী একটি কবরস্থানের নামও 'আল কুসাইবুল আহমার'। যা ইহুদিদের কাছে পুণ্যভূমি।

মসজিদের কল্যাণে মহামারি দূর হলো

৭৪৯ হিজরির রবিউস সানি মাসের শেষ দিকে দামেস্কে প্রচণ্ড মহামারি দেখা দেয়। আমি সে সময় দামেস্কের জনগণকে এই মসজিদের সীমাহীন শ্রদ্ধা করতে দেখেছিলাম, যা আমাকে বিস্মিত করে দেয়। প্রধান গভর্নর, সুলতানের স্থলাভিষিক্ত আরগুন শাহ তখন এই ফরমান জারি করেন যে, দামেস্কের প্রত্যেকে তিন দিন রোযা রাখবে। আর বাজারের মাঝখানে সবার জন্যে রান্না হবে।' নির্দেশনা অনুসারে দামেস্কবাসী ধারাবাহিক তিন দিন রোযা রাখে। শেষদিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। এরপর শহরের সকল আমির, উমারা, অভিজাত, বিচারক, ফকিহ তথা সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধি দামেস্ক জামে মসজিদে সমবেত হন। চোখের পানি ছেড়ে সবাই মুনাজাতে মগ্ন হন। এখানেই রাত্রিযাপন করেন। রাতভর সবাই ইবাদত করেছেন। কেউ নামায পড়েছেন। কেউ যিকির করেছেন। কেউ মুনাজাত করেছেন। এরপর ফজর নামায পড়ে সবাই হাতে কুরআন কারিম নিয়ে, খালি পায়ে মসজিদ থেকে বের হন। তাদের সঙ্গে শহরের সকল পুরুষ, মহিলা, শিশু, বুড়ো যোগদান করেন। এমনকি ইহুদিরা তাওরাত হাতে ও খ্রিস্টানগণ ইঞ্জিল হাতে বেরিয়ে পড়েন। এ সময় তাদের নারী ও শিশুরাও যোগদান করেছিল। প্রত্যেকে নিজ ধর্মগ্রন্থ ও নবী-রাসূলদের উসিলা করে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ তাআলার কাছে রোনাজারি করতে থাকে। সবাই পায়ে হেঁটে সম্মিলিতভাবে মাসজিদুল আকদামের উদ্দেশে যাত্রা করেন। মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সবাই এই বরকতময় মসজিদের ভেতরে আল্লাহর কাছে কেঁদে-কেটে দোয়া করতে থাকে। সূর্য মাঝআকাশ থেকে পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার পর সবাই শহরে

ফিরে আসে এবং জুমার নামায আদায় করে। যার বরকতে আল্লাহ তাআলা মহামারির তীব্রতা কমিয়ে দেন। ইতিপূর্বে প্রতিদিন শুধু দামেস্ক নগরীতেই গড়ে দু' হাজার নাগরিক মারা যেত। কায়রো ও মিসর অঞ্চলে প্রতিদিন চব্বিশ হাজার মানুষ মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত।

দামেস্কের সাদা মিনার

দামেস্কের পূর্বপ্রান্তের ফটকের কাছে একটি সাদা মিনার আছে। সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস অনুসারে সাইয়েদুনা ঈসা আ. এখানে অবতরণ করবেন।

একমাত্র পূর্বদিক ব্যতিরেকে দামেস্কের বাকি তিন দিক জুড়ে গড়ে উঠেছে বিস্তীর্ণ শহরতলী। দামেস্কের মূল শহরের তুলনায় এইসব শহরতলীতে বেশি ভিড়। পথঘাটগুলোও বেশ সংকীর্ণ। উত্তর দিকের শহরতলীকে বলা হয় 'সালিহিয়্যা'। যা এখন নিজেই একটি বিশাল স্বতন্ত্র নগরীতে পরিণত হয়েছে। নিজস্ব বাজারঘাট রয়েছে। সুবিন্যস্ত ও পরিপাটি। এখানে একটি জামে মসজিদ ও দুটি মাদরাসা রয়েছে। প্রথমটির নাম, ইবনে উমর মাদরাসা। এখানে বয়স্ক ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী কুরআন কারিমের বিশুদ্ধ শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। এখানকার সকল ছাত্র ও শিক্ষকদেরকে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় খাবার ও পোশাক দেওয়া হয়। দ্বিতীয় মাদরাসার নাম, ইবনে মানজা মাদরাসা। সেখানেও অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সালিহিয়্যা নগরীর সকল অধিবাসী হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী।

ইবরাহিম আ.-এর স্মৃতি বিজড়িত পাহাড়

দামেস্কের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত পর্বতমালার নাম কাসিয়ুন। সেই পাহাড়ের পাদদেশেই সালিহিয়া নগরী অবস্থিত। ইতিহাসের অসংখ্য নবী-রাসূলের স্মৃতিবিজড়িত এই নগরীকে সবাই বরকতময় জ্ঞান করে থাকে। এখানকার একটি পাহাড় সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে যে, সাইয়িদুনা ইবরাহিম আ. সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পাহাড়টির আকৃতি হলো, আয়তক্ষেত্র। কাছেই একটি মসজিদ রয়েছে। যার পাশে বেশ বড় আকারের উপাসনাগৃহও রয়েছে। কথিত রয়েছে যে, এ গুহাতেই সাইয়িদুনা ইবরাহিম আ.-এর নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য অবলোকনের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছিল। যার

বিবরণ কুরআন কারিমে উঠে এসেছে। গুহার পিঠে একটি নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে, যেখানে তিনি বের হতেন।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, আমি যখন ইরাক ভ্রমণ করি তখন সেখানে বাগদাদ ও হুল্লাহ নগরীর মাঝখানে 'বুরস' নামক একটি ঐতিহাসিক জনপদে গিয়েছিলাম। সেই নগরী সম্পর্কেও জনশ্রুতি রয়েছে যে, ইবরাহিম আ. সেখানে বসবাস করতেন। যা হযরত যুলকিফল আ.-এর জনপদের বেশ কাছে। সেখানে তার কবর রয়েছে।

হাবিল-কাবিলের স্মৃতি বিজড়িত রক্তের গুহা

এখানকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র হলো, 'মাগারাতুদ দম। যার উপরে অবস্থিত পাহাড়ে হযরত আদম আ.-এর ছেলে হাবিলের রক্ত রয়েছে। একটি পাথরের ওপর আল্লাহ তাআলা এখনো সেই রক্তের ছাপ বহাল রেখেছেন। এখানে তিনি নিজ ভাইয়ের হাতে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এরপর সেখান থেকে টেনে এনে এই গুহায় নিক্ষেপ করেন। লোকজন বলাবলি করে যে, এই গুহার মাঝে হযরত ইবরাহিম, মুসা, ঈসা, আইয়ুব ও লুত আলাইহিমুস সালাম ইবাদত করেছিলেন। বর্তমানে সেখানে একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ রয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে সেই মসজিদে উঠতে হয়। ভেতরে বসবাসকারীদের জন্যে অনেকগুলো ঘর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র রয়েছে। যা প্রতি রোববার ও বৃহস্পতিবার দর্শনার্থীদের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। গুহার ভেতরে প্রদীপের সাহায্যে আলোর বন্দোবস্তও রয়েছে।

আদম আ.-এর স্মৃতি বিজড়িত গুহা

পাহাড়ের চূড়ায় একটি বড় আয়তনের গুহা রয়েছে। কথিত রয়েছে যে, আদম আ.-এর সঙ্গে সেই গুহার স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে। সেখানেও একটি স্থাপনা রয়েছে।

ঠিক তার নিচেই আরেকটি গুহা রয়েছে, যা 'ক্ষুধার গুহা' নামে পরিচিত। কথিত রয়েছে যে, ইতিহাসের কোনো একসময়ে এখানে সত্তুর জন নবী-রাসূল আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাদের হাতে তখন একটিমাত্র রুটির টুকরো ছিল। প্রত্যেকে নিজে না খেয়ে অন্যের দিকে সেই টুকরো রুটি বাড়িয়ে দেন। যার ফলে কেউ না খাওয়ায় অবশেষে সবাই ইন্তেকাল করেন।

বর্তমানে সেই গুহায় একটি পাকা মসজিদ রয়েছে। যার ভেতরে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকে। এ রকম যতগুলো মসজিদ রয়েছে, সেগুলোর প্রতিটির ব্যয়ভার নির্বাহের জন্যে প্রচুর পরিমাণ সম্পত্তি ওয়াকফ করা রয়েছে।

এখানকার লোকমুখে এ কথা বহুল প্রচলিত যে, ফারাদিস ফটক ও কাসিয়ুন জামে মসজিদের মধ্যবর্তী জায়গায় অন্তত সাতশ, কারো কারো মতে সাত হাজার নবী সমাহিত রয়েছেন।

দামেস্ক শহরের বাইরে একটি প্রাচীন কবরস্থান রয়েছে। সেখানে ইতিহাসের অনেক রাসূল ও নেককার বুযুর্গের কবর রয়েছে। এই কবরস্থানের পাশে ফলবাগানগুলোর কাছে একটি নিচু জলাভূমি রয়েছে। জায়গাটি সবসময় পানির নিচে থাকে। এই জায়গাটি সম্পর্কেও প্রচলিত রয়েছে যে, এখানে সত্তর হাজার নবীর কবর রয়েছে। যেহেতু অনেক দিন ধরে জায়গাটি পানির নিচে ডুবে রয়েছে, এজন্যে এখানে দাফন করার সুযোগ নেই।

সাইয়েদুনা ঈসা ও মারইয়াম আ.-এর স্মৃতি বিজড়িত টিলা

কাসিয়ুন পর্বতমালার শেষপ্রান্তে একটি ছোট্ট টিলা রয়েছে। মহান আল্লাহ কুরআন কারিমে যার সম্পর্কে বলেছেন, قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ। জনশ্রুতি রয়েছে যে, সাইয়েদুনা ঈসা আ. ও তাঁর মহীয়সী জননী মারইয়াম আ. এই টিলায় বাস করতেন। এমন দৃষ্টিনন্দন জায়গা পৃথিবীতে আরেকটি চোখে পড়েনি। এখানকার সারি সারি ছোট ছোট প্রাসাদ, অভিজাত বাড়িঘর, ফুলে-ফলে সুশোভিত বাগিচা আর বিস্ময়কর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

টিলার ঠিক মধ্যখানে একটি ছোট্ট গুহা রয়েছে। যার মাঝখানে একটি ছোট ঘর রয়েছে। এই বিপরীত প্রান্তে আরেকটি ঘর রয়েছে। যার সম্পর্কে কথিত রয়েছে যে, হযরত খিযির আ. সেখানে ইবাদত-তপস্যা করতেন। এখানে নামায পড়ার জন্যে জনতার মাঝে রীতিমতো হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা লেগে যায়।

এই প্রাকৃতিক গুহার একটি ছোট্ট লৌহনির্মিত ফটক রয়েছে। যার চতুর্পাশে মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের চারদিকে বৃত্তাকার সড়ক রয়েছে। এখানকার

জল বিতরণ ব্যবস্থাপনা খুবই সুন্দর। দেয়ালের ওপর দিয়ে পানির প্রবাহধারা রয়েছে। উপর থেকে সেই প্রবাহধারা বেয়ে পানি এসে হাউজে পড়ে। পুরো হাউজ মর্মর পাথরে তৈরি। সেই হাউজের ব্যবস্থাপনা এতই আধুনিক ও সুন্দর যে, আমি কোথাও এ রকম হাউজ দেখিনি। হাউজ থেকে স্বল্প দূরে অযু করার জায়গা। স্বয়ংক্রীয়ভাবে সেই হাউজ থেকে অযুর জায়গায় পানি চলে যায়।

এই ঐতিহাসিক বরকতময় টিলা দামেস্কের বুকে যতগুলো বাগান রয়েছে, সেগুলোর মাঝে সবচেয়ে উঁচু। একটি উৎস থেকে পানির স্রোতধারা নির্গত হয়ে সাতটি নহর বেয়ে এখানে চলে আসে। মজার বিষয় হলো, সবগুলো নহরের গতিমুখ ভিন্ন। যেই উৎস থেকে নহরগুলো সৃষ্টি হয়েছে, তা 'মাকাসিম' নামে পরিচিত। সবচেয়ে বড় নহরের নাম, তাওরা। এই নহর থেকে টিলার শক্ত পাথরের ওপর অনবরত পানি পড়ার ফলে ভেতরে একটি বড় গুহা সৃষ্টি হয়েছে। কিছু দুঃসাহসী সাতারুকে আমি টিলার উপর থেকে সেই গুহার ওপর লাফ দিতে দেখেছি। যদিও তা আমার কাছে বেশ বিপজ্জনক কাজ মনে হয়েছে।

দামেস্ক নগরীতে যতগুলো বাগান রয়েছে, তার সবকটি সেই ঐতিহাসিক টিলার আশপাশে অবস্থিত। যার ফলে এই টিলাকে কেন্দ্র করে যেই প্রাকৃতিক নান্দনিকতা গড়ে ওঠেছে, তা আমি পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখিনি। সাতটি নহর নিজ নিজ পথ ধরে বয়ে যাচ্ছে। কোথাও নহরগুলো একত্র হচ্ছে, আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। কখনো দু কুল ছাপিয়ে নহরের পানি নিচে গড়িয়ে পড়ছে। আসলে টিলার এই নৈস্বর্গিক দৃশ্যের যথাযথ বিবরণ শব্দ-বাক্যের গাঁথুনিতে ততটা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়, যতটা বাস্তবে দেখা যায়।

এখানকার অনেক শষ্যক্ষেত, ফলবাগান ও চারণভূমি মসজিদ ও ধর্মীয় চর্চাকেন্দ্রের জন্যে ওয়াকফকৃত। এখানকার অর্জিত আয় দিয়ে সেসব মসজিদের ইমাম, মুয়াযযিনদের বেতন এবং আগত অতিথি ও পর্যটকদের খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়।

টিলার নিচে একটি গ্রাম রয়েছে। নাম, নায়রাব। এখানেও প্রচুর ফলবাগান ও ছায়াদার বৃহৎ গাছগাছালি রয়েছে। গাছপালা এতটাই ঘন যে, স্রেফ বড় বাড়িগুলোই দূর থেকে দেখা যায়। বাকি সবকিছু সবুজ প্রকৃতির আড়ালে

ঢাকা পড়ে। এখানকার জামে মসজিদ ও গোসলখানা বেশ সুন্দর। মসজিদের চত্বর মূল্যবান মর্মর পাথরে নির্মিত। এখানকার জলবিতরণ ব্যবস্থাপনাও অনেক সুশৃঙ্খল। মসজিদের চারপাশে অনেকগুলো অযুখানা রয়েছে। যেখানে স্বয়ংক্রীয়ভাবে পানি পৌঁছে যায়।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব আজরের স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম

এই গ্রাম থেকে কেবলার দিকে এগিয়ে গেলে আরেকটি গ্রামের দেখা মিলবে। নাম, মিযযা। গোত্রপ্রধান কালব বিন ওয়াবরার দিকে সম্বন্ধিত করে এই গ্রামকে বলা হয়, 'মিযযাতুল কালব'। বিখ্যাত জ্ঞানতাপস, হাফিযুদ দুনিয়া জামালুদ্দিন বিন ইউসুফ কালবি মিযযি এখানকার অধিবাসী ছিলেন। এছাড়াও এখানে আরো অনেক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেছেন। বলা হয়, এটি দামেস্কের সবচেয়ে বড় গ্রাম। এই গ্রামেও সুবিশাল দৃষ্টিনন্দন মসজিদ রয়েছে। পানির সুন্দর বিতরণ ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত আমি দামেস্কের যতগুলো গ্রামে গিয়েছি, তার অধিকাংশগুলোতে সুবিশাল মসজিদ, সুরম্য গোসলখানা, সুপরিসর বাজারঘাট পেয়েছি। জীবনযাপনের উপকরণের সহজলভ্যতার ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মাঝে খুব বেশি তারতম্য দেখিনি।

দামেস্কের পূর্বদিকে আরেকটি ঐতিহাসিক জনপদ রয়েছে, যা 'বাইতুল আহিব্বা' নামে পরিচিত। সেখানে একটি প্রাচীন গির্জা ছিল। কথিত রয়েছে যে, সেই গির্জাতে আজর পাথর খোদাই করে মূর্তি তৈরি করত। যা পরবর্তীকালে হযরত ইবরাহিম আ. নিজ হাতে ধ্বংস করেছিলেন। সেই গির্জাটি বর্তমানে একটি মসজিদে পরিণত হয়েছে। রঙ-বেরঙের মূল্যবান মর্মর পাথর দিয়ে অসাধারণ সুন্দর শৈলীতে মসজিদভবন নির্মিত।

জনকল্যাণমূলক খাতের জন্যে অঢেল ওয়াকফ সম্পত্তি

দামেস্কের মাটিতে এত প্রচুর ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে যে, আমার পক্ষে তা গুণে শেষ করা সম্ভব হয়নি। সেই ওয়াকফগুলোর ধরন ও ব্যয়ের খাত বিচিত্র। যেমন ধরুন, কেউ হজ করতে অক্ষম। তার পক্ষ থেকে কেউ হজ করলে তাকে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার দেওয়ার জন্যে এক ধরনের ওয়াকফ রয়েছে। কেউ অর্থাভাবে নিজের ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করাতে পারছে না, এমন দায়গ্রস্ত লোকদেরকে আর্থিক সহায়তা করার জন্যে কিছু সুনির্দিষ্ট

ওয়াকফ রয়েছে। তাদেরকে বিয়ের নানা সামগ্রীও দেওয়া হয়। কেউ যদি অর্থসংকটের কারণে কয়েদি মুক্ত করতে না পারে, তাহলে তাকে সহায়তা করার জন্যেও ওয়াকফ রয়েছে। কোনো বিদেশি মুসাফির এখানে এসে অর্থসংকটের সম্মুখীন হয়ে খাদ্য, পোশাক ও পাথেয়জনিত কষ্টে পড়লে তাকে সহায়তার জন্যে ওয়াকফ রয়েছে। সড়ক ও ফুটপাত সংস্কারের জন্যে ওয়াকফ রয়েছে। দামেস্কের পথগুলো এমন যে, রাস্তার দু' পাশের ফুটপাতগুলো পায়ে হাঁটা লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকে। মাঝখানের অংশ বাহনে যাতায়াতকারীদের জন্যে বরাদ্দ। এর বাইরে আরো অনেক জনকল্যাণমূলক খাতের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্যে প্রচুর ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে।

আমি নিজ চোখে দেখেছি

একদিনের ঘটনা। আমি দামেস্কের একটি গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে হঠাৎ এক অল্পবয়সী ক্রীতদাসের হাত থেকে চিনাপাত্র পড়ে গেল। বেশ মূল্যবান সেই পাত্রকে তারা 'সিহন' বলে থাকে। এ দৃশ্য দেখে আশপাশে লোকজন জড়ো হলো। তারা পরামর্শ দিল যে, 'তুমি চিনাপাত্রের সবগুলো টুকরো একত্র করে ওয়াকফ প্রশাসনের কর্মকর্তার কাছে যাও।' ছেলেটি তাই করল। ওই কর্মকর্তা তখন টুকরোগুলো গ্রহণ করে সমপরিমাণ অর্থ ছেলের হাতে তুলে দিল। সে দোকান থেকে অনুরূপ আরেকটি পাত্র কিনে মনিবের কাছে ফিরে গেল। তাদের সেই উদ্যোগ আমাকে মুগ্ধ করেছে। নয়তো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে সেই অল্পবয়সী ক্রীতদাসকে নিজ মনিবের মারধরের শিকার হতে হতো। প্রচণ্ড ভয়ে আমি সেই কিশোরকে হতবিহ্বল হতে দেখেছিলাম। এই ওয়াকফ প্রক্রিয়ার ফলে অনেক হতাশ হৃদয়ে আশার বাতি জ্বলছে। মহান আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে উত্তম বিনিময় দিন, যিনি এ ধরনের জনকল্যাণমূলক খাতে ওয়াকফ করার সর্বপ্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

দামেস্কবাসীর অনুপম আতিথেয়তা

দামেস্কবাসী উন্নত শৈলীতে মসজিদ, খানকা, মাদরাসা ও দর্শনীয় স্থাপনা নির্মাণে বেশ আগ্রহী। আফ্রিকা অঞ্চলের বারবার গোত্রের মুসলমানদের সঙ্গে তাদের বেশ চমৎকার বোঝাপড়া রয়েছে। তারা তাদের কাছে নিশ্চিন্তে নিজ

সম্পদ, পরিবার ও সন্তানসন্ততি আমানত রাখে। যদি পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে কেউ জীবিকার খোঁজে দামেস্কে আসে, তাহলে তার জন্যে কোনো না কোনো মাধ্যমে দিন গুজরানের বন্দোবস্ত হয়ে যায়। এখানে মসজিদের ইমামতি, মাদরাসার শিক্ষকতা, প্রতিষ্ঠানের চাকুরি, কবরস্থানে প্রহরা বা খানকার বুযুর্গদের সেবা, অর্থাৎ জীবিকার প্রচুর সংস্থান রয়েছে। অর্থাৎ চাকুরিপ্রার্থীর যোগ্যতা অনুসারে জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। কেউ যদি মজদুরি করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে অনায়াসে এখানকার ফলবাগান বা আটা পেশার চাকুরি পেয়ে যাবে। যেসব শিশু প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা বিদ্যালয়ে পড়তে যায়, তাদের আনা-নেওয়ার কাজও এখানকার সম্মানজনক চাকুরি। কেউ যদি পড়াশুনা করা বা ইবাদতের করার জন্যে নিজেকে কর্মমুক্ত রাখতে চায়, তাহলে তার জন্যেও এখানে পর্যাপ্ত ভাতার বন্দোবস্ত রয়েছে।

দামেস্কবাসী একাকী ইফতার করে না

দামেস্কবাসীর আরেকটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তারা রমযান মাসে কখনো একাকী ইফতার করেন না। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অভ্যাস হলো, তারা প্রতিদিন বন্ধুবান্ধব ও দরিদ্রদের দাওয়াত করে এনে একসঙ্গে ইফতার করেন। বড় বড় ব্যবসায়ী, অভিজাত, বিচারক ও আমত্যবর্গকেও আমি এমনটাই করতে দেখেছি। এমনকি এখানকার গ্রাম্য লোকজন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীদেরকে আমি দেখেছি যে, তারা সন্ধ্যার সময় নিজ বাড়িতে বা স্থানীয় মসজিদে অন্যদের ডেকে এনে একসঙ্গে ইফতার করেন। এ সময় প্রত্যেকে নিজের পক্ষে যতটুকু সম্ভব, ততটুকু এনে সম্মিলিত দস্তরখানে পেশ করেন।

আমি যখন দামেস্কে আসি তখন এখনাকার মালেকিয়া মাযহাবের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল শিক্ষক নুরুদ্দিন সাখাবির অতিথি হয়েছিলাম। তিনি তখন অনুরোধ করলেন, আমি যেন রমযান মাসে সন্ধ্যার সময় তার সঙ্গে ইফতার করি। আমি সেসূত্রে তার সঙ্গে চার দিন ইফতার করি। পঞ্চম দিন থেকে আমার জ্বর শুরু হয়ে যায়। যার ফলে আমি তার কাছে যেতে পারিনি। তিনি আমার সন্ধানে লোক পাঠান। আমি তখন অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করি; কিন্তু তিনি তার সঙ্গে যেতে আমাকে জোরাজুরি করতে থাকেন। অগত্যা আমি তার কাছে হাজির হই। সেখানেই রাত্রিযাপন করি। পরদিন সকালে আমি জানালাম, এবার আমাকে যেতে হবে। তিনি

আমাকে জোর করে রেখে দিয়ে বললেন, 'ধরে নাও, এই বাড়ি তোমার, বা তোমার বাবার, বা তোমার ভাইয়ের।' এ কথা বলে তিনি চিকিৎসক ডেকে আনালেন। চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুসারে তার বাড়িতেই আমার জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অষুধ তৈরি করে দিলেন। ঈদুল ফিতর পর্যন্ত এভাবে তিনি আমাকে তার বাড়িতে রেখে দেন। রমযানের শেষ দিকে আমি সুস্থ হই। ঈদগাহে গিয়ে নামায আদায় করি। ততদিনে আমার কাছে যেই অর্থ ছিল তা ফুরিয়ে যায়। কীভাবে যেন তিনি বিষয়টি জানতে পারেন। তখন তিনি আমার জন্যে একটি উট ভাড়া করে নিয়ে এলেন। পথখরচ হিসেবে যতটুকু টাকা লাগবে, তার চেয়ে অধিক টাকা আমার হাতে গুজে দিলেন। এরপর আমাকে বললেন, 'আপনার যা লাগবে, তা পূরণ করার জিম্মাদারি আমার ওপর।' আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দিন।

দামেস্কের আরেকজন গুণী ব্যক্তিত্ব হলো, সুলতান আল মালিকুন নাসিরের মুন্সি ইমাদুদ্দিন কায়সারানি। তার অভ্যাস ছিল, তিনি যখনই আফ্রিকা থেকে কোনো মুসাফিরের আগমনের সংবাদ পেতেন, যেভাবেই হোক, তাকে খুঁজে বের করতেন। আতিথেয়তা করতেন। কারো মাঝে যোগ্যতা দেখলে উপযুক্ত পদে চাকুরি দিতেন। যার ফলে তার অধীনে প্রচুর আফ্রিকান চাকরি করত। আলাউদ্দিন বিন গনম নামের আরেক গুণী ব্যক্তিত্বের একই অভ্যাস ছিল।

দামেস্কের আরেকজন গুণী ব্যক্তিত্ব হলেন, ইয্যুদ্দিন কালানসি। তাঁর মাঝে অসংখ্য গুণ, প্রতিভা ও যোগ্যতার সমাবেশ ঘটেছিল। পাশাপাশি আল্লাহ তাকে অঢেল সম্পত্তি দান করেছিলেন। কথিত রয়েছে যে, যখন সুলতান আল মালিকুন নাসির দামেস্কে আগমন করেন, তখন তিনি পুরো রাজবহর সমেত সুলতানকে তিন দিন আপ্যায়ন করেন। সেদিন থেকে তার উপাধি হয়ে যায়, 'সাহিব'।

দামেস্কবাসীর আরো কিছু উল্লেখযোগ্য গুণাবলি

দামেস্কবাসীদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, অতীতের কোনো এক সুলতান জীবনের শেষ বেলায় উপনীত হয়ে এ অসিয়ত করে যান যে, তাকে যেন দামেস্কের বনু উমাইয়া জামে মসজিদের কেবলার দিকে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে দাফন করা হয়। কবরের ওপর কোনো চিহ্ন রাখবে না। এ সময় তিনি কারীদের জন্যে বড় অংকের সম্পত্তি ওয়াকফ করে যান। ওই কারীগণের

দায়িত্ব হলো, প্রতিদিন ফজর নামাযের পর তার জন্যে সাতবার কুরআন কারিমের খতম দেবে। দামেস্কের পূর্বদিকে যেখানে সাহাবায়ে কেরামের কবরস্থান রয়েছে, সেখানে তাকে দাফন করা হয়। দাফনের পর থেকে নিয়মিত তার কবরের পাশে একদল কারী কুরআন কারিম তেলাওয়াত করতেন। সেখান থেকে এই প্রথা দামেস্কবাসীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

দামেস্কবাসীর ধর্মচর্চা

দামেস্কসহ আশপাশের অন্যান্য অঞ্চলের আরেকটি প্রথা হলো, তারা আরাফার দিন সবাই আসর নামায শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাইতুল মাকদিস, মসজিদে বনু উমাইয়া– এ জাতীয় বড় মসজিদগুলোতে সমবেত হয়। ইমামদের নেতৃত্বে তারা খালি মাথায়, দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড অনুনয়-বিনয় সহকারে মহান আল্লাহর দরবারে বরকতের দোয়া করতে থাকে। আরাফার ময়দানে যতক্ষণ হাজিগণ অবস্থান করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত, অর্থাৎ সূর্যাস্ত পর্যন্ত তারা হাজিদের উসিলায় আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতে থাকে। এরপর হাজিগণ যেভাবে দুঃখভারাক্রান্ত মনে আরাফার ময়দান থেকে বের হন, তারাও অশ্রুস্বজল চোখে মসজিদের অবস্থান সমাপ্ত করে নিজ বাড়ির উদ্দেশে বের হন। এ সময় তাদের ঠোঁটে এই মুনাজাত উচ্চারিত হতে থাকে যে, আল্লাহ, আমাদেরকেও আরাফার ময়দানে হাজির হবার তাওফিক দিন। জীবনের গুনাহখাতার জন্যে সেই সৌভাগ্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

জানাযার খাটিয়ার সঙ্গে যাত্রা ও কুরআন তেলাওয়াত

দামেস্কবাসীদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা পূর্ণ গুরুত্ব ও সম্মানের সাথে জানাযার খাটিয়াকে সঙ্গ দিয়ে থাকেন। সাধারণত, তারা খাটিয়ার আগে আগে হাঁটেন। এ সময় একদল কারী সুললিত কণ্ঠে, শোকাতুর ভাষায় কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকে। সেই তেলাওয়াত শুনলে রুক্ষ অন্তরের কর্কশ মানুষও মোমের মতো গলে যেতে বাধ্য হবে। মসজিদে বনু উমাইয়ার ছোট্ট প্রাসাদের সামনে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। যদি মসজিদের কোনো ইমাম, মুয়াজ্জিন বা খাদেমের জানাযা হয় তাহলে কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় তার খাটিয়া মুসল্লার স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্য কেউ হলে মসজিদের ফটক পর্যন্ত তেলাওয়াত চলে। এরপর খাটিয়া ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কিছু লোকের জানাযা এভাবে হয় যে, বাবুল বারিদ সংলগ্ন চত্বরের পশ্চিম প্রান্তে সবাই জড়ো হয়ে কুরআন কারিমের একেক পারা তেলাওয়াত করতে থাকে। এ সময় শহরের কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব শোকপ্রকাশের উদ্দেশ্যে হাজির হলে তার নাম উচ্চস্বরে ঘোষণা করা হয়। তেলাওয়াত সম্পন্ন হলে মুয়াযযিন দাঁড়িয়ে বলে যে, 'সবাই মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। শিক্ষাগ্রহণ করুন। এখন অমুক সৎ আলেমের জানাযার নামায হবে।' এরপর তারা তার অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করে। জানাযার নামায আদায় করে দাফনের স্থানে নিয়ে যায়। আমি যখন ভারতবর্ষে যাই তখন তাদেরকে মৃত সজনদের জানাযায় আরো বেশি আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে দেখেছি।

ভারতবাসীদের প্রথা হলো, তারা দাফনের তৃতীয় দিন সকালে সবাই মৃত ব্যক্তির বাড়ির বাগানে সমবেত হয়। মূল্যবান কাপড় দিয়ে পুরো বাগানের ওপর ছাউনি দেয়। কবরের ওপর দামি চাদর জড়ায়। কবরের চারপাশে নানা ফুলের তোড়া স্থাপন করে। আগত লোকজন যেন রোদের তাপে কষ্ট না পায়, এজন্যে পুরো অনুষ্ঠানস্থল জুড়ে কাপড়ের ছাউনি দেওয়া হয়। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিচারক ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় জড়ো হয়। একদল কারী সমবেত হয়ে নিজেদের মাঝে কুরআন কারিমের বিভিন্ন পারা বণ্টন করে নিয়ে তেলাওয়াত করতে থাকে। তেলাওয়াত কার্যক্রম সম্পন্ন হলে কাজি সাহেব দাঁড়িয়ে বিশেষ খুতবা পাঠ করেন। যার মাঝে তিনি মৃত ব্যক্তির গুণাবলি স্মরণ করেন। খুতবার সময় কবিতার নানা পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করেন। এ সময় তার বিভিন্ন আত্মীয়স্বজন ও সহচরের নাম ধরে প্রশংসা করা হয়। সুলতানের জন্যে দোয়া করা হয়। যখন সুলতানের নাম উচ্চারিত হয় তখন সবাই সম্মান প্রদর্শন করে সুলতানের দিকে মাথা ঝোঁকায়। এরপর কাজি সাহেব বসে পড়েন।

তখন গোলাপজল আনা হয়। প্রথমে কাজির ওপর, এরপর একে একে তার পার্শ্ববর্তী লোকদের ওপর ছিটানো হয়। এরপর সবার সামনে মিষ্টি সুপেয় পানি বিতরণ করা হয়। সবশেষ পান আনা হয়। ভারতবর্ষে পান অত্যন্ত সম্মানিত খাবার। কারো সামনে পান পরিবেশন করার অর্থ, এর মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করা হলো। সুলতান যদি কারো দিকে পান বাড়িয়ে দেন, তাহলে এটা তাকে স্বর্ণ-রৌপ্য প্রদানের চেয়েও অধিক সম্মানের বিষয়। কেউ মারা গেলে, তার আত্মীয়স্বজন তৃতীয় দিবসের এই আনুষ্ঠানিকতার আগ

পর্যন্ত পান ভক্ষণ বন্ধ রাখে। অনুষ্ঠানের সময় কাজি সাহেব কয়েক পাতা পান হাতে তুলে নিয়ে মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেন। এরপর সবাই পান খাওয়ার অনুমতি পায়। পান সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। যথাস্থানে আলোচনা করব।

দামেস্কে এসে হাদীস অধ্যয়ন

আমি দামেস্কে এসে সহিহ বুখারীর পাঠ গ্রহণ করেছি মসজিদে বনু উমাইয়াতে। এতদাঞ্চলের বয়োবৃদ্ধ আলেমে দীন শিহাবুদ্দিন আহমদ আস-সালেহি রহ.-এর কাছে মোট চৌদ্দটি বৈঠকে পূর্ণ বুখারী শরিফ শ্রবণ করি। আমাদের পাঠ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ৭২৬ হিজরির রমযান মাসের ঠিক মাঝামাঝিতে। দিনটি ছিল মঙ্গলবার। আর পাঠগ্রহণ সম্পন্ন হয় ২৮ তারিখ সোমবারে। এ সময় সহিহ বুখারী পাঠ করেন শামদেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক, আলেমে দীন, হাফেয আলামুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ কাসিম বারাযালি। যার জন্ম যদিও ইশবিলিয়ায় হয়েছিল, বর্তমানে দামেস্কের অধিবাসী। এ সময় আমাদের সঙ্গে প্রচুর ছাত্র অংশগ্রহণ করেছিল।

আমাদের হাদীসের সনদ নথিবদ্ধ করেছেন মুহাম্মাদ বিন তুগরেল বিন আবদুল্লাহ সায়রাফি। সনদের ধারাক্রম এমন যে, আমাদের শায়খ হাদীসের সকল প্রচলিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন শায়খ আবুল আব্বাস হিজাযির কাছে। তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন শায়খ সিরাজুদ্দিন রবিঈ বাগদাদি যাবিলি হাম্বলির কাছ থেকে। কাসিয়ুন পর্বতমালার পৃষ্ঠে জামে মুযাফফারিতে ৬৩০ হিজরির শাওয়াল মাসের শেষদিকে ও যিলকদ মাসের শুরুতে। তিনি হাদীস পাঠদানের অনুমতি পেয়েছেন দুজন শায়খ থেকে। একজন হলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল হাসান কতিঈ। অন্যজন আলী বিন আবু বকর বাগদাদি। তাদের উস্তাদ আবদুল্লাহ বিন উমর লাইসি খুযায়ি বাগদাদি। তিনি ৫৫৩ হিজরিতে হাদীস গ্রহণ করেছেন শায়খ আবদুল আউয়াল বিন ঈসা হারাবি সুফি থেকে। তিনি ৪৬৫ হিজরিতে বুশাঞ্জ নগরীতে হাদীস গ্রহণ করেছেন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ দাওয়াবি থেকে। তিনি ৩৮১ হিজরির সফর মাসে হাদীস পড়েছেন আবদুল্লাহ বিন আহমদ সারাখসি রহ.-এর কাছে। তিনি ফিরাবরা নগরীতে ৩১৬ হিজরিতে হাদীস পড়েছেন শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ ফিরাবরি রহ.-এর কাছে। এছাড়াও একই শতাব্দীর ৫৩ হিজরিতে তিনি দ্বিতীয়বার তার কাছে হাদীস পড়েছেন।

দামেস্কের বিভিন্ন জায়গায় আরো অনেক বড় বড় আলেম ও হাদীসবিশারদ পাঠদান করে থাকেন। তাদের অনেকের কাছ থেকে আমি হাদীসের অনুমতি গ্রহণ করেছি। যেমন, শায়খ আবুল আব্বাস হিজাযি, শায়খ শিহাবুদ্দিন আহমদ আল মাকদিসি, শায়খ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আন নাজদি, ইমামুল আইম্মাহ জামালুদ্দিন মুযানি কালবি, ইমাম আলাউদ্দিন আলী শাফেয়ী, শায়খ মুহিউদ্দিন আলাবি, শায়খ মাজদুদ্দিন কাসিম দিমাশকি, শায়খ শিহাবুদ্দিন আহমদ ইস্কান্দারি, বিখ্যাত বুযুর্গ শায়খ শামসুদ্দিন বিন আবদুল্লাহ বিন তাম্মাম, দুই সহোদর শায়খ—শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ও কামালুদ্দিন আবদুল্লাহ, ইবাদতগুজার শায়খ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ আল হাকারি, মহিলা মুহাদ্দিস উম্মু মুহাম্মাদ আয়িশা বিনতু মুহাম্মাদ আল হাররানি, আরেক দুনিয়াবিবাগী মুহাদ্দিস যায়নাব বিনতু কামালুদ্দিন আল মাকদিসি। তাদের প্রত্যেকেই আমাকে ৭২৬ হিজরিতে হাদীস পাঠদানের অনুমতি দিয়েছেন।

হৃদয়তীর্থ মদিনার পানে

৭২৬ হিজরি। আকাশে শাওয়াল মাসের চাঁদ উঠেছে। দামেস্ক থেকে হিজাযগামী কাফেলা রওনা হয়ে শহরের বাইরে বেরিয়েছে। 'কুসওয়া' নামের একটি গাঁয়ে তাবু বিছিয়ে ক্লান্তি দূর করছে। আমি দ্রুত রওনা হয়ে সেই কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হলাম। সাইফুদ্দিন জোহান নামের এক বড় গভর্নর সেই কাফেলার দলপতি। বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন শারফুদ্দিন আযরায়ি হাওরানি। এ বছর মালেকী মাদরাসার স্বনামধন্য শিক্ষক সদরুদ্দিন উমারি হজ করেছেন। আমি 'আজারিমা' নামের একটি আরব গোত্রের সঙ্গে আমার নাম লেখালাম। মুহাম্মাদ বিন রাফে' নামের একজন সম্মানিত আমির সেই দলটির সর্দারের দায়িত্ব পালন করছেন।

আমাদের কাফেলা কুসওয়া থেকে যাত্রা শুরু করল। 'সানামাইন' নামের একটি বড় গ্রামে পৌঁছুলাম। সেখান থেকে রওনা হয়ে 'যুরওয়া' নামের একটি ছোট্ট গ্রামে পৌঁছুলাম, যা 'হাওরান' অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের কাছাকাছি একটি স্থানে আমরা যাত্রাবিরতি করলাম।

নবীজির স্মৃতিবিজড়িত বুসরা নগরীতে

পরদিন সেখান থেকে রওনা হয়ে পৌঁছুলাম 'বুসরা' নামের আরেকটি ছোট্ট গ্রামে। দামেস্কের ঐতিহ্য হলো, হিজাযগামী কাফেলা এই গ্রামে পৌঁছে অন্তত চার দিন যাত্রাবিরতি করে। যেন, কোনো কারণবশত দামেস্কের কোনো হজ গমনেচ্ছুক ব্যক্তি পেছনে রয়ে গেলে অন্তত এখানে এসে মিলিত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভের পূর্বে হযরত খাদিজা রা.-এর বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে এই বুসরা নগরীতে এসেছিলেন। নবীজির উষ্ট্রী যেই স্থানে থেমেছিল, বর্তমানে সেখানে একটি বিশাল মসজিদ গড়ে উঠেছে। হাওরান অঞ্চলের সকল অধিবাসী সেখানে জমায়েত হয়ে থাকে। সকল হাজি নিজেদের প্রয়োজনীয় পাথেয় এখান থেকেই সংগ্রহ করে থাকে।

হাজিগণ সেখান থেকে রওনা হয়ে পৌঁছেন 'বারাকাহ যিযাহ' নামক জায়গায়। সেখানে একদিন অবস্থান করেন।

এরপর রওনা হয়ে পৌঁছেন 'লাজুন' গ্রামে। সেখানে পানির বহমান ঝরনা রয়েছে।

বিপদগ্রস্থ রাজাদের আশ্রয়স্থল কারাক কেল্লায়

এরপর কাফেলা পৌঁছুলো কারাক কেল্লায়। দৃষ্টিনন্দন, সুরক্ষিত ও বিস্ময়কর কেল্লা। এর অপর নাম, কিল্লাতুল গুরাব। চারপাশে দিগন্ত বিস্তৃত বালিয়াড়ি। এই কেল্লায় প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্যে একটি মাত্র দরজা। একটি বিশাল শক্ত পাথরের নিচ দিয়ে কেটে এই দরজা তৈরি করা হয়েছে। ভেতরে প্রবেশ করতেই সর্বপ্রথম চওড়া দহলিজ চোখে পড়বে।

যুগে যুগে কখনই কোনো রাজা-মহারাজা বিপদে পড়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। এমনকি ভারপ্রাপ্ত সুলতানরাও বিপদের মুহূর্তে এখানে আশ্রয় নিয়ে থাকে। আমাদের সুলতান নাসির মুহাম্মাদও একবার এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। তার কারণ হলো, তাকে শৈশবেই সুলতানের আসনে বসতে হয়েছিল। 'সালার'[১] নামে তার এক ক্রীতদাস ছিল। সুলতানের পক্ষ থেকে সে সহ-শাসকের দায়িত্ব পালন করত। সুলতানের এই অল্পবয়সকে সে সুযোগ হিসেবে লুফে নেয় এবং সর্বত্র তার ক্ষমতার জাল ছড়িয়ে দেয়। যার ফলে নাসির মুহাম্মাদ মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তখন তিনি কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বলেন, আমি হজে যাবার ইচ্ছা করেছি।

সকল আমাত্যবর্গ তার সেই ইচ্ছের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। সেমতে, নির্দিষ্ট তারিখে সুলতান হজের উদ্দেশে রওনা হন। 'আইলা' ঘাঁটিতে পৌঁছানোর পর অন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি একান্ত সহচরদের নিয়ে এই কারাক কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর থেকে এখানে তিনি কয়েক বছর অবস্থান করেন। এ সময়ে শামদেশের গভর্নরবৃন্দ তার সঙ্গে এখানে যোগাযোগ করে। অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্ত হয়।

---

[১] পুরো নাম, আমির সাইফুদ্দিন সালার।–অনুবাদক

এসময় দেশের নিয়ন্ত্রণ ছিল বাইবার্স জাশানকিরের[১] হাতে। খাদ্য পরীক্ষা করার দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি 'আল মালিকুল মুযাফফার' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবি যেই 'খানকাহ সাঈদুস সুআদা' নির্মাণ করেছিলেন, তার কবরস্থান এলাকায় তিনি 'বাইবার্স খানকাহ' নামে আরেকটি খানকা নির্মাণ করেন।

দীর্ঘ পরিকল্পনা শেষে সুলতান নাসির মুহাম্মাদ সৈন্যদল সহকারে মিসরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তার আক্রমণের সংবাদ শুনে বাইবার্স মরু অঞ্চলে পালিয়ে যান। সৈন্যরা তাকে পেছন থেকে ধাওয়া করে এক পর্যায়ে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়। সুলতানের কাছে হাজির করা হলে তিনি তার শিরোচ্ছেদের আদেশ দেন। নির্দিষ্ট দিনে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়।

ওদিকে আমির সাইফুদ্দিন সালারও গ্রেফতার হয়। তাকে একটি অন্ধকূপে বন্দি করা হয়। ক্ষুৎ-পিপাসার কাছে পরাজিত হয়ে সেখানে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কথিত আছে যে, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এ সময় সে মৃত লাশ খেতে বাধ্য হয়েছিল। মহান আল্লাহ এমন নির্মম পরিণতি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

সাওয়ানের বিপদসংকুল জঙ্গলে

কারাক নগরীর বাইরে 'সানিয়্যা' নামে একটি উপশহর রয়েছে। আমাদের কাফেলা সেখানে চারদিন অবস্থান করে। এর মাঝে সবাই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিগুলো সেরে নেয়।

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা 'মাআন' নগরীতে এসে পৌঁছি। এটাই হলো শাম অঞ্চলের সর্বশেষ নগরী। আমরা 'সাওয়ান' নামের একটি ঘাঁটিতে এসে পৌঁছি, যা বালিয়াড়িতে অবস্থিত। সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা মরুপ্রান্তরের বুকে অবস্থিত একটি ঘনজঙ্গলে এসে পৌঁছি। যার সম্পর্কে লোকজন বলাবলি করে যে,

---

[১] পুরো নাম, আল মালিকুল মুযাফফার রুকনুদ্দিন বাইবার্স জাশনকির মানসুরি। ১৩০৯ থেকে ১৩১০ পর্যন্ত মিশরের দ্বাদশতম মামলুক সুলতান। ১৩০৩ সালের ঐতিহাসিক শাকহাবের যুগে তিনি মঙ্গোলদের পরাজিত করেছিলেন। বাইবার্স শব্দের অর্থ, প্রভু কর্তৃক নির্বাচিত। আর জাশানকির একটি ফার্সি শব্দ। যার অর্থ, খাদ্য রসজ্ঞ ব্যক্তি। তার দায়িত্ব ছিল, কোনো খাবার সুলতানকে পরিবেশন করার আগে নিজে স্বাদ গ্রহণ করে বিষ পরীক্ষা করা।

داخلها مفقود، وخارجها مولود.

'কেউ যদি এই জঙ্গলে প্রবেশ করে তাহলে নিশ্চিত গুম হয়ে যাবে। এখান থেকে কেউ যদি বের হতে পারে, তাহলে ধরে নিতে হবে, আল্লাহ তাকে নতুন জীবন দান করেছেন।'

কাফেলা যাত্রা শুরু করল। দুদিনের টানা সফর শেষে আমরা পৌঁছুলাম 'যাতু হজ' অঞ্চলে। যেখানে কোনো মানববসতি নেই। আবার যাত্রা শুরু করলাম। পৌঁছুলাম 'বালদাহ' উপত্যকায়। এখানেও কোথাও পানীয়জল নেই।

ঐতিহাসিক তাবুক নগরীতে

অতপর আমরা এসে পৌঁছুলাম তাবুক নগরীতে। এই সেই তাবুক, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এখানে একটি ছোট্ট ঝরনা ছিল, যেখান থেকে ক্ষীণ ধারায় পানি পড়তো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেই ঝরনার পাশে অবতরণ করে অযু করতে শুরু করেন, তখন বিপুল ধারায় পানি বইতে শুরু করে। নবীজির বরকতে এখনো ঝরনাটির ফল্গুধারা প্রবহমাণ রয়েছে।

শামদেশের হাজিদের ঐতিহ্য হলো, তারা যখন তাবুক পৌঁছে তখন কোষ থেকে তরবারি বের করে ছুটতে শুরু করে। আশপাশের গাছপালার ওপর সজোরে হামলে পড়ে। কথিত রয়েছে যে, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এভাবেই প্রবেশ করতেন।'

সেই ঐতিহাসিক ঝরনার পাদদেশে সাধারণত সকল কাফেলাই অবতরণ করে থাকে। আমাদের কাফেলা এখানে চার দিন অবস্থান করল। এ সুযোগে সবাই নিজেদের উটগুলোকে জিরিয়ে নিল। পর্যাপ্ত পানি পান করাল। অন্যান্য প্রয়োজন সেরে নিলো। এখান থেকে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হলো 'উলা'। যেহেতু মাঝখানের পথটুকু বিপদসংকুল; এজন্যে তাবুক থেকেই সকল প্রস্তুতি সেরে নিতে হয়।

কিছু লোক এখানে পেশাদারত্বের সঙ্গে পানি পরিবেশন করে থাকে। তাদেরকে 'সাক্কায়ি' বলা হয়। তাদের কর্মকাণ্ড হলো, তারা হাউজের চারপাশে মহিষের চামড়া বিছিয়ে ছোট ছোট হাউজ তৈরি করে রেখেছে। যাত্রীরা তাদের কাছে অবতরণ করে প্রথমে নিজেদের বাহনগুলোকে পানি

পান করায়। উটের ওপর যেসব মশক বা পানির থলের মাধ্যমে পানি বহন করে থাকে, সেগুলোও এখান থেকে ভরিয়ে নেয়। সাধারণত একেকজন আমির বা ধনাঢ্য ব্যক্তি এসে নিজেদের জনবলের জন্যে একেকটি করে হাউজ ভাড়া নিয়ে নেয়। সাক্কায়িদের সেবার কারণে সুন্দর পদ্ধতিতে সবাই সহজে পানি গ্রহণ করতে পারে।

আমাদের কাফেলা তাবুক থেকে রওনা হলো। যেহেতু এখানকার বালিয়াড়ি অত্যন্ত বিপজ্জনক। যেকোনো সময় মরুঝড় উঠে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে ফেলতে পারে। এজন্যে আমাদের কাফেলা দিন-রাত একাকার করে সফর অব্যাহত রাখল। এখানে 'ওয়াদিল উখাইদির' নামে একটি ভয়ংকর উপত্যকা রয়েছে। মানুষ যার নাম দিয়েছে জাহান্নামের উপত্যকা। আল্লাহ আমাদেরকে তার ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করুন। প্রতি বছর এখানে এসে হাজিদের কাফেলা চরম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। বিগত বছরগুলোতে এ পরিমাণ মরুঝড় আছড়ে পড়েছে যে, কাফেলার সব মশক বা পানির থলে খালি হয়ে গেছে। চারপাশে পানির জন্যে এ পরিমাণ হাহাকার উঠেছে যে, এক গ্লাস পানি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রাতে বিক্রি হয়েছে। শেষপর্যন্ত পানির ক্রেতা-বিক্রেতা, দুই পক্ষকেই ধ্বংস হতে হয়েছে। উপত্যকার বিশাল বিশাল পাথরের গায়ে মানুষ সেই ভয়াবহ ঘটনাগুলোর বিবরণ লিখে রেখেছে।

এখান থেকে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছুলাম 'বিরকাতুল মুয়াজ্জাম' বা বড় জলাশয়ে। অনেক বড় জলাধার। আইউব সন্তান আল মালিকুল মুয়াজ্জামের দিকে সম্বন্ধিত করে এই জলাশয়ের নামকরণ। সাধারণত এখানে কয়েক বছর ধরে বৃষ্টির পানি জমা থাকতো। তবে মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টির কারণে পুরোটা শুষ্ক থাকে।

তাবুক থেকে একাধারে পাঁচ দিনের যাত্রা শেষে আমরা পৌঁছুলাম সামুদ গোত্রের স্মৃতি বিজড়িত 'হিজর' নামক কুয়োর পাদদেশে। পুরো কুয়ো পানিতে টলটল করছে; অথচ একজন যাত্রীও সেখান থেকে পানি গ্রহণ করেনি। অথচ পিপাসার কারণে সবাই ছটফট করছিল। কারণ হলো, তাবুক যুদ্ধে যাবার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কুয়োর পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তখন তিনি দ্রুত গতিতে এই অঞ্চল পাড়ি দিয়েছিলেন এবং আদেশ করেছিলেন যে, 'কেউ যেন এখান থেকে পানি পান না করে।

কেউ যদি এই নির্দেশনার আগে এখানকার পানির সাহায্যে আটার খামিরা তৈরি করে থাকে, তাহলে সে যেন তা উটকে খাইয়ে দেয়।'

আল্লাহর গজবে ধ্বংস হলো একটি উন্নত গোষ্ঠী

এ অঞ্চলেই একটা সময় সামুদ জাতি বাস করত। পাহাড়ের গায়ে লাল পাথর কেটে তারা বাড়িঘর তৈরি করত। ওঠার সিঁড়িগুলো এত সুন্দর ও কারুকার্য খোচিত যে, দর্শকদের মনে হবে—অল্প কদিন আগে বুঝি এগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। সেসব বাড়িঘরের ভেতরে এখনো যত্রতত্র জীর্ণশীর্ণ হাড়গোড় পড়ে আছে। আমাদের সবার জন্যে যা চরম শিক্ষা।

এখানে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে সেই ঐতিহাসিক জায়গাটি অবস্থিত, যেখানে হযরত সালিহ আ. নিজ উষ্ট্রি বসিয়েছিলেন। দু পাহাড়ের মধ্যবর্তী সেই জায়গায় একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। লোকজন এখানে এসে নামায আদায় করে।

হিজর ও উলা নগরীদ্বয়ের মাঝে মোটামুটি একদিন বা তার কিছুটা সময়ের দূরত্ব। উলা নগরীটি আয়তনে বেশ বড় ও সুন্দর পরিপাটি। সবখানে প্রচুর খেজুর বাগান ও ঝরনাধারা রয়েছে। আমাদের হজগামী কাফেলা এখানে চারদিন অবস্থান করে। সবাই এর ফাঁকে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য-পাথেয় সংগ্রহ করে নেয়। পোশাক-আশাক ধুয়ে পরিষ্কার করে। কারো কাছে অতিরিক্ত পাথেয় থাকলে এখানে রেখে যায়। কারণ, নিয়ম হলো, যাত্রাপথে স্রেফ প্রয়োজনীয় পাথেয়টুকুই সঙ্গে নেবে। আমরা উলার জনগণকে বেশ আমনতদার-বিশ্বস্ত পেয়েছি। শামের খ্রিস্টান বণিকদের জন্যে এই অঞ্চলে আসার অনুমতি রয়েছে। এখান থেকে সামনে যাওয়ার অনুমতি নেই। তারা হাজিগণ ও অন্যদের কাছে সামান বেচাকেনা করে।

অবশেষে আমাদের কাফেলা উলা থেকে রওনা হলো। পরদিন সকালে আমরা পৌঁছুলাম উতাস উপত্যকায়। এখানে প্রচণ্ড গরম ছিল। প্রাণবিনাশী মরুঝড় এখানে নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। বছরখানিক আগে এখানে মরুঝড়ের কবলে পড়ে একটি বিশাল কাফেলার সিংহভাগ সদস্য নিহত হয়েছিল। ওই বছরটি সবার মুখে মুখে 'আমির জালেকির বছর' নামে পরিচিত।

আমাদের কাফেলা সেখান থেকে রওনা হয়ে 'হুদ্দায়াহ' নগরীতে পৌঁছুলো। যা একটি উপত্যকার ধারে অবস্থিত। এখানকার বৈশিষ্ট্য হলো, অল্প মাটি খুঁড়লেই নিচ থেকে পানি বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেই পানি লবণাক্ত হয়ে থাকে।

মদিনা মুনাওয়ারা ও হারাম শরিফে

লবণাক্ত পানির হুদ্দায়া নগরী থেকে রওনা হলাম। আমাদের কাফেলা একাধারে তিন দিন পথ চলল। অবশেষে আমরা দূর দিগন্তে মদিনা মুনাওয়ারার বাড়িঘরের নিশান দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ শহরের বাইরে অবস্থান করলাম।

এরপর সন্ধ্যানাগাদ হারাম শরিফে প্রবেশ করলাম। আল মাসজিদুল হারামের সামনে দাঁড়াতেই আমাদের সফরের সকল ক্লান্তি মুছে গেল। সালাম জানিয়ে 'বাবুস সালাম'-এর সামনে দাঁড়ালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানে নামায আদায় করলাম। উসতুওয়ানে হান্নানের ধ্বংসাবশেষে চুমু খেলাম। যা নবীজির কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী পিলার থেকে ডান দিকে কেবলামুখী স্থানে অবস্থিত।

এরপর আমরা দু' জাহানের সর্দার, গুনাহগারদের জন্যে সুপারিশকারী, কুরাইশি হাশেমি বংশের গর্বিত মহামানব মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দু বাহুতে শায়িত দু বন্ধু আবু বকর সিদ্দিক রা. ও উমরে ফারুক রা.—সবাইকে সালাম করলাম।

যিয়ারাহ পর্ব শেষে আমরা যখন আমাদের তাবুতে ফিরছিলাম, তখন নেয়ামত প্রাপ্তির পরমানন্দে আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত। আল্লাহর লাখো শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিবিজড়িত মসজিদ ও মদিনা মুনাওয়ারার যিয়ারত করার তাওফিক দিয়েছেন। বারবার এ দোয়া করছিলাম যে, হে আল্লাহ, এই যিয়ারাই যেন শেষ দর্শন না হয়। আল্লাহ আমাদের এই যিয়ারাহকে কবুল করুন এবং আমাদের এই দীর্ঘ যাত্রাকে আল্লাহর রাস্তায় অভিযাত্রা হিসেবে মঞ্জুর করুন।

মসজিদে নববী ও নবীজির রওযা

মসজিদে নববী বেশ লম্বা আয়তনের। চারপাশে মর্মর পাথরের চত্বর। মধ্যখানে ছাদ দিয়ে আবৃত স্থাপনা। মাটিতে কংকর ও বালু বিছানো।

মসজিদকে কেন্দ্র করে চার দিকে পাথরনির্মিত রাস্তা রয়েছে। পাথরগুলো পরস্পরে যুক্ত।

নবীজির কবর হলো, পশ্চিম দিকে কেবলামুখী হয়ে মসজিদে নববীর যুক্ত। নবীজির রওযার আকৃতি এতটাই অভিনব যে, অন্য কিছুর সঙ্গে তার তুলনা চলে না। দুষ্প্রাপ্য মর্মর পাথরের ইমারত। এক পাথরের সঙ্গে অন্য পাথরের সংযুক্তি বেশ বিরল, পবিত্র ও সাম্যপূর্ণ। মিশক ও এ জাতীয় সুগন্ধিযুক্ত মিশ্রণ ব্যবহার করে পাথরগুলোকে জোড় দেওয়া হয়েছে। যার ফলে পুরো স্থাপনা এতটাই মজবুত যে, শত বছর পেরোনোর পরেও কোথাও দুর্বলতা আসেনি। রওযার কেবলা প্রান্তের দেয়ালে একটি রুপার কীলক রয়েছে। লোকজন এই জায়গাটিতে এসে কেবলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রওযামুখী হয়ে সালাম নিবেদন করে থাকে। প্রথমে নবীজির উদ্দেশে সালাম নিবেদন করে। এরপর একটু ডান দিকে সরে সাইয়েদুনা আবু বকর রা.-এর চেহারার দিকে মুখ করে। নবীজির পায়ের কাছে সাইয়েদুনা আবু বকর রা.-এর মাথা। এরপর সামান্য সরে হযরত উমরে ফারুক রা.-এর দিকে মুখ করে। হযরত আবু বকর রা.-এর কাঁধ বরাবর উমর রা.-এর মাথা।

নবীজির রওযার মধ্যখানে মর্মর পাথরের একটি ছোট্ট হাউজ রয়েছে। যার কেবলার প্রান্তে একটি মেহরাব সদৃশ স্থাপনা রয়েছে। কথিত রয়েছে যে, এখানে নবীজির আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা রা.-এর বাড়ি ছিল। এ কথাও লোকমুখে চর্চিত যে, এখানে তাঁর কবর অবস্থিত। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

আবু বকর ও উমর রা.-এর বাড়ি

মসজিদের মাঝখানে একটি দরজার পাল্লা রয়েছে, যেখান থেকে মসজিদের ফ্লোর থেকে অপেক্ষাকৃত নিচুতে একটি পথ নেমে গেছে। বর্তমানে গোলাকার ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। সেখানে যাওয়ার জন্যে সিঁড়ি রয়েছে। এই সিঁড়ির ধাপগুলো মসজিদের বাইরে হযরত আবু বকর রা.-এর বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে। এই নিচু পথ দিয়ে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা রা. নিজ পিতার বাড়িতে যাতায়াত করতেন। সন্দেহ নেই, এটাই সেই ঐতিহাসিক 'খওখাহ' (বড় দরজার মধ্যে ছোট দরজা), যার কথা হাদিসে এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই একটি খওখাহ বহাল রেখে, অন্যগুলো বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর রা.-এর বাড়ির বিপরীত পার্শ্বেই হযরত উমর রা. ও তাঁর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর বাড়ি।

মসজিদের পূব দিকে মদিনার শ্রেষ্ঠ হাদিস বিশারদ ইমাম মালিক বিন আনাস রা.-এর বাড়ি। বাবুস সালামের কাছে একটি 'পানশালা' [সিকায়াহ] রয়েছে। লোকজন সিঁড়ি বেয়ে সেখানে অবতরণ করে থাকে। পানি পানের সেই জায়গাটির নাম 'আইনুয যারকা'। এই কূপের পানি বহমান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে এই মদিনায় আগমন করেন রবিউল আউয়াল মাসের ১৩ তারিখ রাতে। প্রথমে তিনি বনু আমর বিন আউফ গোত্রে অবতরণ করেন। এখানে তিনি ২২ দিন অবস্থান করেন। অন্য বর্ণনানুসারে ১৪ রাত অবস্থান করেন। কেউ কেউ ৪ রাতের কথাও বলেছেন। এরপর তিনি মদিনা নগরীতে প্রবেশ করেন। বনু নাজ্জার গোত্রে হযরত আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর বাড়িতে মেহমান হন। এই বাড়িতে তিনি ৭ মাস অবস্থান করেন। এরপর তিনি নিজের বাড়ি ও মসজিদ নির্মাণ করেন। নির্মাণের আগে মসজিদটি ছিল বনু নাজ্জার গোত্রের মৃত রাফে' বিন আবি উমর বিন আনিদের দু ছেলে সাহল ও সুহাইলের উট পালনের জায়গা। আরবরা সাধারণত বাড়ির পেছনে এক টুকরো খোলা জায়গা রাখতো। যেখানে উট বেঁধে রাখা হতো। এটাকে মিরবাদ বলে। বাবাহারা এই দু' ছেলে হযরত আসআদ বিন যুরারাহ রা.-এর অধীনে প্রতিপালিত হচ্ছিল। অন্য বর্ণনানুসারে তারা ছিল হযরত আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর আশ্রিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই জায়গাটি কিনে নেন। অন্য বর্ণনানুসারে আবু আইয়ুব রা. তাদের দুজনের কাছ থেকে সম্মতি গ্রহণ করেন। অপর বর্ণনামতে, তারা দুজন নবীজিকে উপহার দিয়েছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। এই নির্মাণ কাজে সাহাবায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে তারা চতুষ্কোণ আকৃতির একটি ঘর নির্মাণ করে চারদিকে দেয়াল তোলেন। সেই ঘরের উপরে কোনো ছাদ ছিল না। পিলারও ছিল না। দৈর্ঘ্য একশ গজ, প্রস্থও অনুরূপ। কারো মতে, প্রস্থ খানিকটা কম ছিল। চারপাশের দেয়ালের উচ্চতা ছিল মানবদেহের কাঁধ বরাবর।

কিছুদিন পর গরমকাল চলে এলে সাহাবায়ে কেরাম ছাদ দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। তখন তারা খেজুরের কাণ্ড তুলে এনে

মসজিদের মাঝখানে কয়েকটি পিলার স্থাপন করলেন। আর তার ডালপালা দিয়ে ছাদ বানালেন।

কিছু দিন পর এলো বর্ষাকাল। যার ফলে ছাদ থেকে ভেতরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তো। এজন্যে তারা মাটির খামিরা তৈরি করে তা দিয়ে ছাদ বানালেন। ছাদ এতটা নিচু ছিল যে, কেউ দাঁড়ালে মাথায় লেগে যেত।

প্রথম দিকে মসজিদের তিনটি দরজা ছিল। কেবলা পরিবর্তিত হলে দক্ষিণের দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনকাল ও আবু বকর রা.-এর পুরো শাসনকাল জুড়ে মসজিদটি ঠিক এ অবয়বে বহাল ছিল।

উমর রা. খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হবার পর মসজিদের আয়তন সম্প্রসারণ করেন। তিনি বলতেন, 'আমি যদি প্রিয়নবীর মুখ থেকে এ কথা না শুনতাম যে, মসজিদের সম্প্রসারণ প্রয়োজন, তাহলে কখনই আয়তন বৃদ্ধি করতাম না।' তিনি গাছের পিলার সরিয়ে কাঁচা ইটের পিলার স্থাপন করেন। মানুষের কাঁধ সমান উচ্চতা পর্যন্ত পাথরের ভিত তৈরি করেন। এই সম্প্রসারিত মসজিদের জন্যে তিনি ছয়টি দরজা রাখেন। কেবলার দিক ব্যতিরেকে অবশিষ্ট তিন দিকে দুটি করে দরজা রাখেন। একটি দরজাকে নির্দিষ্ট করে দিয়ে বলেন, 'শুধু মহিলারা এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।' উমর রা.-এর মৃত্যু পর্যন্ত মসজিদ এ অবয়বে ছিল।

উমর রা.-এর ইচ্ছা ছিল, নবীজির চাচা হযরত আব্বাস রা.-এর জায়গা পর্যন্ত মসজিদ সম্প্রসারণ করবেন। কিন্তু তাঁর অমত থাকায় তিনি তা করতে পারেননি। আব্বাস রা.-এর জায়গা থেকে একটি নল বেয়ে বৃষ্টির পানি এসে মসজিদে ঝরতো। উমর রা. তা অপসারণ করেন। ফলে এ নিয়ে ঝগড়া বেধে যায়। উভয়ে তখন হযরত উবাই বিন কা'ব রা.-এর কাছে বিচার প্রার্থনা করেন। এ উদ্দেশ্যে তারা দুজন তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হন। এ সময় উবাই বিন কাব রা.-এর বাড়ির ভেতর থেকে বের হতে এক ঘণ্টা বিলম্ব হয়ে যায়। তিনি এসে বলেন, 'আমার এক বাঁদি আমার মাথা ধুয়ে দিচ্ছিল। এজন্যে বের হতে বিলম্ব হয়েছে।'

প্রথমে উমর রা. কথা বলতে শুরু করলে উবাই রা. তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'আপনি আবুল ফজলকে আগে কথা বলতে দিন। কারণ, তিনি নবীজির কাছে পরম সম্মানিত ছিলেন। তখন আব্বাস রা. বলেন, 'এই ঘর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্যে বরাদ্দ করেছেন। এবং আমার সঙ্গে তিনি এই বাড়ির নির্মাণ কাজ করেছেন। এই বৃষ্টির নালা যখন আমি নির্মাণ করেছিলাম, তখন আমার পাজোড়া রাসূলের কাঁধের ওপর ছিল। এখন উমর এসেছে, তা ভেঙে মসজিদের কাজ সম্প্রসারণ করতে।'

তখন উমর রা. বলেন, 'আপনি আমার কাঁধের ওপর আপনার পা রেখে নালাটি পুনরায় স্থাপন করুন।' আব্বাস রা. তাই করলেন। এরপর বললেন, 'আপনি যেহেতু এখন আমার ইচ্ছার প্রতি সম্মান ব্যক্ত করেছেন, এজন্যে আমি আল্লাহর জন্যে সদকা করে দিলাম।' তখন উমর রা. পুনরায় তা ভেঙে দেন এবং জায়গাটি মসজিদে যুক্ত করেন।

পরবর্তীকালে হযরত উসমান রা. মসজিদের জায়গা আরো সম্প্রসারণ করেছেন। সেই পথ ধরে ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকও সম্প্রসারণ করেছেন। তিনি উমর ইবনে আবদুল আজিজের হাতে সেই দায়িত্বভার তুলে দিয়েছিলেন। এভাবে যুগে যুগে অসংখ্য সুলতান ও গভর্নর মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ, নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধনের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিবিজড়িত মিম্বার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারে ৩টি ধাপ ছিল। সবচেয়ে উপরের ধাপে নবীজি বসতেন। এ সময় মাঝখানের ধাপে তিনি দু' পা রাখতেন। নবীজির ইন্তেকালের পর যখন সাইয়েদুনা আবু বকর রা. খলিফা হন তখন তিনি মাঝখানের ধাপে বসতেন এবং নিচের ধাপের ওপর পা রাখতেন। এরপর যখন সাইয়েদুনা উমরে ফারুক রা. খলিফা হন তখন তিনি প্রথম ধাপের ওপর বসতেন আর মাটিতে পা রাখতেন। উসমান রা. খলিফা হওয়ার পর প্রথম দিকে এভাবেই বসতেন। কিন্তু শেষ বয়সে এসে তিনি উপরের ধাপে বসতেন।

হযরত মুআবিয়া রা. খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হবার পর এই ঐতিহ্যবাহী মিম্বার মদিনা থেকে শামদেশে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন মদিনার জনগণ এর বিরুদ্ধে প্রচুর হৈ চৈ করেন। এ সময় তুমুল ঝড় শুরু হয়ে যায়। সূর্যগ্রহণ দেখা দেয়। অন্ধকারের কারণে দিনের বেলায় আকাশে চাঁদ দেখা যায়। প্রচণ্ড ধূলিঝড়ের কারণে একজন অন্যজনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকে। খালি চোখেও রাস্তা দেখা যাচ্ছিল না।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এই মারাত্মক চিত্র দেখতে পেয়ে সাইয়েদুনা মুআবিয়া রা. পূর্বের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। এ সময় তিনি ওই মিম্বারে নিচে আরো ছয়টি ধাপ যুক্ত করেন। এর ফলে তা নয় ধাপ বা নয় সিঁড়ির মিম্বারে পরিণত হয়।

বর্তমানে যা মসজিদে নববীর খতিবের দায়িত্ব পালন করছেন

আমি যখন মদিনা মুনাওয়ারায় আসি তখন মসজিদে নববীর ইমামের দায়িত্ব পালন করছিলেন ইমাম বাহাউদ্দিন সালামাহ। তিনি মিসরের শীর্ষ আলেম ছিলেন। তাঁর সহকারী ইমাম পদে ছিলেন দুনিয়াবিবাগী তাপস শায়খ আজিজুদ্দিন ওয়াসেতি। তাঁর মাধ্যমে ইসলামের অসাধারণ খেদমত হচ্ছে। তাঁর আগে এ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন সিরাজুদ্দিন উমর মিসরি।

উল্লেখ্য, এই সিরাজুদ্দিন মিসরি একাধারে চল্লিশ বছর মদিনার বিচারক ও মসজিদে নববীর খতিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর যখন তিনি মিসরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তিনবার নবীজিকে স্বপ্নে দেখতে পান। প্রতিবার স্বপ্নে এসে নবীজি তাঁকে মদিনা ছেড়ে চলে যেতে বারণ করেন। আর বলেন, 'তোমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে।' এরপরও তিনি নিজ সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসেননি।

মিসরের উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু সেখানে পৌঁছুনোর আগেই তিন মনযিল পথ অতিক্রম করার পর সুওয়াইস নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। এমন মৃত্যু থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

তার সহকারীর দায়িত্ব পালন করতেন ফকিহ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ফারাহুন রহ.। তাঁর বংশধররা এখনো মদিনাতে বাস করেন। এই শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মালেকি মাযহাবের মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। পাশাপাশি সহকারী বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি মূলত তিউনিসিয়া বংশোদ্ভূত।

মসজিদের নববীর মুয়াযযিন ও খাদেম

প্রচুর হাবশি যুবক মসজিদে নববীর খাদেমের দায়িত্ব পালন করছে। এঁদের মধ্য হতে যিনি প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন, তাকে 'শাইখুল খুদ্দাম' বলা হয়। চেহারায়-অবয়বে তিনি যেমন সুন্দর, তেমনি পোশাক-

পরিচ্ছেদও যথেষ্ট শালীন। চেহারা-সুরত ও পোশাক-আশাকে তাকে মদিনার গভর্নর হবে। তাঁর জন্যে মিসর ও শাম প্রশাসন কর্তৃক বেতন-ভাতা নির্ধারিত রয়েছে। প্রতিবছর যথাসময়ে যা তার কাছে পৌঁছে যায়।

মসজিদে নববীর মুয়াযযিনের সংখ্যাও কম নয়। তাঁদের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন বিদগ্ধ আলিমে দীন ও হাদিস বিশারদ জামালুদ্দিন মাতারি। যিনি মূলত মিসরের মাতরাতাহ অঞ্চলের অধিবাসী। তাঁর ছেলে নাহিফুদ্দিন আব্দুল্লাহও যোগ্য আলেমে দীন।

মসজিদের নববীতে যে সকল বুযুর্গ ও জ্ঞানতাপস বাস করতেন

বিখ্যাত বুযুর্গ ও জ্ঞানতাপস আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মাদ মারজুক নামের একজন মনীষীর সুনাম লোকমুখে বেশ চর্চিত। একদিকে তিনি প্রচুর ইবাদত করেন, অন্যদিকে সারাবছর রোযা রাখেন। তাঁর ইখলাস ও সবর প্রবাদপ্রতীম। দীর্ঘ দিন মক্কা মুকাররমাতে বাস করেছেন। আমি তাঁকে ৭২৮ হিজরিতে মক্কা মুকাররমাতে দেখেছি। তাঁর মতো দীর্ঘ সময় তাওয়াফ করতে আমি কাউকে দেখিনি। আমি বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে তাঁর তাওয়াফের দৃশ্য দেখতাম। তখন ছিল প্রচণ্ড গরম কাল। পুরো মাতাফ জুড়ে কালো পাথর বিছানো। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে সেই পাথরগুলো জ্বলন্ত তাওয়ার মতো গরম হয়ে থাকত। আমি নিজ চোখে দেখেছি যে, খাদেমরা যখন সেই পাথরের মেঝের ওপর পানি ছুড়ত, তখন সেই পানি যেখানে পড়ত, সেখানকার পাথরই তা চুষে নিত। এক বিঘত সামনে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ ছিল না। যাদেরকে আল্লাহ তাওফিক দিতেন, তারা পায়ে অন্তত চামড়ার পুরো মোজা পরে তাওয়াফ করত। কিন্তু আমাদের সবাইকে বিস্মিত করে এমন প্রচণ্ড গরমের ভেতরেও শায়খ আবুল আব্বাস বিন মারজুক খালি পায়ে তাওয়াফ করতেন।

একদিনের ঘটনা। তাকে এভাবে তাওয়াফ করতে দেখে আমার মনের ভেতর ইচ্ছা জাগল যে, তাঁর সঙ্গে আমিও তাওয়াফে নেমে পড়ব। সে মোতাবেক তার সঙ্গে তাওয়াফ শুরু করে দিলাম। হজরে আসওয়াদে চুমু খেতে গেলাম। স্পর্শ করার সময় মনে হলো, কেউ আমাকে ঝাঁকি দিল। এই একবার চুমু খাওয়ার পর তাওয়াফের বাকিটা সময়ে মনের শত ইচ্ছা সত্ত্বেও হজরে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস হয়নি। তাওয়াফ

শেষে যখন ছাদঢাকা অংশে ফিরে আসার ইচ্ছা করি, তখন পুরোটা পথ পায়ের নিচে কম্বল ফেলে ফেলে তার উপর দিয়ে আমাকে ফিরতে হয়েছে।

ওই সময় গ্রানাডার উযির সেখানকার শীর্ষ আলেম ও বুযুর্গদের একটি কাফেলা নিয়ে মক্কায় এসেছিলেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন আবুল কাসিম বিন মুহাম্মাদ। যিনি ফকিহ আবুল হাসান সাহল বিন মালিক আযদির পৌত্র। তিনি প্রতিদিন ৪৯০ বার তাওয়াফ করতেন। তার মতো বুযুর্গও প্রচণ্ড গরমের কারণে দুপুরে তাওয়াফ করতে পারতেন না। কিন্তু ইবনে মারজুক রহ. সেই তীব্র গরমের ভেতরেও দুপুরে তাঁর অধিক তাওয়াফ করতেন।

মদিনার আরেকজন বুযুর্গ হলেন, অধিক ইবাদতকারী বুযুর্গ সাঈদ আল মারাকেশি। আরেকজন হলেন, শায়খ আবু মাহদি ঈসা মিকনাসি। আরেকজন হলেন, আবু মুহাম্মাদ শারাবি। তিনি চমৎকার তেলাওয়াত করতেন। সে বছর তিনি মক্কা মুকাররমাতেও অবস্থান করেছিলেন। এখানে তিনি যোহর নামাযের পর কাজি ইয়ায রহ. এর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'আশ-শিফা' পড়াতেন। পাশাপাশি তারাবির নামাযে ইমামতি করতেন।

আরেকজন বুযুর্গ হলেন, বিশিষ্ট ফিকাহবিদ আবুল আব্বাস ফা'সি। তিনি এখানকার মালেকি মাযহাবের মাদরাসার শিক্ষক। তিনি আরেকজন বুযুর্গ শায়খ শিহাবুদ্দিন যারনাদির মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন।

মদিনার গভর্নর চাচাকে হত্যা করে রক্ত দিয়ে অযু করেছিল

কুবাইশি বিন মানসুর ছিলেন মদিনার গভর্নর। এই লোক নিজের চাচাকে হত্যা করেছিল। কথিত রয়েছে যে, খুন করার পর নিহতের রক্ত দিয়ে অযু করেছিল। কিছু দিন সেই কুবাইশি ৭২৭ হিজরির কোনো এক দিনে প্রচণ্ড গরমের ভেতরে কোনো কারণে সাথীদের সঙ্গে নিয়ে প্রান্তরে বেরোয়। ওই সময় সঙ্গে সাথীরা গরমের কারণে পেরেশান হয়ে বিভিন্ন গাছের নিচে ছড়িয়ে পড়ে। ওদিকে নিহত চাচার এক ছেলে সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে ছিল। কয়েকজন ক্রীতদাসকে সঙ্গে নিয়ে সে হাজির হয়ে যায়। আক্রমণ করে কুবাইশি ইবনে মানসুরকে হত্যা করে এবং তার রক্ত চেটে খেয়ে ফেলে।

মদিনার বাইরের এলাকা

মদিনার বাইরের একটি বিশ্ববিখ্যাত জায়গা হলো, বাকিউল গারকাদ। যা মদিনা নগরীর পূবদিকে অবস্থিত। যিয়ারতকারীগণ সাধারণত যেই দরজা

দিয়ে যাতায়াত করে থাকেন, তার নাম 'বাবুল বাকি'। এই দরজা দিয়ে বের হলেই বাম দিকের সর্বপ্রথম কবরটি হলো হযরত সফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব রা.-এর মাজার। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুপু ও বিখ্যাত সাহাবি যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.-এর জননী।

তার ঠিক সামনেই মদিনার প্রবাদপ্রতীম ইমাম হযরত মালিক বিন আনাস রা.-এর কবর। বর্তমানে তার ওপর একটি গম্বুজ বিশিষ্ট ছোট্ট ইমারত রয়েছে। এর সামনেই নববী পরিবারের সংক্ষিপ্ত হায়াতের সন্তান, নবীজির সাহেবযাদা হযরত ইবরাহিম রা.-এর কবর। তার ওপর একটি সাদা গম্বুজ রয়েছে। গম্বুজের ডানপ্রান্তে হযরত উমর রা.-এর ছেলে আবদুর রহমানের কবর। তিনি আবু শাহমাহ নামে পরিচিত ছিলেন। এর বিপরীত দিকে হযরত আকিল বিন আবি তালেব রা. ও হযরত জাফর বিন আবি তালেব রা.-এর কবর।

এই কবরগুলোর বিপরীত প্রান্তে একটি বাগান রয়েছে। সেখানে একাধিক উম্মুল মুমিনিন রা.-এর কবর রয়েছে। এর পাশে আরেকটি বাগান রয়েছে। সেখানে নবীজির চাচা হযরত আব্বাস বিন আবি তালেব রা. ও হযরত হাসান বিন আলী রা.-এর কবর। এই কবরের ওপর একটি উঁচু মজবুত গম্বুজ রয়েছে। বাবুল বাকি থেকে কেউ বের হলে হাতের ডান পাশে এই কবরগুলোর দেখা পাবে। হযরত আব্বাস রা.-এর পায়ের দিকে হযরত হাসান রা.-এর মাথা। এই দুজনের কবর মাটির সমতল থেকে বেশ উঁচুতে অবস্থিত। সুন্দর কারুকার্য খচিত কাঠের সিন্দুকের ওপর পিতলের প্রলেপ মাখা।

এই বাকি গোরস্থানে নাম জানা-অজানা অসংখ্য মুহাজির ও আনসার সাহাবির কবর রয়েছে। এখানে যাদের কবর অবস্থিত, তাদের সিংহভাগের নাম অজানা। বাকি গোরস্থানের সর্বশেষ প্রান্তে আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান বিন আফফান রা.-এর কবর অবস্থিত। যার ওপর অনেক বড় গম্বুজ রয়েছে। তার কবরের কাছেই হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ বিন হাশিম রা.-এর কবর অবস্থিত, যিনি হযরত আলী বিন আবি তালিব রা.-এর জননী।

কুবা নগরী

মদিনার শহরতলীর আরেকটি ঐতিহাসিক জায়গা হলো কুবা নগরী। মদিনা থেকে কেবলার দিকে প্রায় দু' মাইল দূরত্বে অবস্থিত। মাঝখানে পথটুকুর সবটা জুড়ে অজস্র খেজুর বাগান। এখানেই সেই ঐতিহাসিক মসজিদ অবস্থিত, যার সম্পর্কে কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে যে, এই মসজিদ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাকওয়ার বুনিয়াদের ওপর নির্মিত। চতুর্ভুজ আকৃতির মসজিদ। যার সাদা ধবধবে মিনার অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে।

এই মসজিদের মধ্যখানেই সেই ঐতিহাসিক জায়গা, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রি বসেছিল। মানুষ বরকতের উদ্দেশ্যে এখানে নামায পড়ে থাকে। মসজিদের উঠানে কেবলামুখী করে একটি মেহরাব রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেই সর্বপ্রথম নামায আদায় করেছিলেন। মসজিদের কিবলাপ্রান্তে একটি বাড়ি রয়েছে, যার মালিক ছিলেন হযরত আবু আইয়ুব আনসারি রা.। তার আশপাশে আরো অনেকগুলো বাড়ি রয়েছে, যেগুলো হযরত আবু বকর, উমর, ফাতেমা ও আয়েশা রা.-এর বাড়ি বলা হয়ে থাকে।

ঠিক বিপরীত প্রান্তেই সেই ঐতিহাসিক 'আরিস' কূপ অবস্থিত, যার পানি পূর্বে বিস্বাদ ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার ভেতরে নিজ থুথু নিক্ষেপ করেন, তারপর থেকে সেটি সুমিষ্ট হয়ে যায়। হযরত উসমান রা.-এর আংটি এখানেই পড়ে গিয়েছিল।

মদিনার বাইরে আরেকটি ঐতিহাসিক জায়গা হলো হজরুয যায়ত গম্বুজ। কথিত রয়েছে যে, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে পাথর থেকে তেল বেরিয়েছিল। এর উত্তর দিকে ঐতিহাসিক বুদাআহ কূপ অবস্থিত। আর বিপরীত দিকে শয়তানের পাহাড়। অহুদ যুদ্ধের দিন শয়তান এই পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'আমি তোমাদের নবীকে হত্যা করেছি।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাব যুদ্ধের সময় যেই পরীখা খনন করিয়েছিলেন, তার পাড়ে এখন একটি অনাবাদ কেল্লা রয়েছে। যা 'অবিবাহিতদের কেল্লা' নামে পরিচিত। কথিত রয়েছে যে, উমর রা. মদিনার অবিবাহিতদের বসতভিটা হিসেবে এই কেল্লা নির্মাণ করিয়েছিলেন।

এই কেল্লার সামনের দিকে পূর্বপ্রান্তে ঐতিহাসিক 'রুমা কূপ' অবস্থিত। আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান রা. তৎকালীন বিশ হাজার দিরহাম মূল্যে সেই কূপের অর্ধেক মালিকানা ক্রয় করে মুসলিমদের জন্যে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

মদিনার আরেকটি দর্শনীয় ঐতিহাসিক স্থান হলো, অহুদ পাহাড়। এই সেই ঐতিহাসিক অহুদ পাহাড়, যার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই অহুদ আমাদের ভালোবাসে; আমরাও তাকে ভালোবাসি।' মদিনা নগরী থেকে এক ফারলং দূরত্বে উত্তর দিকে অবস্থিত। তার ঢালেই অহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবরস্থান। এখানে শায়িত আছেন প্রিয়নবীর প্রিয় চাচা হযরত হামযা রা.। তার পাশে অহুদ যুদ্ধের অন্যান্য বীর শহীদদের কবর। পুরো কবরস্থান অহুদের কেবলার দিকে অবস্থিত। অহুদের পথে অনেকগুলো ছোট ছোট মসজিদ রয়েছে। একটি হলো মসজিদে আলী রা.। আরেকটি মসজিদে সালমান ফারসি রা.। আরেকটি মসজিদের নাম, 'মাসজিদুল ফাতহ'। এখানেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সূরা ফাতহ অবতীর্ণ হয়েছিল।

এই সফরে আমি মদিনা নগরীতে চার দিন অবস্থান করেছি। প্রতি রাতে মসজিদে নববিতে রাত্রিযাপন করেছি। মসজিদের চত্বরে লোকজন বৃত্ত বানিয়ে বসে। চারপাশে প্রচুর প্রদীপ জ্বলে। কেউ কুরআন কারিমের খণ্ড খণ্ড পারা তুলে নিয়ে তেলাওয়াত করছে। কেউ ধ্যানচিত্তে আল্লাহর যিকির করছে। কেউ প্রিয়নবীর রওযা শরিফের দিকে তাকিয়ে পুরো রাত কাটিয়ে দিচ্ছে। চতুর্দিকে লোকজন গুনগুন আওয়াজে নবীজির প্রশংসায় মনের মাধুরি মিশিয়ে নাত পড়ে চলেছে। এখানে এসে মানুষের মন এতটাই গলে যায় যে, তারা মুক্ত হস্তে প্রচুর দানখয়রাত করে থাকে। সবার সঙ্গে ভালো আচরণ করে।

এই সফরে আমার সঙ্গে বেশ কজন গুণী ব্যক্তিত্ব সহযাত্রী হয়েছিলেন। তাদের একজন হলেন শামের বিখ্যাত আলেম শায়খ মানসুর বিন শাকল। তিনি মদিনাতে আমার আতিথেয়তা করেছেন। এরপরে আমরা একসাথে আলেপ্পো ও বুখারা সফর করেছি। মদিনায় আমার সঙ্গে আরো ছিলেন, যায়দিয়া ফেরকার বিচারপতি শারফুদ্দিন কাসিম বিন শিনান। গ্রানাডার অনেক সুফি সাধকও আমার সঙ্গে ছিলেন। তাদেরই একজন, শায়খ আলী

বিন হাজার উমাবি। আমরা যখন মদিনায় পৌঁছি তখন এই আলী বিন হাজার আমার কাছে এসে বলেন, 'আমি আজ রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আমি কিছু কথা বলব। তা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও মুখস্থ রাখবে।

هنيئا لكم يا زائرين ضريحه أمنتم به يوم المعاد من الرجس
وصلتم إلى قبر الحبيب بطيبة فطوبى لمن يضحي بطيبة أو يمسى

'হে রাসূলের রওযা যিয়ারতকারীগণ, অভিনন্দন গ্রহণ করো। তোমরা কেয়ামত দিবসের সকল পঙ্কিলতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলে।

তোমরা মদিনাতে প্রেমাস্পদের কবর পর্যন্ত পৌঁছেছ। মুবারক হোক ওই ব্যক্তি, যে সকাল বা সন্ধ্যা মদিনাতে অবস্থান করে।'

আলী বিন হাজার আমার সঙ্গে মদিনায় এসেছিলেন। এরপর ৭৪৩ হিজরিতে যখন তিনি হিন্দুস্তানের রাজধানী দিল্লিতে আসেন, তখন আমার প্রতিবেশে উঠেছিলেন। আমি তার সেই স্বপ্নের কথা এখানকার সুলতানের সামনে তুলে ধরি। তখন তিনি তাকে উপস্থিত হতে বলেন। সেমতে তিনি নিজে হাজির হয়ে সেই ঘটনা তুলে ধরেন। যা শুনে সুলতান অত্যন্ত প্রীত হন। তার সাথে ফার্সি ভাষায় সৌহার্দ্যপূর্ণ কথাবার্তা বলেন। তার সম্মানে তিনি আতিথেয়তা করেন এবং তিনশ খাঁটি স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন। পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে তুলনা করলে এখানকার একটি খাঁটি স্বর্ণমুদ্রা সে অঞ্চলের আড়াই স্বর্ণমুদ্রার সমান। এছাড়াও সুলতান তাকে উন্নত জিনপোশ ও লাগাম দিয়ে সজ্জিত একটি ঘোড়া ও এক সেট পোশাক উপহার দেন। পাশাপাশি প্রাত্যহিক ভাতা ঘোষণা করেন।

এখানে আমাদের সঙ্গে গ্রানাডার একজন গুণী ফকিহ ছিলেন। যার জন্ম হয়েছিল বাজায়া নগরীতে। সবাই তাকে জামালুদ্দিন মাগরিবি নামে চিনত। আলী বিন হাজারের সঙ্গে বসবাস করতেন। তার সঙ্গে আলী বিন হাজার অঙ্গীকার করেছিলেন যে, নিজের মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দেবেন। এজন্যে তার বাড়ির বাইরে আরেকটি ছোট্ট ঘর তুলে সেখানে জামালুদ্দিনের থাকার বন্দোবস্ত করেন। আর একজন গোলাম ও একজন বাঁদি কিনে নিয়ে আসেন। সুলতান তাকে যেই স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন, সেগুলো তিনি নিজের বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখতেন। কারো প্রতি আস্থা রাখতে পারছিলেন না।

ঘটনাক্রমে সেই গোলাম ও বাঁদি পরস্পরে শলাপরামর্শ করে সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো চুরি করে পালিয়ে যায়। আলী বিন হাজার বাহির থেকে ঘরে ফিরে এসে দেখতে পান যে, সেই গোলাম-বাঁদির একজনকেও দেখা যাচ্ছে না। ওদিকে সবগুলো স্বর্ণমুদ্রাও খোয়া গেছে। এই শোকে তিনি মুহ্যমান হয়ে বিছানায় পড়ে যান। নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দেন। দিনে দিকে রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকে।

নিরুপায় হয়ে আমি তার দুরাবস্থার কথা সুলতানের কাছে তুলে ধরি। সুলতান তখন তাকে সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে লোকমারফত প্রেরণ করেন। সুলতানের প্রতিনিধি সেই উপহার নিয়ে তার ঘরের সামনে এসে দেখতে পান যে, তিনি ততক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন।

মদিনা থেকে মক্কা অভিমুখে

অতঃপর চলে আসে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা অভিমুখে সফরের কাঙ্ক্ষিত লগ্ন। জুল হুলাইফা মসজিদের নিকটে আমরা অবতরণ করি। যেখান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের কাপড় পরিধান করেছিলেন। এখান থেকে মদিনা মুনাওয়ারার দূরত্ব পাঁচ মাইল। এটিই মদিনার হেরেম তথা পবিত্র সীমানার শেষ প্রান্ত। কাছেই আল আকিক উপত্যকার অবস্থান। সেখানে আমি পরনের সেলাইকৃত কাপড় খুলে গোসল সেরে ইহরামের কাপড় পরিধান করে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে নিই। শুধু হজের নিয়ত করেই আমি ইহরামের কাপড় পরিধান করি। এরপর সমতল ও পাহাড়ি ভূমিতে চলাচল ও উঠা-নামার মুহূর্তে আমি অনবরত তালবিয়া পাঠে মগ্ন থেকেছি। এভাবে একপর্যায়ে শিআবে আলীতে এসে উপনীত হই এবং সেই রাতে এখানেই অবস্থান করি।

অতঃপর এখান থেকে যাত্রা করে আমরা আর রাওহায় অবতরণ করি। এখানে বিরু জাতিল আলামি নামক একটি প্রসিদ্ধ কূপ রয়েছে। কথিত আছে, আলী রা. এখানে জিনদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

এরপর আবার যাত্রা করে আমরা আস সাফরা নামক জনবহুল উপত্যকায় অবতরণ করি। এখানে পর্যাপ্ত পানি, খেজুরগাছ, ঘরবাড়ি এবং একটি প্রাসাদও রয়েছে। যেখানে হাসান রা.-এর বংশধর অভিজাত ব্যক্তি ও

অন্যান্যরা বসবাস করে। এখানে বড় একটি দুর্গও রয়েছে। যার পাশেই রয়েছে আরো কিছু ছোট ছোট দুর্গ এবং নিরবচ্ছিন্ন জনপদ।

পুনরায় যাত্রা করে আমরা অবতরণ করি ঐতিহাসিক বদর প্রাঙ্গণে। যেখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছিলেন মহিমান্বিত বিজয়। পূরণ করেছিলেন তার পবিত্র প্রতিশ্রুতি। চূর্ণ করে দিয়েছিলেন মুশরিক নেতাদের দম্ভের প্রাসাদ। এটি এখন ঘন খেজুর বৃক্ষের সারিতে আচ্ছাদিত মনোরম একটি গ্রাম। এখানে রয়েছে একটি সুরক্ষিত দুর্গ। পাহাড়ের বুক চিড়ে বের হওয়া উপত্যকার মধ্য দিয়ে এই দুর্গে প্রবেশ করতে হয়। এছাড়াও বদরে রয়েছে একটি প্রবহমান ঝরনা, যার পানি বিভিন্ন স্থানে প্রবাহিত হয়। আরো আছে সেই গর্তের স্থান, যেখানে আল্লাহর শত্রু মুশরিকদের লাশগুলোকে দাফন করা হয়েছিল। বর্তমানে এটি একটি বাগান। এর পিছনেই রয়েছে মুসলিম শহীদগণের কবরের স্থান এবং ঐতিহাসিক জাবালে রহমত, যার পৃষ্ঠে ফেরেশতাগণ অবতরণ করেছিলেন। সাফরা যাওয়ার পথে বামদিকে এই পাহাড়টির অবস্থান। এর পাশেই রয়েছে জাবালুত তুবুল নামক আরেকটি পাহাড়। এটি বালিমাটির দীর্ঘকায় টিলার মতো দেখতে। এখানকার লোকদের ধারণা, তারা প্রতি শুক্রবার রাতে এখানে তবলা বাজানোর মতো আওয়াজ শুনতে পায়। বদর যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ছাউনির নিচে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করেছিলেন, সেটির অবস্থান এই জাবালুত তুবুলের পাদদেশেই। এর সম্মুখ প্রান্তরেই হয়েছিল মুখোমুখি লড়াই। মুশরিকদের লাশ দাফনকৃত গর্তের স্থানে গজিয়ে উঠা খেজুর বাগানের কাছেই রয়েছে একটি মসজিদ। কথিত আছে, এখানেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রী বসে পড়েছিল। বদর ও আস সাফরার মধ্যকার দূরত্ব এক বারিদ। পর্বতমালা, ঝরনা এবং খেজুর বাগানবেষ্টিত মনোরম এক পথের মধ্য দিয়ে এই দুই স্থানে যাতায়াত করা হয়।

বদর থেকে কুখ্যাত আল বাজওয়া মরুভূমির মধ্য দিয়ে শুরু হয় আমাদের পরবর্তী যাত্রা। এই মরুভূমিতে এসে পথপ্রদর্শকরাও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। সঙ্গীকে ফেলে চলে যায় অপর সঙ্গী। তিনদিনের এই পথের শেষ হয় রাবিগ উপত্যকায় গিয়ে। এখানে বৃষ্টির পানি জমে পুকুরের মতো সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই পানি অক্ষত থাকে। এখান থেকে একটু সামনেই আল

জুহফা থেকে মিসর ও মাগরিব অঞ্চলের হাজিগণ ইহরামের কাপড় পরিধান করেন।

রাবিগ থেকে তিনদিনের যাত্রা শেষে আমরা খুলাইসে পৌঁছাই। পথে আমরা আস-সাওয়িক গিরিপথ অতিক্রম করি। খুলাইস থেকে অর্ধদিবস দূরত্বে অবস্থিত এই গিরিপথটি খুবই বালুকাময়। হাজিগণ এখানে এসে ছাতু খেয়ে থাকেন। মিসর ও শাম অঞ্চল থেকে তারা এই ছাতু সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। চিনির সঙ্গে মিশিয়ে এই পানীয় পান করা হয়। আমির-উমারা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই ছাতু দিয়ে হাউজ ভর্তি করে রাখেন এবং লোকদেরকে খাওয়ান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ঘটনা স্মরণ করে তারা এমন করে থাকেন। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর সাহাবিদের কারো সঙ্গেই কোনো খাবার ছিল না। তাই তিনি এখানকার বালু হাতে নিয়ে সাহাবিদেরকে দেন। তারা তা খেয়ে ছাতুর মতো স্বাদ অনুভব করেন।

অতঃপর আমরা খুলাইসের জলাশয়ের কাছে অবতরণ করি। ঘন খেজুর গাছবেষ্টিত বিস্তীর্ণ এক সমতল ভূখণ্ডে এর অবস্থান। কাছেই পাহাড়ের পৃষ্ঠে রয়েছে সুরক্ষিত একটি দুর্গ। আর সমতলে রয়েছে প্রাচীন একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এখানে আছে প্রবহমান একটি ঝরনা। এর পানি চাষক্ষেত্র পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার জন্য জমিনে অনেকগুলো গর্ত খনন করা হয়েছে। খুলাইসের প্রশাসক হাসান রা.-এর বংশধর অভিজাত এক ব্যক্তি। এই অঞ্চলের বেদুইন আরবরা এখানে বিরাট একটি বাজার জমিয়েছে। যেখানে তারা বকরি, খেজুর ও বিভিন্ন তরি-তরকারি বিক্রি করে থাকে।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য উসফান। পর্বতমালায় বেষ্টিত বিস্তীর্ণ এক ভূখণ্ডজুড়ে এর অবস্থান। এখানে রয়েছে অনেক কূপ ও প্রবহমান পানির উৎস। তন্মধ্য হতে একটি কূপকে উসমান রা.-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। খুলাইস থেকে অর্ধদিনের দূরত্বে রয়েছে উসমান রা.-এর নামে নামকরণকৃত দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ। সেখানেই একটি স্থানে সিঁড়ি আকৃতির একটি করিডোর এবং পুরাতন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। আরো রয়েছে আলী রা.-এর নামে নামকরণকৃত একটি কূপ। কূপগুলোর মধ্যে এটিকেই সবচেয়ে নতুন ছিল বলে ধারণা করা হয়। উসফানে আরো রয়েছে সুরক্ষিত

একটি দুর্গ এবং উঁচু একটি টাওয়ার। যেটি এখন প্রায় ধ্বংসের মুখে। প্রচুর পরিমাণে দুম গাছের দেখা পাওয়া যায় এখানে।

উসফান থেকে যাত্রা করে আমরা অবতরণ করি বাতুন মার নামক স্থানে। এটিকে মাররুয যাহরান নামেও অভিহিত করা হয়। এটি প্রচুর খেজুর গাছবিশিষ্ট উর্বর একটি উপত্যকা। এখানে রয়েছে প্রবহমান একটি পানির ফোয়ারা। যা থেকে এই অঞ্চলের পানি সেচের ব্যবস্থা করা হয়। এই উপত্যকা থেকেই পবিত্র মক্কা মুকাররমায় ফল ও সবজি আমদানি করা হয়। পবিত্র এই উপত্যকা থেকে আমরা প্রশান্তচিত্তে ও স্বপ্ন পুরণ হওয়ার অকৃত্রিম আনন্দ নিয়ে রাতের বেলায় শুরু করি আমাদের পরবর্তী যাত্রা। পরদিন ভোরেই আমরা প্রবেশ করি নিরাপত্তার শহর পবিত্র মক্কা মুকাররমায়। মক্কায় পৌঁছে প্রথমেই আমরা চলে যাই পবিত্র হেরেমে। যেখানে অবস্থান করেছিলেন আল্লাহ তাআলার প্রিয় বন্ধু ইবরাহিম আ.। এখান থেকেই হয়েছিল তাঁর নির্বাচিত প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের সূচনা। বনু শাইবা ফটক দিয়ে আমরা পবিত্র এই হেরেমে প্রবেশ করি। যেখানে প্রবেশকারী প্রতিটি ব্যক্তিই লাভ করেন ঐশী নিরাপত্তার সৌভাগ্য। আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠে আল্লাহর ঘর কাবা। আল্লাহ তাআলা এর সম্মান আরো বৃদ্ধি করুন। নববধূর মতো দ্যুতিময় সজ্জায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেই ঘর। মহান আল্লাহ তাআলার প্রেরিত ফেরেশতাগণের পদচারণায় তা ছিল মুখরিত। মাটির বুকের এই পবিত্র ঘর মিলিত হয়েছে অনাবিল সুখের জান্নাতের সঙ্গে। প্রথমেই আমরা পবিত্র এই ঘরকে ঘিরে তাওয়াফে কুদুম করে নিই। চুমো খাই পবিত্র হাজরে আসওয়াদে। মাকামে ইবরাহিমে আদায় করি দুই রাকাত নামায। হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মধ্যবর্তী আল মুলতাজামে কাবার ঝুলানো পর্দাকে আলিঙ্গন করে থাকি কিছুক্ষণ। এখানে কোনো দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা তা নিশ্চিত কবুল করেন। তারপর গলা ভেজাই জমজম কূপের সুমিষ্ট পানির সুধায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এই পানির যে গুণ বর্ণিত হয়েছে, তা এখনো ঠিক তেমনই। এরপর আমরা সাফা আর মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাঈ করি। সেখানেই বাবে ইবরাহিমের কাছাকাছি একটি বাড়িতে আমরা অবস্থান নিই। আল্লাহ তাআলার জন্য অগণিত প্রশংসা। তিনি আমাদেরকে তার পবিত্র ঘরের সান্নিধ্যের সৌরভ লাভ করার তাওফিক দান করেছেন। হাজার বছর আগে ইবরাহিম আ. যে

দাওয়াত জানিয়েছিলেন, আমাদেরকে শামিল করেছেন সেই দাওয়াতে সাড়াপ্রদানকারী সৌভাগ্যবানদের দলে। আমাদের চক্ষুগুলোকে প্রদান করেছেন পবিত্র কাবা, মাসজিদুল হারাম, হাজরে আসওয়াদ, জমজম কূপ এবং হাতিমের মতো বহুল আকাঙ্ক্ষিত স্থানগুলো দেখার অকৃত্রিম আনন্দ।

মহান আল্লাহর আশ্চর্য এক কারিশমা এই যে, তিনি মানুষের হৃদয়ে এই সকল পবিত্র তীর্থস্থানগুলো সশরীরে হাজির হয়ে দেখার প্রতি দুর্দমনীয় আকর্ষণ ও আগ্রহ তৈরি করে দিয়েছেন। গেঁথে দিয়েছেন অকৃত্রিম ভালোবাসা। তাই যারাই এখানে আসে, হৃদয়ের সবটা নিংড়ে দিয়ে নিবেদন করে নিজেকে। বিদায়কালে বিচ্ছেদ বেদনা তাদেরকে করে প্রবল আহত। ভালোবাসার আতিশয্যে এই দূরত্ব তারা পারে না সহ্য করতে। তবুও আবার ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা বুকে পোষে তারা নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। তাই মক্কার এই পবিত্র ভূমি পৃথিবীর তাবৎ চক্ষুর আরাধ্য। তার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ সকল মুমিনের হৃদয়রাজ্য। এটি আল্লাহ তাআলার বিরাট এক প্রজ্ঞার পরিচয়। তাঁর প্রিয় বন্ধু ইবরাহিম আ. যে দাওয়াত জানিয়েছিলেন, সেটির মহা বাস্তবায়ন।

দুর্দমনীয় এই আকাঙ্ক্ষা দূরদূরান্তের মানুষকে এখানে নিয়ে আসে। এতদিন হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষায় লালিত হয়ে থাকা কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তের সাক্ষী হয় তারা। এমনকি এই পথে আসা শত কষ্ট ও বাঁধার প্রাচীর তারা জয় করে নেয় অবলীলায়। এই লক্ষ্য পূরণ করতে এসে অনেক দুর্বল মৃত্যুকে অনুভব করে তার খুব কাছে। যাত্রাপথে হয় মরণসম বিপদের মুখোমুখি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন তাদের আশাকে বাস্তবে রূপ দেন, তাদের আনন্দ ও উচ্ছলতা যেন আর বাঁধ মানতে চায় না। তাদের প্রাণবন্ত উৎফুল্লতা দেখে মনে হয়, কোনো কষ্ট বা ক্লান্তির তিক্ততা তাদেরকে একটুও ছুঁতে পারেনি। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহরই কুদরত। তাঁরই মহিমা। স্পষ্টতই এটি তাঁর নিদর্শন। যা নিয়ে নেই একফোঁটাও সন্দেহ ও বিভ্রান্তি। বিশ্বাসীদের অন্তর্দৃষ্টিতে এই অনুভূতি শ্বাশ্বত আর চিন্তাশীলদের ভাবনায় সদাজাগ্রত। আল্লাহ তাআলা যাকে পবিত্র এই ভূখণ্ডে পা রাখার এবং বরকতময় প্রাঙ্গণে নিজেকে হাজির করার তাওফিক দিয়েছেন, নিশ্চয়ই তিনি লাভ করেছেন বিশাল এক নেয়ামত। অর্জন করে নিয়েছেন দুনিয়া ও আখিরাতের সমৃদ্ধি। অতএব, তার উচিত এই অর্জনের জন্য অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা। সর্বদাই নিজেকে তাঁর প্রশংসায় নিরত রাখা। আল্লাহ তাআলা

আমাদেরকে করুন সৌভাগ্যবান সেই দলের অন্তর্ভুক্ত, যাদের জিয়ারত হয়েছে গ্রহণযোগ্য। নিজেদের নিয়ত ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমে যারা লাভবান হয়েছেন বরকতময় এই ব্যবসায়। যাদের প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে লেখা হয়েছে আল্লাহর রাহে নিবেদনের সওয়াব। নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় আল্লাহ যাদেরকে গ্রহণযোগ্য করে মুছে দিয়েছেন তাদের জীবনের সকল পাপের কালিমা।

সম্মানিত মক্কা শহরের বিবরণ

পর্বতমালাবেষ্টিত এক উপত্যকার বুকে বিশাল এই শহরের অবস্থান। দীর্ঘ এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এর বাড়িঘরগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে সংযুক্ত। তাই এই শহরকে দেখতে হলে এর বুকে এসে পৌঁছাতে হবে। শহরকে বেষ্টন করে রাখা দীর্ঘ এই পর্বতমালা তেমন উঁচু নয়। এর সবচেয়ে বন্ধুর পর্বত দুটি হচ্ছে জাবালে আবু কুবাইস ও জাবালে কুআইকিয়ান। প্রথমটির অবস্থান শহরের দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে। আর দ্বিতীয়টির অবস্থান পশ্চিমপ্রান্তে। উত্তরপ্রান্তে রয়েছে জাবালে আহমার বা লালপাহাড়। জাবালে আবু কুবাইসের প্রান্তে আল জিয়াদুল আকবার ও আল জিয়াদুল আসগার নামের দুটি গিরিখাত। রয়েছে আল খানদামা নামক আরেকটি পাহাড়। যার বিবরণ সামনে আসবে। মিনা, আরাফা ও মুজদালিফা প্রভৃতি সকল তীর্থস্থানগুলোর অবস্থান মক্কার পূর্বপ্রান্তে।

এই শহরের মোট তিনটি ফটক রয়েছে। প্রথমটি বাবুল মাআল্লা। এটির অবস্থান মক্কার উচ্চভূমিতে। দ্বিতীয় ফটকের নাম বাবুশ শাবিকা। যার অবস্থান মক্কার নিম্নভূমিতে। এটিকে বাবুল উমরাও বলা হয়। এটি শহরের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। এখান দিয়েই মদিনা মুনাওয়ারা, মিসর, শাম ও জেদ্দা প্রভৃতি অবস্থানে যেতে হয়। তানঈমে যেতে হলেও এই পথ অবলম্বন করতে হবে। এর আলোচনা সামনে আসবে। তৃতীয় ফটকের নাম বাবুল মাসফাল। এটি অবস্থিত শহরের দক্ষিণপ্রান্তে। খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. মক্কা বিজয়ের দিন এই ফটক দিয়েই শহরে প্রবেশ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধুর ভাষায় মক্কা মুকাররমাকে ফসলহীন এক উপত্যকা হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ইবরাহিম আ.-এর দোয়ার বরকতে এখানে কোনো কিছুরই অভাব হয় না। পৃথিবীর সকলপ্রান্ত থেকে এখানে সকল প্রকার খাদ্যশস্য ও ফলমূল আমদানি করা হয়। এখানে এসে আমি আঙুর,

তীন, পীচ এবং তাজা খেজুর ভক্ষণ করেছি। স্বাদে ও মানে যা ছিল অতুলনীয়। এমনিভাবে মিষ্টতা ও উৎকৃষ্টতার দিক দিয়ে এখানে আমদানিকৃত তরমুজের কোনো তুলনা হয় না। এখানকার গোশত বেশ চর্বিযুক্ত ও অনেক সুস্বাদু। এছাড়াও পৃথিবীর আনাচেকানাচে যত পণ্য রয়েছে, এখানে তার সবই পাওয়া যায়। তায়েফ, ওয়াদি নাখলা এবং বাতনে মার প্রভৃতি স্থান থেকে এখানে তাজা শাকসবজি ও ফলমূল সরবরাহ করা হয়। নিশ্চয়ই এটি পবিত্র হেরেমের বাসিন্দা ও পবিত্র ঘরের প্রতিবেশীদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ একটি রহমত।

মাসজিদুল হারামের বিবরণ

মাসজিদুল হারামের অবস্থান শহরের ঠিক মধ্যখানে। প্রশস্ত এর আঙিনা। পূর্ব থেকে পশ্চিমে এর দৈর্ঘ্য চারশত হাতেরও বেশি। ইতিহাসবিদ আল আজরাকি এই পরিমাপ উল্লেখ করেছেন। এর প্রস্থও দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি। আঙিনার ঠিক মাঝবরাবর পবিত্র কাবাঘরটি দাঁড়িয়ে আছে। কী চমৎকার দৃশ্য তার। দেখলেই হৃদয়ে মুগ্ধতার ঝড় বয়ে যায়। কোনো ভাষাতেই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয় এর চমৎকারিত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বয়ান। কোনো লেখকের কলম সক্ষম নয় এর সৌন্দর্যের যথাযথ বিবরণ তুলে ধরতে। কাবার দেয়ালগুলোর উচ্চতার বিশ হাতের মতো। ছাদটি দাঁড়িয়ে আছে তিন সারিতে বিন্যস্ত অনেকগুলো মজবুত ও নান্দনিক পিলারের উপর। মাসজিদুল হারামের তিনটি করিডোর এমন আশ্চর্যভাবে যুথবদ্ধ হয়ে আছে যে, সেগুলোকে দেখে একটি করিডোরই মনে হয়। মোট ৪৯১টি মার্বেল পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছে মাসজিদুল হারামের এই অনিন্দ্য স্থাপনা। আরো আছে চুনাপাথরের তৈরি কিছু পিলার। সেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে মাসজিদুল হারামের সঙ্গে বর্ধিত দারুন নাদরায়। যেটি উত্তরমুখী করিডোরের ভেতরে পড়েছে। এর সম্মুখপ্রান্তেই আছে পবিত্র মাকামে ইবরাহিম এবং রুকনে ইরাকি তথা কাবার ইরাকমুখী প্রান্ত। এগুলোর প্রাঙ্গণ একসঙ্গে সংযুক্ত। এই করিডোর দিয়েই মাকামে ইবরাহিম এবং রুকনে ইরাকিতে যাওয়া যায়। এই করিডোরের দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে কিছু বেঞ্চ। কারী, লিপিকার ও দর্জিগণ এখানে বসেন। বিপরীতমুখী করিডোরের দেয়ালেও অনুরূপ কিছু বেঞ্চ রয়েছে। এভাবে সবগুলো করিডোরেই এমন কিছু বেঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। বাবে ইবরাহিম ফটকের কাছে পশ্চিমপ্রান্তের করিডোরে

চুনাপাথরের পিলারের মাধ্যমে তৈরিকৃত আরেকটি প্রবেশপথ রয়েছে। আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মানসুরের পুত্র খলিফা মাহদি মাসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ ও এর স্থাপনা মজবুতকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। পশ্চিমপ্রান্তের করিডোরের দেয়ালের উঁচুতে লিখিত রয়েছে, 'খলিফা আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল মাহদি (আল্লাহ তাআলা তাকে সংশোধন করুন) ১৬৭ হিজরিতে আল্লাহ তাআলার পবিত্র ঘরের হাজিগণের জন্য মাসজিদুল হারাম সম্প্রসারণের নির্দেশ দিয়েছেন।'

পবিত্র কাবাঘরের বিবরণ

মাসজিদুল হারামের মাঝবরাবর কাবাঘরের অবস্থান। বর্গাকৃতির এই স্থাপনাটির তিনদিকের উচ্চতা ২৮ হাত। তবে হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানির মধ্যবর্তী প্রান্তের উচ্চতা ২৯ হাত। রুকনে ইরাকি থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত প্রান্তের প্রস্থ ৫৪ বিঘত। এর বিপরীতদিকে রুকনে ইয়ামানি থেকে রুকনে শামি পর্যন্ত প্রান্তের প্রস্থও একই। তবে হিজর বা হাতিমের ভেতরের দিকে রুকনে ইরাকি থেকে রুকনে শামি পর্যন্ত প্রান্তের প্রস্থ ৪৮ বিঘত। এর বিপরীতদিকে রুকনে শামি থেকে রুকনে ইরাকি পর্যন্ত প্রান্তের প্রস্থও সমান। আর হিজরের বাইরের দিকে এই দুই প্রান্তের প্রস্থ ১২০ বিঘত। তাওয়াফ করতে হিজরের বাইরের অংশ দিয়ে। রুক্ষ প্রকৃতির বাদামি রঙের পাথরকে আনোখা মজবুতির সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করে এর স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। তাই বহু কালের বিবর্তনেও আজও তা অটুট। কাবাঘরের দরজাটি হাজরে আসওয়াদ থেকে রুকনে ইরাকি পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তে। দরজা থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত দশ বিঘত দূরত্বের জায়গাটুকু আল মুলতাযাম নামে পরিচিত। এখানে বসে দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা তা নিশ্চিত কবুল করেন। জমিন থেকে সাড়ে এগারো বিঘত উঁচুতে কাবাঘরের দরজা স্থাপন করা হয়েছে। দরজার প্রস্থ আট বিঘত এবং দৈর্ঘ্য তেরো বিঘত। দরজার সঙ্গে সংযুক্ত দেয়ালটি পাঁচ বিঘত পরিমাণ পুরো। রূপার পাতের মাধ্যমে অনুপম পদ্ধতিতে এই দরজাটি তৈরি করা হয়েছে। এর চৌকাঠেও রূপা ব্যবহার করা হয়েছে। দরজায় ব্যবহৃত তালাবদ্ধ বিরাট আকৃতির আংটা দুটিও রূপার তৈরি।

প্রতি শুক্রবার জুমার নামাযের পর পবিত্র কাবাঘরের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের দিনেও তা

খোলা হয়। দরজা খুলার জন্য ব্যবহার করা হয় কাঠের পিলার ও সিঁড়িযুক্ত মিম্বারের মতো চার চাকাযুক্ত একটি চেয়ার। এটিকে কাবাঘরের দেয়ালের সঙ্গে এনে লাগানো হয়। এর উপরের সিঁড়িটি তখন থাকে কাবাঘরের দরজার চৌকাঠের ঠিক নিচে। অতঃপর কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারী বনু শাইবা গোত্রের সর্দার চাবি হাতে প্রহরীদের নিয়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেন। প্রহরীরা গিয়ে কাবার ঝুলানো গিলাফ টেনে ধরে। ততক্ষণে বনু শাইবার সর্দার দরজার তালা খুলে ফেলেন। দরজা খুলেই তিনি এর মর্যাদাময় চৌকাঠে চুম্বন করেন। অতঃপর একা ঘরে প্রবেশ করে ভেতর থেকে দরজাটি বন্ধ করে দেন। দুই রাকাত নামায আদায় পরিমাণ সময় ভেতরে অবস্থান করে তিনি বেরিয়ে আসেন। অতঃপর বনু শাইবা গোত্রের লোকেরা ভেতরে প্রবেশ করে তারাও দরজা বন্ধ করে দেয়। দুই রাকাত নামায আদায় করে তারা দরজা খুলে দেয়। এরপর আসে সাধারণ লোকদের পালা। তারা তখন ভেতরে প্রবেশের জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয়। এ সময় তারা ভয়ার্ত চোখে আর আকুতিপূর্ণ হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার দরবার হাত উঁচু করে পবিত্র দরজায় চুম্বন করে। দরজা খুলতেই তারা সমস্বরে বলে উঠে আল্লাহু আকবার। অতঃপর এই দোয়া পাঠ করে, আল্লাহুম্মাফতাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা ও মাগফিরাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন (হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য আপনার রহমত ও ক্ষমার দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দিন। আপনিই সবচেয়ে দয়ালু)।

পবিত্র কাবাঘরের ভেতরের মেঝে ও দেয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে খাঁজকাটা মার্বেল পাথর। রয়েছে টিক কাঠের তৈরি খুবই লম্বা তিনটি খুঁটি। এক খুঁটি থেকে আরেক খুঁটির মাঝে রয়েছে চার কদম পরিমাণ দূরত্ব। কাবাঘরের ভেতরের মেঝের মাঝবরাবর এই তিন খুঁটির অবস্থান। মধ্যবর্তী খুঁটির বিপরীতমুখে রয়েছে রুকনে ইরাকি ও রুকনে শামি পর্যন্ত প্রান্তের প্রস্থের অর্ধেক পরিমাণ জায়গা। কাবাঘরের পর্দাটি তৈরি করা হয়েছে কালো রঙের রেশমি কাপড় দিয়ে। এর উপরে থাকা সাদা রঙের লেখাগুলো জ্বলজ্বল করে থাকে। কাবাঘরের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এই পর্দার মাধ্যমে আবৃত করে দেওয়া হয়।

কাবাঘরের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তাআলার অনন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে, যখন এর দরজা খোলা হয়, মাসজিদুল হারামের আঙিনায় তখন এত অসংখ্য লোকের সমাবেশ ঘটেছে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে তাদের গণনা

করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু তারা সবাই নিঃসংকোচে একে একে কাবাঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। তা কখনো সংকীর্ণ হয়ে যায় না। আরেকটি আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে, দিবস ও রাতের কোনো অংশেই কাবাঘর তাওয়াফকারী থেকে খালি থাকে না। কাবাঘরকে কখনো তাওয়াফকারী ছাড়া অবস্থায় দেখেছে, এমন বর্ণনা কেউই দিতে পারবে না। আরেকটি আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে, মক্কার কবুতর বা অন্য কোনো পাখি কখনোই কাবাঘরের উপর দিয়ে উড়ে যায় না। এর ছাদের উপর বসা তো আরো দূরের কথা। দেখতে পাবেন হারাম প্রাঙ্গণজুড়ে অনেক কবুতর উড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কাবাঘরের কাছাকাছি যেতেই তা যেকোনো একদিকে মোড় নিয়ে নেয়। এর উপর দিয়ে উড়ে যায় না। কথিত আছে, কাবাঘরের উপর কোনো পাখি তখনই অবতরণ করে, যখন সেটি অসুস্থ হয়ে যায়। এরপর হয়তো মুহূর্তের মধ্যেই সেটি মারা যায় অথবা তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে উঠে। সেই সত্তা কতইনা মহান, যিনি কাবাঘরকে এই বিরল মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন।

বরকতময় মিযাবের বিবরণ

হিজর বা হাতিমের উপরের প্রান্তে বরকতময় মিযাব বা ছাদের পানি গড়িয়ে পড়ার নালার অবস্থান। এটি তৈরি করা হয়েছে স্বর্ণ দিয়ে। এর প্রস্থ এক বিঘত এবং তা দুই হাত পরিমাণ জায়গাজুড়ে প্রসারিত। মিযাবের নিম্নাংশের স্থানকেও দোয়া কবুল হওয়ার স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মিযাবের নিম্নাংশে হিজরের মাঝে রয়েছে ইসমাইল আ.-এর কবর। মিহরাব আকৃতির সবুজ রঙের লম্বা একটি মার্বেল পাথর স্থাপন করে এর চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। এর পাশেই রয়েছে বৃত্তাকৃতির আরেকটি সবুজ রঙের মার্বেল পাথর। উভয়টির প্রস্থ এক বিঘত সমান। দুটোই দেখতে বেশ অদ্ভুত ও মনোহর। এর একপাশে রুকনে ইরাকি ঘেঁষে রয়েছে ইসমাইল আ.-এর সম্মানিতা মাতা হাজেরা আলাইহাস সালামের কবর। সেটির চিহ্ন হিসেবে স্থাপন করা একবিঘত প্রস্থবিশিষ্ট বৃত্তাকৃতির সবুজ রঙের মার্বেল পাথর। দুটি কবরের মধ্যকার দূরত্ব সাত বিঘত পরিমাণ।

হাজরে আসওয়াদের বিবরণ

পবিত্র হাজরে আসওয়াদ মাটি থেকে ছয়বিঘত উঁচুতে অবস্থিত। লম্বা মানুষদেরকে তা চুমো খাওয়ার জন্য নিচের দিক ঝুঁকতে হয়। আর খাটো

মানুষদেরকে কিছুটা উঁচুতে উঠতে হয়। কাবাঘরের পূর্বমুখীপ্রান্তে এটিকে স্থাপন করা হয়েছে। এর প্রস্থ একবিঘতের দুইতৃতীয়াংশ আর দৈর্ঘ্য একবিঘতের কিছুটা বেশি। এর ঠিক কতটুকু রুকনের ভিতরে প্রবেশ করেছে তা কেউ জানে না। এখানে মোট চারটি পাথরের টুকরোকে সংযুক্ত করা হয়েছে। কথিত আছে, অভিশপ্ত কারামাতি এটিকে ভেঙে ফেলেছিল। কারো মতে, কারামাতি নয়, বরং অন্য কেউ এটিকে গদা দিয়ে আঘাত করে ভেঙে ফেলে। তখন লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। তার কারণে মাগরিবের একদল লোক সেদিন নিহত হয়েছিল। পাথরের প্রান্তগুলোতে রূপার পাতের মাধ্যমে বেড়ি দেওয়া হয়েছে। পবিত্র এই পাথরের কালোর মাঝে রূপার শুভ্রতা চকচক করে উঠে ধাঁধিয়ে দেয়। এই পাথর চুম্বনে মুখে আশ্চর্য এক স্বাদ অনুভব হয়। চুম্বনকারীর তখন এটিকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না। আল্লাহ তাআলা এই পাথরে এমনই এক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন। এর মর্যাদার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কথাই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন, 'এই পাথর জমিনে আল্লাহ তাআলার ডান হাত।' আল্লাহ তাআলা এই পাথরকে স্পর্শ ও চুম্বন করার মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন এবং প্রত্যেক আগ্রহী প্রাণকে এর কাছে হাজির হওয়ার তাওফিক দান করুন। চুম্বনকারীর ডানদিকে পাথরের অক্ষত অংশটুকুতে তিলের মতো একটি ছোট উজ্জ্বল সাদা রঙের ফোঁটা রয়েছে। পবিত্র এই পাথরে চুমো খাওয়ার জন্য লোকদের হুমড়ি খেয়ে পড়ার দৃশ্য আপনার নজর কেড়ে নিবে। এত ভিড় জমে যায় যে, অনেক কষ্ট ও শ্রমের পর লোকেরা তাতে চুম্বন করতে সক্ষম হয়। হারামে প্রবেশ করার সময়েও এমন ভিড় পরিলক্ষিত হয়। হাজরে আসওয়াদ থেকেই তাওয়াফ শুরু করতে হয়। তাওয়াফকারীর জন্য এটিই প্রথম প্রান্ত। পাথরে চুম্বন শেষে কিছুটা সরে গিয়ে কাবাকে বামদিকে রেখে তাওয়াফ শুরু করতে হয়। এরপর আসে উত্তরমুখী রুকনে ইরাকি। তারপর পশ্চিমমুখী রুকনে শামি, তারপর দক্ষিণমুখী রুকনে ইয়ামানি। এরপর পুনরায় ফিরে আসে পূর্বমুখী হাজরে আসওয়াদের প্রান্তে।

পবিত্র মাকামে ইবরাহিমের বিবরণ

পবিত্র কাবাঘরের দরজা এবং রুকনে ইরাকির মাঝে বারো বিঘত দৈর্ঘ্য এবং ছয় বিঘত প্রস্থ এবং দুই বিঘত উচ্চতাবিশিষ্ট একটি স্থান রয়েছে। ইবরাহিম

আ.-এর সময়ে এটিই ছিল মাকামে ইবরাহিমের স্থান। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে বর্তমান অবস্থানে সরিয়ে এনেছেন। যেখানে এখন নামায আদায় করা হয়। আর আগের সেই স্থানটি এখন হাউজের মতো আকৃতি ধারণ করেছে। কাবাঘরকে ধৌত করার সময় এখানে এসে পানি জমা হয়। মাকামে ইবরাহিমের স্থানটি অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতময়। এখানে নামায আদায় করার জন্য লোকদের ভিড় জমে যায়। রুকনে ইরাকি এবং কাবার দরজার মধ্যবর্তী স্থানের সম্মুখভাগের জায়গাটুকুই মাকামে ইবরাহিমের স্থান। তবে এটি দরজার অধিক কাছাকাছি। এখানে লোহার খাঁচাবিশিষ্ট একটি ছাউনি স্থাপন করা হয়েছে। মাকামে ইবরাহিম বা ইবরাহিম আ.-এর পদছাপের জায়গা থেকে এক আঙুল পরিমাণ উঁচু থেকে এই খাঁচা বসানো হয়েছে। আর এর পেছনের অংশে তাওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামায আদায়ের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে কাবাঘরের কাছে এসে সাতবার তাওয়াফ করেছেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহিমের কাছে এসে এই আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, 'মাকামে ইবরাহিমকে তোমরা নামায আদায়ের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো।'[১] এরপর তিনি এর পেছনে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। মাকামে ইবরাহিমের পেছনেই শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের নামাযের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। এজন্য সেখানে একটি মিহরাব স্থাপন করা হয়েছে।

হিজর ও মাতাফের (তাওয়াফের স্থান) বিবরণ

হিজরের দেয়ালের পরিধি ২৯ কদম বা ৯৪ বিঘত। খাঁজকাটা চমৎকার মার্বেল পাথরের মাধ্যমে অত্যন্ত মজবুতভাবে এই দেয়ালটি তৈরি করা হয়েছে। এটির উচ্চতা সাড়ে পাঁচ বিঘত এবং প্রস্থ সাড়ে চার বিঘত। হিজরের অভ্যন্তরে রয়েছে প্রশস্ত একটি করিডোর। যার মেঝেতে সারিবদ্ধভাবে বিছানো হয়েছে চমৎকার ও সুগঠিত মার্বেল পাথর। কাবাঘরের মিজাবের নিম্নপ্রান্তের দেয়াল এবং এর বিপরীতে অবস্থিত হিজরের দেয়ালের মাঝে সোজাসুজি চল্লিশ বিঘত পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে। দুইটি প্রবেশপথ দিয়ে হিজরে প্রবেশ করা যায়। একটির অবস্থান হিজর ও রুকনে ইরাকের মাঝখানে। সেটির প্রশ ছয় হাত। বিশুদ্ধ হাদীসের ভাষ্যমতে, কুরাইশরা

---

[১] সূরা বাকারা : ১২৫

কাবাঘর নির্মাণের সময় এই জায়গাটুকু ছেড়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় প্রবেশপথটির অবস্থান রুকনে শামির কাছে। সেটির প্রস্থও ছয় হাত। দুই প্রবেশপথের মধ্যকার দূরত্ব ৪৮ বিঘত।

তাওয়াফের স্থানে অত্যন্ত মজবুতভাবে সংযুক্ত কালোপাথর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাবাঘর থেকে নয় কদম পরিমাণ জায়গাজুড়ে এর বিস্তৃতি। তবে মাকামে ইবরাহিমের প্রান্তে এটি মাকাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া মাসজিদুল হারামের সকল করিডোরসহ এর আঙিনার পুরোটা জুড়ে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে সাদা বালুর আস্তর। বিছিয়ে দেওয়া পাথরের শেষপ্রান্ত থেকে মহিলাগণ তাওয়াফ করে থাকেন।

জমজম কূপের বিবরণ

জমজম কূপের ছাউনির অবস্থান হাজরে আসওয়াদের বিপরীতপ্রান্তে। দুই স্থানের মধ্যকার দূরত্ব চব্বিশ কদম। মাকামে ইবরাহিম পড়েছে ছাউনি থেকে ডানদিকে। ছাউনির প্রান্ত থেকে মাকামে ইবরাহিম পর্যন্ত দূরত্ব দশ কদম। ছাউনির ভেতরে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে সাদা রঙের মার্বেল পাথর। ছাউনির ঠিক মাঝবরাবর জমজম কূপের মুখ। যেটি তার বিপরীতপ্রান্তে অবস্থিত কাবাঘরের দেয়ালের অধিক নিকটবর্তী। কূপের মুখে চারপাশে সীসার মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করে মার্বেল পাথর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর পরিধি চৌদ্দ বিঘত এবং এর উচ্চতা সাড়ে চৌদ্দ বিঘত। আর কূপের গভীরতা এগারো পুরুষ পরিমাণ। স্থানীয় লোকদের মতে, প্রতি শুক্রবার রাতে এই কূপের পানি বৃদ্ধি পায়। কূপের ছাউনির দরজার অবস্থান পূর্বদিকে। ছাউনির ভেতরে গোলাকার একটি হাউজের মতো রয়েছে। যেটির প্রস্থ এক বিঘত এবং গভীরতাও এর অনুরূপ। ভূমি থেকে এর উচ্চতা পাঁচ বিঘতের মতো। অযু করার জন্য এটি পানি দিয়ে পূর্ণ করে রাখা হয়। এর পাশেই রয়েছে বসে বসে অযু করার জন্য কিছু বেঞ্চ। জমজম কূপের ছাউনির সাথেই রয়েছে আব্বাস রা.-এর দিকে সম্বন্ধকৃত পানি পান করার ছাউনি। এটির দরজার অবস্থান উত্তরদিকে। বর্তমানে এই ছাউনিতে দাওরাক নামক পাত্রে করে জমজমের পানি ঠান্ডা করা হয়। প্রতিটি দাওরাকের মাত্র একটি করে হাতল থাকে। লোকেরা এই পাত্রগুলো থেকে ঠান্ডা পানি পান করে থাকে। এই ছাউনিতেই রয়েছে একটি কোষাগার। যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের আঠারো বছর পর জায়েদ বিন

সাবিত রা.-এর হস্তে লিখিত পবিত্র কুরআনের অনুলিপি এবং হারাম শরিফের অন্যান্য বইপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে। মক্কার অধিবাসীরা কখনো দুর্ভিক্ষ বা ঘোর কোনো বিপদে আক্রান্ত হলে পবিত্র কুরআনের এই অনুলিপিটি বের করে এনে কাবাঘরের দরজা খুলে পবিত্র চৌকাঠের উপর রাখে। এমনিভাবে মাকামে ইবরাহিমের উপরেও রাখে। লোকেরা তখন একত্র হয়ে তাদের মাথা উন্মুক্ত করে পবিত্র কুরআনের এই অনুলিপি এবং মাকামে ইবরাহিমের উসিলা দিয়ে কাকুতিমিনতি করে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়ায় রত হয়। অতঃপর পৃথক হওয়ার আগেই আল্লাহ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহ তাদেরকে আবিষ্ট করে নেয়। আব্বাস রা.-এর ছাউনি থেকে সামান্য দূরত্বে রয়েছে আরেকটি ছাউনি। যেটি ইহুদি ছাউনি নামে পরিচিত।

মাসজিদুল হারামের ফটক এবং পার্শ্ববর্তী ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহের বিবরণ

মাসজিদুল হারামের মোট উনিশটি ফটক রয়েছে। যার অধিকাংশেই রয়েছে একাধিক প্রবেশপথ। ১. বাবুস সফা। এর প্রবেশপথ পাঁচটি। পূর্বে এটি বাবু বনি মাখজুম নামে পরিচিত ছিল। এটিই মাসজিদুল হারামের সর্ববৃহৎ ফটক। এটি দিয়েই সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার স্থানে যেতে হয়। মক্কা মুকাররমায় আগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির বাবে বনু শাইবা ফটক দিয়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। তাওয়াফ শেষ করে তারা বাবুস সফা ফটক দিয়ে বের হয়ে খলিফা মাহদির নির্দেশে নির্মিত দুইটি স্তম্ভের মধ্য দিয়ে চলে যাবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথ ধরে সাফা অভিমুখে যেতেন, তা চিহ্নিত করার জন্যই এই স্তম্ভ দুটি নির্মাণ করা হয়েছে। ২. বাবু জিয়াদিল আসগার। এর প্রবেশপথ দুইটি। ৩. বাবুল খাইয়াতিন। এর প্রবেশপথও দুইটি। ৪. বাবু আব্বাস। এর প্রবেশপথ তিনটি। ৫. বাবুন নবীয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই ফটকের প্রবেশপথ দুইটি। ৬. বাবু বনি শাইবা। মাসজিদুল হারামের উত্তর থেকে পূর্বদিক পর্যন্ত বিস্তৃত দেয়ালে পবিত্র কাবাঘরের দরজা থেকে ডানদিকে অবস্থিত এই ফটকের প্রবেশপথ তিনটি। এটিকে বনু আবদি শামস ফটকও বলা হতো। খলিফাগণ এই ফটক দিয়ে হারামে প্রবেশ করতেন। ৮. বনু শাইবা ফটকের পাশেই আরেকটি নামহীন ছোট ফটক রয়েছে। কেউ কেউ

এটির নাম উল্লেখ করেছেন বাবুর রিবাত। কারণ, এটি দিয়ে বরই গাছের নিচে অবস্থিত রিবাত বা আশ্রমে যাওয়া যায়। ৮, ৯, ১০. বাবুন নাদওয়া। এ নামে মোট তিনটি ফটক রয়েছে। দুইটি পাশাপাশি এবং আরেকটির অবস্থান দারুন নাদওয়ার পশ্চিমপ্রান্তে। দারুন নাদওয়াকে মাসজিদুল হারামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মিযাবের ঠিক বিপরীতপ্রান্তে এটির অবস্থান। ১১. আরেকটি ছোট ফটক রয়েছে নবনির্মিত দারুল আজলায়। ১২. দারুস সিদরাতেও রয়েছে একটি ফটক। ১৩. বাবুল উমরা নামক ফটকটি মাসজিদুল হারামের সবচেয়ে নান্দনিক ফটক হিসেবে বিবেচিত। ১৪. বাবু ইবরাহিম। তবে ঠিক কোনো ইবরাহিমের দিকে এটিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন ইবরাহিম আ.-এর দিকে। তবে সঠিক মত হচ্ছে, ইবরাহিম আল খাওজি নামক এক অনারব ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধ করে এই ফটকের নামকরণ করা হয়েছে। ১৫. বাবুল হাজওয়ারা। এর প্রবেশপথ দুইটি। ১৬. বাবু জিয়াদিল আকবার। এর প্রবেশপথও দুইটি। ১৭, ১৮. একই নামে রয়েছে আরো দুটি ফটক। উভয়টিই দুই প্রবেশপথ বিশিষ্ট। ১৯. একই নামে তৃতীয় আরেকটি ফটক রয়েছে। যা বাবুস সফা ফটকের সঙ্গে সংযুক্ত। বাবু জিয়াদিল আকবার নামে পরিচিত এই চারটি ফটক থেকে দুটি ফটককে অনেকে বাবুদ দাক্কাকিন বা ময়দা ব্যবসায়ীদের ফটক নামে অভিহিত করে থাকেন।

মাসজিদুল হারামে মিনার রয়েছে মোট পাঁচটি। প্রথমটির অবস্থান জাবালে আবু কুবাইস প্রান্তে বাবুস সফার কাছে। দ্বিতীয়টির অবস্থান বাবু বনু শাইবার প্রান্তে। তৃতীয়টির অবস্থান দারুন নাদওয়া ফটকে। চতুর্থ মিনারের অবস্থান বাবুস সিদরার প্রান্তে। আর পঞ্চম মিনারের অবস্থান বাবু জিয়াদিল আকবারের প্রান্তে। বাবুল উমরার নিকটে নির্মাণ করা হয়েছে একটি মাদরাসা। যা প্রতিষ্ঠা করেছেন ইয়েমেনের মহান সুলতান ইউসুফ বিন রাসূল। যিনি আল মালিকুল মুয়াজ্জাম নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনিই কাবা শরিফের গিলাফ পরিধান করাতেন। একপর্যায়ে মিসরের সুলতান আল মালিকুল মানসুর কালাউন এই মর্যাদা অধিকার করে নেন। বাবু ইবরাহিম ফটকের বাইরে রয়েছে বিশাল এক খানকা। মালিকি মাযহাবের ইমাম আবু উবাইদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবদির রাহমান এখানেই বাস করেন। বাবু ইবরাহিম ফটকেই রয়েছে অনেক উঁচু একটি গম্বুজ। এর ভিতরে রয়েছে চুনাপাথরের তৈরি অভাবনীয় সুন্দর কারুকাজ। যার বর্ণনা ভাষায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। এই ফটকের পাশেই প্রবেশকারীর ডানদিকে বসতেন

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ জালালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল আফশাহরি। বাবু ইবরাহিম ফটকের বাইরে রয়েছে একটি কূপ। যেটি বিরে ইবরাহিম নামে পরিচিত। এর নিকটে রয়েছে আরেক বুযুর্গ শাইখ দানিয়াল আল আজমির গৃহ। ইরাকের সুলতান আবু সাঈদের শাসনামলে ইরাক অঞ্চল থেকে সংগ্রহকৃত সদকা তার হাত ধরেই আসত। তার গৃহের কাছেই আল মুওয়াফফিক সরাইখানা। এটি দেখতে খুবই চমৎকার। মক্কায় থাকাকালীন আমি এই সরাইখানাতেই অবস্থান করেছি। তখন বুযুর্গ শাইখ সাআদাত আল জিরানীও এখানে অবস্থান করছিলেন। একদিন আসর নামাযের পর তার গৃহে প্রবেশ করে তাকে কাবা শরিফের দিকে সেজদারত অবস্থায় মৃত পাওয়া যায়। তখন তার কোনো অসুস্থতা ছিল না। আরেক বুযুর্গ শায়খ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ আশ শামি প্রায় চল্লিশ বছর এখানে অবস্থান করেছিলেন। শায়খ শুআইব আল মাগরিবিও এখানে অবস্থান করেছেন। একদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তার গৃহে চাটাই ছাড়া অন্য কিছুই আমার চোখে পড়েনি। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যা দেখেছেন তা গোপন রাখবেন।

মাসজিদুল হারামের আশপাশে অনেক বাড়িঘর রয়েছে। সেগুলোর জানালা ও ছাদ দিয়ে সর্বদা দেখা যায় আল্লাহ তাআলার পবিত্র ঘরের অপার্থিব দৃশ্য। কিছু ঘরের দরজা দিয়ে সরাসরি হারাম প্রাঙ্গণে আসা যায়। খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জুবাইদার ঘরটি এমন। এছাড়াও দারুল আজালা ও দারুশ শারাবির দরজা দিয়েও সরাসরি হারাম প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা যায়।

মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী পবিত্র কিছু স্থাপনার একটি হচ্ছে কুব্বাতুল ওহি বা ওহির গম্বুজ। বাবুন নবী ফটকের নিকটে অবস্থিত উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা.-এর গৃহে এই গম্বুজের অবস্থান। এই গৃহে আরেকটি ছোট গম্বুজ রয়েছে। যেখানে ফাতেমা রা. জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এর কাছেই রয়েছে আবু বকর রা.-এর গৃহে। তার গৃহের সম্মুখেই রয়েছে বরকতময় একটি দেয়াল। দেয়ালের সঙ্গে রাখা হয়েছে পবিত্র একটি পাথর। যার একপ্রান্ত দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত। লোকেরা এই পাথরটিতে চুম্বন করে। বর্ণিত আছে, এই পাথরটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানাত। আরো বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম একবার এক লোকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে পাথরটি বলে উঠে, হে আল্লাহর রাসূল, সে উপস্থিত নেই।

সাফা ও মারওয়ার বিবরণ

মাসজিদুল হারামের বাবুস সফা ফটক থেকে সাফা পাহাড় পর্যন্ত দূরত্ব ৭৬ কদম। সাফা পাহাড়ের প্রস্থ ১৭ কদম। চৌদ্দটি সিঁড়ি পেরিয়ে এর উপরে উঠতে হয়। একেবারে উপরের সিঁড়িটি দেখতে বেঞ্চের মতো। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যকার দূরত্ব ৪৯৩ কদম। সাফা থেকে আল মাইলুল আখযার বা সবুজ রঙের স্তম্ভ পর্যন্ত দূরত্ব ৯৩ কদম। এই স্তম্ভ থেকে আরো দুটি সবুজ রঙের স্তম্ভ পর্যন্ত দূরত্ব ৭৫ কদম। শেষোক্ত দুই স্তম্ভ থেকে মারওয়া পাহাড়ের দূরত্ব ৩২৫ কদম। মারওয়া পাহাড়ে রয়েছে পাঁচটি সিঁড়ি। এর মাঝে রয়েছে বড় একটি বাঁক। মারওয়া পাহাড়ের প্রস্থ ১৭ কদম। মারওয়া পাহাড়ের উদ্দেশের সাঈ করার সময় বামদিকে মাসজিদুল হারামের পূর্বপ্রান্তের মিনারের কোণে একাকী সবুজ স্তম্ভটি স্থাপন করা হয়েছে। অপর দুটি সবুজ স্তম্ভের অবস্থান মাসজিদুল হারামের বাবু আলী ফটকের পাশে। একটির অবস্থান ফটক দিয়ে বের হওয়ার সময় বামদিকে হারামের দেয়ালের পাশে। অপরটির অবস্থান এর বিপরীতে। এই দুই স্তম্ভের মাঝ দিয়ে খুব দ্রুত হেঁটে যেতে হয়। সাফা ও মারওয়ার মাঝে একটি নালার মতো আছে। সেখানে এখন বিরাট বাজার বসে। সেই বাজার সকল প্রকার খাদ্যশস্য, গোশত, খেজুর, ঘি এবং নানানপ্রকার ফলমূল বিক্রি হয়। দোকানগুলোতে প্রচণ্ড ভিড় হওয়ার কারণে সাঈ করার সময় অনেক ব্যাঘাত ঘটে। মক্কা মুকাররমার বুকে সুবিন্যস্ত বাজার বলতে গেলে একমাত্র এটিই। এর বাইরে বনু শাইবা ফটকের কাছে সুগন্ধি বিক্রেতাদের বাজার রয়েছে। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝেই আব্বাস রা.-এর গৃহের অবস্থান। সেটি এখন সরাইখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মক্কায় আগত দর্শনার্থীরা এখানে অবস্থান করে। সুলতান আল মালিকুন নাসির রহ. এটি চালু করেছেন। সাফা ও মারওয়ার মাঝে তিনি একটি অযুখানাও নির্মাণ করেছেন। যার ছিল দুটি দরজা। একটি দরজা এই বাজারের এখানে। আরেকটি দরজা সুগন্ধি বিক্রেতাদের বাজারের কাছে। অযুখানার উপরে বেশ কিছু কক্ষ রয়েছে। যেখানে খাদেমরা বসবাস করে। এই অযুখানা নির্মাণের দায়িত্ব ছিলেন আমির আলাউদ্দিন বিন হিলাল। মারওয়া পাহাড় থেকে ডানদিকে মক্কার আমির সাইফুদ্দিন উতাইফা বিন আবি নুমাইয়ের গৃহের অবস্থান। তার আলোচনা সামনে উল্লেখ করব।

ঐতিহাসিক গোরস্থানের বিবরণ

মক্কার ঐতিহাসিক গোরস্থানটি বাবুল মাআল্লা ফটকের বাইরে অবস্থিত। সেই স্থানটি আল হাজুন নামে পরিচিত। কবি হারিস বিন মুজাজ আল জুরহুমি তার কবিতায় এই স্থানটিকে উল্লেখ করে লিখেছেন,

হাজুন থেকে সাফা পর্যন্ত ছিল একদম নীরব
সেই রাতে মক্কায় ছিল না কোনো নৈশ আলাপকারী

যদিও আমরা ছিলাম তারই বাসিন্দা, তবে
রাতের পরিক্রম আর ভাগ্যের আঘাতে আমরা ছিলাম নির্বাক।

এই গোরস্থানেই সমাহিত হয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ প্রিয় সাহাবি। এছাড়াও অনেক তাবেয়ি, বুযুর্গ, আল্লাহর ওলি ও জগদ্বিখ্যাত মনীষী সমাহিত হয়েছেন এখানে। তবে তাদের সমাধিগুলো আজ অক্ষত নেই। মক্কার অধিবাসীরাও ভুলে গেছে সেগুলোর চিহ্ন-পরিচয়। তাই এখন খুব কম কবরই চেনা যায়। এর মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা.-এর কবর। এর কাছেই রয়েছে আব্বাসি খলিফা আবু জাফর মানসুরের কবর। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রা.-কে যেখানে শূলেতে চড়ানো হয়েছিল, সেই জায়গাটিও এখানে। একটি স্থাপনা নির্মাণ করে তার চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তায়েফের অধিবাসীরা সেটি ধ্বংস করে দেয়। কারণ, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তায়েফের বাসিন্দা হওয়ার কারণে তায়েফ থেকে আগত হাজিগণকেও এই স্থাপনার কারণে অভিশাপ শুনতে হতো। গোরস্থানে যাওয়ার সময় ডানদিকে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। কথিত আছে, এটিই সেই মসজিদ যেখানে জিনেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইআত হয়েছিল। এই গোরস্থানের উপর আরাফা, তায়েফ ও ইরাকের উদ্দেশে যেতে হয়।

মক্কার বাইরের কিছু ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ

এমন একটি ঐতিহাসিক স্থান আল হাজুন। যার কথা মাত্র উল্লেখ করা হলো। তবে এও বলা হয়, হাজুন মূলত গোরস্থানের সাথে মাথা উঁচু করে রাখা পাহাড়টির নাম। আরেকটি ঐতিহাসিক স্থানের নাম আল মুহাসসাব। যা দেখতে আবতাহের মতোই। এর অবস্থান মক্কার গোরস্থানের পাশেই। এখানেই অবস্থিত বনু কেনানার সেই ঢালু জায়গা, মক্কা বিজয়ের দিন

যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করেছিলেন। আরেকটি ঐতিহাসিক স্থান জু তুওয়া উপত্যকা। এই উপত্যকা গিয়ে নেমেছে কাদা গিরিপথের এখানে আল হাসহাস নামক স্থানে মুহাজিরদের কবরস্থানে। মক্কার হালাল ও হারাম তথা পবিত্র ও মুক্ত স্থানের মাঝে পার্থক্য করার জন্য যে পিলারগুলো স্থাপন করা হয়েছে, এই উপত্যকা দিয়েই সেখানে যাওয়া যায়। আবদুল্লাহ বিন উমর রা. মক্কায় আগমনকালে জু তাওয়ায় রাত্রিযাপন করে গোসল সেরে সকাল বেলা মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। আরেকটি ঐতিহাসিক মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত কুদা গিরিপথ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় এই পথ ধরে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। মক্কার নিম্নভূমিতে অবস্থিত আরেকটি ঐতিহাসিক স্থান কাদা গিরিপথ। এটিকে আল বাইদা গিরিপথও বলা হয়। এই পথেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন। দুই পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত এই পথের সংকীর্ণ অংশে যাতায়াতপথের পাশে পাথরের স্তূপ চোখে পড়ে। যারাই এই পথ দিয়ে অতিক্রম করে তারা সেখানে একটি করে পাথর নিক্ষেপ করে। কথিত আছে, এটি আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর কবর। এই গিরিপথ থেকে মক্কা পর্যন্ত বিস্তৃত সমতলভূমিতে মিনা থেকে রওনা করে আসা কাফেলাগুলো বিশ্রাম নেয়। এই স্থানের কাছেই মক্কা থেকে আনুমানিক এক মাইল দূরে একটি মসজিদ রয়েছে। যার পাশে পথের ধারে একটি পাথরের উপর আরেকটি পাথর রাখা আছে। যা দেখতে বেঞ্চের মতো মনে হয়। আগে এই পাথরে কিছু অঙ্কিত করা ছিল। তা এখন মুছে গেছে। বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা থেকে ফেরার সময় এই পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তাই লোকেরা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এই পাথরে চুম্বন করে এবং হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে। আরেকটি ঐতিহাসিক স্থানের নাম আত তানঈম। মক্কা থেকে এক ফারসাখ দূরত্বে অবস্থিত। মক্কার অধিবাসীরা এখান থেকে উমরার নিয়ত করে। এটিই মাসজিদুল হারামের সবচেয়ে নিকটবর্তী মুক্ত স্থান। বিদায় হজের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-কে তার ভাইয়ের সঙ্গে মক্কার উদ্দেশে প্রেরণ করে তানঈম থেকে উমরার নিয়ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেখানে পথের পাশে তিনটি মসজিদ নির্মাণ করা

হয়েছে। প্রতিটির নামকরণ করা হয়েছে আয়েশা রা.-এর নামে। আত তানঈমের পথটি বেশ প্রশস্ত। সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে লোকেরা প্রতিদিনই এই পথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে। কারণ, অনেক উমরাকারী এই পথে খালি পায়ে হেঁটে যায়। এই পথেই রয়েছে শুবাইকা নামে পরিচিত সুমিষ্ট পানির কূপগুলো। আরেকটি ঐতিহাসিক স্থানের নাম আয যাহির। মক্কা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত এই স্থানে যেতে হয় তানঈমের পথ ধরে। এখানে পথের দু ধারেই অনেক ঘরবাড়ি, বাগান ও বাজার চোখে পড়ে।

এখানে পথের একপাশে দীর্ঘ সারিতে পানি ও অযুর পাত্র রাখা হয়। এখানে নিয়োজিত খাদেমরা আয যাহির পল্লীর সুগভীর কূপগুলো থেকে পানি এনে এই পাত্রগুলো পূর্ণ করে রাখে। মক্কার স্থানীয় কল্যাণকামী লোকেরা ও দরিদ্র ব্যক্তিরা এই কাজে খাদেমদেরকে সাহায্য করে থাকে। উমরাকারীদের অযু-গোসল ও পানি পানের সুব্যবস্থার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আয যাহির পল্লীর সঙ্গে জু তুওয়া উপত্যকা অবস্থিত।

মক্কাকে বেষ্টন করে রাখা পাহাড়গুলোর বিবরণ

সবার আগে উল্লেখ করতে হয় মক্কা থেকে দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত জাবালে আবু কুবাইসের কথা। এটি মক্কার সবচেয়ে নিকটবর্তী পাহাড় এবং নিচু দুই পাহাড়ের একটি। মাসজিদুল হারামের হাজরে আসওয়াদ প্রান্তের বরাবর এটির অবস্থান। এর পৃষ্ঠদেশে একটি মসজিদ এবং সরাইখানা ও ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সুলতান আল মালিকুয যাহির রহ. সরাইখানাটি পুনরায় চালু করতে চেয়েছিলেন। মাসজিদুল হারাম এবং পুরো মক্কা শহরকে ঘিরে এই পাহাড়টি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এর উপরে দাঁড়িয়ে মক্কা শহর, মাসজিদুল হারামের প্রশস্ত আঙিনা এবং পবিত্র কাবাঘরের অপার্থিব সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। এও বর্ণিত আছে, জাবালে আবু কুবাইস আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি করা প্রথম পাহাড়। নুহ আ.-এর মহাপ্লাবনের সময়ে পবিত্র হাজরে আসওয়াদ গচ্ছিত ছিল এই পাহাড়ের বুকে। কুরাইশরা এই পাহাড়কে ডাকে আল আমিন তথা বিশ্বস্ত। কারণ, এটি তার বুকে গচ্ছিত রাখা হাজরে আসওয়াদকে ইবরাহিম আ.-এর হাতে তুলে দিয়েছে। এও বর্ণিত আছে, আদম আ.-কে এই পাহাড়েই কবর দেওয়া হয়েছে। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পাহাড়েই দাঁড়িয়েছিলেন। মক্কার দুই নিচু পাহাড়ের আরেকটি হচ্ছে জাবালে

কুআইকিয়ান। উল্লেখযোগ্য আরেকটি পাহাড়ের নাম জাবালে আহমার। মক্কার উত্তরদিকে এর অবস্থান। আরেকটি পাহাড়ের নাম আল খানদামা। আল জিয়াদুল আকবার ও আল জিয়াদুল আসগার নামে প্রসিদ্ধ দুই গিরিখাতের কাছে এই পাহাড়ের অবস্থান। আরো আছে তানঈমের দিকে অবস্থিত জাবালুত তাইর নামে পরিচিত চারটি পাহাড়। বর্ণিত আছে, ইবরাহিম আ. পাখি টুকরো টুকরো করে এই চার পাহাড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর এগুলো একত্র হয়ে যায়। যেমনটি পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় এসেছে। সেই স্থানগুলোতে পাথরের স্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে। আরেকটি ঐতিহাসিক পাহাড়ের নাম জাবালে হেরা। এটির অবস্থান মক্কা থেকে উত্তরদিকে এক ফারসাখের মতো দূরত্বে। সুউচ্চ এই পাহাড়টি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মিনার ময়দানের পাশে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভের পূর্বে প্রায়ই এই পাহাড়ে এসে নিভৃতে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতেন। এখানেই তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবুওয়াত লাভ করেন এবং ওহির অবতরণ শুরু হয়। এই পাহাড়টিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কেঁপে উঠেছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, তুমি স্থির হও। তোমার উপরে একজন নবী, একজন সত্যবাদী ও একজন শহীদ রয়েছে।[১] সেদিন তাঁর সঙ্গে কে কে ছিলেন এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এও বর্ণিত আছে, তাঁর সঙ্গে সেদিন দশজন সাহাবি ছিলেন।

বর্ণিত আছে, জাবালে সাবিরও নবীজিকে নিয়ে কেঁপে উঠেছিল। ঐতিহাসিক আরেকটি পাহাড়ের জাবালে সাওর। এই পাহাড়ের অবস্থান মক্কা থেকে এক ফারসাখ দূরে ইয়ামানের পথ। মক্কা থেকে হিজরত করার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা. এই পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। যে ঘটনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল আযরাকি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, এই পাহাড়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে বলেছিল, হে মুহাম্মাদ, আমার কাছে আসো। আমার কাছে আসো। তোমার আগেও আমি আরো সত্তর নবীকে আশ্রয় দিয়েছি। এই গুহায় প্রবেশ

---

[১] সহিহ বুখারীতে আনাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর, উমর ও উসমান রা.-কে সঙ্গে নিয়ে উহুদ পাহাড়ে উঠেছিলেন। তখন পাহাড়টি কেঁপে উঠলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, উহুদ পাহাড় তুমি স্থির হও। তোমার উপরে একজন নবী, একজন সত্যবাদী ও দুইজন শহীদ রয়েছে। [সহিহুল বুখারী, হাদীস : ৩৬৭৫, ৩৬৮৬]

করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সঙ্গী আবু বকর রা. নিশ্চিন্ত অনুভব করেন। আল্লাহ তাআলার আদেশে গুহার মুখে মাকড়সা জাল বুনে আর কবুতর বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে। মুশরিকরা পদছাপ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গুহার মুখ পর্যন্ত এসে দেখে আর কোনো পায়ের ছাপ দেখা যায় না। কিন্তু গুহার মুখে মাকড়সার জাল আর কবুতরের ডিম পাড়া দেখে তারা বলে, এখানে কেউ প্রবেশ করেনি। এই বলে তারা ফিরে যায়। তখন আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেন, যদি তারা সেখান দিয়ে গুহার ভেতরে প্রবেশ করত তখন কী হতো? নবীজি তখন গুহার অপর প্রান্ত দেখিয়ে বলেন, তাহলে আমরা ওইদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতাম। সেখানে কোনো প্রবেশমুখ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলার মহিমায় সেখানে একটি প্রবেশমুখ তৈরি হয়ে যায়।

লোকেরা পবিত্র এই গুহা দেখার জন্য আসে। যে প্রবেশমুখ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুহায় প্রবেশ করেছিলেন, বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তারাও সেখান দিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। অনেকেই তাতে সফল হয়। কেউ কেউ ব্যর্থ হয়ে সেখানে আটকে যায় এবং অনেক কষ্টের পর উঠে আসতে সক্ষম হয়। অনেকেই ভেতরে প্রবেশ না করে এর সম্মুখে নামায আদায় করে। স্থানীয় লোকেরা বলাবলি করে, সতী নারীর গর্ভ থেকে যাদের জন্ম হয়েছে, তারা এই মুখ দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। আর যাদের জন্ম অসতী নারীর গর্ভ থেকে হয়েছে, তারা প্রবেশ করতে পারে না। তাই অনেকেই লজ্জা ও লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার জন্য এই মুখ দিয়ে গুহায় প্রবেশ থেকে বিরত থাকে। ইবনে জুযাই বলেন, হজ করে আসা বেশকজন বিচক্ষণ শায়খের কাছ থেকে আমি শুনেছি, এই মুখ দিয়ে প্রবেশ করা কঠিন হওয়ার কারণ হচ্ছে, এর প্রবেশমুখের সাথেই গুহার ভেতরে একটি অনুপ্রস্থভাবে থাকা বিরাট একটি পাথর রয়েছে। তাই কেউ যদি উপুড় হয়ে সেখান দিয়ে প্রবেশ করতে চায়, তার মাথা সেই পাথরের সঙ্গে গিয়ে ঠেকবে। তাই সে ভিতরে যেতে পারবে না। আবার উপরের দিকে উঠে আসাও হয়ে যাবে দুঃসাধ্য। তার চেহারা এবং বুক তখন মাটির সঙ্গে মিশে থাকবে। এ কারণেই সে আটকে যাবে এবং অনেক চেষ্টা ও কষ্ট করার পর সেখান থেকে উঠতে সক্ষম হবে। তবে কেউ যদি কাত হয়ে প্রবেশ করতে চায় তাহলে যেতে পারবে। তখন তার মাথা পাথরের কাছে যাওয়ার পর সে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে বসে যাবে। ফলে তার পিঠ থাকবে সেই পাথরের দিকে হেলান দেওয়া অবস্থায়, শরীরের মাঝামাঝি অংশ থাকবে প্রবেশমুখে আর

দুই পা থাকবে গুহার বাইরে। তখন সে পা দুটো ভেতরে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেই গুহার ভেতরে পৌঁছে যাবে।

একটি ঘটনা

আমাদের দুই সঙ্গী ফকিহ আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন ফারহান আল আফরিকি আত তাউযিরি এবং আবুস আব্বাস আহমাদ আল আন্দালুসি আল ওয়াদিয়াশির সঙ্গে এই পাহাড়ে একটি ঘটনা ঘটে যায়। ৭২৮ হিজরিতে মক্কায় অবস্থানকালে তারা দুজন এই গুহায় প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে করে কোনো পথপ্রদর্শকও না নিয়ে তারা একাকীই গিয়েছিলেন। ফলে তারা গুহার পথ হারিয়ে অন্য একটি বিচ্ছিন্ন পথে গিয়ে দেখেন এই পথ দিয়ে আর কোথাও যাওয়া যায় না। তখন ছিল চামড়া পুড়িয়ে দেওয়া তীব্র গরমের সময়। তাদের সঙ্গে থাকা পানিও নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই তারা গুহায় পৌঁছতে না পেরে মক্কার দিকে ফেরার মনস্থ করেন। চলতে চলতে একটি পথ খুঁজে পেয়ে সেটি ধরে চলতে থাকেন। কিন্তু এই পথ চলে গেছে আরেকটি পাহাড়ের কাছে। এদিকে প্রচণ্ড গরমে পিপাসায় কাতর হয়ে তাদের দুজনের মরণপণ অবস্থা। ফকিহ আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন ফারহান হাঁটার শক্তি হারিয়ে মাটিতে বসে পড়েন। তবে আবুল আব্বাস আন্দালুসি সেই যাত্রায় বেঁচে যান। তার মাঝে তখনও কিছু শক্তি অবশিষ্ট ছিল। তিনি ওই পাহাড়ের পথে না গিয়ে অন্য একটি পথ ধরেছিলেন। সেটি তাকে আল জিয়াদুল আসগার গিরিখাত পর্যন্ত নিয়ে আসে। সেখান তিনি মক্কায় চলে আসেন। মক্কায় এসেই তিনি আমার কাছে এসে তার ঘটনা এবং আবদুল্লাহ তাউযিরির পাহাড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জানান। তখন সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। আবদুল্লাহ তাউযিরির চাচাতো ভাই হাসান ছিল ওয়াদি নাখলার অধিবাসী। তিনি তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। আমি তাকে তার চাচাতো ভাইয়ের এই অবস্থার কথা জানাই এবং মালেকি মাযহাবের ইমাম শায়খ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবদির রাহমান—যিনি খলিল নামে পরিচিত ছিলেন—তার কাছেও গিয়ে এই ঘটনা ব্যক্ত করি। তখন তিনি ওই পাহাড় ও গিরিখাত সম্পর্কে অবগত একদল লোককে আবদুল্লাহ তাউযিরির সন্ধানে প্রেরণ করেন। এদিকে আবদুল্লাহ তাউযিরির তার সঙ্গীকে হারিয়ে ফেলার পর বড় একটি পাথরের ছায়ায় আশ্রয় নেন। ক্লান্তি ও পিপাসা নিয়ে তিনি সেখানে কাহিল হয়ে বসে

থাকেন। তার মাথার উপরে উড়তে থাকা কাকের দল অপেক্ষা করতে থাকে কখন তার প্রাণবায়ু উড়ে যাবে আর তারা ঠোকর বসিয়ে তার গোশত খাবে। দিনের উত্তাপ শেষে রাত্রির আগমনের পর তিনি শরীরে কিছুটা বল অনুভব করেন। রাতের শীতলতা তাকে সতেজ করে তোলে। ভোরবেলায় তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যান পাহাড়সংলগ্ন উপত্যকায়। পাহাড়ের কারণে এখানটা সূর্যের আলো থেকে আড়াল হয়ে থাকে। চলতে চলতে তিনি একটি বাহনজন্তুর দেখা পেয়ে সেটির উদ্দেশ্যে যেতে থাকেন। সেখানে গিয়ে বেদুইনদের একটি তাঁবু দেখতে পান। সেটি দেখার পরপরই তিনি মাটিতে পড়ে যান। আর উঠে দাঁড়াতে পারেন না। তাঁবুর ভেতরে থাকা এক নারী তাকে দেখতে পান। তার স্বামী গিয়েছেন পানি সংগ্রহ করে আনতে। তিনি নিজের কাছে থাকা অবশিষ্ট পানি শায়খ আবদুল্লাহ তাউযিরিকে পান করান। কিন্তু তার তৃষ্ণা মিটে না। এমন সময় সেই নারীর স্বামীও চলে আসেন। তিনি পুরো এক মশক পানি পান করান। তবুও শায়খ আবদুল্লাহর তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। এরপর মহিলাটির স্বামী একটি গাধায় চড়িয়ে শায়খকে নিয়ে মক্কার দিকে রওনা করিয়ে দেন। আসর নামাযের সময় শায়খ আবদুল্লাহ পুনরায় মক্কায় এসে পৌঁছান। কিন্তু তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে এমন হয়, যেন তিনি মাত্র কবর থেকে উঠে এসেছেন।

মক্কার দুই আমিরের বিবরণ

আমি যখন মক্কায় প্রবেশ করি, তখন এর আমিরের দায়িত্ব ছিল আসাদুদ্দিন রুমাইসা ও সাইফুদ্দিন উতাইফা নামক সম্ভ্রান্ত দুই ভাইয়ের কাঁধে। তাদের পিতা ইবনে নুমাইও ছিলেন মক্কার আমির। তারা হাসান রা.-এর বংশধর। রুমাইসা বয়সে জ্যেষ্ঠ হলেও উতাইফা ছিলেন অধিক ন্যায়পরায়ণ। তাই মক্কায় তাদের জন্য দোয়া করার সময় উতাইফার নাম আগে উচ্চারণ করা হতো। রুমাইসার দুই পুত্র আহমাদ ও আজলান এবং তিন কন্যা তাকিয়া, সিন্দ এবং উম্মে কাসিম। বর্তমানে তার পুত্র আজলান মক্কার আমির পদে নিয়োজিত আছে। আর উতাইফার তিন পুত্র। মুহাম্মাদ, মুবারক ও মাসউদ। উতাইফার বাড়ি মারওয়া পাহাড় থেকে ডানে। আর রুমাইসার বাড়ি বনু শাইবা ফটকের কাছে সরাইখানার পাশে। প্রতিদিন মাগরিবের নামাযের সময় তাদের দুজনের বাড়ির দরজাতেই তবলা বাজানো হয়।

মক্কার মানুষ ও তাদের মহত্বের কথা

মক্কার অধিবাসীগণ অনেক মহৎ কাজ ও মহৎ গুণের অধিকারী। চারিত্রিক মাধুর্যে তারা পরিপূর্ণ। অসহায় ও নীড়হারা মুসাফির লোকদের জন্য তারা নিরাপদ আশ্রয় ও উত্তম প্রতিবেশী। তাদের চমৎকার একটি বিষয় হচ্ছে, ওলিমার আয়োজনের সময়ে তারা প্রথমে অসহায়, দরিদ্র ও মুসাফির ব্যক্তিদের খাওয়ায়। তাদেরকে দাওয়াত করে এনে অত্যন্ত সমাদর ও সহমর্মিতার সঙ্গে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অসহায় লোকদের অধিকাংশই অবস্থান করেন গণ চুলার কাছে। যেখানে মক্কার লোকেরা রুটি তৈরি করে থাকেন। নিজেদের ভাগের রুটি রান্না শেষে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় অসহায় ব্যক্তিরা তাদের পিছু পিছু যায়। প্রত্যেকেই তখন নিজেদের ভাগ থেকে অসহায়দের রুটি প্রদান করে। কাউকে খালি হাতে ফেরায় না। কারো কাছে যদি একটি রুটিও থাকে সেখানে থেকে সে খুশি মনে তার এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক রুটি দিয়ে দেয়।

তাদের আরেকটি মহৎ গুণ হচ্ছে, মক্কার এতিম শিশুরা বাজারে ছোট ও বড় দুটি পাত্র নিয়ে বসে থাকে। মক্কার লোকেরা বাজারে এসে শস্য, গোশত ও তরিতরকারি ক্রয় করে ফেরার সময় এতিম শিশুরা এসে একটি পাত্রে খাদ্যশস্য এবং আরেকটি পাত্রে গোশত ও তরিতরকারি বহন করে লোকদের বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দেয়। লোকেরা তাদের হাতে বাজার তুলে দিয়ে কেউ চলে যায় তাওয়াফ করতে। কেউ চলে যায় অন্য দরকারি কাজে। তাদের অনুপস্থিতিতে এই শিশুরা কখনো আমানতের খেয়ানত করেছে বলে শোনা যায়নি। তারা যথাযথভাবে সেগুলো যার যার গৃহে পৌছে দেয়। এর বিনিময়ে তাদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পয়সা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

এছাড়াও মক্কার অধিবাসীরা অনেক পরিচ্ছন্ন রুচির অধিকারী। সবসময় তারা পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করেন। তাদের অধিকাংশ পোশাক সাদা রঙের হয়ে থাকে। তাই তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সবসময় উজ্জ্বল থাকে। তারা অনেক সুগন্ধি ও সুরমা ব্যবহার করেন। সবুজ আরাক গাছের ডাল দিয়ে তারা একটু পরপরই মিসওয়াক করতে থাকেন।

মক্কার নারীগণ সৌন্দর্য, সতীত্ব ও চারিত্রিক উৎকর্ষে অতুলনীয়া। তারাও অধিক পরিমাণে সুগন্ধি ব্যবহার করেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ

সারারাত না খেয়ে কাটিয়ে সেই খাবার দিয়ে সুগন্ধি ক্রয় করেন। প্রতি শুক্রবার রাতে কাবাঘর তাওয়াফ করার সময় তারা উত্তম পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি মেখে আসেন। তাদের চলে যাওয়ার পরও হারাম প্রাঙ্গণে সুগন্ধির ঘ্রাণ ভেসে বেড়াতে থাকে। এছাড়াও মক্কার অধিবাসীদের আরো অনেক চমৎকার চমৎকার নিয়ম-রীতি রয়েছে। সামনে সেগুলো উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মক্কার বিচারক, খতিব, হজের মৌসুমের ইমাম, আলেম ও বুযুর্গদের বিবরণ

মক্কার বিচারক হচ্ছেন অভিজ্ঞ আলেম ও বুযুর্গ নাজমুদ্দিন মুহাম্মাদ। তিনি আরেক অভিজ্ঞ আলেম মুহিউদ্দিন আত তাবারির পুত্র। শায়খ নাজমুদ্দিন অত্যন্ত উদারমনা ও মহৎ একজন ব্যক্তি। তিনি অনেক সদকা করেন এবং মক্কায় আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তিদের বেশ সহমর্মিতা রাখেন। তার চারিত্রিক মাধুর্যের কথা সুবিদিত। প্রায়ই কাবাঘর দেখতে যান এবং তাওয়াফ করেন। ধর্মীয় বিভিন্ন আয়োজন কেন্দ্র করে, বিশেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিনের সময়ে তিনি অনেক লোকের খাবারের আয়োজন করেন। এ সময় তিনি মক্কার অভিজাত, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও অসহায়-দরিদ্র লোক, হারাম শরিফের সকল খাদেম এবং মক্কায় অবস্থান নেওয়া সকল মুসাফিরের জন্য খাবারের আয়োজন করেন। মিসরের সুলতান আল মালিকুন নাসির তাকে খুবই সম্মান করতেন। সুলতান ও তার আমির-উমারাদের সকল সদকা তার হাতেই ব্যয় করা হতো। তার পুত্র শিহাবুদ্দিনও সম্মানিত একজন ব্যক্তি। বর্তমানে তিনিই মক্কার বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন।

মক্কার খতিব ও মাকামে ইবরাহিমের ইমাম হচ্ছেন বিশুদ্ধভাষী, সুবক্তা ও বাগ্মিতার অধিকারী অদ্বিতীয় আলেম বাহাউদ্দিন তাত তাবারি। তার মতো সুন্দর ও অলংকারপূর্ণ খুতবা দেওয়ার মতো যোগ্যতা খুব কম খতিবেরই আছে। আমি শুনেছি, তিনি প্রতি জুমার জন্য একটি করে খুতবা প্রস্তুত করেন। এরপর আর কখনোই সেই খুতবা দ্বিতীয়বার পাঠ করেন না।

হজের মওসুমের ইমাম হিসেবে নিয়োজিত হয়েছেন অভিজ্ঞ আলেম, ফকিহ এবং নন্দিত বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব শায়খ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ। তিনি প্রসিদ্ধ আলেম, ফকিহ ও বুযুর্গ আবু যায়েদ আবদুর রহমানের পুত্র। শায়খ আবু আবদুল্লাহই হারাম শরিফে মালেকি মাযহাবের অনুসারীদের ইমামতি করে

থাকেন। তিনি খলিল নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন এবং তার হায়াত বৃদ্ধি করুন। তার পূর্বপুরুষগণ আফ্রিকার জারিদ অঞ্চলের অধিবাসী। সেখানে তারা বনু হাইয়ুন নামে পরিচিত। যা সেখানকার অভিজাত বংশ হিসেবে বিবেচিত। তিনি এবং তার পিতা মক্কাতেই জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মক্কার শীর্ষস্থানীয় একজন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত। বরং বলতে গেলে তিনিই সবার চেয়ে এগিয়ে। অনেকেই তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছেন। সবসময় তিনি ইবাদতে নিয়োজিত থাকেন। মনের দিক থেকে তিনি উদার। চারিত্রিক মাধুর্যে শ্রেষ্ঠ এবং অনেক দয়ালু। তার কাছে কোনো কিছু চেয়ে কেউ কখনো খালি হাতে ফিরে না।

বরকতময় একটি ঘটনা

মক্কায় থাকাকালীন যখন আমি মুজাফফারিয়া মাদরাসায় অবস্থান করতাম, তখন একরাতে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখতে পাই। তিনি এই মাদরাসারই পাঠকক্ষের জানালার পাশে বসে আছেন। সেই জানালা দিয়ে পবিত্র কাবাঘর দেখা যায়। লোকেরা তার কাছে এসে বাইআত করে যাচ্ছে। আমি দেখতে পাই খলিল নামে পরিচিত শায়খ আবু আবদুল্লাহ কক্ষে প্রবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে তার হাত নবীজির হাতে রেখে বলেন, আমি আপনার কাছে এই এই বিষয়ে বাইআত করছি। এই বলে কিছু বিষয় উল্লেখ করেন। আরো বলেন, আমি এই বাইআতও করছি যে, আমার গৃহ থেকে কোনো অসহায় ব্যক্তি খালি হাতে ফিরে যাবে না। এটিই ছিল তার শেষকথা। আমি তার এই কথা শুনে যারপরনাই অবাক হই। তিনি কি এমনটি বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখেন। মক্কা, ইয়েমেন, জাইলা, ইরাক, পারস্য, মিসর ও শাম অঞ্চল মিলিয়ে এখানে অসংখ্য অসহায় দরিদ্র লোকের আগমন ঘটে। স্বপ্নে আমি তাকে কাফতান নামক সাদা রঙের সুতি কাপড়ের খাটো একটি জুব্বা পরিহিত দেখতে পাই। মাঝে মাঝে তিনি এই জুব্বাটি পরিধান করতেন। ফজর নামায আদায় করে আমি তার কাছে গিয়ে এই স্বপ্নের কথা জানাই। তিনি তা শুনে আনন্দের আতিশয্যে কান্না করে দেন। আমাকে বলেন, এই জুব্বাটি কোনো এক বুযুর্গ ব্যক্তি আমার দাদাকে উপহার দিয়েছিলেন। আমি বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তা পরিধান করি। এরপর আমি কখনোই তাকে কোনো অসহায় ব্যক্তিকে খালি হাতে ফেরাতে দেখিনি। খাদেমদেরকে তিনি

রুটি ও খাবার প্রস্তুত করতে বলতেন এবং প্রতিদিন আসর নামাযের পর আমার কাছে সেই খাবার নিয়ে হাজির হতেন। মক্কার অধিবাসীরা আসর নামাযের পর দিনে মাত্র একবারই আহার করে। পরদিন আসর নামায পর্যন্ত তারা এই আহারের উপরেই নির্ভর করেন। আর দিনের বাকি সময়ে ক্ষুধা পেলে তারা খেজুর ভক্ষণ করেন। এজন্যই তারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং রোগব্যাধি থেকে মুক্ত।

শায়খ নাজমুদ্দিন আত তাবারির মেয়ের সঙ্গে শায়খ খলিল বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তার তালাকের ব্যাপারে সন্দিহান হওয়ার পর শায়খ খলিল তাকে ছেড়ে দেন। অতঃপর ফকিহ শিহাবুদ্দিন আন নুওয়াইরি সেই মেয়েকে বিয়ে করেন। তিনি মক্কায় আশ্রয় নেওয়া বরেণ্য একজন আলেম। তার মূল নিবাস সইদে মিসরে। সেই মেয়ে তার সঙ্গে বেশ কয়েক বছর সংসার করে। ফকিহ শিহাবুদ্দিন তাকে নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় সফর করেন। সঙ্গে সেই মেয়ের ভাই শিহাবুদ্দিনও ছিল। সেখানে গিয়ে ফকিহ শিহাবুদ্দিন তালাকের কসম করে বসেন। এরপর তারা পৃথক হয়ে যান। এর কয়েক বছর পর শায়খ খলিল পুনরায় সেই মেয়েকে বিয়ে করেন।

মক্কার বরেণ্য আলেমদের মাঝে উল্লেখযোগ্য কজন ব্যক্তি হচ্ছেন, শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের ইমাম শিহাবুদ্দিন ইবনুল বুরহান, হানাফী মাযহাবের ইমাম শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন আলী। তিনি মক্কার শীর্ষস্থানীয় ও সম্মানিত একজন ব্যক্তি। মক্কায় আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তি এবং মুসাফিরদের জন্য খাবারের আয়োজন করেন। প্রতি বছরই তিনি চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার দিরহাম করে দেনা হয়ে যান। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সেই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। তুর্কি অঞ্চলের আমিরগণ তাকে খুবই সম্মান করেন এবং তার প্রতি সুধারণা পোষণ করেন। তিনিই তাদের ইমাম। উল্লেখযোগ্য আরেকজন আলেম হচ্ছেন হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ও হাদীসবিশারদ মুহাম্মাদ বিন উসমান আল বাগদাদী। তার জন্ম মক্কাতেই। তিনি কাজি নাজমুদ্দিনের নায়েব হিসেবে নিয়োজিত। তাকিউদ্দিন আল মিসরীর মৃত্যুর পর তিনিই মক্কার মুহতাসিবের[১] দায়িত্ব পালন করেন। তার প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে লোকেরা তাকে খুবই ভয় করে।

---

[১] মুহতাসিবের দায়িত্ব হচ্ছে বাজার এবং ব্যবসায়ীদের তদারকি করা এবং লোকদের নীতি-নৈতিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা। সবমিলিয়ে এই পদকে আইনমন্ত্রীর দায়িত্বের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচারকের চেয়েও অধিক হস্তক্ষেপের ক্ষমতা ছিল তার।—অনুবাদক

আরেকটি ঘটনা

তাকিউদ্দিন মিসরী মক্কার মুহতাসিব পদে নিয়োজিত ছিলেন। উচিত ও অনুচিতভাবে সবকাজেই তিনি হস্তক্ষেপ করতেন। ঘটনাক্রমে একবার হজের আমিরের কাছে মক্কার দস্যুদলের এক ছেলেকে নিয়ে আসা হয়। সে এক হাজির সম্পদ চুরি করেছিল। হজের আমির তার হাত কর্তন করার নির্দেশ দেন। তাকিউদ্দিন তখন বলেন, আপনার উপস্থিতিতে যদি তার হাত কর্তন সম্পন্ন না করা হয়, তবে এই নির্দেশ বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হবে না। মক্কার লোকেরা এসে আপনার খাদেমদের কাছ থেকে তাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে মুক্ত করে দিবে। তখন হজের আমির তার উপস্থিতিতে হাত কর্তনের নির্দেশ দিলে তার আদেশ বাস্তবায়ন করা হয়। তখন থেকে সেই ছেলেটি তাকিউদ্দিনের উপর ক্রুদ্ধ হয় এবং সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই তার সেই সুযোগ ছিল না। মক্কার দুই আমির রুমাইসা ও উতাইফার কাছ থেকে তাকিউদ্দিন হাসাব লাভ করেছিলেন। হাসাব হচ্ছে আমির কর্তৃক কাউকে জনসম্মুখে পাগড়ি অথবা টুপি উপহার দেওয়া। এই উপহার গ্রহণকারীর জন্য নিরাপত্তার স্মারক হয়ে থাকে। মক্কা থেকে বের হওয়া বা অন্যস্ত্র স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিরঙ্কুশ নিরাপত্তার মধ্যে থাকেন। তাকিউদ্দিন মক্কায় কয়েক বছর অবস্থান করার পর অন্যত্র চলে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। আমিরদ্বয়কে বিদায় জানিয়ে বিদায়ী তাওয়াফ করে তিনি বাবুস সাফা ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসেন। তখনই হাত কেটে ফেলা সেই বালকটি তার কাছে নিজের দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করে সাহায্য কামনা করে। তাকিউদ্দিন তাকে ধমক দিয়ে দূরে সরে যেতে বলেন। তখন সেই বালকটি জানবিয়া নামক খঞ্জর বের করে তাকিউদ্দিনকে সজোরে একটি আঘাত করে। এই আঘাতেই তাকিউদ্দিনের মৃত্যু হয়ে যায়।

মক্কার উল্লেখযোগ্য আরো কজন আলেম হচ্ছেন, ফকিহ জাইনুদ্দিন আত-তাবারি। তিনি বিচারক নাজমুদ্দিন আত তাবারির সহোদর ভাই। তিনিও মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং আশ্রয় নেওয়া মুসাফিরদের প্রতি খুবই সদয়। ফকিহ মুহাম্মাদ বিন ফাহাদ আল কুরাশিও তেমনই একজন আলেম। ফকিহ মুহাম্মাদ বিন উসমান আল হাম্বলির মৃত্যুর পর তিনি বিচারক নাজমুদ্দিনের নায়েবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আরেকজন উল্লেখযোগ্য আলেম হচ্ছেন দুনিয়াবিমুখ বুযুর্গ মুহাম্মাদ ইবনুল বুরহান। তবে তিনি ওয়াসওয়াসা বা

সন্দেহের রোগে আক্রান্ত। একদিন তিনি মুজাফফারিয়া মাদরাসার পুকুরে অযু করছিলেন। দেখতে পাই তিনি একটি বারবার ধৌত করছেন। মাথা মাসেহ করার পর আরো কয়েকবার মাসেহ করেন। এতেও তিনি নিশ্চিন্ত না হয়ে শেষমেশ পুকুরেই মাথা ডুবিয়ে দেন। নামাযের সময় দেখা যায় শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম সাহেব নামায শেষ করে ফেলেছেন আর তিনি তখনো নিয়ত করার মাঝেই আটকে আছেন। শেষে তিনি অন্য মাযহাবের ইমামের পেছনে নামায আদায় করেন। এছাড়াও তিনি অনেক তাওয়াফ ও উমরা করতেন এবং সর্বদা জিকিরে মগ্ন থাকতেন।

মক্কায় আশ্রয় নেওয়া উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যক্তি

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অভিজ্ঞ আলেম ও বুযুর্গ শায়খ আফিফুদ্দিন আবদুল্লাহ বিন আসআদ আল ইয়ামানি আশ শাফেয়ীর কথা। তিনি শায়খ আল ইয়াফেয়ি নামে প্রসিদ্ধ। দিনে-রাতে তিনি অনেক তাওয়াফ করেন। রাতের বেলায় তাওয়াফ শেষে তিনি মুজাফফরিয়া মাদরাসার ছাদে উঠে কাবাঘরের দিকে অপলক চেয়ে থাকেন। এ অবস্থাতেই তন্দ্রাভাব চলে এলে মাথার নিচে একটি পাথর রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। সামান্য পরিমাণ ঘুমিয়ে তিনি নতুন করে অযু করে পুনরায় ফজর নামায পর্যন্ত তাওয়াফ করেন। তিনি ফকিহ শিহাবুদ্দিন ইবনুল বুরহানের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তখন মেয়ের বয়স ছিল খুবই অল্প। সে তার পিতার কাছে নানা অভিযোগ করত আর পিতা তাকে ধৈর্যধারণ করতে বলতেন। এভাবেই কয়েক বছর সংসার করার পর সেই মেয়ে ও শায়খ আল ইয়াফেয়ির মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

আরেকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন শায়খ নাজমুদ্দিন আল আসফুনী। তিনি সইদে মিসরের বিচারক পদে নিয়োজিত ছিলেন। সব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল থাকার জন্য মক্কায় এসে হারাম শরিফে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রতিদিনই তিনি আত তানঈম থেকে নিয়ত করে উমরা সম্পন্ন করেন। রমযানে মাসে তিনি দিনে দুইবার উমরা করেন। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রমযানে একটি উমরা আমার সঙ্গে হজ করার সমান।'[১]

---

[১] মাওয়ারিদুয যামআন, হাদীস : ১০২০।–অনুবাদক

শায়খ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ আল হালাবী। তিনি অনেক তাওয়াফ করতেন এবং প্রচুর পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। অনেক আগে তিনি মক্কায় এসেছেন। এখানেই তার মৃত্যু হয়েছে।

শায়খ আবু বকর আস সিরাজি। তিনি আস সামিত নামে পরিচিত। অনেক তাওয়াফ করতেন তিনি। মক্কায় যে বছর অবস্থান করেছেন কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেননি।

শায়খ বুরহানুদ্দিন আল আজমি। তিনি ছিলেন ওয়ায়েজ। কাবাঘরের পাশেই তার জন্য চেয়ার দেওয়া হতো। তিনি বিশুদ্ধ আরবিতে হৃদয় নিংড়ানো কথামালা দিয়ে সাজিয়ে আলোচনা করতেন।

শায়খ বুরহানুদ্দিন ইবরাহিম আল মিশরি। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত একজন কারি। বাস করতেন দারুস সিদরা সরাইখানায়। মিসর ও শামের লোকেরা তার কাছে সদকা নিয়ে আসত। তিনি এতিমদের কুরআন শিক্ষা দিতেন এবং তাদের খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থাও করতেন।

শায়খ ইজ্জুদ্দিন আল ওয়াসিতি। তিনি ছিলেন অনেক সম্পদের মালিক। প্রতিবছর তার এলাকা থেকে তার কাছে প্রচুর সম্পদ নিয়ে আসা হতো। তিনি সেগুলো দিয়ে খাদ্যশস্য ও খেজুর ক্রয় করে অসহায়-দরিদ্র লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। নিজেই বহন করে লোকদের ঘরে ঘরে গিয়ে দিয়ে আসতেন। আমৃত্যু তিনি এমনটি করে গেছেন।

শায়খ আবুল হাসান আলী বিন রিযকিল্লাহ আল আনজারি। তার নিবাস ছিল তানজায়। ছিলেন বিশিষ্ট একজন বুযুর্গ ব্যক্তি। মক্কায় আশ্রয় নিয়ে কয়েক বছর অবস্থান করার পর এখানেই তার মৃত্যু হয়। তার সঙ্গে আমার পিতার অনেক আগে থেকেই পরিচয় ছিল। কখনো তানজায় গেলে তিনি আমাদের কাছেই অবস্থান করতেন। মুজাফফারিয়া মাদরাসায় তার পৃথক একটি কক্ষ ছিল। দিনের বেলায় সেখানে তিনি ইলম শিক্ষা দিতেন এবং রাতে অবস্থান করতেন রাবি এলাকার খানকায়। এটি মক্কার চমৎকার খানকা ও সরাইখানাগুলোর একটি। এর ভেতরে মিষ্টি পানির একটি কূপ রয়েছে। যার সঙ্গে মক্কার অন্য কোনো কূপের তুলনা হয় না। এখানে অবস্থানকারী সবাই বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। হেজাজের লোকেরা এই খানকাকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং এর জন্য মানতও করে। তায়েফের লোকেরা এখানে ফলমূল নিয়ে আসে। যাদের খেজুর, আঙুর, পিচ অথবা তীন ফলের বাগান আছে, তারা

এর এক দশমাংশ এই খানকার জন্য বরাদ্দ করে এবং নিজেদের উটের মাধ্যমে এখানে এনে পৌঁছে দেয়। মক্কা থেকে তায়েফের দূরত্ব দুইদিনের। কেউ যদি এমনটি না করে তাহলে দেখা যায় পরবর্তী বছরে তার ফলের বাগান খরা অথবা মড়কে আক্রান্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে।

আশ্চর্য একটি ঘটনা

মক্কার আমির আবু নুমাইয়ের এক গোলাম একবার আমিরের একটি ঘোড়া নিয়ে এই খানকায় প্রবেশ করে কূপ থেকে ঘোড়াকে পানি পান করায়। আস্তাবলে নিয়ে যাওয়ার পর ঘোড়াটি পীড়ায় ভুগতে থাকে এবং মাটিতে পড়ে অস্বাভাবিকভাবে মাথা ও পা নাড়তে থাকে। আমির আবু নুমাইয়ের কাছে এই খবর গেলে তিনি নিজে খানকায় এসে এখানে অবস্থানরত লোকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং তাদের মধ্যকার একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। সেই ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে সেটি তার পেটে থাকা কূপের পানি বমি করে সুস্থ হয়ে যায়। এরপর আর কেউ কখনো খানকায় গিয়ে মন্দ কিছু করার সাহস করেনি।

মক্কায় আশ্রয় নেওয়া আরো কজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি

শায়খ আবুল আব্বাস আল গুমারি। তিনি শায়খ আবুল হাসান বিন রিযকিল্লাহর একজন শাগরেদ। অবস্থান করতেন রাবি এলাকার খানকায়। মক্কাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শায়খ আবু ইয়াকুব ইউসুফ। তিনি এসেছিলেন সিউটার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। ছিলেন আগের দুজন শায়খের খাদেম। তাদের ইন্তেকালের পর তিনি খানকার শায়খ হিসেবে মনোনীত হন।

আরো আছেন শায়খ আবুল হাসান আলী বিন ফারগুস আত তিলমিসানি এবং শায়খ সাঈদ আল হিন্দি। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন কালালা অঞ্চলের খানকার শায়খ।

একটি ঘটনা

শায়খ সাঈদ আল হিন্দি ভারতবর্ষের সুলতান মুহাম্মাদ শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। সুলতান তাকে অনেক সম্পদ প্রদান করেন। যা নিয়ে

তিনি মক্কায় আগমন করেন। মক্কায় আসার পর আমির উতাইফা তাকে বন্দি করে সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিতে বলেন। তিনি অস্বীকৃতি জানালে তাকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখে শাস্তি দেওয়া হয়। অতঃপর পঁচিশ হাজার রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে তিনি মুক্তি লাভ করেন। এরপর তিনি পুনরায় ভারতবর্ষে চলে যান। সেখানে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ভারতবর্ষে গিয়ে তিনি শাম অঞ্চলের আরবদের আমির সাইফুদ্দিন গদার বাড়িতে উঠেন। আমির সাইফুদ্দিন গদা তখন ভারতেই বসবাস করতেন। সুলতান মুহাম্মাদ শাহের বোনকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। তার আলোচনা সামনে আসবে। সুলতান মুহাম্মাদ শাহ শায়খ সাঈদকে বেশ কিছু সম্পদ প্রদান করেন। আমির সাইফুদ্দিন গদার অধীনে থাকা ওয়াশাল নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি আবারও আরবের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। আমির সাইফুদ্দিন ওয়াশালকে পাঠিয়েছিলেন তার কিছু আপন লোককে নিয়ে আসার জন্য। তার সঙ্গে তিনি বেশ কিছু সম্পদ ও উপহারও প্রেরণ করেছিলেন। তন্মধ্যে সুলতানের বোনের সঙ্গে বিবাহের দিন তার কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া বহুমূল্যের স্বর্ণখচিত ও অলংকারসজ্জিত বাহারি রঙের রেশমি কাপড়ের পোশাকটিও ছিল। অলংকারের আধিক্যের কারণে সেই পোশাকের রঙ চেনা যেত না। এছাড়াও তেজি ঘোড়া ক্রয় করার জন্য তার সঙ্গে আরো পঞ্চাশ হাজার দিরহামও দিয়েছিলেন। শায়খ সাঈদ ওয়াশালের সঙ্গে সফর করেন। তাদের কাছে থাকা সম্পদ দিয়ে ক্রয় করেন বিভিন্ন পণ্য। সুকতারা দ্বীপে যাওয়ার পর ভারতবর্ষের জলদস্যুদের বিশাল এক দল অনেকগুলো নৌযানে করে তাদের দুজনের কাফেলার উপর হামলা করে। তারাও দস্যুদের সঙ্গে জানবাজি রেখে লড়াই করেন। উভয়পক্ষ থেকেই বেশকজন লোক নিহত হয়। ওয়াশাল ছিলেন দক্ষ তিরন্দাজ। তিনি একাই একদল দস্যুর জীবনলীলা সাঙ্গ করে দেন। কিন্তু পরে গিয়ে আর দস্যুদের সঙ্গে পেরে উঠতে পারেননি। তাকে আহত করে তাদের কাছে থাকা সমস্ত সম্পদ দস্যুরা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। শুধু তাদের নৌযানটি আর সফরের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও পাথেয় রেখে যায়। অতঃপর তারা এডেনে চলে যান। সেখানে ওয়াশালের মৃত্যু হয়। এই দস্যুরা লড়াইয়ের সময় প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে বা ডুবিয়ে না দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিত। তাদের লক্ষ্য ছিল শুধু সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া। জাতিগত দিক থেকে ক্রীতদাস হওয়ার কারণে তারা কোনো ক্রীতদাসকেও ছিনতাই করত না। শায়খ সাঈদ শুনেছিলেন ভারতবর্ষের সুলতান তার সাম্রাজ্যে আব্বাসি খেলাফতের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান।

যেমনটি তার পূর্বের সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ, তার ছেলে সুলতান নাসিরুদ্দিন, সুলতান জালালুদ্দিন ফিরোজ শাহ এবং সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন প্রমুখ শাসকগণ করে গেছেন। বাগদাদ থেকে তাদের জন্য রাজকীয় সম্মাননা প্রেরণ করা হতো। ওয়াশালের মৃত্যুর পর শায়খ সাঈদ মিসরের রাজধানী কায়রোতে খলিফা আবুর রবি সুলাইমান আল আব্বাসির পুত্র খলিফা আবুল আব্বাসের কাছে চলে যান।[১] তাকে ভারতবর্ষের সুলতানের ইচ্ছার ব্যাপারে অবগত করেন। খলিফা সুলতানের উদ্দেশ্যে নিজ হাতে একটি পত্র লিখে তাকে ভারতবর্ষে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করেন। শায়খ সাঈদ সেই চিঠি সঙ্গে নিয়ে ইয়েমেনে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনটি কালো পোশাক ক্রয় করে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক জাহাজে উঠেন। ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী থেকে চল্লিশ দিনের দূরত্বে অবস্থিত কাম্বাইয়ে এসে পৌঁছানোর পর সেখানকার গোয়েন্দা সুলতানকে শায়খ সাঈদের আগমন ও তার সঙ্গে থাকা খলিফার চিঠি ও ফরমানের বিষয়ে অবগত করে চিঠি প্রেরণ করেন। তখন শায়খ সাঈদকে সসম্মানে রাজধানীতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি রাজধানীর কাছাকাছি আসার পর সুলতান তার মন্ত্রী, বিচারক ও ফকিহগণকে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রেরণ করেন। এরপর তিনি নিজে বেরিয়ে এসে শায়খের সঙ্গে দেখা করে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। শায়খ তার হাতে খলিফার ফরমানটি তুলে দিলে তিনি তাতে চুমো খান এবং নিজের মাথার উপর রাখেন। অতঃপর শায়খ সাঈদ সুলতানের হাতে সম্মানসূচক পোশাকের সিন্দুকটিও তুলে দেন। সুলতান সেটি তার কাঁধে নিয়ে কয়েক কদম হাঁটেন। তারপর একটি পোশাক তিনি নিজে পরেন। আরেকটি পরিধান করান তার মন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন মুহাম্মাদকে। তিনি আব্বাসি খলিফা আল মুনতাসিরের পুত্র। সুলতানের কাছেই অবস্থান করেন। তার আলোচনা সামনে আসবে। তৃতীয় পোশাকটি পরান আমির কুবুলাকে। যার উপাধি আল মালিকুল কাবির। তিনি সুলতানের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তার কাছ থেকে মশা-মাছি তাড়ান। এদিকে সুলতানের নির্দেশে শায়খ সাঈদ ও তার সঙ্গীদেরকে রাজকীয় সম্মানসূচক

---

[১] এটি মামলুক সালতানাত নিয়ন্ত্রিত কায়রো বা মিশরের আব্বাসি খিলাফত নামে পরিচিত। ৬৫৬ হিজরিতে বাগদাদে মূল আব্বাসি খেলাফতের পতনের পর মিশরের আব্বাসি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯২৩ হিজরিতে সর্বশেষ খলিফা মুহাম্মাদ আল মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ উসমানি সুলতান প্রথম সালিমের হাতে ক্ষমতা সোপর্দ করার মাধ্যমে এই খেলাফতের সমাপ্তি ঘটে এবং উসমানি সালতানাত খেলাফতের অবস্থান লাভ করে। খলিফা আবুল আব্বাস ছিলেন এই খেলাফতের চতুর্থ খলিফা।–অনুবাদক

পোশাক পরানো হয়। তাকে হাতির পিঠে চড়িয়ে শহরে প্রবেশ করানো হয়। সুলতান তখন নিজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে তার সম্মুখে ছিলেন। তার ডানে বামে ছিলেন দুই আমির, সুলতানমাত্রই যাদেরকে সম্মানসূচক পোশাক পরিয়েছেন। দিল্লী শহরকে তখন আকর্ষণীয় সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল। তৈরি করা হয়েছিল এগারোটি কাঠের গম্বুজ। প্রতিটি ছিল চার তলাবিশিষ্ট। প্রতি তলায় ছিল পুরুষ ও নারী গায়ক-গায়িকা আর নর্তকীদের দল। এরা সবাই ছিল সুলতানের ক্রীতদাস। গম্বুজগুলোকে সাজানো হয়েছিল উপরে-নিচে, ভেতরে-বাইরে স্বর্ণের কারুকার্যখচিত রেশমি কাপড় দিয়ে। এর মাঝের তলায় ছিল মহিষের চামড়া দিয়ে বানানো তিনটি মটকি। সেগুলো ছিল জুলাপমিশ্রিত পানি দিয়ে পূর্ণ। আগত প্রত্যেক ব্যক্তিই সেখান থেকে পান করেছে। কাউকে নিষেধ করা হয়নি। যারাই এখান থেকে পান করেছে তাদেরকে এরপরে পনেরোটি পান, সুপারি ও জর্দা দেওয়া হয়েছে। সেগুলো ভক্ষণ করে তাদের মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়েছে। তাদের চেহারার হলদেটে ভাব দূর হয়ে লালিমা বৃদ্ধি হয়েছে এবং যা যা খেয়েছে, সব হজম হয়ে গেছে। শায়খ সাঈদ হাতির পিঠে চড়ার পর তার সম্মানে হাতির সম্মুখে রেশমের গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হয়। রাজধানীর তোরণ থেকে সুলতানের প্রাসাদ পর্যন্ত হাতি সেই গালিচা মাড়িয়ে আসে। সুলতানের প্রাসাদের কাছাকাছি একটি বাড়িতে শায়খ সাঈদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সুলতান তাকে প্রচুর সম্পদ উপহার প্রদান করেন। কাঠের গম্বুজগুলোর সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত মূল্যবান কাপড়গুলো এবং হাতির সামনে বিছিয়ে দেওয়া গালিচাটি আর সুলতানের কাছে ফেরত যায়নি। বিনোদনশিল্পী, গম্বুজ নির্মাণকারী মিস্ত্রী আর পানি পরিবেশনকারীরা সেগুলোকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে গেছে। সুলতান কোনো সফর থেকে ফেরার সময় এমনই সাজসজ্জা করা হয়ে থাকে।

সুলতান প্রতি শুক্রবার জুমার নামাযে দুই খুতবার মাঝে মিম্বারে খলিফার প্রেরিত চিঠিটি পাঠ করার নির্দেশ প্রদান করেন। শায়খ সাঈদ এক মাস সেখানে অবস্থান করেন। তারপর সুলতান তাকে উপহার-উপঢৌকন নিয়ে খলিফার কাছে প্রেরণ করেন। তিনি পুনরায় কাম্বাইয়ে আসেন এবং সামুদ্রিক সফরের উপযুক্ত সময় হওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করেন। এদিকে ভারতবর্ষের সুলতান তার পক্ষ থেকে আরেকজন দূতকে খলিফার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সুফি শায়খ রজব আল বুরকুয়ি। তার পূর্বপুরুষদের নিবাস ককেশাস মরুভূমির আল কিরিম শহরে। তার সঙ্গেও

সুলতান উপহার পাঠিয়েছিলেন। সেখানে পঞ্চাশ হাজার দিনার মূল্যের একটি ইয়াকুত পাথরও ছিল। সুলতান তার মাধ্যমে খলিফার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি খলিফার কাছে আবেদন করেন, যেন তাকে হিন্দুস্তান ও সিন্ধু অঞ্চলে খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করা হয় নতুবা খলিফার পক্ষ থেকে অন্য কোনো প্রতিনিধি পাঠানো হয়। এভাবেই স্পষ্ট করে নেকনিয়তে তিনি এই চিঠি পাঠিয়েছিলেন। মিসরে শায়খ রজবের এক ভাইও বাস করত। তার নাম ছিল সাইফুদ্দিন আল কাশিফ। শায়খ রজব খলিফার কাছে পৌঁছানোর পর তিনি সুলতান আল মালিকুস সালিহের অনুপস্থিতিতে চিঠি পাঠ করতে এবং উপহার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন সাইফুদ্দিন তার ভাইকে ইয়াকুত পাথরটি বিক্রি করে ফেলার প্ররোচনা দেন। তারা সেই পাথরটি তিন লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে তা দিয়ে আরো চারটি পাথর ক্রয় করেন। অতঃপর সুলতান আল মালিকুস সালিহের কাছে উপস্থিত হয়ে সুলতান মুহাম্মাদ শাহের প্রেরিত চিঠি ও একটি পাথর পেশ করেন। সুলতান সেগুলো তার মন্ত্রীদের কাছে দিয়ে দেন এবং সুলতান মুহাম্মাদ শাহের আবেদন মেনে নিয়ে চিঠি লিখে পাঠাতে সম্মত হন। খলিফা থেকে এই মর্মে প্রত্যয়ন গ্রহণ করা হয় যে, তিনি সুলতান মুহাম্মাদ শাহকে হিন্দুস্তান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তার প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন। এছাড়াও সুলতান আল মালিকুস সালিহ মিসরের একজন শায়খ রুকনুদ্দিন আল আজমিকে নিজের পক্ষ থেকে দূত নির্বাচিত করে শায়খ রজব ও তার সঙ্গীদেরসহ প্রেরণ করেন। তারা উবুল্লা থেকে হুরমুজের উদ্দেশে পারস্য সাগরে সফর করেন। তখন হুরমুজের সুলতান ছিলেন কুতুবুদ্দিন তামতাহান তুরান শাহ। তিনি তাদেরকে খুব সমাদর করেন এবং ভারতবর্ষে সফর করার নৌযান প্রস্তুত করে দেন। তারা কাম্বাইয়ে এসে পৌঁছান। শায়খ সাঈদও তখন সমুদ্রযাত্রা শুরু করার অপেক্ষায় সেখানে অবস্থান করছিলেন। তখন কাম্বাইয়ের গভর্নর ছিলেন সুলতান মুহাম্মাদ শাহের আস্থাভাজন মাকবুল তালতাকি। শায়খ রজব এই গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, শায়খ সাঈদ আপনাদের কাছে বানোয়াট ফরমান নিয়ে এসেছেন। তিনি যে সম্মানসূচক পোশাকগুলো এনেছেন, সেগুলো এডেন থেকে কিনেছেন। তাই আপনার উচিত তাকে বন্দি করে মহামান্য সুলতানের কাছে প্রেরণ করা। গভর্নর জবাবে বলেন, শায়খ সাঈদ সুলতানের কাছে অনেক সম্মানিত। তাই সুলতানের আদেশ ব্যতীত তাকে বন্দি করা যাবে না। তবে আমি তাকে আপনাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।

তারপর সুলতান তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানাবেন। এসব বিষয় জানিয়ে গভর্নর সুলতানের কাছে চিঠি লিখেন। এদিকে কাম্বাইয়ে নিয়োজিত গোয়েন্দাও একই বিবরণ জানিয়ে চিঠি লিখেন। সুলতান শায়খ সাঈদকে সম্মান জানানোর পরও তাকে নিয়ে শায়খ রজব এমন কথা বলায় সুলতান খুব রাগান্বিত হন। কিন্তু শায়খ রজব সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এই কথা বলার কারণে সুলতানের পক্ষে তাকে শাস্তি দেওয়ার কোনো উপায় ছিল না। তবে তিনি শায়খ রজবকে তার কাছে আসতে নিষেধ করে দেন এবং শায়খ সাঈদের প্রতি সম্মান আরো বাড়িয়ে দেন। মিসর থেকে আগত শায়খ রুকনুদ্দিন সুলতানের কাছে আসার পর তিনি এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করেন এবং সম্মাননা জানান। তিনি যখনই সুলতানের কাছে আসতেন, সুলতান উঠে দাঁড়াতেন। শায়খ সাঈদ এভাবেই ভারতবর্ষে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে অবস্থান করতে থাকেন। ৭৪৮ হিজরিতে আমি তাকে সেখানেই দেখে এসেছি।

আমি মক্কায় অবস্থান করার সময় হাসান নামে মাগরিবের পাগল এক লোক ছিল। তার ঘটনা খুবই বিস্ময়কর। আগে তিনি সুস্থ ছিলেন। আল্লাহর ওলি শায়খ নাজমুদ্দিন আল ইস্পাহানির জীবদ্দশায় তার সেবা করতেন।

তার ঘটনা

পাগল হাসান রাতের বেলায় অনেকবার তাওয়াফ করতেন। তখন তিনি এক ফকিরকে দেখতে পেতেন। কিন্তু দিনের বেলায় সেই লোককে আর দেখা যেত না। এক রাতে সেই ফকির তার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন, হে হাসান, তোমার মা তো তোমার জন্য কেঁদে বেহুঁশ। তোমাকে দেখার জন্য তিনি পাগলপ্রায়। তিনি আল্লাহ তাআলা নেককার একজন বান্দী। তুমি কি তাকে দেখতে চাও না? হাসান বলেন, হ্যাঁ। দেখতে তো চাই। কিন্তু আমার তো সেই সামর্থ্য নেই। ফকির বলেন, আগামী রাতে এখানেই আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে। পরের রাতটি ছিল জুমার রাত। ফকির ব্যক্তিকে তার ওয়াদা মতোই হাজির হতে দেখা যায়। তারা দুজন কিছুক্ষণ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে। তারপর লোকটি বাবুল মাআল্লা ফটকের দিকে বেরিয়ে পড়েন আর হাসান তার পিছু পিছু যেতে থাকেন। ফকির লোকটি হাসানকে বলেন তার চোখ বন্ধ করে পরনের কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতে। কিছুক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তোমার

শহর চিনো? হাসান বলেন, হ্যাঁ, চিনি। লোকটি বলেন, এই তো সেই শহর। হাসান চোখ খুলে দেখেন তার মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর হাসান মায়ের কাছে যান। তার সঙ্গে কী ঘটেছে এ ব্যাপারে কিছুই মাকে জানাননি। পনেরো দিন তিনি মায়ের কাছে অবস্থান করেন। আমার ধারণা তার শহর ছিল আসফা। এরপর তিনি শহরের গোরস্থানের দিকে গমন করেন। সেখানে দেখা হয়ে যায় সেই ফকিরের সঙ্গে। ফকির জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কেমন আছ? হাসান বলেন, হে আমার মনিব, আমি শায়খ নাজমুদ্দিনকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি। আমি তো আমার রোজকার অভ্যাসমতোই বেরিয়েছিলাম সেদিন। এই কদিন আমি তার কাছ থেকে অনুপস্থিত। এখন আপনি আমাকে তার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। ফকির তাকে বলেন, হ্যাঁ, নিয়ে যাব। এই বলে তিনি রাতের বেলায় গোরস্থানে আসার প্রতিশ্রুতি দেন। রাতে উপস্থিত হওয়ার পর ফকির ব্যক্তিটি হাসানকে মক্কায় যেমনটি করেছিল, তেমনটি করার নির্দেশ দেন এবং শায়খ নাজমুদ্দিন অথবা অন্য কাউকে এ ব্যাপারে কিছু না জানানোর অঙ্গীকার নেন। শায়খ নাজমুদ্দিনের কাছে আসার পর তিনি হাসানকে জিজ্ঞেস করেন, হে হাসান, এই কদিন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে তুমি? হাসান তা বলতে না চাইলে শায়খ নাজমুদ্দিন তাকে জোর করেন। তখন হাসান পুরো ঘটনা খুলে বলেন। শায়খ নাজমুদ্দিন বলেন, আমাকে সেই লোকটিকে দেখাও। রাতের বেলায় তিনি হাসানের সঙ্গে হারাম প্রাঙ্গণে আসেন। লোকটিও তার অভ্যাসমতো সেখানে উপস্থিত হয়। লোকটি তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাসান বলেন, তিনিই সেই ব্যক্তি। লোকটি এই কথা শুনে হাসানের মুখে আঘাত করে বলেন, চুপ করো। আল্লাহ তোমাকে চুপ করিয়ে দিন। তখন থেকেই হাসান বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং পাগল হয়ে যান। তারপর থেকে তিনি হারাম প্রাঙ্গণে পড়ে থাকেন। ক্ষুধা পেলে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী বাজারে গিয়ে এক দোকান থেকে যা ইচ্ছে হয় খেয়ে আসেন। কেউ তাকে নিষেধ করে না। উলটো সেই দোকানি আনন্দিত হন। তার বেচাকেনায় বরকত প্রকাশ পায়। তিনি বাজারে এলেই সবাই মাথা উঁচু করে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকে। তার বরকতের কথা প্রমাণিত হওয়ায় সবাই মনে মনে আশা করে যেন তিনি তার দোকান থেকে কিছু খেয়ে যান। এমনিভাবে কিছু পান করার ইচ্ছা হলে তিনি কোনো পানীয় বিক্রেতার কাছে গিয়ে যা ইচ্ছে পান করে আসেন। ৭২৮ হিজরি পর্যন্ত এভাবেই চলছিল। সেই বছর আমির সাইফুদ্দিন ইয়ালামলাক হজ করতে যান। হজ শেষে তিনি

পাগল হাসানকে সঙ্গে করে মিসরে নিয়ে যান। এরপর আর তার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে উপকার সাধন করুন।

নামায ও ইমামদের স্থানের ক্ষেত্রে মক্কাবাসীর নিয়ম-রীতি

তাদের নিয়ম হচ্ছে সবার আগে শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম তার অনুসারীদের নিয়ে নামায পড়াবেন। ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ তাকে নিয়োগ দিয়েছেন। তার নামাযের স্থান পবিত্র মাকামে ইবরাহিমের পেছনে। সেখানে তার জন্য চমকপ্রদ একটি হাতিম স্থাপন করা হয়েছে। মক্কার অধিকাংশ লোকই শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। দুইটি কাঠের তক্তাকে সিঁড়ির মতো কয়েকটি কাঠির মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয় এবং এর বিপরীতে একইরকমের দুটি কাঠকে একসঙ্গে যুক্ত করে হাতিম তৈরি করা হয়। এই তক্তাগুলোকে স্থাপন করা হয় সামান্য উঁচু দুটি আস্তরকৃত পাথরের খুঁটির উপর। কাঠের তক্তাগুলোর উপরে আরেকটি কাঠ বসিয়ে তার উপর লোহার পাত যুক্ত করা হয় এবং তার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কাঁচের কয়েকটি প্রদীপ। শাফেয়ী মাযহাবের ইমামের নামায আদায় শেষ হলে মালেকি মাযহাবের ইমাম রুকনে ইয়ামানি বরাবর স্থাপিত মিহরাবের এখানে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করেন। একই সময়ে হাম্বলী মাযহাবের ইমাম হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানির মাঝামাঝি অংশের দিকে মুখ করে নামায পড়ান। সবশেষে হানাফী মাযহাবের মিযাব বরাবর নির্মিত হাতিমে দাঁড়িয়ে নামায পড়ান। ইমামদের সম্মুখে মোমদানিতে মোম প্রজ্বলিত করা হয়। চার ওয়াক্তের নামাযে তারা এই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী নামায আদায় করেন। মাগরিবের নামাযের সময় প্রত্যেক ইমাম নিজ নিজ অনুসারীদেরকে নিয়ে নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে দাঁড়িয়ে একইসময়ে নামায আদায় করেন। তখন লোকদের নামাযে অনেক ভুল ও সন্দেহ হয়ে যায়। কখনো মালেকি মাযহাবের অনুসারীরা শাফেয়ী ইমামের সঙ্গে রুক দিয়ে ফেলে। হানাফীরা সেজদা করে ফেলে হাম্বলীদের সঙ্গে। প্রত্যেক দলই তাদের মুয়াযযিনের আওয়াজের প্রতি সচেতন হয়ে থাকে। যেন কোনো ভুল না হয়ে যায়।

জুমার নামায ও খুতবার ক্ষেত্রে তাদের রীতি

জুমার দিন তারা পবিত্র কাবাঘরের হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইরাকির মাঝামাঝি দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে মিম্বার স্থাপন করেন। খতিব সাহেব

দাঁড়ান মাকামে ইবরাহিমের দিকে মুখ করে। কালো পোশাক, কালো পাগড়ি আর কালো চাদর পরিধান করে তিনি নামায পড়াতে আসেন। এই পোশাকগুলো সুলতান আল মালিকুন নাসির উপহার দিয়েছেন। খতিব সাহেবের মাঝে তখন গাম্ভীর্য ও আভিজাত্যের ছাপ ফুটে উঠে। মুয়াযযিন শ্রেণীর দুইজন ব্যক্তির হাতে থাকা দুটি কালো পতাকার মাঝ দিয়ে তিনি ধীর পদক্ষেপে মিম্বারের দিকে আগমন করেন। তার সম্মুখে পাহারায় নিযুক্ত থাকে আরেক ব্যক্তি। সেই ব্যক্তির হাতে থাকে একপাশে লোহার আংটাযুক্ত একটি লাঠি। বাতাসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সেই আংটা থেকে সজোরে শব্দ বের হয়। যা হারাম প্রাঙ্গণের ভেতর-বাহির থেকে শুনা যায়। এই আওয়াজই যেন ঘোষণা করে দেয়, খতিব সাহেব বের হয়ে এসেছেন। মিম্বারের কাছাকাছি পর্যন্ত তিনি এভাবে হেঁটে আসেন। তারপর হাজরে আসওয়াদে চুমো খেয়ে সেখানে দোয়া করেন। তারপর মিম্বারে আরোহণ করেন। এদিকে জমজম কূপের মুয়াযযিন, যিনি হারাম শরিফে নিয়োজিত মুয়াযযিনদের প্রধান, তিনি কালো পোশাক পরিহিত অবস্থায় খতিবের আগে আগে চলতে থাকেন। তার কাঁধে ঝোলানো ছিল একটি তরবারি। যেটি তিনি মুঠোবদ্ধ করে রেখেছেন। মিম্বারের দুই পাশে কালো পতাকা দুটি গেঁথে দেওয়া হয়। খতিব সাহেব যখন মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখেন, তখন প্রধান মুয়াযযিন তরবারিটি খাপমুক্ত করে মাটিতে সজোরে আঘাত করেন। যার আওয়াজ উপস্থিত সকলেই শুনতে পায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিঁড়িতে আরোহণের সময় একইভাবে আঘাত করা হয়। খতিব সাহেব যখন সর্বশেষ সিঁড়িতে আরোহণ করেন তখন মুয়াযযিন চতুর্থ আঘাত করেন। তখন খতিব সাহেব কাবা শরিফের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ক্ষীণ আওয়াজে দোয়া করেন। অতঃপর ডানে-বামে মুখ ফিরিয়ে সালাম প্রদান করেন। লোকেরা তার সালামের জবাব দিলে তিনি মিম্বারে বসে পড়েন। এরপর মিম্বারের সম্মুখে বসে থাকা মুয়াযযিনগণ দাঁড়িয়ে সমস্বরে আযান দেন। আযান শেষ হলে খতিব সাহেব দাঁড়িয়ে খুতবা পেশ করেন। খুতবায় তিনি অধিক পরিমাণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ পাঠ করেন। চার খলিফা, নবীজির দুই নাতি, তাদের মা ফাতেমা ও নানী খাদিজা ও সকল সাহাবির প্রতি সালাম জানান। তারপর সুলতান আল মালিকুন নাসিরের জন্য দোয়া করেন। এরপর দোয়া করেন সুলতান নুরুদ্দিন আলী ইবনুল মালিকিল মুওয়াইয়িদ দাউদের জন্য। এরপর দোয়া করেন মক্কার দুই

আমিরের জন্য। ন্যায়পরায়ণতার জন্য প্রথমে কনিষ্ঠ ভাই সাইফুদ্দিন উতাইফার নাম উল্লেখ করা হয়। তারপর আসাদুদ্দিন রুমাইসির নাম। একবার তিনি ইরাকের সুলতানের জন্যও দোয়া করেছিলেন। পরে তা বন্ধ করে দেন। খুতবা শেষ করে তিনি নামাযের স্থানে ফিরে আসেন। নামায শেষে তিনি অনুরূপ কালো পতাকার মাঝ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যান। সম্মুখের ব্যক্তির হাতে থাকা লোহার আংটা থেকে আগের মতো আওয়াজ হতে থাকে। এভাবে যেন নামায সমাপ্তি এবং খতিবের প্রস্থানের ঘোষণা দেওয়া হয়। অতঃপর মিম্বারটিকে পুনরায় মাকামে ইবরাহিমের পাশে এনে রাখা হয়।

তাদের নতুন চাঁদ দেখার নিয়ম

প্রতি মাসের প্রথম দিন মক্কার আমির সাদা পোশাক ও পাগড়ি পরে কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রহরীবেষ্টিত হয়ে হারাম প্রাঙ্গণে আসেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহিমের কাছে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। তারপর হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করে তাওয়াফের সাত চক্কর শুরু করেন। প্রধান মুয়াযযিন তখন অবস্থান করেন জমজম কূপের ছাউনিতে। আমির এক চক্কর তাওয়াফ শেষ করে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করতে যান। মুয়াযযিন তখন উচ্চস্বরে তার নাম উচ্চারণ করে দোয়া করেন এবং নতুন মাসকে স্বাগত জানান। অতঃপর আমির ও তার পূর্বপুরুষদের প্রশংসায় একটি পঙ্‌ক্তি পাঠ করেন। সাত চক্করের প্রতি চক্করের সময় তিনি এমন করেন। তাওয়াফ শেষে আমির মুলতাযামে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। মাকামে ইবরাহিমের পেছনে আদায় করেন আরো দুই রাকাত। তারপর নিজ বাসভবনে ফিরে যান। এমনিভাবে কোথাও সফরে যাওয়ার সময় অথবা কোনো সফর থেকে ফেরার সময়ও তিনি এই নিয়ম পালন করেন।

রজব মাসে তাদের প্রথা

রজব মাসের চাঁদ উদিত হতেই মক্কার আমির এই মাসের আগমনবার্তা জানানোর জন্য তবলা ও বাদ্য বাজানোর নির্দেশ দেন। অতঃপর মাসের প্রথম দিন তিনি ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে বের হন। মক্কার অধিবাসীরা ঘোড়ায় চড়ে আর পায়ে হেঁটে তাকে সঙ্গ দেয়। তারা সবাই অস্ত্রেসজ্জিত হয়ে

চমৎকার বিন্যস্তভাবে চলতে থাকে। আমিরের সম্মুখে তারা বিভিন্ন খেলা প্রদর্শন করে। অশ্বারোহীরা দেখায় তাদের অশ্বচালনার কারিশমা। এদিকে পদাতিক লোকেরা শূন্যে তির ছুড়ে মারে সেটি নিচে নেমে আসতেই ক্ষিপ্র গতির সঙ্গে ধরে ফেলে। আমির রুমাইসা ও উতাইফার পাশে ছিলেন তাদের সন্তান এবং মুহাম্মাদ ইবরাহিম, সুবাইহের দুই পুত্র আলী ও আহমাদ, আলী বিন ইউসুফ, শাদ্দাদ বিন উমর, আমের আশ শারক, মানসুর বিন উমর এবং মুসা আল মাযরাক প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় হাসানি বংশোদ্ভূত সেনাপতিরা। তাদের সম্মুখে ছিল পতাকা আর ঢোল-তবলা বাদকদের দল। তাদের সবার মাঝেই ফুটে উঠেছিল গাম্ভীর্য ও আভিজাত্যের ছাপ। এভাবে তারা মিকাত পর্যন্ত গিয়ে আগের মতো বিন্যাসে মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরে আসে। আমিরদ্বয় নেমে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেন। প্রতি চক্করের সময় জমজম কূপের মুয়াযযিন ছাউনির উপর দাঁড়িয়ে তাদের জন্য দোয়া করেন। যেমনটি আগেও উল্লেখ করেছি। তাওয়াফ শেষে তারা মুলতাযামে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। এরপর মাকামে ইবরাহিমের পাশে দুই রাকাত নামায আদায় করে সেটি স্পর্শ করেন। এরপর বেরিয়ে যান সাঈ করার উদ্দেশ্যে। ঘোড়ার পিঠে চড়েই সাঈ সেনাপতি ও প্রহরীদের মাধ্যমে পরিবেষ্টিত হয়ে সাঈ সম্পন্ন করেন। তারপর নিজ বাসভবনে চলে যান। এই দিনটি তাদের কাছে উৎসব হিসেবে পরিগণিত। এইদিন তারা প্রতিযোগিতা করে নিজেদের সবচেয়ে উত্তম পোশাকটি পরিধান করে।

রজব মাসের উমরার বিবরণ

মক্কার লোকেরা রজব মাসের উমরা করার জন্য দিনে-রাতে এমন ভিড় জমায়, যা সচরাচর চোখে পড়ে না। পুরো মাসজুড়ে লোকেরা হারাম প্রাঙ্গণে ইবাদতে মশগুল থাকে। বিশেষকরে মাসের প্রথম, পনেরোতম এবং সতেরোতম দিন ভিড় থাকে সবচেয়ে বেশি। এই দিনগুলোর জন্য তারা কয়েকদিন থেকে প্রস্তুতি নেয়। সতেরোতম রাতে আমি দেখতে পাই মক্কার অলিগলি অসংখ্য মূল্যবান রেশমি ও কাতান কাপড়ে সজ্জিত হাওদায় ভরপুর। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী হাওদাগুলোকে সাজিয়েছে। উটের গলায় পরানো হয়েছে রেশমি কাপড়ের মালা। হাওদার পর্দাগুলো বেশ লম্বা, প্রায় মাটি ছুঁইছুঁই। সেগুলোকে দেখে তাঁবুর মতো মনে হচ্ছিল। তারা যখন উমরার মিকাত তানঈমের উদ্দেশে বের হয়, তখন মক্কার সমতলভূমি

সেই হাওদাগুলো দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। পথের দুই ধারে করা হয় অগ্নি প্রজ্বলনের ব্যবস্থা। হাওদাগুলোর সামনেও জ্বলতে থাকে মোমবাতি আর মশাল। পাহাড়গুলো থেকে ভেসে আসে লোকদের মুখে উচ্চারিত হতে থাকা লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইকের প্রতিধ্বনি। এমন ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে হৃদয় নরম না হয়ে পারে না। চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুর ঢল। উমরা সম্পন্ন কর তারা তাওয়াফ করে। অতঃপর রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে গেলে তারা সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাঈ করার লক্ষ্যে বের হয়। সাঈ করার স্থানটি তখন প্রদীপের আলোয় ভরে উঠে আর লোকারণ্যে পরিণত হয়। মহিলা সাঈকারীগণ তাদের হাওদায় বসেই সাঈ করেন। মাসজিদুল হারাম তখন আলোয় জ্বলজ্বল করতে থাকে। এই উমরাকে তারা উমরাতুল আকমিয়া নামে আখ্যায়িত করে। কারণ, এই উমরার সময় তারা আকামা নামক স্থানে মাসজিদে আয়েশা রা.-এর এক তির পরিমাণ দূর থেকে ইহরামের কাপড় পরিধান করে। স্থানটি আলী রা.-এর নামে নির্মিত মসজিদের কাছাকাছি। এই উমরার পেছনে তাদের মূল প্রেরণা হচ্ছেন মহান সাহাবি আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রা.। পবিত্র কাবার সংস্কার সমাপ্ত করার পর তিনি মক্কাবাসীদের সঙ্গে উমরার নিয়তে খালি পেয়ে হেঁটে এই আকামা নামক স্থান থেকে উমরার কাপড় পরিধান করেন। সেদিন ছিল রজবের সাতাশ তারিখ। তিনি হাজুন গিরিখাত ধরে মক্কার সেই উঁচু ভূমির দিকে যেতে থাকেন, যেখান দিয়ে মুসলিমরা মক্কা বিজয়ের দিন প্রবেশ করেছিল। এরপর থেকেই এই দিনে এবং এই স্থান থেকে উমরা করা মক্কার অধিবাসীদের একটি রীতি হয়ে দাঁড়ায়।

সেদিন আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রা. অগণিত পশু কুরবানি দিয়েছিলেন। এমনিভাবে মক্কার অভিজাত ও সচ্ছল ব্যক্তিরাও সেদিন কুরবানি দিয়েছিলেন। এই খাবার খেয়ে, মেহমানদারি করে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে করে মক্কাবাসীর অনেকগুলো দিন কেটে যায়। ইবরাহিম আ.-এর সময়ে কাবাঘর যেভাবে নির্মিত ছিল, ঠিক সেভাবে এর সংস্কার করতে পেরে তারা মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় রত হন।

কিন্তু আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রা. শহীদ হওয়ার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাবাঘরকে ভেঙে পুনরায় কুরাইশের নির্মিত অবয়বে ফিরিয়ে দেয়। কুরাইশরা কাবাঘরের সংস্কারের সময় বেশ কৃপণতা দেখিয়েছিল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই অবয়বই বহাল রাখেন। কারণ,

তখনো তাদের ইসলাম গ্রহণের বেশি সময় হয়নি। এরপর আব্বাসি খলিফা আবু জাফর মানসুর পুনরায় আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রা.-এর সংস্কার করা অবয়বে কাবাঘরকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। তখন ইমাম মালেক রহ. তাকে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহর পবিত্র ঘরকে রাজা-বাদশাহদের খেলার বস্তু বানিয়ে দিবেন না। যে তারা যখন চাইবে নিজের মনমতো পরিবর্তন করে নিবে।' তাই তিনি এই ক্ষতি রোধ করার জন্য কাবাঘরকে আগের অবস্থাতেই রেখে দেন। মক্কার পার্শ্ববর্তী বাজিলা, যাহরান ও গামিদ অঞ্চলের লোকেরা রজব মাসের উমরা করার জন্য ছুটে আসে। এ সময় তারা বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য, ঘি, মধু, কিসমিস, জাইতুন তেল ও আখরোট প্রভৃতি নিয়ে আসে। ফলে তখন মক্কায় জিনিসপত্রের দাম সস্তা হয় এবং লোকেরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটায়। এই সকল অঞ্চলের লোকেরা না থাকলে মক্কার অধিবাসীদের বেশ কষ্টে দিন কাটাতে হতো। এও বলা হয় যে, তারা এই সকল খাদ্যের জোগান নিয়ে মক্কায় আগমন না করে নিজেদের অঞ্চলে বসে থাকলে, তাদের ফসলি জমিগুলো খরার কবলে পড়ে। গবাদিপশুগুলোও মরে যেতে থাকে। কিন্তু এই খাদ্যের জোগান মক্কায় পৌঁছে দিলে তাদের অঞ্চল আগের চেয়েও উর্বর হয়ে উঠে। বরকত প্রকাশ পেয়ে তাদের অর্থ-সম্পদে প্রবৃদ্ধি ঘটে। তাই যদি এই সময়ে তাদের অলসতা পেয়ে বসে, তখন তাদের নারীরা মিলে তাদেরকে বের করে ছাড়ে। নিশ্চয়ই এটি পবিত্র ও নিরাপদ মক্কা শহরের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ ও তদারকি। বাজিলা, জাহরান, গামিদ ও অন্যান্য গোত্রের বসবাসের এই অঞ্চলের নাম সারও। অঞ্চলটি খুবই উর্বর। আঙুর ও অন্যান্য ফল-ফসলে পরিপূর্ণ। এখানকার অধিবাসীরা বিশুদ্ধভাষী ও খাঁটি মনের অধিকারী। তাওয়াফ করার সময় কাবাঘরের ছায়ায় ও তার গিলাফ স্পর্শ করে নিজেদের ধন্য করতে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়েন। তখন তারা এতই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় একনিষ্ঠ হয়ে দোয়া করেন যে নিজের অজান্তেই চোখ বেয়ে জল নেমে আসে। তাই উপস্থিত অন্যান্য লোকেরাও তাদের দোয়ার সময় নিজেদের হাত তুলে দেয়। তাদের তাওয়াফ করার সময় ভিড়ের কারণে অন্য কেউ কাছাকাছি যেতে পারে না। তারা বেশ শক্ত সবল দেহের অধিকারী। পরিধান করেন চামড়ার পোশাক। মক্কায় আগমনের সময় পথের বেদুইনরা বেশ তটস্থ হয়ে থাকে। ভয়ে তাদের মুখোমুখি হতে চায় না। তবে যারাই তাদের সংস্পর্শে গিয়েছে, তাদের

প্রশংসা করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের কথা উল্লেখ করে তাদের প্রশংসা করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'তাদেরকে তোমরা শেখাও কীভাবে নামায আদায় করতে হয়, তারা তোমাদের শেখাবে কীভাবে দোয়া করতে হয়।'[১] নবীজি সা. আরো বলেছেন, 'ইয়েমেনের অধিবাসীরা হচ্ছে প্রকৃত ঈমানের অধিকারী।'[২] নবীজি সা.-এর এই কথার মাঝে তারাও শামিল। তাদের জন্য এর চেয়ে মর্যাদার আর কী হতে পারে?! বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ বিন উমর রা. তাদের তাওয়াফের সময়কে খুব মূল্যায়ন করতেন এবং তাদের দোয়ার বরকত লাভের জন্য তাদের কাফেলায় প্রবেশের চেষ্টা করতেন। সবমিলিয়ে তাদের অবস্থা খুবই বিস্ময়কর। কোনো এক সাহাবি বলেছেন, তাওয়াফের সময় তাদের ভিড়ের মধ্যে যাও। কারণ, তাদের উপর প্রবলভাবে আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হয়।

শাবানের পনেরো তারিখের রাতে তাদের প্রথা

মক্কাবাসীদের এই রাত খুবই সম্মানিত। এই রাতে তারা তাওয়াফ, উমরা এবং জামাতের সাথে ও একাকী নামায আদায় ইত্যাদি বিভিন্ন নেকআমল করে কাটিয়ে। হারাম প্রাঙ্গণে কয়েকটি জামাত হয়। প্রত্যেকে জামাতের জন্য থাকেন পৃথক পৃথক ইমাম। মশাল, বাতি ও প্রদীপের আলোয় ভরে উঠে হারাম প্রাঙ্গণের আনাচকানাচ। এই আলোর সঙ্গে চাঁদের আলো মিশে এক অপার্থিব দৃশ্যের অবতারণা করে। আলোয় ভরে উঠে পৃথিবীর উঠোন আর আকাশের সামিয়ানা। তারা একশ রাকাত নামায আদায় করেন। প্রতি রাকাতেই সূরা ফাতেহা ও সূরা ইখলাস দশবার করে পাঠ করেন। কেউ কেউ হিজর প্রান্তরে একা একা নামায পড়েন। কেউ বাইতুল্লাহকে ঘিরে তাওয়াফে মগ্ন হন। আর কেউ বেরিয়ে পড়েন উমরা করার উদ্দেশ্যে।

মহিমান্বিত রমযান মাসে তাদের প্রথা

রমযান মাসের চাঁদ উদিত হতেই মক্কার আমিরের নির্দেশে ঢোল-তবলা বাজানো হয়। হারাম প্রাঙ্গণে হয় লোকদের সমাবেশ। তারা নতুন করে

---

[১] হাদীসটির বিশুদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ।–অনুবাদক

[২] সহিহুল বুখারী : ৪৩৮৮; সহিহ মুসলিম : ৫২।–অনুবাদক

চাটাই বিছায় এবং অনেক প্রদীপ ও মশাল প্রজ্বলিত করে। আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠে হারাম প্রাঙ্গণের প্রতিটি কোণ। বেড়ে যায় এর রূপ-লাবণ্য। শাফেয়ী, হাম্বলি, হানাফী এবং জায়েদি মাযহাবের ইমামগণ তাদের অনুসারীদের নিয়ে নামাযে দাঁড়ান। আর মালেকি মাযহাবের অনুসারীগণ দাঁড়ান চারজন ইমামকে নিয়ে। তারা পালাক্রমে নামাযে ইমামতি করেন। নিজ নিজ প্রান্তে সবাই আলো প্রজ্বলিত করেন। দেখা যায় হারামের প্রতিটি কোণেই কোনো না কোনো ইমাম জামাতের সঙ্গে নামায পড়াচ্ছেন। গোটা মাসজিদুল হারাম কারীগণের কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজে গমগম করে উঠে। এমন অপার্থিব দৃশ্য দেখে হৃদয় হয় বিগলিত আর চক্ষু হয় অশ্রুশীতল। কিছু মানুষকে দেখা যায় তাওয়াফে রত হতে অথবা হিজর প্রান্তরে একাকী নামায আদায় করতে। ইমামগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্টকর ইবাদত করেন শাফেয়ী ইমাম। তারা তারাবির বিশ রাকাত নামায আদায় করে জামাতের সঙ্গে তাওয়াফ করেন। সাত চক্কর শেষ হতেই জুমার দিন খতিব সাহেবের সম্মুখের লোকের হাতে যে আংটাযুক্ত লাঠিটি থাকে, সেটি বাজানো হয়। এটি তাদের পুনরায় জামাতে দাঁড়ানোর ঘোষণা। এরপর তারা দুই রাকাত নামায আদায় করে আবার সাত চক্কর তাওয়াফ করেন। এমন করে তারা আরো বিশ রাকাত নামায পড়েন। এরপর নফল ও বিতর নামায আদায় করে যার যার ঘরে ফিরে যান। অন্য সকল মাযহাবের ইমামগণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি নামায আদায় করেন না। সাহরি সময় জমজম কূপের ছাউনির মুয়াযযিন হারামের পূর্বপ্রান্তের মিনারে উঠে লোকদের ঘুম থেকে উঠে সাহরি করার অথা স্মরণ করিয়ে দেন। এরপর অন্য মিনারগুলো থেকেও নিয়োজিত মুয়াযযিনরা ডাক দেয়। তাদের একজন কথা বললে অপরজন সাড়া প্রদান করেন। মিনারের উপরে একটি কাঠের স্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছিল। যার উপরে একটি তাকের দুই প্রান্তে বাতি প্রজ্বলিত করে রাখার ব্যবস্থা ছিল। সাহরির সময়ে এই বাতি দুটি জ্বলে থাকত। ফজরের সময় ঘনিয়ে এলে মুয়াযযিন বাতি দুটি নিভিয়ে দিয়ে আযান শুরু করেন। এরপরই অন্য সকল মুয়াযযিন আযান শুরু করেন এবং একে অপরের আযানের জবাব দেন। মক্কার প্রায় প্রতিটি গৃহেই উঁচু উঁচু ছাদ রয়েছে। কেউ যদি মাসজিদুল হারাম থেকে দূরে থাকার কারণে সাহরির ঘোষণা শুনতে না পেত, তারা মিনারের উপরে প্রজ্বলিত করে রাখা বাতি দুটি দেখতে পেতেন। যখনই বাতি দুটির আলো বন্ধ হয়ে যেত, বুঝতে পারতেন সাহরির সময় শেষ হয়ে গেছে।

রমযানের শেষ দশকের প্রতি বেজোর রাত্রিতে এক খতম কুরআন পাঠ করা হয়। একুশ তারিখ রাতে মক্কারই এক ছেলে কুরআন খতম সম্পন্ন করেন। মক্কার বিচারক এবং সম্ভ্রান্ত আলেমগণ এই জামাতে শরিক ছিলেন। জামাত শেষ হলে কুরআন খতমকারী ছেলেটি কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ায়। ছেলেটির পিতা উপস্থিত সবাইকে তার বাড়িতে গিয়ে খাবার ও মিষ্টান্ন আহারের জন্য দাওয়াত দেন। এর মধ্য হতে ২৭ তারিখের রাত তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। অন্য রাতগুলোর তুলনায় এই রাতে লোকদের সমাবেশ হয় সবচেয়ে বেশি। এই রাতে মাকামে ইবরাহিমের পিছনে কুরআন খতম করা হয়। শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য নির্ধারিত হাতিমের সম্মুখে স্থাপন করা হয় লম্বা ও মজবুত কাঠের খুঁটি। প্রত্যেক তিনটি খুঁটিকে একটি মজবুত কাঠের টুকরোর মাধ্যমে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এগুলোকে তিন তলা বিশিষ্ট করে এর ভিতরে মোমবাতি ও কাঁচের প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয়েছে। সেগুলোর উজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে তোলে। অতঃপর ইমাম এগিয়ে এসে ইশার ফরয নামায আদায় করেন। তিনি কেরাত শুরু করেন সূরা কদরের মাধ্যমে। মাসজিদুল হারামের ইমামগণ আগের রাতে এখানে এসে কেরাত সমাপ্ত করেছিলেন। কাজি সাহেব এখন দুই রাকাতে সূরা কদর থেকে নিয়ে কুরআনের শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করবেন। তবে পবিত্র মাকামের পিছনে দাঁড়িয়ে কুরআন খতমের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে আজ রাতে ইমামগণ ফরয নামাযের কেরাত থেকে বিরতি নিয়েছেন। তারা আজ শুধু তারাবিহ নামাযের কেরাত পাঠ করবেন। বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তারা সকলেই এই জামাতে এসে শরিক হয়েছেন। দুই সালামের মাধ্যমে ইমাম নামায সমাপ্ত করেন। তারপর মাকামে ইবরাহিমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করেন। খুতবা শেষ হলে ইমামগণ যার যার নামাযে চলে যান এবং সকলে প্রস্থান নেন। উনত্রিশ তারিখে কুরআন খতম হয় মালেকি মাযহাবের নামাযের স্থানে। তাদের নামাযের স্থানটি ছিল খুবই অনাড়ম্বর ও সাজসজ্জামুক্ত। কুরআন খতম শেষ করে ইমাম সাহেব খুতবা প্রদান করেন।

শাওয়াল মাসে তাদের প্রথা

হজের মাসগুলোর ধারাবাহিকতা শুরু হয় শাওয়াল মাসের মধ্য দিয়ে। শাওয়াল মাসের চাঁদ উঠার রাতে তারা রমযানের ২৭ তারিখের রাতের

মতোই মশাল, প্রদীপ ও মোমবাতি প্রজ্বলিত করে। হারাম শরিফের সকল প্রান্তের মিনারগুলোতে প্রদীপ জ্বালানো হয়। হারামের পুরো ছাদ এবং জাবালে আবু কুবাইসের পৃষ্ঠে অবস্থিত মসজিদেও করা হয় আলোকসজ্জা। মুয়াযযিনগণ সেই রাতটি তাকবির, তাহলিল ও তাসবিহ পাঠে মগ্ন থাকেন। লোকেরা মগ্ন হয়, তাওয়াফ, নামায, জিকির ও দোয়ায়। ফজর নামায আদায় করে তারা ঈদের প্রস্তুতি শুরু করেন। উত্তম পোশাক পরিধান করে হারাম শরিফে এসে ঈদের নামাযের পড়ার জন্য আগে আগে এসে স্থান দখল করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় তাদের মাঝে। হারাম শরিফের চেয়ে উত্তম জায়গা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সবার আগে উপস্থিত হন বনু শাইবার লোকেরা। তারা এসে পবিত্র কাবাঘরের দরজা খুলেন। তাদের সর্দার বসেন দরজার চৌকাঠে আর অন্য সবাই তার সম্মুখে বসে মক্কার আমিরের আগমনের অপেক্ষা করেন। মক্কার আমির এলে তারা উঠে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। এরপর আমির তাওয়াফের সাত চক্কর পূর্ণ করেন। জমজম কূপের মুয়াযযিন তখন ছাউনির ছাদে দাঁড়িয়ে তার অভ্যাসমতো উচ্চস্বরে দোয়া ও প্রশংসা পাঠে রত হয়। অতঃপর খতিব সাহেব কালো পোশাক পরিধান করে দুই কালো পতাকার মাঝ দিয়ে হেঁটে আসেন। তার সম্মুখের ব্যক্তির হাতে থাকে সেই আংটাযুক্ত লাঠি। তিনি এসে মাকামে ইবরাহিমের পেছনে দুই রাকাত নামায আদায় করে মিম্বারে আরোহণ করেন। তারপর মর্মস্পর্শী খুতবা প্রদান করেন। খুতবা ও ঈদের নামায শেষে লোকেরা একে অপরের সঙ্গে মুসাফাহা করেন এবং একে অপরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এরপর তার দলে দলে কাবাঘরের ভেতরে প্রবেশ করেন। এরপর বের হন বাবুল মাআল্লার কবর জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে। সেখানে সমাহিত সাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফে সালেহীনের বরকত ধন্য হতে। জিয়ারত শেষে তারা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যান।

কাবার ইহরাম

যিলকদ মাসের ২৭ পবিত্র কাবাঘরের গিলাফটিকে চারদিক থেকেই দেড় পুরুষ পরিমাণ উঁচুতে উঠানো হয়। যাতে করে কেউ এটির কোনো অংশ ছিঁড়ে নিতে না পারে। এটিকে তারা কাবার ইহরাম হিসেবে অভিহিত করে থাকে। হারাম শরিফে এই দিনটিকে মর্যাদাপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেদিন থেকে নিয়ে আরাফায় অবস্থান সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত কাবার দরজা খোলা হয় না।

হজের বিধান ও কার্যক্রম

যিলহজ মাসের প্রথম সকাল ও সন্ধ্যায় নামাযের সময় ঢোল-তবলা বাজিয়ে হজের মওসুমের আগমন জানান দেওয়া হয়। আরাফার ময়দানের উদ্দেশ্যে যাওয়ার আগপর্যন্ত এমনটি করা অব্যাহত থাকে। যিলহজ মাসের সাত তারিখ যোহর নামাযের পর খতিব সাহেব হৃদয়গ্রাহী খুতবা প্রদান করেন। এই খুতবায় তিনি লোকদের হজের বিধিবিধান এবং আরাফায় অবস্থানের দিনের ব্যাপারে জানান। এরপর দিন সকাল থেকেই শুরু হয় মিনা ময়দানে যাওয়ার কার্যক্রম। মিসর, শাম ও ইরাক থেকে আগত সকল আমির-উমারা ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ সেদিন মিনায় রাত্রিযাপন করেন। প্রদীপ ও মোমবাতি প্রজ্বলন নিয়ে মিসর, শাম ও ইরাকের অধিবাসীদের মধ্যে হয় সরব প্রতিযোগিতা। কিন্তু শামের লোকেরাই সবসময় অন্যদের ছাপিয়ে যান। যিলহজের নবম দিন ফজর নামাযের পর সবাই মিনা থেকে আরাফার ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথে আল মুহাসসির উপত্যকা অতিক্রম করার সময় তারা দৌড়ে যান। এমনটি করা সুন্নাত। এই উপত্যকাটিই মিনা ও মুজদালিফার মাঝে সীমানা গড়ে দিয়েছে। মুজদালিফার ময়দানটি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে অত্যন্ত প্রশস্ত একটি ভূমি। এর পাশে রয়েছে পানি সংরক্ষণের জলাধার। খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জুবাইদার নির্দেশে এগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। মিনা থেকে আরাফার ময়দানের দূরত্ব পাঁচ মাইল। এমনিভাবে মিনা থেকে মক্কার দূরত্বও পাঁচ মাইল। আরাফার ময়দানের মোট তিনটি নাম রয়েছে, আরাফা, জামআ এবং মাশআরুল হারাম। প্রশস্ত এবং বিস্তীর্ণ এক ভূখণ্ডজুড়ে আরাফার ময়দানের অবস্থান। প্রশস্ত এই ময়দানকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য পাহাড়ের সারি। ময়দানের শেষপ্রান্তে অবস্থিত পাহাড়টির নাম জাবালে রহমত বা রহমতের পাহাড়। এই পাহাড় এবং এর আশপাশে হাজিগণ অবস্থান নিয়ে থাকেন। এর দুই মাইল পূর্বে দুইটি চিহ্ন নির্দেশক খুঁটি স্থাপন করা হয়েছে। এই দুই খুঁটির সম্মুখে আরাফার ময়দানের যে অংশ আছে, সেখানে অবস্থান করা বৈধ। আর এর পেছনে যে অংশটুকু আছে, সেখানে অবস্থান অবৈধ। খুঁটি দুটির কাছেই আরাফার ময়দান সংলগ্ন একটি স্থানের নাম বাতনে উরানা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থান থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই যারা বাতনে উরানায় অবস্থান করবে, তাদের হজ শুদ্ধ হবে না। সূর্যাস্ত হওয়ার আগেই আরাফার ময়দানে এসে উপস্থিত হওয়া

উচিত। কারণ, আরাফায় আগমনের দিন সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই দেখা যায়, উটের জকিরা তাড়াহুড়ো করে তাদের যাত্রী হাজিগণকে উপস্থিত করে অন্য হাজিগণের ভিড় এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলে তাদেরকে ওই দুই খুঁটির সম্মুখেই নামিয়ে দিয়ে যায়। অতঃপর হাজিগণ অবস্থান করার জন্য বাতনে উরানায় পৌঁছে যান কিংবা তা অতিক্রম করেও চলে যান। এভাবে তাদের হজ বাতিল হয়ে যায়।

জাবালে রহমত অন্যান্য পাহাড়ের সারি থেকে বিচ্ছিন্ন। আরাফার বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে তা একা দাঁড়িয়ে আছে। এই পাহাড়ের পুরোটাই টুকরো টুকরো পাথর দিয়ে গঠিত। পাহাড়ের চূড়ায় একটি ছাউনি রয়েছে। ধারণা করা হয়, উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রা. এটি নির্মাণ করেছিলেন। তবে এর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত নয়। ছাউনির মধ্যখানে রয়েছে নামাযের জায়গা। সেখানে নামায পড়ার জন্য লোকদের ভিড় জমে যায়। পবিত্র এই মসজিদ ঘিরে সেখানে রয়েছে চমৎকার প্রশস্ত একটি চত্বর। সেখান থেকে তাকালে দেখা যায়, পুরো আরাফার ময়দানের বিস্ময় জাগানিয়া দৃশ্য। চূড়ার সম্মুখভাবে একটি দেয়াল স্থাপন করে সেখানে বেশ কিছু মিহরাব রাখা হয়েছে। যেগুলোর ভিতরে আগত দর্শনার্থীগণ নামায আদায় করে থাকেন।

এই পাহাড়ের পাদদেশে, আগত দর্শনার্থীদের বামদিকে তাকালেই দেখা যাবে অনেক প্রাচীন একটি ঘর। যার উপরে রয়েছে খিলানযুক্ত কিছু কক্ষ। ধারণা করা হয়, হযরত আ. এখানে বসবাস করতেন। ঘরটির বামপাশেই রয়েছে একটি ঐতিহাসিক পাথর, যেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করতেন। জাবালে রহমত এবং পবিত্র এই ঘরটির আশপাশে অনেক কূপ এবং জলাধার রয়েছে। ঘরটির কাছেই রয়েছে একটি ছোট মসজিদ। আরাফায় অবস্থানের দিন এখানে দাঁড়িয়েই খতিব তার খুতবা প্রদান করেন। অতঃপর যোহর ও আসর নামায একসঙ্গে মিলিয়ে পড়েন। খুঁটি দুটির বামদিকে কেবলামুখী হয়ে তাকালে চোখে পড়বে আরাক উপত্যকা। যেখানে সবুজ রঙের সারি সারি আরাক গাছের সমাহার দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

প্রস্থানের সময় ঘনিয়ে এলে মালেকি মাযহাবের ইমাম তার দুই হাতে ইঙ্গিত প্রদান করে তার আসন থেকে নেমে যান। লোকেরা তখন সেখান থেকে প্রস্থানের জন্য এমন তোড়জোড় শুরু করে দেয় যে, এর ভারে যেন জমিন ও

পাহাড় প্রকম্পিত হয়ে উঠে। কী এক হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল যে তখন! এর উত্তম বিনিময় কেবল আল্লাহ তাআলার কাছেই আশা করা যায়। তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হোন।

৭২৬ হিজরিতে আমি সর্বপ্রথম আরাফার ময়দানে অবস্থান করেছিলাম। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। তখন মিসরের হজ কাফেলার আমির ছিলেন মিসরের সুলতানের নায়েব আরগুন আদ দাওদার। সুলতানের মেয়েও সে বছর হজ করেন। তিনি ছিলেন উল্লিখিত আরগুনের ছেলে আবু বকরের স্ত্রী। সুলতান স্ত্রী খাওয়ান্দাও সে বছর হজ করেন। তিনি ছিলেন সারায় ও খাওয়ারিজমের প্রতাপশালী সুলতান মুহাম্মাদ উযবেকের কন্যা। সেবার শামের হজ কাফেলার আমির ছিলেন সাইফুদ্দিন আল জুবান।

সূর্যাস্তের পর আরাফ থেকে প্রস্থান নিয়ে ইশার নামাযের সময় আমরা মুজদালিফায় এসে উপনীত হই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী সেখানে একত্রে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করি। মুযদালিফায় ফজর নামায আদায় করে মাশআরুল হারামের কাছে দোয়া শেষে আমরা প্রত্যুষেই মিনার উদ্দেশে রওনা দেই। মুযদালিফা ময়দানের পুরোটা জুড়েই অবস্থান করা যায়। শুধু আল মুহাসসির উপত্যকা ব্যতিত। সেখানে দৌড়ে অতিক্রম করতে হয়। অধিকাংশ লোক মুযদালিফা থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। যা করা মুস্তাহাব। অনেক সংগ্রহ করেন মাসজিদুল খাইফের আশপাশ থেকে। এ নিয়ে বিস্তর আলাপ রয়েছে। মিনায় গিয়েই তারা প্রথমে জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করেন। এরপর কুরবানির পশু জবাই করে মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়ে যান। এর মধ্য দিয়ে তারা সুগন্ধি ব্যবহার ও স্ত্রীগমন ব্যতীত অন্য সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়ে যান। এ দুটি নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হতে তাওয়াফে ইফাযা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কুরবানির দিন সূর্য উদিত হওয়ার পর এই কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়। তা নিক্ষেপ করে কুরবানি ও মাথা মুণ্ডন শেষে অধিকাংশই লোকই তাওয়াফে ইফাযার জন্য মিনা থেকে বেরিয়ে পড়েন। কেউ পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। আবার কেউ তৃতীয় দিন তথা মক্কায় গমনের দিন পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করেন। কুরবানির দ্বিতীয় দিন সূর্য হেলে পড়ার সময় হাজিগণ জামরাতুল উলা ও উসতায় সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। এ দুটি স্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান নিয়ে তারা দোয়া করে থাকেন।

জামরাতুল আকাবায়ও তারা দোয়া করেন, তবে সেখানে তারা খুব বেশি অবস্থান করেন না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুসরণ করেই এসব কিছু করা হয়ে থাকে। তৃতীয় দিন সকালে উনপঞ্চাশটি পাথর নিক্ষেপ সমাপ্ত করার পর সবাই মক্কায় অবতরণের লক্ষ্যে তোড়জোড় শুরু করে দেয়। তাদের অনেকেই কুরবানির পর তৃতীয় দিনেও অবস্থান করে সত্তরটি কঙ্কর নিক্ষেপ পূর্ণ করে মক্কায় ফিরে যান।

কাবার গিলাফ পরিবর্তন

কুরবানির দিন মিসরের হজ কাফেলা থেকে কাবাঘরের উদ্দেশ্যে গিলাফ পাঠানো হয়। সেটি কাবাঘরের ছাদে উঠানো হয়। কুরবানির পর তৃতীয় দিন বনু শাইবার লোকেরা সেই গিলাফ পরানো শুরু করেন। কালো রঙের রেশমি কাপড়ের সঙ্গে কাতান কাপড় সেলাই করে এই গিলাফটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। এর উপরদিকের পাড়ে সাদা অক্ষরে লেখা রয়েছে, "جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا" পবিত্র কাবাঘরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতিষ্ঠার উপকরণ বানিয়েছেন। এছাড়াও গিলাফের প্রতিটি প্রান্তেই এমন পাড়যুক্ত ছিল। যেগুলো সাদা অক্ষরে কুরআনের আয়াত লিখিত ছিল। কালোর মাঝে সেই অক্ষরগুলো আলোর জ্বলজ্বল করছিল। গিলাফ পরিবর্তন শেষে এর নিম্নপ্রান্ত উপরের দিকে টেনে দেওয়া হয়। যেন মানুষ তা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে না পারে। সুলতান আল মালিকুন কাবার এই গিলাফ পরিবর্তনের তদারকি করেন। তিনিই প্রতিবছর হারাম শরিফের কাজি, খতিব, ইমাম, মুয়াযযিন, খাদেম ও প্রহরীদের বেতন প্রদান করেন। এছাড়াও মোম, প্রদীপ ও তেল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের খরচ প্রদান করেন। এই সময় প্রতিদিনই ইরাক, খোরাসান ও ইরাকি কাফেলার সঙ্গে আসা অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের জন্য কাবাঘর খুলে দেওয়া। শাম ও মিসরের কাফেলার প্রস্থানের পর তারা অতিরিক্ত চার দিন মক্কায় অবস্থান করেন। এ সময় তারা আশ্রয় নেওয়া মুসাফির ও অসহায় লোকদেরকে অনেক দান-সদকা করেন। আমি তাদেরকে রাতের বেলায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে দেখেছি। হারামে তাদের সঙ্গে আশ্রয় নেওয়া কোনো লোক অথবা মক্কার স্থানীয় যারাই সাক্ষাৎ করেছে তাদেরকে তারা রৌপ্যমুদ্রা ও পোশাক উপহার দিয়েছেন। কাবাঘর দেখতে আসা লোকদেরকেও তারা উপহার দিয়েছে। এমনও হয়েছে কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তিকে দেখে তার পকেটে

স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ভরে দিয়েছে। লোকটি ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে গেছে। ৭২৮ হিজরিতে আমি যখন তাদের সঙ্গে ইরাক থেকে এসেছিলাম, সেবার তারা এমন অনেক কাজ করেছে। তারা এত বেশি স্বর্ণমুদ্রা সদকা করেছিল যে, মক্কার স্বর্ণমুদ্রার মূল্যমান কমে গিয়েছিল এবং এক মিসকালের বিনিময় আঠারো রৌপ্যমুদ্রা পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিল। এ বছরই মাসজিদুল হারামের মিম্বারে এবং জমজম কূপের ছাউনিতে ইরাকের সুলতা আবু সাঈদের নাম উচ্চারণ করা হয়।

কুফা নগরী অভিমুখে

যিলহজের বিশ তারিখে ইরাকি হজ কাফেলার আমির পাহলোয়ান মুহাম্মাদ আল হুয়াইহের সঙ্গে আমি মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ি। পাহলোয়ান মুহাম্মাদ আল হুয়াইহ মসুলের অধিবাসী। শায়খ শিহাবুদ্দিল কালানদারের মৃত্যুর পর থেকে তিনি হজ কাফেলার আমিরের দায়িত্ব পেয়েছেন। শায়খ শিহাবুদ্দিন কালানদার ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ও মহৎ ব্যক্তি। তাদের সুলতান তাকে খুবই সম্মান করতেন এবং কালানদারের লোকদের মতো করে দাড়ি ও ভ্রু ছাঁটতেন। আমির পাহলোয়ানের সঙ্গে মক্কা থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি আমাকে একটি হাওদা ক্রয় করে দেন এবং তার পাশে পাশে রাখেন। বিদায়ী তাওয়াফ শেষে আমরা বাতনে মারে চলে যাই। সেখানেই ইরাক, খোরাসান, পারস্য ও অন্যান্য অনারব অঞ্চলের অসংখ্য লোক অবস্থান করছিলেন। এত মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল যে, দেখে মনে হয় তাদের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। আর তারা সেই তরঙ্গের মাঝে ঘন মেঘমালার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। কেউ যদি কোনো প্রয়োজনে নিজের জায়গা থেকে বের হতেন, তাহলে কোনো চিহ্ন না থাকলে তিনি সেই জায়গা আর চিনতে পারতেন না। বিশাল এই ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তার দিশেহারা হওয়ার দশা হতো। এই কাফেলায় অনেকগুলো পানি বহনকারী উটনী ছিল। দরিদ্র হাজিগণ সেগুলো থেকে পানি পান করতেন। এছাড়াও সদকার সম্পদ এবং ঔষধ-পানীয় বহন করার জন্যও অনেক উট ছিল। কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে তার তাৎক্ষনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো। কাফেলা কোথাও বিশ্রামের জন্য অবরতণ করলে দাসত নামক বিশাল তামার পাত্রে খাবার রান্না করা হতো। অসহায় ও পাথেয়হীন ব্যক্তিদেরকে সেখান থেকে খাবার দেওয়া হতো। কাফেলায় এমন অনেক উটও ছিল, যেগুলো হাঁটতে অক্ষম

লোকদের বহন করার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এ সবকিছুই সুলতান মুহাম্মাদ আবু সাঈদের দান-সদকা ও উদারতার অবদান।

ইবনু জুযাই বলেন, আল্লাহ তাআলা তার এই আবু সাঈদ উপনামটিকে সম্মানিত করুন। উদারতা ও মহত্ত্বে তার জুড়ি মেলা ভার। তিনি আমাদের মহান অভিভাবক, উদারতার সাগর, দানশীলতার পতাকা সমুন্নতকারী, সম্মান ও আভিজাত্যের প্রতীক, মুসলিমদের আমির আবু সাঈদ। আমাদের অপর মহান অভিভাবক, কাফেরদের ত্রাস, ইসলামের পরিত্রাতা, মুসলিমদের আমির আবু ইউসুফের পুত্র। আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা সমুন্নত করুন এবং কেয়ামতের দিন উত্তম প্রতিদান দান করুন।

বিশাল এই কাফেলাতে সমৃদ্ধ বাজার, প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ এবং বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূলের সমাহার ছিল। রাতের বেলায় সফরকালে প্রজ্বলিত করা হয় অগণিত মশাল। যেগুলো পদাতিক বাহিনীর সদস্যরা তাদের হাতে ধরে রাখে। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই দেখা যায় মশালের আলো। রাত হয়ে যায় উজ্জ্বল দিনের মতো।

বাতনে মার থেকে আমরা যাই উসফানে। সেখান থেকে খুলাইসে। তারপর চার মারহালা পরিমাণ সফর করে ওয়াদিউস সামাকে অবতরণ করি। সেখান থেকে পাঁচ মারহালা সফর করে অবতরণ করে ঐতিহাসিক বদরে। এক দিনের মধ্যে দুইবার সফর করে আমরা এই মারহালাগুলো অতিক্রম করি। একবার সফর শুরু করি ফজর নামাযের পর। দ্বিতীয় সফর করি রাতে। বদর থেকে আমরা চলে যাই আস সাফরায়। সেখানে একদিন অবস্থান করে বিশ্রাম নিই। মদিনা মুনাওয়ারা এখান থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত। অতঃপর পুনরায় সফর শুরু করে আমরা মদিনা মুনাওয়ারা শহরে এসে পৌঁছাই। দ্বিতীয়বারের মতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারক জিয়ারতের সৌভাগ্য হয় আমার। মদিনাতের আমরা ছয়দিন অবস্থান করি। সেখান থেকে তিনদিন পরিমাণ দূরত্বের জন্য পানি সংগ্রহ করে নিয়ে আমরা আবারও সফর শুরু করি। তৃতীয় দিন অবতরণ করি ওয়াদিউল আরুসে। এখান থেকে নতুন করে পানি সংগ্রহ করে নিই। এখানে বালিমাটির মাঝে খনন করার পর মিষ্টি পানি বের হয়ে আসে। ওয়াদিউল আরুস থেকে সফর করে আমরা প্রবেশ করি নাজদের দিগন্তজুড়ে বিস্তৃতে সমতলভূমিতে। এখানকার উৎকৃষ্ট আবহাওয়া আমাদের চাঙা করে দেয়।

চার মারহালা পরিমাণ সফর শেষে আমরা উসাইলা নামক জলাশয়ের পাশে অবতরণ করি। এরপর অবতরণ করি আন নুকরা নামক জলাশয়ের কাছে। এখানে বিশাল কয়েকটি হাউজের মতো স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এরপর অবতরণ করি আল কারুরা নামক জলাশয়ের পাশে। এখানে খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জুবাইদার নির্দেশে পানির হাউজ তৈরি করা হয়েছে। তাতে বৃষ্টির পানি জমা হয়। এই স্থানটি নাজদ অঞ্চলের মাঝামাঝিতে। প্রতি ঋতুতেই এখানকার আবহাওয়া বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল আল হাজিয জলাশয়। সেখানেও পানির হাউজ রয়েছে। মাবে মাঝে পানি শুকিয়ে গেলে বালি খনন করে পানি সংগ্রহ করতে হয়। এরপর অবতরণ করি সামিরা নামক স্থানে। সমতল নিম্নভূমিতে এর অবস্থান. এখানে দুর্গের মতো একটি স্থাপনা রয়েছে। যেখানে লোক বসবাস করে। এখানে অনেক পানির কূপ থাকলেও সেগুলোর স্বাদ তিক্ত। এই অঞ্চলের বেদুইন লোকেরা বকরি, ঘি ও দুধ নিয়ে এসে মোটা সুতি কাপড়ের বিনিময়ে হাজিগণের কাছে বিক্রি করে। এছাড়া অন্য কোনো মূল্য গ্রহণ করে না। এরপর অবতরণ করি আল জাবালুল মাখরুক (গর্তবিশিষ্ট পাহাড়) নামক স্থানে। এই পাহাড়টি অবস্থিত মরুভূমির বুকে এবং এর উপরে একটি গর্ত রয়েছে। যেখান দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়। এখান থেকে চলে যাই ওয়াদিউল কুরুশে। এ স্থানে কোনো পানি থাকায় আমরা রাতেই পুনরায় যাত্রা শুরু করি এবং সকালবেলায় ফাইদ নামক দুর্গে এসে উপনীত হই। এটি প্রশস্ত ভূখণ্ডে অবস্থিত অসংখ্য টাওয়ার ও খিলান বিশিষ্ট বিশাল একটি দুর্গ। এর পাশেই বেড়ে উঠেছে প্রাচীনকালীন প্রাচীরের মাধ্যমে বেষ্টিত শহরতলী। বেদুইন আরবরা এখানে বসবাস করে এবং হাজিদের সঙ্গে ব্যবসা ও বেচাকেনা করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। মক্কায় যাওয়ার সময় হজযাত্রীগণ এখানে তাদের পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে নিজ নিজ পাথেয় থেকে কিছু অংশ রেখে যান। যেন ফেরার সময় তাদেরকে পাথেয় শূন্য না হতে হয়। বাগদাদ থেকে মদিনার পথ ধরে মক্কা যাত্রাকালে এখানেই অথবা এখান থেকে সামান্য দূরে অর্ধেক পথ সমাপ্ত হয়। আল্লাহ তাআলা স্থানটিকে সম্মানিত করুন। ফাইদ থেকে কুফার দূরত্ব বারো দিনের এবং যাতায়াত পথও বেশ সহজ এবং স্বস্তিকর। এই পথে অনেক পানির হাউজ রয়েছে। কাফেলার লোকেরা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের বিন্যাসে এই শহরে প্রবেশ করেন। যাতে করে এখানে বসবাসকারী বেদুইনদের মনে ভীতি সৃষ্টি হয়।

কাফেলার লোকদের সম্পদের দিকে লালসার হাত বাড়াতে না পারে। এখানে ফাইয়াজ ও হাইয়ার নামক দুই আরব আমিরের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তারা আমির মুহান্না বিন ঈসার পুত্র। তাদের সঙ্গে ছিল অসংখ্য আরব অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য। তারা হাজিগণ ও কাফেলার যাত্রীদের সুরক্ষার প্রতি বেশ গুরুত্ব দেন। বেদুইনরা উট-বকরি নিয়ে এলে লোকেরা যার যার সাধ্যমতো ক্রয় করে। এরপর পুনরায় সফর করে আমরা আল আজফার নামক স্থানে অবতরণ করি। স্থানীয়দের কাছে এই স্থানটি জামিল এবং বুশাইনা নামক দুই প্রেমিক-প্রেমিকার স্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ। এখান থেকে চলে যাই আল বাইদায়। তারপর অবতরণ করি যারুদ নামক প্রশস্ত ও ঘন বালুকাময় এক ভূখণ্ডে। এখানে ছোট ছোট কিছু ঘর রয়েছে। সেগুলো মিলে একটি দুর্গের মতো রূপ ধারণ করেছে। এখানে কিছু পানির কূপ রয়েছে। কিন্তু সেগুলো মিষ্টি। এরপর অবতরণ করি আস সা'লাবিয়্যা নামক স্থানে। এখানে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এর গোলাকার প্রাচীরটিই কেবল এখন অক্ষত আছে। এর পাশেই রয়েছে বিশাল আয়তনের একটি পানির হাউজ। অনেকগুলো সিঁড়ির মাধ্যমে এই হাউজে নামতে হয়। এই হাউজে জমে থাকা বৃষ্টির পানি বিশাল কাফেলার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। আরবের অনেক নারী-পুরুষ এখানে এসে উট, ভেড়া, ঘি, দুধ এবং উটের ঘাসের বিশাল হাট জমিয়ে দেয়। সবাই নিজ নিজ পাথেয় থেকে খরচ করে প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করে নেন। এখান থেকে আর মাত্র তিনটি মারহালা অতিক্রম করে কুফায় পৌঁছানো যাবে। আমাদের পরবর্তী অবতরণ স্থল ছিল বিরকা আল মারজুম (পাথর নিক্ষেপে মৃত ব্যক্তির পুকুর) নামক একটি জলাশয়ের পাশে। পাথর নিক্ষেপে মৃত ব্যক্তির কবরটি পথের একপাশে অবস্থিত, যা পাহাড়ি টিলার মতো উঁচু হয়ে আছে। এর পাশ দিয়ে যারা অতিক্রম করে সবাই এর উপর পাথর নিক্ষেপ করে যায়। কথিত আছে, পাথর নিক্ষেপে নিহত এই ব্যক্তিটি ছিল রাফেযি। সে কাফেলার সঙ্গে হজ করতে গিয়েছিল। সেখানে আহলে সুন্নাতের অনুসারী এক তুর্কি লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে কজন সাহাবিকে গালি দেয়। ফলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়। এখানে বেদুইনদের অনেক ঘরবাড়ি রয়েছে। তারা কাফেলার কাছে নিজেদের খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসে। এখানেও মহীয়সী জুবাইদার নির্মিত বিরাট একটি হাউজ রয়েছে। যার পানি পুরো কাফেলার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। বাগদাদ থেকে মক্কা পর্যন্ত যত

হাউজ, পুকুর এবং কূপ চোখে পড়ে, সবই এই মহীয়সী নারীর অবদান। আল্লাহ তাআলা তাকে এর যথাযথ বিনিময় দান করুন। তার এই সকল অবদান না থাকলে কেউ কখনও এই পথ দিয়ে চলাচল করত না।

এরপর আমরা আল মাশকুক নামক স্থানে অবতরণ করি। এখানে সুমিষ্ট পানির দুটি কূপ রয়েছে। তাই কাফেলার লোকেরা তাদের কাছে থাকা পানি ফেলে দিয়ে এখান থেকে নতুন করে পানি সংগ্রহ করে নেয়। এরপর অবতরণ করি আত তানানির নামক স্থানে। এখানেও পানিতে পরিপূর্ণ কিছু হাউজ রয়েছে। এখান থেকে প্রস্থান নিয়ে পূর্বাহ্নের সময় জুবালা নামক জনবসতিপূর্ণ একটি পল্লী অতিক্রম করি। এখানে বেদুইনদের সুরক্ষিত একটি দুর্গ রয়েছে। রয়েছে দুইটি পানির হাউজ এবং অনেকগুলো কূপ। এই স্থানটি এই পথের প্রাকৃতিক পানি সংগ্রহের স্থানগুলোর একটি। এরপর আমরা হাইসামিন নামক স্থানে অবতরণ করি। এখানেও পানির দুইটি হাউজ রয়েছে। আমাদের পরবর্তী অবতরণ স্থাল ছিল শয়তানের টিলা নামে পরিচিত এক দুর্গম টিলার পাশে। দিনের বেলায় আমরা টিলাটি অতিক্রম করি। এই পথে এটি ছাড়া আর কোনো দুর্গম স্থান নেই। যদিও এটি খুব বেশি দীর্ঘ নয় এবং পাড়ি দেওয়াও তেমন কঠিন নয়। এরপর আমরা ওয়াকিসা নামক স্থানে পৌঁছি। এখানে রয়েছে পানির হাউজ, বিশাল একটি প্রাসাদ এবং প্রাচীন স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ। এখানকার সকল অধিবাসী বেদুইন। এটিই এই পথের সর্বশেষ পানি সংগ্রহের স্থান। এরপর কুফা পৌঁছানোর আগে ফোরাত নদীর পানি ব্যতীত অন্য কোনো পরিচিত পানি সংগ্রহের স্থান নেই। এখান থেকে কুফার দূরত্ব প্রায় তিন দিনের। হজ কাফেলার লোকদের কাছে আটা, রুটি, খেজুর, সবজি ও ফলমূল বিক্রির জন্য এখানে কুফা অধিবাসী অনেক লোকের সমাগম ঘটে। হাজিগণকে তারা বরণ করে নেন উষ্ণ অভিবাদনের মাধ্যমে।

এরপর আমরা অবতরণ করি লাউরা নামক স্থানে। এখানে বড় একটি পানির হাউজ রয়েছে। তারপর অবতরণ করি আল মাসাজিদ নামক স্থানে। এখানে রয়েছে তিনটি পানির হাউজ। এরপর অবতরণ করি আল কুরুন নামক মিনারের পাশে। জনপদহীন বিরান মরুর মাঝে এই মিনারটির অবস্থান। আশপাশে নেই অন্য কোনো স্থাপনার চিহ্ন। মাটির গর্ভ থেকে উত্থিত ইটের স্তম্ভের মতো মিনারটি দাঁড়িয়ে আছে। এরপর আমরা উজাইব নামক উর্বর

একটি উপত্যকা অতিক্রম করি। এখানে স্থাপনা রয়েছে এবং এর আশপাশে রয়েছে অনেক উর্বর শস্যভূমি। সবমিলিয়ে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে এখানে। এরপর আমরা চলে যাই ঐতিহাসিক কাদিসিয়ায়। যেখানে পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয় দান করেছিলেন। অগ্নিপুজারিদের করেছেন পরাস্ত। সেই যুদ্ধে মুসলিমদের সেনাপতি ছিলেন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা.। সে সময় কাদিসিয়া ছিল বিরাট এক শহর। এরপর এটি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এখন কেবল একটি বড় পল্লীর সমান জায়গা আবাদ আছে। এখানে বেশ কিছু খেজুরের বাগান এবং ফোরাত নদী থেকে সৃষ্ট খাল রয়েছে।

দক্ষিণ পারস্য ও ইরাক অঞ্চল

অতঃপর সেখান থেকে রওনা করে আমরা আলী রা.-এর (কথিত) সমাধির শহর নাজাফে অবতরণ করি। প্রশস্ত পাথুরে ভূখণ্ডজুড়ে বিস্তৃত মনোরম এক শহর নাজাফ। ইরাকের শহরগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সুরক্ষিত এবং সবচেয়ে জনবহুল। শহরটিতে রয়েছে বেশ কয়েকটি পরিচ্ছন্ন বাজার। বাব আল হাজরা ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশ করে প্রথমেই দেখতে পাই সবজি বিক্রেতা, বাবুর্চি এবং রুটি প্রস্তুতকারীদের বাজার। তারপর চোখে পড়ে ফলের বাজার, সেলাইকারীদের বাজার এবং কাপড় ব্যবসায়ীদের বাজার। তারপর সুগন্ধি বিক্রেতাদের বাজার পেরিয়ে এসে উপনীত হই সেই কবরের কাছে, যেটিকে আলী রা.-এর কবর বলে ধারণা করা হয়। এর পাশেই রয়েছে একাধিক চমৎকার স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত একাধিক মাদরাসা ও খানকা। এগুলোর দেয়ালজুড়ে অঙ্কিত করা হয়েছে কাশানি[১] কারুকার্য। যা দেখতে অনেকটা আমাদের অঞ্চলের জেলিজ কারুকার্যের মতোই। তবে জেলিজ কারুকার্যের রঙ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল এবং এর নকশা আরো চমৎকার।

নাজাফের সমাধি ও কবরসমূহের বিবরণ

বাব আল হাজরা ফটক দিয়ে প্রবেশ করে বিশাল একটি মাদরাসায় উপনীত হই। শিয়া মতাবলম্বী সুফি এবং ছাত্ররা এখানে বসবাস করে। আগত প্রত্যেক অতিথির জন্য এখানে তিনদিনের আতিথেয়তা বরাদ্দ রয়েছে। প্রতিদিন দুইবেলা তাদেরকে রুটি, গোশত এবং খেজুরের মাধ্যমে আপ্যায়ন করানো হয়। সেই মাদরাসা থেকে চলে যাই গম্বুজবিশিষ্ট সমাধির ফটকে। সেখানে দেখতে পাই দ্বাররক্ষী সৈনিক এবং গোলামদের পাহাড়া। কোনো দর্শনার্থী সেখানে পৌঁছুলে তাদের একজন উঠে আসে অথবা দর্শনার্থী বেশি হলে তারা সবাই উঠে আসে। অতঃপর প্রহরী আগত দর্শনার্থীর সঙ্গে সমাধির দরজার চৌকাঠে দাঁড়ায় এবং অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন সে বলে,

---

[১] পারস্য থেকে উদ্ভাবিত একপ্রকার সৌন্দর্যবর্ধক কারুকার্য বা নকশা।–অনুবাদক

হে আমিরুল মুমিনিন, এই দুর্বল বান্দা এই দর্শনার্থীর জন্য আপনার পবিত্র সমাধিতে প্রবেশের অনুমতি কামনা করছে। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে সে প্রবেশ করবে, নয়তো ফিরে যাবে। আর সে যদি এর যোগ্য এর যোগ্য না হয়, তাহলে আপনি তো একজন সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি। নিশ্চয়ই আপনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিবেন না। এরপর দর্শনার্থীকে দরজার দুইপাশের দুই কাঠে এবং রূপার তৈরি চৌকাঠে চুমো দিতে বলা হয়। তারপর তাকে সমাধির ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। সেখানে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বাহারি রঙের রেশমি ও অন্যান্য জাতের কাপড়। আরো দেখা যায়, স্বর্ণ ও রূপার ছোট-বড় দীপাধারের সমাহার। গম্বুজের ঠিক মাঝবরাবর রয়েছে কাঠের নির্মিত বেঞ্চ আকৃতির একটি বস্তু। যার উপর রয়েছে দক্ষ হাতে বসানো স্বর্ণের কারুকার্যের চমৎকার ফলক। রূপার পেরেকের মাধ্যমে এগুলো যুক্ত করা হয়েছে। স্বর্ণের এই কারুকার্য কাঠকে সবদিক দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। তার কোনো অংশই প্রকাশ পায় না। উচ্চতায় একপুরুষের চেয়ে কিছুটা কম। এর উপরে তিনটি কবর রয়েছে। লোকদের ধারণা এখানকার একটি কবর আদম আ.-এর, দ্বিতীয়টি নুহ আ.-এর এবং তৃতীয়টি আলী রা.-এর। কবরগুলোর মাঝে রয়েছে স্বর্ণ ও রূপার তৈরি বড় একটি পাত্র, যার মধ্যে গোলাপজল, মেশক এবং বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি মেশানো হয়েছে। দর্শনার্থীরা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সেই পাত্রে হাত ডুবিয়ে তাদের মুখে পানি লাগিয়ে নেয়। সমাধিটির আরেকটি ফটক রয়েছে। এটির চৌকাঠও রৌপ্যের তৈরি। এর উপরে রয়েছে বাহারি রঙের রেশমি কাপড়ের পর্দা। এই ফটক দিয়ে প্রবেশ করে যাওয়া যায় চমৎকার কার্পেট বিছানো এক মসজিদে। যার দেয়াল এবং ছাদকে রেশমি কাপড়ের পর্দার মাধ্যমে সজ্জিত করা হয়েছে। এই ফটকের রয়েছে চারটি প্রবেশপথ। প্রতিটির চৌকাঠ রৌপ্যের তৈরি এবং রেশমি কাপড়ের পর্দার মাধ্যমে সজ্জিত। এই শহরের অধিবাসীদের সবাই রাফেযি। এই সমাধি থেকে বেশ কিছু আশ্চর্য বিষয় (কারামত) প্রকাশ পেয়েছে। যার ফলে স্থানীয় লোকেরা এখানে আলী রা.-এর কবর রয়েছে বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। এমন একটি আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে, রজবের ২৭ তারিখ রাতে—যেটি তাদের কাছে লাইলাতুল মাহইয়া (জীবনের রাত) নামে পরিচিত—ইরাক, খোরাসান, পারস্য এবং পার্শ্ববর্তী রোম থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে এই সমাধির কাছে নিয়ে আসা হয়। এভাবে ত্রিশ-চল্লিশজনের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি একত্র হয়। ইশার নামাযের পর তাদেরকে কবরের উপরে রাখা হয় আর কখন তারা উঠে দাঁড়াবে এই

অপেক্ষায় লোকেরা প্রহর গুনতে থাকে। কেউ নামায আদায় করে, কেউ মগ্ন হয় যিকিরে, কেউ করে কুরআন তেলাওয়াত আবার কেউ দেখতে থাকে সমাধির এই দৃশ্য। এভাবে অনেক লোকের ভিড় জমে যায় তখন। রাতের অর্ধেক অথবা একতৃতীয়াংশের মতো অতিবাহিত হওয়ার পর আগত সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের শরীরে অসুস্থতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। তারা তখন বলে উঠে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল এবং আলী রা. আল্লাহ তাআলার বন্ধু।' এই ঘটনা তাদের মাঝে ব্যাপক প্রসিদ্ধ। বেশ কজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে আমি তা শুনেছি। সেই রাতে তো আমি উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু আমি অতিথিদের মাদরাসায় তিনজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে দেখেছিলাম। একজন ছিলেন রোমের, আরেকজন ইস্পাহানের এবং আরেকজন ছিলেন খোরাসানের। আমি তাদেরকে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায়, এ বছরের লাইলাতুল মাহইয়ায় তারা উপস্থিত হতে পারেনি। তাই আগামী বছরের এই সময়ের জন্য তারা অপেক্ষা করছে। এই রাতে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এই শহরে এসে একত্র হয়। তখন এখানে দশদিনব্যাপী বিশাল একটি বাজার জমে উঠে। এই শহরে কোনো কর নেই, নেই কোনো কর আদায়কারী এবং কোনো প্রশাসকও নিযুক্ত করা হয়নি এখানে। যিনি তাদের যাবতীয় বিষয় দেখাশোনা করেন তাকে বলা হয় নকিবুল আশরাফ। এখানকার অধিবাসীদের প্রায় সকলেই ব্যবসায়ী। তাদের জীবন কেটে যায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সফর করে। তারা যেমন বীর, তেমনই উদার ও অতিথিপরায়ণ। বেশ কিছু সফরে আমি তাদের সঙ্গ লাভ করেছি এবং এজন্য শুকরিয়া আদায় করেছি। কিন্তু আলী রা.-এর ব্যাপারে তারা সীমাচ্যুত হয়েছে। ইরাক এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা অসুস্থ হয়ে গেছে আলী রা.-এর এই সমাধির জন্য মানত করে। সুস্থ হয়ে গেলে সেই মানতের সম্পদ দান করে যায়। কেউ মাথাব্যথায় আক্রান্ত হলে স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের একটি মাথা তৈরি করে সেটিকে সমাধিতে দান করে যায়। এমনিভাবে হাত-পা অথবা অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হলে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য দিয়ে অনুরূপ একটি অঙ্গ তৈরি করে সমাধিতে এনে দান করে যায়। নকিবুল আশরাফ সেগুলোকে সমাধির কোষাগারে জমা করেন। সমাধির এই কোষাগারটি বিশাল এবং সেখানে রয়েছে অগণিত সম্পদের সমাহার।

নকিবুল আশরাফের বিবরণ

ইরাকের রাজার পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি হিসেবে এই নকিবুল আশরাফকে[১] নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি ইরাকের রাজার খুব কাছের একজন ব্যক্তি। সফর অবস্থায় তার আয়োজন হয় বড় কোনো মন্ত্রীর মতো। তার বেশ কিছু প্রতীক, পতাকা এবং বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি রয়েছে। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তার বাসভবনের ফটকে সামরিক সঙ্গীত বাজানো হয়। তার হাতেই এই শহরের শাসনভার অর্পণ করা হয়েছে। আলাদা করে কোনো প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়নি। সুলতান অথবা অন্য কারো জন্য এখান থেকে কোনো কর উত্তোলন করা হয় না। আমি যখন নাজাফে প্রবেশ করি তখন নকিব ছিলেন নিজামুদ্দিন হুসাইন ইবনে তাজুদ্দিন আল আওয়ি। পারসিক ইরাকের আওয়া অঞ্চলের দিকে সম্বন্ধ করে তাকে আওয়ি বলা হয়। সেখানকার সকল অধিবাসী শিয়া রাফেযি। এই নিজামুদ্দিনের আগে আরো বেশ কজন ব্যক্তি একেরপর এক নাজাফের নকিব পদে নিযুক্ত ছিলেন। যথা: জালালুদ্দিন ইবনুল ফকিহ, কিওয়ামুদ্দিন ইবনে তাউস এবং নাসিরুদ্দিন মুতাহহির প্রমুখ। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন পারসিক ইরাক অঞ্চলের শরিফ আস সালিহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ আল আওহারির পুত্র। তিনি এখন ভারতবর্ষে অবস্থান করছেন এবং সেখানকার শাসকের কাছের একজন মানুষের মর্যাদা লাভ করেছেন। আরেকজন নকিব হচ্ছেন আবু গুররা ইবনে সালিম ইবনে মুহান্না ইবনে জাম্মাজ ইবনে শিহা। তিনি ছিলেন মদিনা মুনাওয়ারার আল হুসাইনি পরিবারের সদস্য।

একটি ঘটনা

শরিফ আবু গুররা প্রথমদিকে ইবাদত ও জ্ঞানার্জনের প্রতি প্রবল আসক্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে তার বেশ সুনাম ছড়িয়েছিল। মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে তিনি ছিলেন তার চাচাতো ভাই ও মদিনার গভর্নর মানসুর ইবনে জাম্মাজের প্রতিবেশী। এরপর তিনি মদিনা থেকে বেরিয়ে ইরাকের হিল্লা শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। নকিব কিওয়ামুদ্দিন বিন তাউসের মৃত্যুর পর ইরাকের জনগণ আবু গুররাকে নকিব নিযুক্ত করার ব্যাপারে একমত হয়। তৎকালীন ইরাকের সুলতান আবু সাঈদকে এ বিষয়ে জানালে

---

[১] এই পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে শরিফও বলা হতো। –অনুবাদক

তিনি জনগণের অভিমত মেনে নেন এবং আবু গুররাকে নকিব পদে বহাল রাখেন। ইরাক অঞ্চলে নকিব নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী আবু গুররার জন্য রাজকীয় পোশাক, প্রতীক, পতাকা এবং বাদ্যযন্ত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু নকিব নিযুক্ত হওয়ার পর আবু গুররা পালটে যায়। তার উপর ভর করে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা। ইবাদত আর দুনিয়াবিমুখতা ছেড়ে তিনি বেশ লাগামহীনভাবে সম্পদ খরচ করতে শুরু করে। ফলে সুলতানের কাছে তার নামে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এ কথা জানতে পেরে আবু গুররা সফরের পরিকল্পনা করেন। খোরাসানের তুস শহরে আলী ইবনে মুসা আর রিজার কবর জিয়ারতের কথা বলে তিনি নাজাফ থেকে বিদায় নেন। মূলত তার উদ্দেশ্য ছিল এখান থেকে পালানো। আলী ইবনে মুসার কবর জিয়ারত শেষে তিনি খোরাসানের সর্বশেষ নগরী হেরাতে চলে আসেন। সঙ্গীদেরকে বলেন তিনি এবার হিন্দুস্তানে যেতে চান। তখন তার অধিকাংশ সঙ্গী ফিরে আসে। অতঃপর তিনি খোরাসান ত্যাগ করে সিন্ধুর উদ্দেশে রওনা করেন। সিন্ধুর পাঞ্জাব উপত্যকা অতিক্রম করার সময় তিনি সঙ্গের লোকদেরকে ঢোল-তবলা বাজাতে বলেন। এর আওয়াজ শুনে পাঞ্জাবের অধিবাসীদের মনে ভীতি সৃষ্টি হয়। তারা মনে করে তাতাররা বুঝি তাদের উপর আক্রমণ করার জন্য চলে এসেছে। উজা নামক শহরটি তখন ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে উঠে এবং শহরের অধিবাসীরা তাদের শাসককে এ ব্যাপারে অবহিত করে। আওজার শাসক তখন সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা করে এবং অগ্রবর্তী বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। তারা গিয়ে বিশজনের মতো সৈনিক আর একদল ব্যবসায়ীকে দেখতে পায়। যারা শরিফ আবু গুররার সঙ্গী হয়ে এসেছিল। পতাকা আর বাদ্যযন্ত্র তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। অগ্রবর্তী বাহিনী গিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। তারা জানায়, এই ব্যক্তি হচ্ছেন ইরাকের একজন নকিব। তিনি হিন্দুস্তানের সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তখন অগ্রবর্তী বাহিনী ফিরে গিয়ে তাদের শাসককে এই কথা জানায়। নিজ এলাকার বাইরে এসে পতাকা উড্ডয়ন আর ঢোল-তবলা বাজানোর কারণে সেই শাসক আবু গুররাকে নির্বোধ মনে করে। অতঃপর আবু গুররা উজা শহরে প্রবেশ করে কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। এ সময় প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থানস্থলের সম্মুখে ঢোল-তবলা বাজানো হতো। এ ব্যাপারে আবু গুররার বেশ আকর্ষণ ছিল। এমনও জানা যায়, ইরাকের নকিব থাকাকালীন তার মাথার উপরে বাদ্য বাজানো হতো।

বাদক থেমে গেলে তিনি তাকে আরো জোরে বাজাতে বলতেন। এ কারণে তাকে নাক্কার (বাদক) উপাধিও দেওয়া হয়। এদিকে উজা শহরের শাসক হিন্দুস্তানের সুলতানের কাছে চিঠি পাঠিয়ে আবু গুররার আগমন এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার বাদ্য বাজানো এবং পতাকা উড্ডয়নের কথা জানিয়ে দেয়। হিন্দুস্তানে সাধারণত এমন প্রচলন নেই। সুলতান যাদেরকে পতাকা ও বাদ্য প্রদান করেন, তারা কেবল সফরের সময় এগুলো ব্যবহার করে। বাকি অবস্থানের সময় শুধু সুলতানের প্রাসাদের সম্মুখেই বাদ্য বাজানো হয়। মিসর, শাম এবং ইরাকের অবস্থা এর চেয়ে ভিন্ন। সেখানকার আমির তথা মন্ত্রী পর্যায়ের লোকদের বাসস্থানের সম্মুখেও বাদ্য বাজানো হয়। ভারতবর্ষের রাজা এ ব্যাপারে জানতে পেরে বিষয়টিকে খুবই অপছন্দ করেন। এদিকে মুলতান নিবাসী কিসলু খান ছিলেন সিন্ধু অঞ্চলের শাসক। হিন্দুস্তানের সুলতানের কাছে তিনি ছিলেন খুবই সম্মানিত এবং মর্যাদাবান। সুলতান তাকে চাচা সম্বোধনে ডাকতেন। কারণ, তার বাবা গিয়াসুদ্দিন তুঘলক শাহকে যারা সুলতান নাসিরুদ্দিন খসরু শাহর হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করেছিলেন, কিসলু খান ছিলেন তাদের অন্যতম। কিসলু খান তখন হিন্দুস্তানের সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। সংবাদ পেয়ে সুলতানও তাকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে বের হন। ঘটনাক্রমে সেদিনই শরিফ আবু গুররা হিন্দুস্তানে পৌঁছান। শরিফ কিসলু খান থেকে এক মাইল পথ এগিয়ে ছিলেন। তিনি তার অভ্যাসমতোই বাদ্য বাজিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সুলতানের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। তিনি এগিয়ে গিয়ে সুলতানকে সালাম দেন। সুলতান সালামের জবাব দিয়ে তার অবস্থা ও আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তার ব্যাপারে জানান। এরপরই সুলতান চলে যান কিসলু খানকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে। তাকে নিয়ে ফিরে আসেন রাজধানীতে। এদিকে আবু গুররা বেচারা হতচ্ছত্র হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। সুলতান তার দিকে তেমন মনোযোগ দেননি এবং তার আতিথেয়তারও কোনো নির্দেশ প্রদান করেননি।

সুলতান তখন দৌলতাবাদ শহরের উদ্দেশ্যে সফর করার পরিকল্পনা করছিলেন। এই শহরকে কাটাকা এবং দেওগিরও বলা হয়। সম্রাজ্ঞীর রাজধানী দিল্লী থেকে এর দূরত্ব চল্লিশ দিনের।

সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় সুলতান আবু গুররার কাছে পাঁচশ রৌপ্য দিনার দিয়ে পাঠান। মাগরিবের স্বর্ণমুদ্রার হিসেবে এর মান হবে

একশ পঁচিশ দিনার। দিনার প্রেরণের সময় সুলতান দূতকে বলে দেন, তাকে গিয়ে বলবে তিনি যদি নিজ দেশে ফিরে যেতে চান তবে এটি হচ্ছে তার সফরের পাথেয়। আর যদি আমাদের সঙ্গে সফর করতে ইচ্ছুক হন, তবে এটিই হবে যাত্রাপথে তার খরচাপাতি। আর যদি তিনি এখানে অবস্থান করতে চান তবে আমি ফিরে আসা পর্যন্ত এ দিয়েই তার খরচ চালাতে হবে। শরিফ তখন খুবই চিন্তায় পড়ে যান। তিনি ভেবেছিলেন সুলতান তাকে বিশাল অংকের কোনো সম্পদ দিবেন। যেমনটি তিনি সাধারণত শরিফের সমপর্যায়ের লোকদের দিয়ে থাকেন। অগত্যা তিনি সুলতানের সঙ্গে সফর করার সুযোগটিই বেছে নেন এবং উজির আহমাদ ইবনে ইয়াসের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। উজির আহমাদের উপাধি ছিল খাজা জাহান। সুলতান এবং অন্য সবাই তাকে এই নামেই ডাকতেন। তাদের নিয়ম ছিল সুলতান যখন কাউকে সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করতেন, তাকে সেই উপাধিতেই ডাকা হতো। এছাড়া অন্য কোনো নামে ডাকলে শাস্তি পেতে হতো। এই উজির এবং শরিফ আবু গুররার মধ্যকার সম্পর্ক ক্রমেই গভীর হয়ে যায়। উজির আবু গুররার প্রতি সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তার ব্যাপারে উত্তম মন্তব্য পেশ করেন। সুলতান তখন আবু গুররার জন্য দৌলতাবাদের দুটি গ্রাম নির্ধারণ করে দেন এবং তাকে সেখানে বসবাস করার আদেশ দেন। এই উজির ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত, উদার, সুচরিত্রবান এবং অতিথিপরায়ণ। অতঃপর আবু গুররা টানা আট বছর এই দুই গ্রামের ফসল ভোগ করে অনেক ধন-সম্পদের মালিক বনে যান। তখন তার মনে এখান থেকে চলে যাওয়ার খায়েশ জাগে। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। কারণ, তিনি সুলতানের একজন সেবক হিসেবে পরিগণিত। তাই সুলতানের অনুমতি ব্যতীত কোথাও যাওয়ার সুযোগ নেই তার। সুলতান ছিলেন অতিথিদের প্রতি খুবই যত্নশীল। খুব কমই তিনি তাদেরকে তার সাম্রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে অনুমতি দিতেন। তবুও আবু গুররা দমে গেলেন না। এবার তিনি সমুদ্র উপকূলের পথ ধরে পালানোর চিন্তা করেও দমে যান। অবশেষে তিনি রাজধানী দিল্লীতে এসে উজিরের সঙ্গে তার ফেরার প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করেন। উজির তার প্রতি দয়াদ্র হলে অবশেষে সুলতান আবু গুররাকে হিন্দুস্তান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন এবং দশ হাজার দিনার হিন্দুস্তানি মুদ্রা প্রদান করেন। মাগরিব অঞ্চলের স্বর্ণমুদ্রা অনুযায়ী এর মান হবে দুই হাজার পাঁচশ দিনার। একটি থলেতে করে সেগুলো নিয়ে এসে তিনি বিছানার নিচে রাখেন। আনন্দের আতিশয্যে এবং কেউ যেন এই থলের কিছু নিয়ে যেতে না পারে এই ভয়ে তিনি এর উপরেই

ঘুমিয়ে যান। তিনি ছিলেন খুবই কৃপণ। মুদ্রার থলের উপর ঘুমানোর কারণে তার পিঠে ব্যথা সৃষ্টি হয় এবং ক্রমেই বাড়তে থাকে। এই অবস্থাতেই তিনি সফরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু টাকার থলে হস্তগত হওয়ার বিশ দিনের মাথায় তার মৃত্যু হয়ে যায়। মৃত্যুর আগে তিনি শরিফ হাসান আল জারানির জন্য সেই সম্পদ অসিয়ত করে যান। আল জারানি সেগুলো দিল্লীতে বসবাসকারী হেজাজ ও ইরাক অঞ্চল থেকে আগত শিয়া এবং স্থানীয় শিয়াদের মাঝে দান করে দেন। হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার এবং বিদেশী মুসাফিরদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করা অথবা জিজ্ঞাসাবাদ করার কোনো অধিকার ছিল না। চাই তাদের সম্পদ যত বেশি হোক না কেন। এমনিভাবে কৃষ্ণাঙ্গরাও শ্বেতাঙ্গদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করত না। বরং কোনো বিদেশী ব্যক্তি মারা গেলে নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তির কাছে তার সম্পদ জমা রাখা হতো। অতঃপর উপযুক্ত প্রাপক এসে সেই সম্পদ নিয়ে যেতেন। শরিফ আবু গুররার কাসিম নাম্নী এক ভাই ছিল। তিনি কিছুকাল গ্রানাডায় বসবাস করেছেন। সেখানে তিনি শরিফ আবু আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহিম আল মাক্কির কন্যাকে বিয়ে করেন। এরপর সেখান থেকে জাবালে তারিকে (জিব্রাল্টারে) এসে বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর আল জাযিরাতুল খাদরা (আলজেসিরাস) প্রদেশের ওয়াদিউল কুররায় তার মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। নিজের দুঃসাহসের অহমিকায় কখনো দগ্ধ হননি তিনি। ছিলেন কিংবদন্তীতুল্য বীরত্বের অধিকারী। এ ব্যাপারে বেশ কিছু প্রসিদ্ধ ঘটনা লোকমুখে চর্চিত আছে। মৃত্যুর সময় তিনি দুইটি সন্তান রেখে যান। তাদের অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত করেন শরিফ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবুল কাসিম বিন নাফিস আল হুসাইনি আল কারবালায়িকে। মাগরিব এবং ইরাক অঞ্চলে তিনি খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি এই দুই সন্তানের পিতার মৃত্যুর পর তাদের মাকে বিয়ে করেন এবং অত্যন্ত সদাচরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

দক্ষিণ পারস্য এবং ইরাক

আমিরুল মুমিনীন আলী রা.-এর মাজার জিয়ারত শেষে আমাদের কাফেলা বাগদাদের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। আর আমি আরবের খাফাজা গোত্রের বড় একটি দলের সঙ্গে বসরার উদ্দেশে যাত্রা করি। এই গোত্রের লোকেরা সেখানেই বসবাস করেন। তারা বেশ শক্তিশালী এবং সবল-সুঠাম দেহের অধিকারী। তাদের সঙ্গী হওয়া ছাড়া এই অঞ্চলে সফর করার অন্য কোনো

উপায় নেই। কাফেলার আমির শামির বিন দাররাজ আল খাফাজির মাধ্যমে আমি একটি উট ভাড়া করি। অতঃপর আলী রা.-এর সমাধি থেকে বের হয়ে যাত্রা শুরুর পর আল খাওয়ারনাক নামক স্থানে এসে অবতরণ করি। মাউসসামার[১] বংশধর নুমান বিন মুনজির ও তার পূর্বপুরুষরা এখানেই বসবাস করতেন। এখানে আজও জনবসতি রয়েছে। ফোরাত নদী থেকে বের হওয়া শাখা নদীর তীরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে চোখে পড়ে বিশাল বিশাল গম্বুজ ও টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ। অতঃপর এখান থেকে যাত্রা করে আমরা 'কায়িম আল ওয়াসিক' নামক স্থানে অবতরণ করি। এখানে দেখা যায় বিধ্বস্ত একটি জনপদের ধ্বংসাবশেষ। শুধুমাত্র তার মসজিদটিই এখন কিছুটা অক্ষত আছে। এখান থেকে রওনা করে ফোরাত নদীর পাশঘেঁষে আল ইজার নামক একটি স্থান দিয়ে আমরা পথ চলতে থাকি। এটি জলাভূমির মাঝে নলখাগড়ার বনবেষ্টিত একটি জায়গা। আল মাআদি নামক একটি বেদুইনগোষ্ঠী এখানে বসবাস করে। এরা রাফেযি মতাদর্শী আর এদের পেশা ডাকাতি। আমাদের কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র একদল লোকের উপর হামলা করে তাদের সবকিছু, এমনকি জুতো ও কাঠের পাত্রগুলোও লুট করে নিয়ে যায়। এই বনকে তারা নিজেদের সুরক্ষিত আস্তানা হিসেবে গড়ে নিয়েছে। সবধরনের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে তাদের কাছে পর্যাপ্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে। এই বনে অনেক হিংস্র প্রাণীর বসবাস। এই ইজারের মধ্যে দিয়ে আমরা তিন মারহালা পরিমাণ পথ অতিক্রম করি। অতঃপর ওয়াসিত শহরে পৌঁছে যাই।

ওয়াসিত শহর

ওয়াসিত শহরটি খুবই সুন্দর এবং ঘন গাছপালা ও বাগানবেষ্টিত। এখানে অনেক মহৎ লোকের বসবাস। তাদের মধ্য হতে যারা জীবিত তারা লোকদেরকে সুপথ দেখান। আর যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের সমাধি

---

[১] মাউসসামা (ماء السماء) : তার প্রকৃত নাম মাবিয়াহ (ماوية) বিনতে জুশাম অথবা মাবিয়াহ বিনতে রাবিয়াহ আত তাগলিবি। জাহিলি যুগে তিনি ছিলেন ইরাকের সম্রাজ্ঞী। ইরাকের আল হিরা শহরের সম্রাট নুমান বিন মুনজির ছিলেন তারই বংশধর। প্রসিদ্ধ আরব কবি ইমরাউল কায়স ছিলেন তার স্বামী। অতুলনীয় সৌন্দর্য ও প্রতাপের অধিকারী হওয়ার কারণে তার উপাধি হয় মাউসসামা অর্থাৎ আকাশের জল। দেখুন, মুজামু আলামিন নিসায়ি, মুহাম্মদ আত-তুনজি, পৃষ্ঠা : ১৫৮
মাউসসামার বংশধর নুমান বিন মুনজির এবং তার পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য লাখমি সাম্রাজ্য নামে পরিচিত।–অনুবাদক

থেকে মানুষ লাভ করে শিক্ষার উপাদান। এখানকার অধিবাসীদেরকে বলা যায় ইরাকের অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। তাদের অধিকাংশই কুরআনের হাফেজ এবং বিশুদ্ধভাবে তাজবিদসহ কুরআন তেলাওয়াতে পারঙ্গম। তাদের কাছ থেকে কুরআন শিখার জন্য ইরাকের সমস্ত অঞ্চল থেকে ছাত্ররা এসে জড়ো হয়। আমাদের কাফেলার সঙ্গেও একদল লোক ছিলেন, যারা এখানকার শায়খদের কাছ থেকে কুরআনের পাঠ নিয়েছেন। এই শহরে অনেক বিশাল জমজমাট একটি মাদরাসা রয়েছে। এতে রয়েছে তিনশটির মতো কক্ষ। দূরদূরান্ত থেকে কুরআন শিখতে আসা শিক্ষার্থীরা এই কক্ষগুলোতে অবস্থান করে। শায়খ তাকিউদ্দিন আবদুল মুহসিন আল ওয়াসিতি এই মাদরাসাটি নির্মাণ করেন। তিনি ওয়াসিতে সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তি এবং বিদগ্ধ ফকিহ। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তিনি বাৎসরিক একটি করে পোশাক প্রদান করেন। তাদের প্রত্যেকের জন্যই দৈনিক ভাতা ও খরচ নির্ধারিত রয়েছে। নিজের ভাই ও সঙ্গীদেরকে নিয়ে তিনি মাদরাসায় কুরআন শিক্ষা দেন। আমি তার সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য লাভ করি। তিনি আমাকে আপ্যায়ন করান এবং আমার পাথেয় হিসেবে খেজুর ও অর্থসহায়তা প্রদান করেন। আমাদের কাফেলা ওয়াসিতে পৌঁছে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনদিন শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান করে। এই সুযোগে আমি প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও আল্লাহর ওলি আবুল আব্বাস আহমাদ আর রেফায়ির কবর জিয়ারত করি। এটি ওয়াসিত থেকে একদিন পরিমাণ দূরত্বে উম্মে উবাইদাহ নামক এক পল্লীতে অবস্থিত। শায়খ তাকিউদ্দিনের কাছে আমি আবেদন করি, তিনি যেন আমার সঙ্গে এমন কাউকে পাঠান যিনি আমাকে পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে যাবেন। তখন তিনি আমার সঙ্গে আরবের বনু আসাদ গোত্রের তিন জন ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দেন। তারা ছিলেন সেখানকার বাসিন্দা। শায়খ তাকিউদ্দিন এই সফরের জন্য আমাকে তার একটি ঘোড়াও প্রদান করেন। যোহরের সময় আমরা রওনা করি। বনু আসাদের মাঝে রাত্রিযাপন করে পরদিন দুপুরে আমরা খানকায় এসে পৌঁছাই। খানকাটি বেশ বড়। হাজারের মতো অসহায়-দরিদ্র লোক এখানে বসবাস করে। ঘটনাক্রমে সেদিনই আবুল আব্বাস আর রেফায়ি রহ.-এর দৌহিত্র শায়খ আহমাদ কুজাক এসে উপস্থিত হন। তিনি বসবাস করেন রোম ভূখণ্ডে (আনাতোলিয়ায়)। সেখান থেকে পিতামহের কবর জিয়ারত করার জন্য এসেছেন। তিনিই এই খানকার বর্তমান গদিনশিন। আসর নামায শেষে

এখানে তবলা ও দফ বাজানো হয়। এখানে অবস্থানকারী লোকেরা তখন নৃত্য করতে শুরু করে। মাগরিব নামায শেষে তাদের জন্য ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। খাবার তালিকায় ছিল চালের রুটি, মাছ, দুধ এবং খেজুর। আহারপর্ব সেরে ইশার নামায আদায় শেষে সবাই যিকিরে মগ্ন হয়ে যায়। শায়খ আহমাদ বসে থাকেন তার পিতামহের জায়নামাযে। এরপর তারা মগ্ন হয়ে যান সঙ্গীতের আসরে। অনেকগুলো কাঠ পুড়িয়ে তারা আগুন প্রজ্বলিত করেছে। আগুনের বৃত্তের মাঝে প্রবেশ করে একদল দেখিয়ে চলে তাদের নৃত্যের মহড়া। কেউ আগুনের মাঝেই গড়াগড়ি খেতে শুরু করে। কেউ আগুন মুখে নিয়ে তার দক্ষতা দেখায়। আগুন পরিপূর্ণভাবে নিভিয়ে দেওয়া পর্যন্ত তাদের এই কারসাজি চলতে থাকে। আহমাদ রেফায়ির খানকার এইসকল লোকেরা এই কাজের জন্যই নির্দিষ্ট। তাদের মধ্যে কেউ আবার জীবন্ত সাপ হাতে নিয়ে তার মাথা দাঁত দিয়ে কামড়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

একটি ঘটনা

একবার আমি হাজার আমরুহা জেলার আফগানপুর[১] নামক এক স্থান দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী থেকে এই স্থানের দূরত্ব পাঁচ দিনের সফর সমান। সেখানে সারজু[২] নামক নদীর তীরে আমাদের কাফেলা অবতরণ করে। তখন ছিল বৃষ্টির সময়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপের সময় এই বৃষ্টিপাত শুরু হতো। আর এই নদীতে পানি প্রবাহিত হতো কারাজিল[৩] (হিমালয়) পর্বতশ্রেণী থেকে। বিষাক্ত ঘাসের উপর পতিত বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ার কারণে এই মৌসুমে কোনো মানুষ অথবা প্রাণী নদী থেকে পানি পান করলে তার পরিণতি হতো নির্ঘাত মৃত্যু। আমরা চারদিন নদীর তীরে অবস্থান করি। এ সময় আমাদের কাফেলার কেউই নদীর কাছাকাছি যায়নি। এমন সময় সেখানে অসহায় দরিদ্র লোকদের একটি কাফেলা এসে পৌঁছায়। তাদের গলায় ও হাতে ছিল লোহার বেড়ি। একজন অতিকায় কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি ছিলেন তাদের কাফেলার প্রধান। তারা ছিল হায়দারি নামক

---

[১] আফগানপুরের বর্তমান নাম আগওয়ানপুর। যা দিল্লীর অন্তর্গত তুঘলকাবাদ শহর থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।–অনুবাদক

[২] আরবি পাঠ্যে নদীটির নাম লেখা হয়েছে সুরুর। যা ভুলবশত হয়ে গেছে। নদীটির আধুনিক নাম সারজু (Sarayu)।–অনুবাদক

[৩] আরবি এবং পারসিক ভাষায় হিমালয় পর্বতশ্রেণীকে কারাজিল নাম দেয়া হয়েছে।–অনুবাদক

একটি দলের লোক। আমাদের কাফেলার কাছেই তারা রাত্রিযাপন করে। তাদের প্রধান ব্যক্তি আমাকে কাঠ নিয়ে যেতে বলেন। তাদের নৃত্যের সময় তারা এই কাঠ পুড়িয়ে আগুন জ্বালাবে। আমি সেই অঞ্চলের গভর্নর আজিজকে এ ব্যাপারে বলি। তিনি খাম্মার নামে পরিচিত (তার ব্যাপারে সামনেই আলোচনা আসবে)। তিনি দশ বোঝা কাঠ পাঠিয়ে দেন। ইশার নামাযের পর তারা সেই কাঠগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। একসময় সেগুলো অঙ্গারে পরিণত হয়। তখন তারা সঙ্গীতের আসর শুরু করে। অতঃপর সেই আগুনের মাঝে প্রবেশ করে তারা নৃত্য আর গড়াগড়ি করতে থাকে। তাদের সর্দার আমার কাছে একটি জামা চাইলে আমি তাকে খুবই পাতলা একটি জামা দেই। সেই জামা পরিধান করে তিনি আগুনের মধ্যে গড়াগড়ি করতে থাকেন এবং জামার আস্তিন দিয়ে আগুনে আঘাত করতে থাকেন। এভাবে একসময় আগুন পুরোপুরি নিভে যায়। সর্দার জামাটি নিয়ে আমার কাছে এলে দেখি তাতে আগুনে পোড়ার কোনো চিহ্ন নেই। এ দেখে আমার আশ্চর্যের সীমা থাকে না।

শায়খ আবুল আব্বাস আর রেফায়ির কবর জিয়ারত শেষে আমি পুনরায় ওয়াসিতে ফিরে আসি। আল্লাহ তাআলা এই জিয়ারতের মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করুন। ওয়াসিতে এসে আমি আমার কাফেলার সঙ্গীদেরকে পেয়ে যাই এবং যাত্রাপথে তাদের সঙ্গে যুক্ত হই। অতঃপর আল হাজিব নামক জলাশয়ের কাছে অবতরণ করি। সেখান থেকে যাত্রা করে অবতরণ করি ওয়াদিউল কুরা নামক পানিবিহীন এক স্থানে। অতঃপর পুনরায় সফর শুরু করে আল মুশাইরবি নামক স্থানে এসে বিশ্রাম নিই। বিশ্রাম শেষে আবার শুরু হয় আমাদের যাত্রা। বসরার নিকটবর্তী একটি স্থানে নেমে আমরা কিছুক্ষণ বিরতি নিই। অতঃপর দিবসকালে পূর্বাহ্নের সময়ে আমরা বসরা শহরে প্রবেশ করি।

বসরা শহর

বসরায় উপনীত হয়ে আমরা মালিক বিন দিনার রহ.-এর নামে পরিচিত খানকায় অবস্থান গ্রহণ করি। এখানে আসার পর প্রায় দুই মাইল দূরে দুর্গের মতো উঁচু একটি স্থাপনা চোখে পড়ে। এ ব্যাপারে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা জবাব দেয়, এটি আলী রা.-এর নামে নামকরণকৃত মসজিদ। আগেকার সময়ে বসরা ছিল খুবই প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত। তখন

এই মসজিদটি ছিল বসরার ঠিক মধ্যখানে। এখন বসরা ও এই মসজিদের মাঝে দুই মাইলের ব্যবধান হয়ে গেছে।[১] এমনিভাবে এই মসজিদ থেকে শহরের পূর্বেকার প্রাচীরের মধ্যেও সমপরিমাণ ব্যবধান তৈরি হয়েছে। যার ফলে এই মসজিদটি পড়ে গেছে শহর এবং পূর্বেকার প্রাচীরের মাঝামাঝি অবস্থানে। ইরাকের প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক শহরগুলোর মধ্যে বসরা অন্যতম। পুরো বিশ্বজুড়ে রয়েছে এই শহরের সুনাম ও সুখ্যাতি। আয়তনে বিশাল এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে প্রসারিত। অনেক বাগান ও প্রচুর ফলমূলের সমাহারে সমৃদ্ধ এই শহরের মাটি। মিষ্টি ও লবণাক্ত দুই সাগরের মিলনস্থলে অবস্থিত হওয়ার কল্যাণে এই শহরটি সজীবতা ও উর্বরতায় পরিপূর্ণ। এই শহরে যত খেজুর গাছ রয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও তা নেই। শহরের বাজারে এক দিরহামের বিনিময়ে ইরাকের পরিমাপ অনুযায়ী চৌদ্দ রিতিল খেজুর পাওয়া যায়। তাদের এক দিরহাম এক নুকরার এক তৃতীয়াংশ সমমূল্যের হয়ে থাকে। শহরের বিচারক হুজ্জতুদ্দিনের কাছে খেজুরের একটি বড় ঝুড়ি পাঠানো হয়েছিল। যা একজন মানুষের বহন করতে খুবই কষ্ট হয়। আমি নয় দিরহামের বিনিময়ে সেই এক ঝুড়ি খেজুর ক্রয় করে নিই। বাসস্থান থেকে বাজার পর্যন্ত নিয়ে আসার ভাড়া হিসেবে কুলি এখান থেকে এক তৃতীয়াংশ নিয়ে যায়। এগুলো দিয়ে সে সায়লান নামক একপ্রকার উৎকৃষ্ট মধু তৈরি করবে। যা খেতে খুবই সুস্বাদু। ঠিক যেন জালাপের[২] মতো।

বসরায় তিনটি মহল্লা রয়েছে। একটি মহল্লা বনু হুজাইল গোত্রের। তাদের প্রধান হচ্ছেন সম্মানিত শায়খ আলাউদ্দিন ইবনুল আসির। একজন সম্মানিত ও উদারমনা ব্যক্তি। তিনি আমার আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন এবং পোশাক ও দিরহাম হাদিয়া প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় মহল্লাটি বনু হারাম গোত্রের। তাদের প্রধান হচ্ছেন সাইয়িদ শরিফ মাজদুদ্দিন মুসা আল হাসানি। তিনিও একজন সম্মানিত ও উদারপ্রাণ ব্যক্তি। তিনিও আমার আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেছেন এবং খেজুর, সাইলান মধু ও দিরহাম হাদিয়া দিয়েছেন। তৃতীয়

---

[১] নানা বিপর্যয়, পরিবর্তন এবং যুদ্ধের কারণে প্রাচীন বসরা বিরান হয়ে পড়েছিল। অতঃপর অষ্টম হিজরি শতাব্দীতে আগের জায়গা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ২৮০০০ হাত পরিমাণ দূরে নতুন বসরা শহরের সৃষ্টি হয়। দেখুন, আত-তুহফাতুন নাবহানিয়্যাহ ফি তারিখিল জাযিরাতিল আরাবিয়্যাহ, বসরার বিবরণ।

[২] একপ্রকার মিষ্টান্ন।–অনুবাদক

মহল্লাটি অনারব বা পারসিকদের। তাদের প্রধান হচ্ছেন জামালুদ্দিন ইবনুল লুকি। বসরার সকল অধিবাসীই সুচরিত্রবান, অতিথিপরায়ণ ও মেহমানের সেবা-সমাদরে তৎপর। তাই কোনো অতিথি এসে তাদের মাঝে একাকিত্ব ও অসহায় বোধ করে না। তারা জুমার নামায পড়েন আলী রা.-এর নামে নামকরণকৃত মসজিদে। যার কথা একটু আগে বলা হয়েছে। এই মসজিদটি খুবই সুন্দর ও নান্দনিক। এর আঙিনা অত্যন্ত প্রশস্ত। পুরো আঙিনাজুড়ে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে লাল রঙের নুড়ি পাথর। যেগুলো আনা হয়েছে ওয়াদি সিবা থেকে। উসমান রা. নিহত হওয়ার সময় কুরআনের যে কপি থেকে তেলাওয়াত করতেন, সেটি এখানে সংরক্ষিত আছে। সূরা বাকারার ১৩৭ নং আয়াত সম্বলিত পৃষ্ঠার একটি অংশে আজও তার রক্তের ছাপ অক্ষত আছে।[১]

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একদিন এই মসজিদে জুমার নামায আদায় করি। খতিব সাহেব খুতবা দিতে গিয়ে উচ্চারণে অনেক ভুল করেন। যেগুলো লাহানে জলি নামে পরিচিত। এ দেখে আমি যারপরনাই হতভম্ব হই। কাজি হুজ্জতুদ্দিনকে এ ব্যাপারে জানালে তিনি বলেন, এই শহরে ইলমে নাহু অর্থাৎ আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কে জ্ঞাত কোনো লোক নেই। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলে এতে শিক্ষার উপাদান পাওয়া যাবে। সেই সত্তা কতইনা মহান, যিনি সবকিছু পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন। এই বসরা একসময় ছিল ইলমে নাহুর শীর্ষ অবস্থানে। ইলমে নাহুর মূলনীতি ও শাখাপ্রশাখার জন্ম হয়েছে এখানে। এখানেই বসবাস করেছেন এই শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম। ইলমে নাহুর ক্ষেত্রে যার অবদান ও অগ্রগণ্যতা কখনো অস্বীকার করা যাবে না।[২] অথচ কী আফসোসের বিষয়, এই শহরের একজন খতিব শুদ্ধ উচ্চারণে জুমার খুতবাটুকুও দিতে পারে না। এই মসজিদে সাতটি মিনার রয়েছে। স্থানীয়দের ধারণা অনুযায়ী, এর একটি মিনার আলী রা.-এর আলোচনা করার সময় কেঁপে উঠে। বসরার স্থানীয় একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আমি মসজিদের ছাদের উঁচু জায়গা দিয়ে এই মিনারে আরোহণ করি। তখন মিনারের একটি খুঁটিতে কাঠের হাতল লাগানো দেখতে পাই। যা দেখতে অনেকটা রাজমিস্ত্রীদের

---

[১] আয়াতের সেই অংশটুকু হচ্ছে, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ তাদের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট হবেন। নিশ্চয়ই সর্বশ্রুত এবং সর্বজ্ঞাত। [সূরা বাকারা : ১৩৭]

[২] এই ইমাম হচ্ছেন প্রসিদ্ধ নাহুবিদ ইমাম সিবাওয়াইহ।

কর্ণিকের[১] মতো। আমার সঙ্গের লোকটি সেই হাতলে তার হাত রেখে বলে, আমিরুল মুমিনিন আলী রা.-এর মাথার দাবি করে বলছি, তুমি কেঁপে উঠো। এই বলে সে হাতলটি ঝাঁকি দিলে পুরো মিনারটি কেঁপে উঠে। এরপর আমি সেই হাতলে হাত রেখে ঐ লোককে বলি, এবার আমি বলব। তারপর আমি বলি, আবু বকর রা.-এর মাথার দাবি করে বলছি, তুমি কেঁপে উঠো। অতঃপর হাতল ধরে ঝাঁকি দিলে পুরো মিনারটিই কেঁপে উঠে। এই দেখে উপস্থিত লোকেরা খুবই আশ্চর্য হয়। তবে বসরার প্রায় সকলেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদায় বিশ্বাসী। আমি যেমনটি করেছি, এমনটি অন্য কেউ করলেও বসরাবাসীর পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তবে হুসাইন রা.-এর সমাধিতে (নাজাফে), অথবা হিল্লা, বাহরাইন, কুম, কাশান, সাওয়া, আওয়া এবং তুস অঞ্চলে যদি কেউ এমনটি করে, তবে তাকে নিশ্চিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হবে। কারণ, সেখানকার অধিবাসীরা উগ্রপন্থী রাফেযি। ইবনে জুজাই বলেন, আমি আন্দালুসের আল মানসুরা উপত্যকার বারসানা শহরে[২] একটি মিনার দেখেছি, যা কোনো খলিফা অথবা অন্য কারো নাম উচ্চারণ ছাড়াই কেঁপে উঠে। এটি ছিল সেখানকার বিরাট জামে মসজিদের মিনার। এর নির্মাণের খুব বেশিদিন হয়নি তখন। মিনারটি দেখতে ছিল খুবই চমৎকার। উচ্চতা ও গঠনের ভারসাম্যের দিক দিয়ে তা ছিল খুবই সুন্দর। কোনো বক্রতা অথবা একদিকে ঝুঁকে থাকার মতো ত্রুটি ছিল না এর মধ্যে। একবার আমি একদল লোকের সঙ্গে মিনারটিতে আরোহণ করি। তখন আমাদের সঙ্গে থাকা এক লোক মিনারের অগ্রভাগ আঁকড়ে ধরে সেটিকে ঝাঁকি দিলে পুরো মিনারটিই কেঁপে উঠতে থাকে। অতঃপর আমি তাকে থামতে বললে সে ঝাঁকানো বন্ধ করে।

বসরার বরকতময় সমাধিসমূহের বিবরণ

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন মহান সাহাবির একজন তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা.-এর সমাধির কথা। এটির অবস্থান শহরের ভেতরে। এর উপরে একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। পাশেই

---

[১] সিমেন্ট, বালি, চুন প্রভৃতির আস্তর লাগানোর জন্য রাজমিস্ত্রীদের ব্যবহার্য কাঠের হাতলের সঙ্গে সংযুক্ত অগ্রভাগ ক্রমশ সরু হয়ে আসা লোহার তৈরি হাতিয়ার। আঞ্চলিক ভাষায় যেটিকে কন্নিও বলা হয়।–অনুবাদক

[২] এই শহরের পরিবর্তিত নাম (Purchena)। আর আল মানসুরা উপত্যকার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে রিও এলমানজুরা (Rio Almanzura)। যা স্পেনের আলমেরিয়া প্রদেশ থেকে ৫৮ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।–অনুবাদক

রয়েছে একটি মসজিদ এবং একটি খানকা। আগত দর্শনার্থীদের জন্য এই খানকায় খাবারের আয়োজন করা হয়। বসরার অধিবাসীরা এই সমাধিকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। অবশ্য এটিই সমীচীন। আরেক মহান সাহাবি, রাসূল সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত শিষ্য এবং তার চাচাতো ভাই যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.-এর সমাধিও এখানে। এটির অবস্থান বসরার শহরতলীতে। এর উপর কোনো গম্বুজ স্থাপন করা হয়নি। সেখানে একটি মসজিদ ও খানকা রয়েছে। যেখানে অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। আরো আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধমা হালিমা সাদিয়ার কবর। তার পাশেই আছে তার পুত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধভাইয়ের কবর। আরেক সাহাবি আবু বাকরা রা.-এর কবরও এখানে। তার কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। এই কবর থেকে ছয় মাইল দূরে ওয়াদি সিবার (হিংস্র প্রাণীর উপত্যকা) কাছাকাছি একটি স্থানে রয়েছে নবীজির দীর্ঘদিনের খাদেম আনাস ইবনে মালিক রা.-এর কবর। জনপদহীন বিরান ভূমিতে অবস্থান হওয়ায় এবং অনেক হিংস্র প্রাণী থাকার কারণে বড় কোনো কাফেলার সঙ্গ ছাড়া তার কবর জিয়ারত করা যায় না। প্রসিদ্ধ তাবেয়ি হাসান বসরী রহ.ও সমাহিত হয়েছেন এখানে। মুহাম্মাদ বিন সিরিন এবং মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াসি রহ.-এর সমাধিও এখানে। আরো আছে উতবা আল গোলাম, মালিক ইবনে দিনার, হাবিব আল আজমি এবং সাহল ইবনে আবদুল্লাহ আত তুসতারি রহ.-এর কবর। তাদের প্রত্যেকের কবরের উপরেই গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। যার উপরে কবরে সমাহিত ব্যক্তি এবং তার মৃত্যুসন লেখা রয়েছে। এই সকল সমাধির অবস্থান শহরের প্রাচীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে। বর্তমান শহর থেকে তা এখন তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এগুলো ছাড়াও সেখানে জঙ্গে জামালে শহীদ হওয়া আরো অনেক সাহাবি এবং তাবেয়ির কবর রয়েছে। বসরা প্রবেশ করার সময় সেখানকার গভর্নর ছিলেন রুকনুদ্দিন আল আজমি আত তাওরিজি। তিনি আমার আতিথেয়তার ব্যবস্থা এবং উত্তমরূপে দেখভাল করেন। ফোরাত এবং দজলা দুই নদীর তীর ঘেঁষে বসরা শহরের অবস্থান। মাগরিব অঞ্চলের ওয়াদি সালা ও অন্যান্য উপত্যকার এখানেও জোয়ার-ভাটা দেখা যায়। এখান থেকে দশ মাইল দূরে পারস্য সাগর থেকে সৃষ্ট লবণাক্ত প্রণালির অবস্থান। নদীতে জোয়ার সৃষ্টি হলে মিষ্টি পানির তুলনায় লবণাক্ত পানির পরিমাণ হয় বেশি। আর ভাটার সময়ে লবণাক্ত পানির উপর মিষ্টি প্রাধান্য লাভ করে। এই কারণে বসরার বাসিন্দাদেরকে এমন অনুৎকৃষ্ট পানিই পান করতে হয়। এজন্যই বলা হয়, বসরার জল

নোনা। ইবনে জুজাই বলেন, এই কারণে বসরার আবহাওয়া উৎকৃষ্ট নয়। তাই এখানকার অধিবাসীদের গাত্রবর্ণ হয় হলদেটে এবং ফ্যাকাশে। এমনকি এইজন্য তারা প্রবাদেও পরিণত হয়েছে। বুওয়াইহি সাম্রাজ্যের উজির সাহিবের সম্মুখে কমলালেবু এনে রাখা হলে একজন কবি তখন আবৃত্তি করেন,

আল্লাহর শপথ, আমাদের সামনে রাখা এই কমলালেবু
প্রকাশ করে বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তির চেহারা,

যেন বা প্রবৃত্তির দাস আর বসরায় অধিবাসীদের
গায়ে পরিয়ে দেওয়া ক্ষীণ পোশাক।

অতঃপর বসরার উপকূল থেকে সুম্বুক নামক ছোট নৌকা যোগে উবুল্লা শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। বসরা থেকে এই শহরের দূরত্ব দশ মাইল। ডানে-বামে নিরবচ্ছিন্ন ঘন বাগান আর ছায়াঘেরা খেজুর গাছের সারির মাঝ দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে থাকি। বণিকরা গাছের ছায়ায় বসে রুটি, মাছ, খেজুর, দুধ এবং বিভিন্ন ফলমূল বিক্রি করছে। বসরা এবং উবুল্লা শহরের মাঝেই সাহল বিন আবদুল্লাহ আত তুসতারির ইবাদতগাহের অবস্থান। নৌকা বা জাহাজযোগে এই ইবাদতগাহ বরাবর এলে লোকেরা নদীর সেই অংশ থেকে পানি পান করে এবং আল্লাহ তাআলার এই ওলির বরকতের উসিলা দিয়ে দোয়া করে। এই অঞ্চলের মাল্লা-মাঝিরা দাঁড়িয়ে থেকেই নৌকার দাঁড় টানে।

আগেকার সময়ে উবুল্লা ছিল জমজমাট একটি শহর। হিন্দুস্তান এবং পারস্যের ব্যবসায়ীদের এখানে সমাগম হতো। কালের পরিক্রমায় তা বিরান হয়ে পড়ে। বর্তমানে এটি একটি গ্রামের রূপ ধারণ করেছে। বেশ কিছু প্রাসাদের ভগ্নাংশ জানিয়ে দিচ্ছে, এককালে এখানে বিরাট জনপদের বসবাস ছিল। অতঃপর উবুল্লার মুগামিস নাম্নী এক ব্যক্তির মালিকানাধীন ছোট নৌকায় চড়ে আমরা পারস্য সাগরের প্রণালি পাড়ি দিই। আমাদের এই যাত্রা শুরু হয় মাগরিবের পর। সকালেই আমরা পৌঁছে যাই আব্বাদান শহরে। এটি লবণাক্ত ভূমিতে অবস্থিত বড় একটি গ্রাম। কোনো চাষাবাদযোগ্য জমি এখানে নেই। তবে অনেকগুলো মসজিদ, ইবাদতগাহ এবং নেককার লোকদের খানকাহ রয়েছে। প্রণালির তীর থেকে এই গ্রামের দূরত্ব তিন মাইল। ইবনে জুজাই বলেন, প্রাচীনকালে আব্বাদান একটি শহর ছিল। কিন্তু

এটি চাষাবাদহীন নিষ্ফলা একটি ভূখণ্ড। তাই খাদ্য আমদানি করে এখানে জীবনযাপন করতে হতো। এমনকি এখানে পানিও ছিল খুব অল্প। কোনো এক কবি এখানে এসে বলেছিলেন,

কে জানাবে আন্দালুসে আমার স্বজনেরে
আটকে আছি বহুদূরের আব্বাদান শহরে,

এমন বিরানভূমি আমি আগে তো দেখিনি
বিশ্বকে তাই জানিয়ে দিব এর যা খবর জানি,

একটি রুটির টুকরো নিয়েও হয় যে কাড়াকাড়ি
মূল্য ছাড়া জল মিলে না, দুঃখ লাগে ভারি।

আব্বাদানের সমুদ্র উপকূলে খিযির ও ইলিয়াস আলাইহিমাস সালামের নামে পরিচিত একটি আশ্রম রয়েছে। পাশেই রয়েছে একটি খানকা। চারজন দরিদ্র লোক তাদের সন্তানসন্ততি নিয়ে সেখানে বসবাস করে। তারা এই আশ্রম ও খানকার দেখাশোনা করে। লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। যারাই এখান দিয়ে অতিক্রম করে তাদেরকে কিছু দান-সদকা করে যায়। এই খানকার একজন বাসিন্দা আমাকে বলেছেন, আব্বাদানে অনেক বড় একজন বুযুর্গ রয়েছেন। সঙ্গীহীন নির্জন জীবনযাপন করেন তিনি। প্রতি মাসে একবার তিনি সমুদ্রে এসে এক মাসের খাদ্য পরিমাণ মাছ শিকার করে নিয়ে যান। পুরো মাসে তাকে আর দেখা যায় না। অনেক বছর ধরেই তিনি এমনটি করছেন। আব্বাদানে পৌঁছে আমি সেই বুযুর্গের সন্ধান করাকেই একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নিই। আমার সঙ্গীরা যখন মসজিদ ও ইবাদতগাহে নামায আর ইবাদতে ব্যস্ত, আমি তখন তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। একটি বিরান মসজিদে এসে দেখি তিনি নামায পড়ছেন। আমি তার পাশে গিয়ে বসলে তিনি নামায সংক্ষেপ করেন। সালাম ফিরিয়ে আমার হাত ধরে বলেন, 'আল্লাহ আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌঁছে দিন।' আল্লাহর অনুগ্রহে আমি দুনিয়াতে আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়ে গেছি। সেটি হচ্ছে পৃথিবীজুড়ে ভ্রমণ করে বেড়ানো। এক্ষেত্রে আমি যে অবস্থানে পৌঁছেছি, আমার জানামতে, অন্য কেউ এ পর্যন্ত উপনীত হতে পারেনি। এখন আখেরাতের কাঙ্ক্ষিত অবস্থান বাকি রয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার প্রতি আমার প্রবল আশা, তিনি তার দয়া ও ক্ষমার গুণে আমাকে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য জান্নাতে পৌঁছে দিবেন। আমার সঙ্গীদের কাছে

ফিরে এসে আমি এই বুযুর্গের মর্যাদা ও গুণের কথা জানাই। তারাও তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে না পায় তাকে, না পায় তার কোনো খবর। এই দেখে তাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। সন্ধ্যায় আমরা খানকায় ফিরে এসে সেখানে রাত্রিযাপন করি। ইশার নামাযের পর খানকার সেবক দরিদ্র চার ব্যক্তির একজন আমাদের কাছে আসেন। তার অভ্যাস হচ্ছে, তিনি প্রতি রাতে আব্বাদানে এসে এখানকার মসজিদগুলোতে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন। অতঃপর খানকায় ফিরে আসেন। তিনি আব্বাদানে গেলে সেই বুযুর্গ ব্যক্তির দেখা পান। বুযুর্গ ব্যক্তিটি তার কাছে একটি তরতজা মাছ দিয়ে বলেন, 'আজ যে মেহমান আমার কাছে এসেছিলেন, এটি তার কাছে পৌঁছে দিবেন।' অতঃপর দরিদ্র লোকটি আমাদের কাছে এসে বলেন, আপনাদের মধ্য থেকে আজ শায়খের সঙ্গে কার দেখা হয়েছে? আমি বললাম, আমার সঙ্গে। লোকটি বলেন, শায়খ আপনার জন্য মেহমানদারি হিসেবে এই মাছটি পাঠিয়েছেন। আমি তখন আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি। দরিদ্র লোকটি আমাদের জন্য মাছটি রান্না করে দেন। আমরা সবাই মিলে তা থেকে ভক্ষণ করি। এমন সুস্বাদ মাছ আমি আগে কখনো খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। তখন আমার মনে বাকি জীবন এই বুযুর্গের সান্নিধ্যে থেকে যাওয়ার চিন্তা উদয় হয়। পরক্ষণেই আমার নফস এই চিন্তা থেকে আমাকে ফিরিয়ে দেয়।

পরদিন সকালে মাজুল শহরের উদ্দেশে আমরা পুনরায় যাত্রা শুরু করি। সফরের ক্ষেত্রে আমার অভ্যাস হচ্ছে, যে পথে একবার গিয়েছি সম্ভব হলে সেই পথে আর না যাওয়া। আমার মনে ছিল ইরাকের রাজধানী বাগদাদে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। তাই বসরার এক ব্যক্তি আমাকে প্রথমে লুর অঞ্চলের উদ্দেশে যাত্রা করার পরামর্শ দেয়। সেখান থেকে যাওয়া যাবে ইরাকে আজম। তারপর ইরাকে আরব। আমি তার পরামর্শ অনুযায়ী এগিয়ে যেতে থাকি। চারদিন পর মাজুল শহরে এসে পৌঁছাই। শহরটি বেশ ছোট। পারস্য সাগর থেকে সৃষ্ট প্রণালির তীরঘেঁষেই এটির অবস্থান। এই শহরের মাটি অনুর্বর। কোনো উদ্ভিদ, গাছপালার দেখা পাওয়া যায় না। তবে শহরটিতে রয়েছে বেশ বড়সড়ো একটি বাজার। সেখানে একদিন অবস্থান করার পর আমি রামিয থেকে মাজুলে শস্য আমদানিকারী একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একটি বাহনজন্তু ভাড়া করি। মরুভূমির মধ্য দিয়ে সফর চলতে থাকে আমাদের। এই মরুভূমিজুড়ে পশমের তৈরি তাঁবুতে কুর্দী জাতিগোষ্ঠীর

বেদুইনরা বসবাস করে। কেউ বলে তারা মূলত আরব জাতিগোষ্ঠীর। টানা তিন দিনের মরু সফর শেষে আমরা রামিয[১] শহরে এসে উপনীত হই। শহরটি খুবই সুন্দর। একাধিক নদীবেষ্টিত এই শহরে রয়েছে প্রচুর ফলমূলের সমাহার। এখানে আমরা কাজি হুসামুদ্দিন মাহমুদের অতিথি হই। তার কার্যালয়ে একজন বিদ্বান ধার্মিক ও খোদাভীরু ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি মূলত হিন্দুস্তানের অধিবাসী। তাকে বাহাউদ্দিন নামেও ডাকা হয়, ইসমাইল নামেও ডাকা হয়। তিনি শায়খ বাহাউদ্দিন আবু জাকারিয়া আল মুলতানির একজন সন্তান। তাওরিজ এবং অন্যান্য অঞ্চলের শায়খদের কাছ থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন। মাত্র একরাত রামিজে অবস্থান করি। অতঃপর টানা তিন দিন কুর্দিদের অধ্যুষিত নিরবচ্ছিন্ন গ্রামীণ পথ দিয়ে আমাদের সফর চলতে থাকে। এই পথের প্রতি মারহালা শেষে সরাইখানা রয়েছে। যেখানে আগত ব্যক্তিদের জন্য রুটি, গোশত এবং মিষ্টান্নের ব্যবস্থা রয়েছে। ময়দা ও ঘি-এর সঙ্গে আঙুরের রস মিশিয়ে এই মিষ্টান্ন তৈরি করা হয়।

প্রতিটি সরাইখানায় একজন ইমাম এবং একাধিক মুয়াযযিন ও সেবক রয়েছে। অসহায় ব্যক্তিদের জন্য এখানে খাবার রান্না করা হয়। এরপর আমি তুসতার শহরে এসে পৌঁছাই। আতাবেকদের নিয়ন্ত্রিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের শেষপ্রান্তে এবং পর্বতশ্রেণীর শুরু ভাগে এই শহরের অবস্থান। শহরটি বেশ বড়, পরিচ্ছন্ন ও মনোরম। বেশ কিছু চমৎকার বাগান ও চিত্তাকর্ষক উদ্যান রয়েছে এখানে। আরো আছে জমজমাট একটি বাজার। সবমিলিয়ে শহরটি চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্যের অধিকারী। প্রাচীন আমলে শহরটির গোড়াপত্তন হয়েছে। মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এটি বিজয় করেন। এখানকার প্রশাসক সাহল ইবনে আবদুল্লাহ আত তুসতারি রহ.-এর বংশধর। আযরাক নামক নদী শহরটিকে বেষ্টন করে রেখেছে। এই নদীর পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ। গ্রীষ্মের দিনগুলোতে নদীর পানি খুবই শীতল থাকে। যা খুবই আশ্চর্য একটি বিষয়। এমন নীল পানি আমি এর আগে শুধু বালাখশান নদীতেই দেখেছি।[২]

---

[১] রামাহুরমুযকে সংক্ষেপে রামিয বলা হয়।–অনুবাদক

[২] আজরাক তথা নীলরঙের নদীর নাম হচ্ছে কারুন। মধ্যযুগীয় গ্রন্থে এর নাম দেয়া হয়েছে দুজাইল। আর বালাখশান বা বাদাখশান নদীটি মূলত অক্সাস বা আমু দরিয়ার একটি উপনদী। মধ্যযুগের ভূগোলবিদদের কাছে এটি দিরগাম নদী এবং আধুনিক সময়ে কুকচা নদী নামে পরিচিত। সূত্রঃ রিহলাতু ইবনে বতুতার ইংরেজি অনুবাদ, ২/২৮৪।–অনুবাদক

শহরের একটি মাত্র ফটক রয়েছে। যা দিয়ে পর্যটকরা প্রবেশ করতে পারে। এর নাম দারওয়াজা দিসবুল। তাদের ভাষায় দারওয়াজা মানে হচ্ছে ফটক বা প্রবেশপথ। তবে শহরটির আরো কিছু ফটক রয়েছে। সেগুলো নদীমুখী। নদীর দুইপাশেই রয়েছে ফলের বাগান এবং জলচাকা। আর নদীটি বেশ গভীর। পর্যটকরা যে ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশ করে সেখানে নৌকার মাধ্যমে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। যেমনটি দেখা গেছে বাগদাদ ও হিল্লা শহরে।

তুসতারে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফলমূল এবং অনেক সহজলভ্য সুযোগ-সুবিধা। এখানকার বাজারের মতো অনিন্দ্য সুন্দর বাজার খুব কমই পাওয়া যাবে। শহরের উপকণ্ঠে একটি পবিত্র সমাধি রয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এই সমাধি জিয়ারত করার জন্য সমবেত হয় এবং বিভিন্ন মানত করে। সমাধির পাশেই রয়েছে একটি খানকা। যেখানে একদল অসহায় লোক বসবাস করে। স্থানীয়দের ধারণা এটি আলী রা.-এর পৌত্র যাইনুল আবিদিন আলী ইবনুল হুসাইন রহ.-এর সমাধি। তুসতারে এসে আমি বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ আলেম শারফুদ্দিন মুসার মাদরাসায় অবস্থান নিই। তিনি আরেক প্রসিদ্ধ আলেম সদরুদ্দিন সুলাইমানের পুত্র। যিনি সাহল বিন আবদুল্লাহ আত তুসতারির বংশধর। শারফুদ্দিন মুসা একজন উত্তম চরিত্রবান ও গুণী আলেম। জ্ঞান, দীনদারিতা, কল্যাণময়তা এবং অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মতো নানা প্রশংসনীয় গুণের সমাবেশ ঘটেছে তার মাঝে। তিনি একটি মাদরাসা এবং একটি খানকা পরিচালনা করেন। যেখানকার সেবকরা বয়সে তরুণ। সুম্বুল, কাফুর, জাওহার এবং সারুর নামের চারজন পুত্রসন্তান রয়েছে তার। প্রথমজন খানকার ওয়াকফকৃত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত। দ্বিতীয়জনের দায়িত্ব হচ্ছে খানকা এবং মাদরাসার প্রাত্যহিক প্রয়োজন ও খরচ সরবরাহ করা, তৃতীয়জনের দায়িত্ব আগত মেহমানদের জন্য খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশন করা এবং চতুর্থজনের দায়িত্ব বাবুর্চি এবং খানসামাদের তত্ত্বাবধান করা। আমি এই আলেমের কাছে ষোলোদিন অবস্থান করি। এখানকার মতো চমৎকার সুবিন্যস্ত ব্যবস্থাপনা এবং সুস্বাদু খাবার আমি আর কোথাও দেখিনি। একজন ব্যক্তিকে যে পরিমাণ খাবার দেওয়া হয়, তা দিয়ে চারজন ভরপেট খেতে পারবে। খাবারের তালিকায় ছিল ঘি দিয়ে রান্না করা গোলমরিচের মিশ্রণযুক্ত চালের ভাত, ভুনা মুরগী, রুটি, গোশত এবং মিষ্টান্ন। বরেণ্য এই আলেম সুন্দর চরিত্রের পাশাপাশি

সুন্দর চেহারা এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। জুমার নামাযের পর তিনি জামে মসজিদে লোকদের উদ্দেশ্যে নসিহত করে থাকেন। তার ওয়াজের মজলিসে বসার পর উপলব্ধি হয় ইতিপূর্বে হেজাজ, শাম এবং মিসরে অন্য যত ওয়ায়েজের মজলিসে বসেছি, যত আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি,তাদের সবাইকে তিনি ছাপিয়ে গেছেন।

নদীর তীরে তার একটি বাগান আছে। সেখানে একদিন তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হই আমি। দেখতে পাই সেখানে শহরের ফকিহ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ একত্র হয়েছেন। শহরের সকল প্রান্তের ফকিহগণ এখানে এসে সমবেত হয়েছেন। তিনি সবার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর সবাকে নিয়ে যোহরের নামায আদায় করে ওয়াজ-নসিহতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ান। সম্মুখে বসে থাকা কারীগণ চিত্তাকর্ষক সুর এবং কান্নাভেজা কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতের পর তিনি ধীরস্থিরভাবে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। এই আলোচনায় জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করেন তিনি। কুরআনের তাফসির থেকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা ও তার অর্থ বলে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রদর্শন করে নিপুণ দক্ষতা। অতঃপর মজলিসের সবদিক থেকে তার কাছে চিরকুট আসতে থাকে। অনারবরা সাধারণত চিরকুটে লিখে মাসআলা জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর আলোচক চিরকুট খুলে খুলে তাদের প্রশ্নের জবাব দেন। এই বরেণ্য আলেম চিরকুটগুলোকে তার হাতে নিয়ে একেরপর চমৎকার ও মুগ্ধকর জবাব প্রদান করেন। ইতিমধ্যেই আসর নামাযের সময় হয়ে গেলে তিনি সবাইকে নিয়ে নামায আদায় করেন। এরপর সবাই ফিরে যায় নিজ নিজ নীড়ে। তার এই মজলিস ছিল জ্ঞানের খোরাক, হৃদয় বিগলিত করে দেওয়া নসিহত এবং বরকতে পরিপূর্ণ। তার নসিহতের প্রভাবে কিছু লোক অনুতপ্ত হয়ে তওবার জন্য এগিয়ে আসে। তিনি তাদের কাছ থেকে ওয়াদা গ্রহণ করেন এবং তাদের চুলের অগ্রভাগ কেটে দেন। তাদের মধ্য হতে পনেরোজন ছিলেন তালিবে ইলম। যারা বসরা থেকে তার নসিহত শ্রবণের উদ্দেশ্যে এসেছেন। আর দশজন ছিলেন তুসতার শহরের সাধারণ লোক।

একটি ঘটনা

তুসতারে এসে আমি জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ি। গ্রীষ্মের সময়ে যারা এই শহরে আসেন তারা সাধারণত জ্বরের কবলে পড়েন। দামেস্ক এবং এই অঞ্চলের

পানি ও ফলমূলের প্রাচুর্য সমৃদ্ধ অন্য শহরগুলোতেও দেখা যায় একই চিত্র। আমার সঙ্গীরাও জ্বরে আক্রান্ত হন। এমনকি তাদের মধ্য হতে ইয়াহইয়া আল খুরাসানি নামক একজন শায়খ ইন্তেকালও করেন। তখন শায়খ শারফুদ্দিন তার দাফন-কাফনের যাবতীয় খরচ আঞ্জাম দেন এবং তার জানাযার নামায পড়ান। বাহাউদ্দিন আল খুশানি নামক একজন সঙ্গীকে তুসতার শহরেই রেখে আসি। আমি চলে আসার পর সেখানেই তার ইন্তেকাল হয়। অসুস্থতার সময়ে আমার কোনো খাবারের চাহিদা হতো না। অথচ প্রতিদিন আমার জন্য শায়খ শারফুদ্দিনের মাদরাসায় বিশেষ খাবার প্রস্তুত করা হতো। একদিন ফকিহ শামসুদ্দিন নামক শায়খের এক ছাত্র আমার কাছে বিশেষ এক খাবারের কথা উল্লেখ করলে আমার তা খেতে ইচ্ছে হয়। আমি তাকে কিছু দিরহাম দিলে তিনি বাজার থেকে আমার জন্য সেই খাবার রান্না করিয়ে নিয়ে আসেন। আমি তা তৃপ্তিভরে আহার করি। শায়খের কাছে এই সংবাদ পৌঁছুলে তিনি খুবই কষ্ট পান। আমার কাছে এসে বলেন, আপনি এমনটি কেন করলেন? বাজার থেকে খাবার রান্না করে নিয়ে আসতে হবে? আপনি খাদেমকে বললেই সে আপনার চাহিদামতো খাবার প্রস্তুত করে দিতো। অতঃপর তিনি তার সকল ছাত্র ও খাদেমকে উপস্থিত করে বলেন, তোমাদের কাছে কেউ কোনো খাবার বা মিষ্টান্ন চাইলে তোমরা তা নিয়ে আসবে এবং তিনি যা চাইবেন তাই রান্না করে দিবে। এ ব্যাপারে তিনি তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

অতঃপর তুসতার শহর থেকে প্রস্থান নিয়ে টানা তিনদিন উঁচু পাহাড়ি পথে সফর করি। তবে এই পথের প্রতি মনজিলেই পূর্বের মতো সরাইখানা ছিল। এরপর আমরা ইজাজ শহরে পৌঁছাই। একে মাল-আল আমির নামেও ডাকা হয়।[১] এটি আতাবেক সুলতানের রাজধানী। এখানে পৌঁছে আমি এখানকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ আলেম নুরুদ্দিন আল কিরমানির সঙ্গে দেখা করি। এই শহরের সবগুলো দীনি প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসার রক্ষণাবেক্ষণ তার হাতে। সুলতানও তাকে খুব সম্মান করেন এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। এমনিভাবে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা তার সান্নিধ্য পেতে উদগ্রীব থাকেন। তিনি আমার অত্যন্ত

---

[১] বর্তমান নাম মালামির বা ইজেহ (Izeh)। ইরানের খুজেস্তান প্রদেশে অবস্থিত।—অনুবাদক

সমাদ্র করেন, আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন এবং আদ দিনাওয়ারি নামক সরাইখানায় আমার থাকার ব্যবস্থা করেন। সেখানে আমি বেশ কিছুদিন অবস্থান করি। তখন প্রচণ্ড গরমের সময় চলছিল। রাতের নামায আদায় করে আমরা খানকার ছাদে ঘুমাতাম। অতঃপর সকাল বেলা পুনরায় সরাইখানায় চলে আসতাম। আমার সঙ্গে এখানে আরো বারোজন দরিদ্র ব্যক্তি থাকতেন। তাদের মধ্যে একজন ইমাম, দুইজন সুদক্ষ কারী এবং একজন খাদেম ছিলেন। আমরা সবাই মিলে সুবিন্যস্তভাবে সেখানে ছিলাম।

ইজাজ ও তুসতার শহরের শাসকের কথা

আমি যখন ইজাজে প্রবেশ করি, তখন সেখানকার শাসক ছিলেন আতাবেক সুলতান আফরাসিয়াব। যিনি ছিলেন আতাবেক সুলতান আহমাদের পুত্র। আতাবেক হচ্ছে এই অঞ্চলের শাসকদের উপাধি। আর এই অঞ্চলকে বলা হয় বিলাদুল লুর বা লুরদের[১] অঞ্চল। এই সুলতান তার ভাই ইউসুফের ক্ষমতায় বসেন। আর ইউসুফ ক্ষমতায় বসেন তার পিতা আহমাদের পর। সুলতান আহমাদ ছিলেন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। তার অঞ্চলের একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে আমি শুনেছি, তিনি তার শাসনাধীন অঞ্চলে ৪৬০টি খানকা ও সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। তন্মধ্য হতে রাজধানী ইজাজেই ছিল ৪৪টি। স্বীয় অঞ্চলের করকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করেন। একভাগ বরাদ্দ করেন খানকা, সরাইখানা ও মাদরাসাগুলোর জন্য। একভাগ বরাদ্দ করেন সৈনিকদের বেতনের জন্য এবং আরেকভাগ বরাদ্দ করেন নিজের জন্য, পরিবারের জন্য এবং গোলাম ও খাদেমদের জন্য। এছাড়াও তিনি এখান থেকে প্রতি বছর ইরাকের সুলতানের জন্য উপহার পাঠাতেন এবং মাঝে মাঝে নিজেই উপহার নিয়ে চলে যেতেন। তার এই সকল কীর্তি ঘুরে ঘুরে দেখে আমি খেয়াল করেছি যে, এগুলোর অধিকাংশই সুউচ্চ পর্বতমালায় অবস্থিত। পাথর কেটে সেগুলোতে যাওয়ার জন্য সমতল করে প্রশস্ত রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। যাতে করে বাহনজন্তুগুলো সেখানে বোঝা নিয়ে যেতে পারে। এই পর্বতমালা উচ্চতায় সতেরো দিনের সফর পরিমাণ আর প্রস্থে দশ দিনের সফর পরিমাণ। একাধিক নিরবচ্ছিন্ন পর্বতের মাধ্যমে

---

[১] ইরানের পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চলে লুর জাতির লোকেরা বসবাস করে। তাদের নামে লুরেস্তান নামক আলাদা প্রদেশ থাকলেও ইরানের আরো অনেক প্রাদেশিক শহরে তাদের বসবাস রয়েছে।–অনুবাদক

এই পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে। যেগুলোর মধ্য দিয়ে নদী বয়ে গিয়ে চিড় ধরিয়ে দিয়েছে। এই পর্বতমালার একমাত্র বৃক্ষ হচ্ছে উক। এর ময়দা থেকে লোকেরা রুটি তৈরি করে। এই পর্বতমালার প্রতিটি বিশ্রামস্থলে একটি করে সরাইখানা রয়েছে। যেগুলোকে তারা মাদরাসা নামে অভিহিত করে থাকে। মুসাফিররা এই সকল মাদরাসায় গিয়ে পৌঁছালে তাকে পর্যাপ্ত খাবার দেওয়া হয় এবং তার বাহনজন্তুর জন্য দেওয়া হয় পর্যাপ্ত হয়। তারা গিয়ে খাবার তালাশ করুক বা না করুক, এই মাদরাসাগুলোর সাধারণ রীতি হচ্ছে, কোনো মুসাফির এসে উপনীত হওয়া মাত্রই সেবকরা তার জন্য খাবার প্রস্তুত করায় লেগে পড়ে। প্রত্যেক মুসাফিরকে তারা দুইটি রুটির টুকরা, গোশত এবং মিষ্টান্ন প্রদান করে থাকে। পুরো খরচ বহন করা হয় সুলতানের বরাদ্দকৃত ওয়াকফ থেকে। আগেই উল্লেখ করেছি সুলতান আহমাদ ছিলেন একজন দুনিয়াবিমুখ ও সৎ ব্যক্তিত্ব। কাপড়ের পোশাকের নিচে তিনি পশমের তৈরি পোশাক পরিধান করতেন।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

একবার আতাবেক সুলতান আহমাদ ইরাকের সুলতান আবু সাঈদের কাছে আগমন করেন। তখন ইরাকের সুলতানের কিছু সহচর তাকে বলেন, আতাবেক আহমাদ বর্ম পরিধান করে আপনার কাছে আসেন। তারা মূলত সুলতান আহমাদের পোশাকের নিচের পশমি পোশাককে বর্ম মনে করেছিল। তখন সুলতান আবু সাঈদ নিশ্চিত হওয়ার জন্য আতাবেক আহমাদকে তল্লাশী করার নির্দেশ দেন। অতঃপর একদিন ইরাকের উচ্চপদস্থ মন্ত্রী জুবান, দিয়ারবাকির অঞ্চলের শাসক সুওয়াইতা এবং ইরাকের বর্তমান শাসক শায়খ হাসান মিলে হাসি-ঠাট্টার ছলে সুলতান আহমাদের উপরের পোশাক খুলে দেখেন তিনি এর নিচে পশমের পোশাক পরিধান করেছেন। সুলতান আবু সাঈদ এই অবস্থা দেখে এগিয়ে এসে আতাবেক আহমাদকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। তাকে নিজের পাশে বসিয়ে তুর্কি ভাষায় বলেন, 'সান আতা।' এর অর্থ হচ্ছে, আপনি আমার পিতা। অতঃপর তিনি আতাবেক আহমাদকে তার দেওয়া উপহারের দ্বিগুণ উপহার প্রদান করেন এবং তার জন্য এই মর্মে শাহী ফরমান লিখে দেন যে, এরপর থেকে আর কখনোই তাকে অথবা তার সন্তানদেরকে ইরাকের সুলতানের কাছে উপহার-উপঢৌকন পাঠাতে হবে না। সে বছরেই আতাবেক আহমাদ মৃত্যুবরণ

করেন। তারপর পুত্র ইউসুফ দশবছর শাসন পরিচালনা করেন। এরপর ক্ষমতা গ্রহণ করেন তার ভাই আফরাসিয়াব। ইজাজ শহরে প্রবেশ করে আমি সুলতান আফরাসিয়াবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছাপোষণ করি। কিন্তু তিনি মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার শুক্রবার দিন ছাড়া জনসমক্ষে বের হন না। তাই তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়নি। তার একমাত্র পুত্র ছিলেন তার স্থলাভিষিক্ত যুবরাজ। আমার ইজাজে অবস্থানকালেই সুলতানের এই সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়েন। একরাতে তার এক সেবক এসে আমার খোঁজখবর নিয়ে চলে যায়। পরদিন মাগরিবের নামাযের পর খাবার আর ফলভর্তি দুইটি বড় ঝুড়ি এবং দিরহামের একটি থলে নিয়ে হাজির হয়। এ সময় তার সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রসহ কিছু সঙ্গীত শিল্পীও ছিল। সে আমাকে বলে, 'আপনার সঙ্গীত গাইতে থাকুন। তাহলে সরাইখানার অসহায় ব্যক্তিরা নৃত্য শুরু করবে এবং সুলতানের পুত্রের জন্য প্রার্থনা করবে।' আমি বললাম, আমার সঙ্গীরা সঙ্গীত আর নৃত্য, কোনোটিতেই পারদর্শী নয়। অতঃপর আমরা সুলতান এবং তার পুত্রের জন্য দোয়া করি এবং দিরহামগুলো অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে বণ্টন করে দেই। মাঝরাতে আমরা কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। সুলতানের অসুস্থ এই সন্তান তখন মৃত্যুবরণ করেছেন। পরদিন সরাইখানার প্রধান এবং স্থানীয় কিছু বাসিন্দা আমাকে এসে বলে, শহরের বিচারক থেকে শুরু করে মন্ত্রী-আমলা এবং গণ্যমান্য সকল ব্যক্তি সুলতানের দরবারে গিয়েছেন তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। আপনারও উচিত তাদের সঙ্গে যাওয়া। আমি এতে অস্বীকৃতি জানালে তারা সবাই মিলে জোর করে। ফলে আমার না যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। আমি তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখি সুলতানের দরবার লোকারণ্যের রূপ ধারণ করেছে। বিভিন্ন বয়সী পুরুষ, শিশু, ক্রীতদাস, শাহজাদা ও মন্ত্রী-আমলাদের সন্তানসন্ততি এবং সেনাবাহিনী সবাই এসেছে এখানে। সবার পরনেই দেখতে পাই ধুলোমলিন ও ধূসর বর্ণের পোশাক। তাদের কেউ মাথায় মাটি আর লতাপাতা রেখেছেন। কেউ আবার তাদের কেশাগ্র কেটে ফেলেছেন। তারা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে একভাগ অবস্থান নিয়েছে দরবারের উপরের অংশে এবং আরেকভাগ অবস্থান নিয়েছে দরবারের নিচের অংশে। সবাই তাদের হাত দিয়ে বুক চাপড়ে বলে যাচ্ছেন, 'খুন্দিকারমা।' যার অর্থ হয়। 'হায়! আমাদের বন্ধু।' এই দৃশ্যকে আমার কাছে খুবই ভয়াবহ এবং উদ্বেগজনক মনে হয়। ইতিপূর্বে আমি কখনো এমন দৃশ্যের মুখোমুখি হইনি।

শিক্ষনীয় ঘটনা

সেদিন আমি আরো কিছু অদ্ভুত বিষয় দেখতে পাই। সুলতানের দরবারে প্রবেশ করতেই দেখি বিচারক, খতিব এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দরবারের দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে আছেন। চতুর্দিকে জনপদের ভিড়ের মাঝে তারা প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। তাদের মধ্য হতে কেউ কান্না করছেন, কেউ কান্নার ভান করছেন, আবার কারো চোখ চারদিকে তাকানোতেই ব্যস্ত। নিজেদের পোশাকের উপর তারা মোটা সুতার তৈরি একধরনের কোর্তা পরে আছেন। যা ঠিকমতো সেলাই করা হয়নি। প্রত্যেকের মাথাতেই রয়েছে ছেড়া কাপড়ের টুকরো অথবা কালো ঘোমটার মতো রয়েছে। টানা চল্লিশদিন তারা এমন করে শোক পালন করে। এটি ছিল তাদের জন্য চূড়ান্ত শোকের বিষয়। চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সুলতান শোকপালনকারীদের জন্য একসেট করে পূর্ণ পোশাক পাঠিয়ে দেন।

দরবারের সকল প্রান্তে মানুষের ভিড় দেখতে পেয়ে আমি ডানে বামে বসার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজতে থাকি। তখন মেঝে থেকে এক বিঘৎ পরিমাণ উঁচু একটি মঞ্চ দেখতে পাই, যার একপ্রান্তে একজন ব্যক্তি জনগণের ভিড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে আছেন। তার পরিধানে রয়েছে একধরনের পশমি পোশাক। যা এখানকার দরিদ্র ব্যক্তিরা বৃষ্টি, তুষারপাত অথবা সফরের সময় পরিধান করে থাকে। আমি তার দিকে এগিয়ে যাই। এ দেখে সঙ্গীরা আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আশ্চর্যবোধ করে। সেই ব্যক্তি আসলে কে, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। আমি মঞ্চে উঠে লোকটিকে সালাম দেই। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়ে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গি করেন। এই অবস্থাকে বলা যায় অর্ধেক দাঁড়ানো। আমি তার বিপরীত প্রান্তে বসে পড়ি এবং লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখি, সবাই আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। লক্ষ্য করে দেখি, শহরের ফকিহ, শায়খ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বেদির নিচে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছেন। একজন বিচারক ইঙ্গিতে আমাকে নেমে তার পাশে দাঁড়াতে বলেন। কিন্তু আমি তা না করেই বসে থাকি। তখনই আমার সন্দেহ হয়, আমি যে ব্যক্তির বিপরীতে বসে আছি তিনিই হয়তো সুলতান আফরাসিয়াব। এক ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর প্রধান শায়খ নুরুদ্দিন আল কিরমানি মঞ্চে উঠে সেই ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করলে তিনি উঠে দাঁড়ান।

অতঃপর শায়খ নুরুদ্দিন আমাদের দুজনের মাঝখানে বসে পড়েন। তখন আমি নিশ্চিন্ত হই তিনিই সুলতান আফরাসিয়াব।

অতঃপর লেবু আর কমলা গাছের বেষ্টনি দিয়ে জানাযার খাটিয়া নিয়ে আসা হয়। গাছের ডালগুলো ছিল ফলে পরিপূর্ণ। কিছু লোক তাদের হাতে গাছগুলো ধরে রেখেছিল। দেখে মনে হয় কোনো ভ্রাম্যমাণ বাগানের মধ্য দিয়ে এই জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জানাযার সম্মুখে ছিল লম্বা লাঠির সঙ্গে সংযুক্ত মশালবাহীদের দল। আরেকদলের হাতে ছিল মোমবাতি। অতঃপর জানাযার নামায আদায় শেষে লোকেরা লাশের খাটিয়া নিয়ে শাহী গোরস্থানে যায়। ইজাজ শহর থেকে চার মাইল দূরের হালাফাইজান নামক জায়গায় এই গোরস্থানের অবস্থান। সেখানে একটি বড় মাদরাসা (সরাইখানা) রয়েছে। যার মাঝ দিয়ে নদী বয়ে গেছে। এর অভ্যন্তরে রয়েছে একটি জামে মসজিদ। আর বহিরাংশে রয়েছে হাম্মামখানা। বিশাল একটি বাগান মাদরাসাটিকে বেষ্টিত করে রেখেছে। আগত অতিথিদের জন্য এখানে আপ্যায়নের সুব্যবস্থা রয়েছে। দূরে হওয়ার কারণে আমি লোকদের সঙ্গে কবরস্থানে যেতে পারেনি। তাই আমি মাদরাসায় ফিরে আসি।

কিছুদিন পর সুলতান আমার কাছে তার পূর্বের দূতকে প্রেরণ করেন। যিনি কিছুদিন আগে আমার জন্য আতিথেয়তামূলক উপহার নিয়ে এসেছিলেন। আমি তার সঙ্গে বাবুস সির নামক ফটকে উপস্থিত হই। অতঃপর অনেকগুলো সিঁড়ি পেরিয়ে অবশেষে একটি কক্ষে এসে উপনীত হই। শোকপালনের কারণে কক্ষে কোনো কার্পেট বিছানো হয়নি। একটি গদির উপর সুলতান বসে আছেন। তার সামনে স্বর্ণ ও রৌপ্যে ভরপুর দুইটি পাত্র। সেখানে সবুজ রঙের একটি জায়নামাজও ছিল। আমার জন্য তার কাছাকাছি চাদর বিছানো হয়। আমি সেখানে গিয়ে বসে পড়ি। এ সময় আমাদের দুজন বাদে সুলতানের গৃহাধক্ষ্য ফকিহ মাহমুদ এবং তার এক উপদেষ্টা ব্যতীত আর কেউ উপস্থিত ছিল না। সুলতান আমার অবস্থা, আমার দেশের অবস্থা এবং খলিফা আল মালিকুন নাসির ও হেজাজ অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আমিও জবাব দেই। অতঃপর এই অঞ্চলের প্রধান ফকিহ আগমন করলে সুলতান আমাকে বলেন, ইনি হচ্ছেন মাওলানা ফাযিল। পারস্য এবং অনারব সকল অঞ্চলেই ফকিহদেরকে মাওলানা উপাধিতে ডাকা হয়। সুলতান এবং সাধারণ প্রজা সবাই এই উপাধিতেই ডাকেন। অতঃপর সুলতান এই ফকিহর প্রশংসা করতে থাকেন। আমি আন্দাজ করতে পারি,

ধীরে ধীরে তিনি মাতাল হয়ে পড়ছেন। আমি আগে থেকেই তার অধিক মদ্যপানের কথা জানতাম। অতঃপর তিনি আরবি ভাষায় আমাকে বলেন, এবার আপনি কথা বলুন। তিনি আরবি ভালোই বলতে পারেন। আমি তখন তাকে বললাম, আপনি যেহেতু শুনতে চাচ্ছেন তাই আপনাকে বলি, আপনি আতাবেক সুলতান আহমাদের একজন সন্তান। আপনার পিতা তার বদান্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য সমাদৃতি লাভ করেছেন। আর আপনার মাঝেও তেমন নিন্দনীয় কিছু নেই। শুধু এটি ছাড়া। এই বলে আমি সামনে রাখা স্বর্ণ ও রূপায় পূর্ণ পাত্র দুটির দিকে ইঙ্গিত করি। আমার এ কথা শুনে তিনি লজ্জিত হন এবং নীরব হয়ে যান। অতঃপর আমি ফিরে আসতে চাইলে তিনি আমাকে বসার নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনার মতো লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার জন্য রহমত। অতঃপর দেখি তিনি ঢলে পড়ছেন এবং ঘুমাতে চাইছেন। তখন আমি ফিরে আসি। আমার জুতো ফটকের কাছেই রেখে গিয়েছিলাম। ফিরার সময় তা খুঁজে পাইনি। ফকিহ মাহমুদ তা খোঁজার জন্য নিচে নেমে আসেন। এদিকে ফকিহ ফাযিল উপরে গিয়ে সুলতানের কক্ষে তালাশ করে একটি তাকের মধ্যে তা পেয়ে যান এবং আমার কাছে নিয়ে আসা। তার এই উদারতা আমাকে বিব্রত করে দেয়। আমি তার কাছে দুঃখবোধ পেশ করি। তখন তিনি আমার জুতোয় চুমো দিয়ে সেটি তার মাথার উপরে রাখেন। আর আমাকে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনার মাঝে বরকত দান করুন। আপনি এখন সুলতানকে যে কথাটি বললেন, তা আপনি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। আল্লাহর শপথ, আমি আশা করছি নিশ্চয়ই তার মাঝে এই কথার প্রভাব পড়বে।'

এর কিছুদিন পরেই আমি ইজাজ শহর থেকে প্রস্থান নিই। অতঃপর শাহী গোরস্থানের নিকটবর্তী সরাইখানায় কিছুদিন অবস্থান করি। সুলতান আমার জন্য এবং আমার সঙ্গীদের জন্য বেশ কিছু দিনার প্রেরণ করেন। আমরা সেই সুলতানের রাজ্যে উঁচু পাহাড়ি পথ দিয়ে টানা দশদিন সফর করি। প্রতি রাতেই আমরা একটি করে সরাইখানায় অবস্থান নিতাম। সেখানে আমাদের আপ্যায়ন করানো হতো। কোনো সরাইখানার পাশে ছিল জনবসতি। আবার কোনোটি ছিল জনমানবহীন বিরান ভূমিতে। কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় সকল কিছুই সরবরাহ করার ব্যবস্থা ছিল। দশমদিন আমরা কিরিওয়াররুখ[১] নামক

---

[১] সম্ভবত এই স্থানের নাম হবে গিরিওয়াররুখ। অর্থাৎ, গন্তব্যের অগ্রভাগ। এর আধুনিক নাম কাহবারুখ। যা ইরানের খারমাহাল প্রদেশে অবস্থিত। সূত্র : রিহলাতু ইবনি বতুতার ইংরেজি অনুবাদ, ২/২৯৪।–অনুবাদক

একটি সরাইখানায় অবস্থান করি। এটি সুলতান আফরাসিয়াবের রাজ্যের একেবারেই শেষপ্রান্তে অবস্থিত। এখান থেকে রওনা করে আমরা ইস্পাহানের অন্তর্গত প্রচুর জলবিশিষ্ট সমতল ভূমির বুক চিড়ে সম্মুখপানে এগোতে থাকি।

অতঃপর আমরা পৌঁছে যাই প্রচুর জলধারা আর বাগানসমৃদ্ধ মনোমুগ্ধকর উসতুরখান শহরে। এখানে রয়েছে অনিন্দ্য সুন্দর একটি মসজিদ। যার মধ্য দিয়ে নদী বয়ে গেছে। এখান থেকে রওনা করে চলে যাই ফিরুজান শহরে। শহরের নামটিকে মনে হয় ফিরুজ শব্দের দ্বিবচন। ছোট্ট এই শহরটিতে বেশ কয়েকটি নদী, ঘন গাছপালা এবং বাগান রয়েছে। আসরের পরে শহরে পৌঁছে দেখি শহরের অধিবাসীরা একটি জানাযা নিয়ে বের হয়েছে। সামনে এবং পেছনে মশাল জ্বালিয়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। আর তাদের পেছনে একদল লোক বাদ্য বাজিয়ে আবেগময় সঙ্গীত গেয়ে যাচ্ছে। তাদের এই অবস্থা দেখে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। একরাত এই শহরে অবস্থান করে পরদিন চলে যাই নাবলান[১] নামক পল্লীতে। প্রশস্ত এক নদীর তীরে অবস্থিত এই পল্লীটি আয়তনে বেশ বড়। এর একপাশে অনিন্দ্য সুন্দর একটি মসজিদ রয়েছে। চারপাশ দিয়ে বাগানবেষ্টিত এই মসজিদে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। সেদিন একেরপর বাগান, জলাধার, সুন্দর গোছালো গ্রাম এবং হাম্মামখানার টাওয়ার পেরিয়ে আসর নামাযের পর আমরা ইরাকে আজমের ইস্পাহান শহরে পৌঁছাই। শহরটি ছিল অত্যন্ত বিশাল ও চমৎকার। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ও রাফেযিদের মধ্যকার ফেতনার কারণে শহরটি এখন প্রায় বিরান। এই ফেতনা এখনো চলমান। এখানে অনেক ফলমূল রয়েছে। বিশেষভাবে বলতে হয় এখানকার অদ্বিতীয় এপ্রিকট ফলের কথা। স্থানীয়রা এই ফলের নাম দিয়েছে কামারুদ্দিন। তারা এই ফলকে শুকিয়ে সংরক্ষণ করে রাখে। এর ভেতরের দানা ভেঙে খেলে মিষ্টি বাদামের মতো স্বাদ লাগে। এখানকার পীচ ফলও অতুলনীয়। যেমন তার স্বাদ, আকারেও বেশ বড়। আরো বলতে হয় সুস্বাদু আঙুর ফলের কথা। আর এখানকার তরমুজগুলোও স্বাদে এবং মানে বিস্ময়কর। শুধুমাত্র বুখারা আর খাওয়ারিজমে এমন স্বাদের তরমুজ পাওয়া যাবে। এছাড়া পৃথিবীর অন্য

---

[১] খুব সম্ভবত এটির আসল নাম হবে লুনবান। যেটি ইস্পাহান শহরের কাছাকাছি বড় একটি পল্লী। আর নদীটির নাম জায়ান্দে রুদ। যেটি ইস্পাহান শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে। সূত্র : রিহলাতু ইবনি বতুতার ইংরেজি অনুবাদ, ২/২৯৪।–অনুবাদক

কোথাও পাওয়া যাবে না। এর খোসা সবুজ রঙের আর ভেতরে লাল। মাগরিব অঞ্চলের শুকনো ডুমুরের মতো করে এই ফলকেও সংরক্ষণ করা হয়। খেতে ভারি মিষ্টি। কেউ যদি এটি খেয়ে অভ্যস্ত না হয়, তাহলে প্রথমবার খাওয়ার সময়েই এটি তাকে চাঙা করে তুলবে। ইস্পাহানে এটি খাওয়ার সময় আমার এমনই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

ইস্পাহানের অধিবাসীরা সুশ্রী চেহারার অধিকারী। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল ফর্সা এবং কিছুটা লালচে। তাদের অধিকাংশই স্বভাবজাতভাবে সাহসী ও সংযমী। এমনিভাবে তারা উদার। খাবার আপ্যায়ন করানো নিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এ নিয়ে বেশ চমকপ্রদ ঘটনা রয়েছে তাদের। কখনো তাদের একজন তার সঙ্গীকে ডেকে এনে বলে, চলো নান আর মাস খেয়ে আসি। তাদের ভাষায় নান হচ্ছে রুটি আর মাস হচ্ছে দুধ। সে যেতে রাজি হলে তার সম্মুখে আরো বেশ কয়েক প্রকারের উৎকৃষ্ট স্বাদের খাবার এনে হাজির করবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেওয়া। শহরের প্রতিটি শিল্পের কারিগর অথবা ব্যবসায়ীগণ তাদের মধ্য একজনকে প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করে। যাকে তারা 'কুলু' উপাধিতে ডেকে থাকে। এমনিভাবে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ছাড়াও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও তাদের মধ্য একজনকে প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করে। একটি দল থাকে অবিবাহিত যুবকদের। তারাই মূলত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকে। নিজেদের সচ্ছলতা ও সক্ষমতা প্রকাশের জন্য একজন আরেকজনকে দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়নের আয়োজন করে তারা। এছাড়া আরো অনেক আয়োজন বড় আয়োজন হয়ে থাকে এই শহরে। আমি শুনেছি, তাদের একদল অপরদলকে দাওয়াত দিয়ে মোমের আগুনে খাবার রান্না করে খাওয়ায়। তখন অপরদলটি প্রথম দলকে দাওয়াত দিয়ে খাবার রান্না করে খাওয়ায় রেশম কাপড় পুড়ানো আগুনে। ইস্পাহানে গিয়ে আমি শায়খ আলী বিন সাহলের খানকায় অবস্থান করি। তিনি জুনাইদ বাগদাদীর শিষ্য। স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে এই খানকাটি অত্যন্ত বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ হিসেবে পরিচিত। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এখানে জিয়ারত করে বরকত লাভের জন্য আসে। তাদের জন্য রয়েছে উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা। খানকার গোসলখানাটি মনোমুগ্ধকর। এর মেঝেতে বিছানো হয়েছে মার্বেল পাথরের মোজাইক আর দেয়ালে অঙ্কিত করা হয়েছে কাশানি কারুকার্য। এটি সবার জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত। এই খানকার দায়িত্বশীল বুযুর্গ শায়খের নাম কুতুবুদ্দিন হুসাইন। তার পিতা

শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ বিন আলীও ছিলেন একজন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ। তার ভাইও একজন আলেম ও মুফতি। তার নাম শিহাবুদ্দিন আহমাদ। শায়খ কুতুবুদ্দিনের সান্নিধ্যে এই খানকায় আমি চৌদ্দ দিন অবস্থান করি। এ সময় আমি ইবাদতের ক্ষেত্রে তার অধ্যবসায় এবং অসহায়-দরিদ্রদের প্রতি তার ভালোবাসা ও বিনয় দেখে মুগ্ধতায় আলোড়িত হয়ে উঠি। আমার সমাদর এবং উত্তম আহার-আপ্যায়নের ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিলেন। আমার জন্য উত্তম পোশাকের ব্যবস্থাও করেছেন তিনি। খানকায় পৌঁছামাত্রই তিনি আমার কাছে খাবার এবং ইস্পাহানের উৎকৃষ্ট স্বাদের তিনটি তরমুজ পাঠিয়ে দেন। আমি আগে কখনো এমন মুখরোচক সুস্বাদু তরমুজ চেখে দেখিনি।

শায়খ কুতুবুদ্দিনের উদারতা

একদিন তিনি খানকায় আমার অবস্থানের জায়গায় আসেন। জায়গাটি ছিল শায়খের বাগানের সম্মুখেই। সেদিন তার কাপড়-চোপড় ধৌত করে বাগানে রোদে শুকাতে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে সূচিকর্মযুক্ত সাদা রঙের একটি জুব্বা দেখে আমার খুব ভালো লেগে যায়। মনে মনে বলি, এমনটিই তো আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ ধরনের পোশাককে তাদের ভাষায় হাজরামিখ বলা হয়। শায়খ আমার কাছে এসে বাগানের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর এক খাদেমকে ডেকে সেই হাজরামিখ পোশাকটি নিয়ে আসতে বলেন। খাদেম পোশাকটি নিয়ে আসলে শায়খ তা আমার গায়ে পরিয়ে দেন। আমি তখন তার দুই পায়ে চুমো দেওয়ার জন্য নুয়ে পড়ি এবং তার কাছে আবেদন করি, তিনি যেন আমাকে তার মাথার একটি টুপিও পরিয়ে দেন এবং তার পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত দীক্ষায় দীক্ষিত করে আমাকে ইজাযত প্রদান করেন। ৭২৭ হিজরির চৌদ্দই জমাদিউল উলা তিনি তার খানকায় আমাকে সেই টুপি পরিধান করিয়ে আমাকে দীক্ষিত করেন। তিনি এই দীক্ষা পেয়েছেন তার পিতা শামসুদ্দিনের কাছ থেকে। শামসুদ্দিন পেয়েছেন তার পিতা তাজুদ্দিন মাহমুদের কাছ থেকে। তাজুদ্দিন মাহমুদ পেয়েছেন তার পিতা শিহাবুদ্দিন আলী আর রজার কাছ থেকে। শিহাবুদ্দিন আলী পেয়েছেন ইমাম শিহাবুদ্দিন আবু হাফস উমর বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আস সোহরাওয়ারদির কাছ থেকে। উমর পেয়েছেন বরেণ্য শায়খ জিয়াউদ্দিন আবুন নাজিব আস সোহরাওয়ারদির কাছ থেকে। আবুন নাজিব পেয়েছেন

তার চাচা ইমাম ওহিদুদ্দিন উমরের কাছ থেকে। ওহিদুদ্দিন পেয়েছেন তার পিতা মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহর কাছ থেকে। যিনি আমওয়াইহ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুহাম্মাদ পেয়েছেন শায়খ আখু ফারজ আজ জিনজানির কাছ থেকে। আখু ফারজ পেয়েছেন শায়খ আহমাদ দিনাওয়ারির কাছ থেকে। আহমাদ পেয়েছেন শায়খ মমশাদ দিনাওয়ারির কাছ থেকে। মমশাদ পেয়েছেন শায়খ আলী বিন সাহল আস সুফির কাছ থেকে। আলী বিন সাহল পেয়েছেন জুনাইদ বাগদাদীর রহ.-এর কাছ থেকে। জুনাইদ বাগদাদী পেয়েছেন সিররী আস সাকাতি রহ.-এর কাছ থেকে। সিররী আস সাকাতি পেয়েছেন দাউদ আততায়ির কাছ থেকে। দাউদ তায়ি পেয়েছেন হাসান বসরী রহ.-এর কাছ থেকে। হাসান বসরী পেয়েছেন আমিরুল মুমিনীন আলী রা.-এর কাছ থেকে। ইবনে জুজাই বলেন, শায়খ আবু আবদুল্লাহ (ইবনে বতুতা) এভাবেই সনদটি বর্ণনা করেছেন। তবে প্রসিদ্ধ যে, সির আস সাকাতি রহ. মারুফ কারখী রহ.-এর শিষ্য ছিলেন। আর মারুফ কারখী রহ. ছিলেন দাউদ আত তায়ীর শিষ্য। এমনিভাবে দাউদ আত তায়ী এবং হাসান বসরি রহ.-এর মাঝে রয়েছেন হাবিব আল আজমী রহ.। আর আখু ফারজ জিনজানির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে, তিনি আবুল আব্বাস নাহাওয়ান্দির শিষ্য ছিলেন। নাহাওয়ান্দি ছিলেন আবু আবদুল্লাহ বিন খফিফের শিষ্য। ইবনে খফিফ ছিলেন আবু মুহাম্মাদের শিষ্য। তবে রুবাম আবুল কাসিম আল জুনাইদের শিষ্যত্বও পেয়েছিলেন। আর মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আমওয়াইহ ছিলেন আহমাদ দিনাওয়ারি আল আসওয়াদের শিষ্য। তাদের মাঝে অন্য কেউ নেই। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। আর আখু ফারজ জিনজানির শিষ্য ছিলেন মূলত আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদিল্লাহ। যিনি ছিলেন শায়খ আবুন নাজিবের পিতা।

ইস্পাহান থেকে প্রস্থান করে এবার আমাদের উদ্দেশ্য সিরাজ শহরে গিয়ে শায়খ মাজদুদ্দিনের সান্নিধ্য লাভ করা। এই দুই শহরের মাঝে দশ দিনের সফরের দূরত্ব। পথিমধ্যে আমরা কালিল শহরে পৌঁছাই। ইস্পাহান থেকে এ শহরের দূরত্ব তিনদিন। শহরটি ছোট হলেও এর বুক চিড়ে বয়ে গেছে কয়েকটি নদী। আছে অনেকগুলো ফলমূলের বাগান। এখানকার বাজারে এক দিরহামের বিনিময়ে ইরাকি পরিমাপে পনেরো রিতিল আপেল বিক্রি করতে দেখেছি। তাদের দিরহামের মান নুকরার এক তৃতীয়াংশের সমান। শহরের প্রধান খাজা কাফি-র নির্মিত সরাইখানায় আমরা অবস্থান গ্রহণ

করি। খাজা কাফি বিশাল সম্পত্তির মালিক। আল্লাহ তাকে এই সম্পত্তি দান-সদকা, সরাইখানা নির্মাণ এবং অসহায় মুসাফিরদের আতিথেয়তা প্রভৃতি ভালো কাজে ব্যয় করার তাওফিক দিয়েছেন। অতঃপর কালিল থেকে রওনা দিয়ে দুইদিনের সফর শেষে আমরা সুরমা নামক বিশাল একটি গ্রামে উপনীত হই। এখানেও খাজা কাফি-র নির্মিত একটি সরাইখানা রয়েছে। যেখানে আগত সবার জন্য আপ্যায়নের সুব্যবস্থা আছে। এখান থেকে প্রস্থান নিয়ে আমরা ইয়াজদুখাসের উদ্দেশে যাত্রা করি। শহরটি ছোট, ছিমছাম ও গোছালো। স্থাপনাগুলো বেশ মজবুত এবং বাজারটিও বেশ সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। এখানকার মসজিদটিও বেশ নান্দনিক। পুরো মসজিদটি পাথরের মাধ্যমে নির্মিত এবং তোরণগুলোও পাথরের তৈরি। শহরটির অবস্থান উপত্যকার একপ্রান্তে। এখানেই বাগান ও জলধারাগুলোর অবস্থান। শহরের উপকণ্ঠে রয়েছে একটি সরাইখানা। মুসাফিররা সেখানে অবস্থান করেন। সরাইখানার দরজাটি অত্যন্ত মজবুত ও দুর্ভেদ্য লোহার তৈরি। শহরের ভেতরে রয়েছে বেশ কিছু দোকানপাট। সেখানে মুসাফিরদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই পাওয়া যায়। এই সরাইখানাটির নির্মাতা সিরাজ শহরের শাসক আবু ইসহাকের পিতা আমির মুহাম্মাদ শাহ ইয়ানজু। ইয়াজদুখাস শহরে এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট মাখন তৈরি করা হয়, যেটি ইয়াজদুখাসি মাখন নামে পরিচিত। এর ওজন দুই থেকে চার আউন্স পর্যন্ত হয়ে থাকে। অতঃপর এখান থেকে রওনা করে আমরা দাশত আর রুমের পথ দিয়ে যাত্রা করতে থাকি। মরুর এই পথে তুর্কি জাতিগোষ্ঠীর লোকদের বসতি চোখে পড়ে। একসময় পৌঁছে যাই অনেক নদী এবং সুবিন্যস্ত বাজারবিশিষ্ট মাইন শহরে। এখানকার গাছপালার বেশিরভাগই আখরোটের। এখান থেকে যাত্রা করে উপনীত হই সিরাজ শহরে। নিরেট স্থাপনা আর প্রশস্ত আয়তনের এই শহরটি লাভ করেছে অনেক প্রসিদ্ধি ও মর্যাদা। নয়নজুড়ানো বাগান, কলকল রবে বয়ে চলা স্রোতস্বিনী নদী, চমৎকার সাজের বাজার আর উঁচু উঁচু সড়কের মাধ্যমে শহরটি ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে আছে। এখানে অনেক লোকের বসবাস। বসতি ও স্থাপনাগুলোও অত্যন্ত মজবুতভাবে এবং নজরকাড়া বিন্যাসে নির্মিত। বাজারে প্রতিটি শিল্পের দোকানিদের জন্য আলাদা আলাদা সারি নির্ধারিত আছে। এক শিল্পের দোকানের মাঝে অন্য শিল্পের দোকান নেই। এখানকার অধিবাসীরা দেখতে সুশ্রী। পরিধানের পরিচ্ছন্ন পোশাকে পাওয়া যায় তাদের সুরুচির পরিচয়। সুবিন্যস্ত বাজার-ঘাট, বাগান, নদী আর

অধিবাসীদের সুন্দর চেহারার বিবেচনায় প্রাচ্যের শহরগুলোর মধ্যে একমাত্র এই সিরাজ শহরই দামেস্কের কাছাকাছি অবস্থানে থাকবে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে প্রসারিত এই শহরটিকে চারদিক দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছে সারি সারি বাগান। এর মাঝ দিয়ে বয়ে পাঁচটি নদী। একটি নদীর নাম রুকনাবাদ। এর পানি অত্যন্ত মিষ্টি। গ্রীষ্মকালে এই পানি খুব ঠান্ডা থাকে আর শীতকালে থাকে উষ্ণ। একটি পাহাড়ের পাদদেশের ঝরনা থেকে এই নদীর সৃষ্টি। ঝরনাটি যেখানে অবস্থিত সেই জায়গাটির নাম কুলাইয়া। সিরাজ শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদটি আল মাসজিদুল আতিক বা প্রাচীন মসজিদ নামে পরিচিত। প্রশস্ত জায়গা এবং চমৎকার স্থাপত্যশৈলীর দিক দিয়ে এটি বড় মসজিদগুলোর প্রথম সারিতে থাকবে। এর প্রশস্ত আঙিনাজুড়ে মর্মর পাথর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মকালে প্রতি রাতেই মসজিদটি ধৌত করা হয়। প্রতি সন্ধ্যায় শহরের গণ্যমান্য লোকেরা মসজিদে এসে একত্র হন এবং মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করেন। মসজিদের বামদিকে বাবু হাসান নামক একটি ফটক রয়েছে। এটি দিয়ে বের হয়ে যাওয়া যায় ফলের বাগানে। যার বিন্যাস খুবই চমৎকার এবং অভিনব। দামেস্কের বাবু বারিদ ফটকের বাজারের তুলনায় আমি এই বাজারটিকে এগিয়ে রাখব।

সিরাজ শহরের অধিবাসীরা কল্যাণকামী, ধর্মপরায়ণ এবং উদারনৈতিক। এক্ষেত্রে তাদের নারীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা হাতমোজা, পা-মোজা, বোরকা পরিধা করে সম্পূর্ণ পর্দাবৃত হয়ে বের হন। দান-সদকা এবং উদারহস্তে খরচের বেলায় তাদের জুড়ি মেলা ভার। তাদের মুগ্ধকর একটি বিষয় হচ্ছে, প্রতি সোমবার, বৃহস্পতি ও শুক্রবার দিন তারা শহরের বড় জামে মসজিদে ওয়াজ-নসিহত শ্রবণ করার জন্য সমবেত হন। তাদের সংখ্যা কখনো এক হাজার থেকে দুই হাজারও ছাড়িয়ে যায়। সবার হাতেই দেখা যায় হাতপাখা। প্রচণ্ড গরমের কারণে তারা হাতপাখা দিয়ে নিজেদের গায়ে বাতাস করেন। অন্য কোনো শহরে আমি এতসংখ্যক নারীকে সমবেত হতে দেখিনি। সিরাজ শহরে প্রবেশের পেছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এখানকার বিচারক, অলিকুল শিরোমণি, যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব, প্রকাশ্য অনেক কারামতের অধিকারী শায়খ মাজদুদ্দিন ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ বিন খোদাদাদ। খোদাদাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত। এই লক্ষ্যে আমি তার হাতে প্রতিষ্ঠিত মাজদিয়্যা মাদরাসায় গমন করি। তিনি এখানেই অবস্থান করেন। আমার সঙ্গে আরো তিনজন সাথীও এসেছেন। দেখতে পাই শহরের

ফকিহ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। সহোদর ভাই রুহুদ্দিনের দুই পুত্র মুহিব্বুদ্দিন এবং আলাউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আসর নামাযের উদ্দেশ্যে বের হন। একজন ছিলেন তার ডানদিকে, আরেকজন বামদিকে। বার্ধক্য এবং দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে এ দুজনকে বিচারকার্য পরিচালনায় তার নায়েব হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে আমি তাকে সালাম দিলে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন। হাতে ধরে তার নামাযের জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যান। আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ইঙ্গিতে তার পাশেই আমাকে নামায পড়তে বলেন। আমি তাই করি। আসর নামায আদায় শেষে তার সম্মুখে আল মাসাবিহ এবং ইমাম আস সাগানী রচিত শাওয়ারিকুল আনওয়ার কিতাব থেকে পাঠ করা হয়। তার নায়েব দুজন তাদের বিচারিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাকে সালাম দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় এমনটিই তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অতঃপর শায়খ আমার খোঁজখবর নেন। জানতে চান আমি কীভাবে এখানে এসে পৌঁছুলাম। এমনিভাবে মাগরিব, মিসর, শাম এবং হেজাজ অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাকে সবকিছুই খুলে বলি। এরপর তার খাদেমদেরকে নির্দেশ দিলে তারা মাদরাসার ছোট একটি কক্ষে আমার থাকার ব্যবস্থা করে। পরদিন তার এখানে ইরাকের সুলতান আবু সাঈদের প্রতিনিধি ইরাকের উচ্চপদস্থ মন্ত্রী নাসিরুদ্দিন আদ দারকান্দি আগমন করে। তিনি খোরাসানি বংশোদ্ভূত। শায়খের কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি মাথা থেকে 'কুলা' নামক বিশেষ টুপি খুলে ফেলেন। অতঃপর শায়খের পায়ে চুমো দিয়ে তার সম্মুখে নিজের কান ধরে বসে পড়েন। তাতার মন্ত্রীরাও তাদের রাজাদের সম্মুখে এমন করে থাকে। মন্ত্রী নাসিরুদ্দিন ইরাক থেকে পাঁচশ অশ্বারোহী ক্রীতদাস, সেবল এবং অনুচর নিয়ে এখানে এসেছেন এবং শহরতলীতে অবস্থান নিয়েছেন। শায়খ মাজদুদ্দিনের এখানে তিনি পাঁচজন অনুচরসহ এলেও শিষ্টাচার হিসেবে শায়খের মজলিসে তিনি একাই এসেছেন।

শায়খ মাজদুদ্দিনের আশ্চর্য কারামতের একটি ঘটনা

ইরাকের সুলতান মুহাম্মাদ খোদাবান্দা কাফের থাকা অবস্থায় শিয়া ইমামিয়া মতাদর্শী জামালুদ্দিন বিন মুতাহহির নামক একজন ফকিহের সংস্পর্শে ছিলেন। কিছুদিন পর সুলতান বেশ কিছু তাতারকে সঙ্গে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ

করেন। এরপর তিনি ফকিহ জামালুদ্দিনকে আগের চেয়েও বেশি সম্মান করতে শুরু করেন। এই সুযোগে জামালুদ্দিন তাকে শিয়া রাফেযি মতবাদের প্রতি আকর্ষণ করতে শুরু করেন। তার কাছে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এবং খেলাফতের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, আবু বকর এবং উমর রা. ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুজন উজির বা মন্ত্রী। আর আলী রা. হচ্ছেন তাঁর চাচাতো ভাই এবং জামাতা। অতএব, তিনিই খেলাফতের উত্তরাধিকারী। সুলতানের কাছে তার পরিচিত একটি উদাহরণ পেশ করে ফকিহ জামালুদ্দিন বলেন, সুলতানের হাতে এখন যে রাজত্ব রয়েছে, এটি তিনি তার পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তেমন করে আলী রা.-ও উত্তরাধিকারসূত্রে খেলাফতের অধিকারী হবেন। অথচ, তখন সুলতান সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ধর্মীয় নীতিমালা সম্পর্কে তার কোনো জানাশোনা ছিল না। তার কথায় প্রভাবিত হয়ে সুলতান লোকদেরকে রাফেযি মতবাদে দীক্ষিত হওয়ার নির্দেশ জারি করে। ইরাকের সমস্ত অঞ্চল, পারস্য, আজারবাইজান, ইস্পাহান, কিরমান ও খোরাসানে তিনি এই নির্দেশ দিয়ে ফরমান ও দূত প্রেরণ করেন। সবার প্রথমেই এই ফরমান পৌঁছায় বাগদাদ, সিরাজ ও ইস্পাহানে। বাগদাদের অধিবাসীদের মধ্য হতে বাবুল আজাজ এলাকার অধিবাসীরা সরাসরি এই ফরমান প্রত্যাখ্যান করেন। তারা ছিলেন আহলুস সুন্নাহ। তাদের অধিকাংশই ছিলেন আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর অনুসারী। জুমার দিন তারা অস্ত্র হাতে সুলতানের দূতকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে আসেন। সেদিন তারা সংখ্যায় ছিলেন বারো হাজার। সকলেই ছিল অস্ত্রসজ্জিত। তারা বাগদাদের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত। খতিব মিম্বরে উঠে দাঁড়ালে তারা খতিবকে এই মর্মে শপথ করতে বলেন, তিনি স্বাভাবিক খুতবায় কোনো পরিবর্তন করবেন না। কোনো কিছু বাড়াবেন না, কমাবেনও না। এর অন্যথা হলে তারা তাকে হত্যা করে ফেলবে। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই ঘটবে, এই কথা মেনে নিয়ে তারা এরই মধ্যে সুলতানের দূতকে হত্যা করে ফেলেছেন। সুলতান নির্দেশ দিয়েছিলেন খুতবা থেকে সকল খলিফা এবং সাহাবিগণের নাম সরিয়ে শুধুমাত্র আলী রা. এবং তার অনুসরণকারী আম্মার রা. প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে। প্রাণের ভয়ে খতিব আগের মতোই খুতবা পাঠ করেন। সিরাজ এবং ইস্পাহানের অধিবাসীরাও বাগদাদের অধিবাসীদের মতো এই ফরমান প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর প্রতিনিধিরা সুলতানের কাছে ফিরে

গিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানালে সুলতান এই তিন শহরের কাজি তথা বিচারককে আটক করে নিয়ে যেতে বলেন। তাদের মধ্যে সবার আগে আটক করা হয় সিরাজের বিচারক কাজি মাজদুদ্দিনকে। সুলতান তখন অবস্থান করছিলেন তার গ্রীষ্মকালীন নিবাস কারাবাগে। কাজি মাজদুদ্দিনকে তার কাছে ধরে নেওয়ার পর তিনি তাকে তার শিকারী কুকুরগুলো সম্মুখে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই কুকুরগুলো ছিল বিশালদেহী, শিকলে বাঁধা এবং মানুষ খাওয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কাউকে কুকুরের মুখে ফেলার সময় সেই কুকুরগুলোর শিকল খুলে উন্মুক্ত প্রান্তরে ছেড়ে দেওয়া হতো। প্রাণপণ চেষ্টা করেও এগুলোর সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। কুকুরগুলো লোকটিকে ধরে ছিন্ন-ভিন্ন করে তার গোশত ভক্ষণ করত। এই কুকুরগুলোকে যখন কাজি মাজদুদ্দিনের সম্মুখে ছেড়ে দেওয়া হলো, তখন সবাইকে অবাক করে দিয়ে কুকুরগুলো তার উপর আক্রমণ না করে উলটো তার সম্মুখে গিয়ে একান্ত প্রভুভক্তের মতো লেজ নাড়াতে শুরু করে। সুলতানের কাছে এই সংবাদ পৌঁছুলে তিনি হতভম্বের মতো খালি পায়ে প্রাসাদ থেকে কাজির কাছে ছুটে এসে তার পদতলে লুটিয়ে পড়েন। তার হাতে ধরে নিজের গায়ের থাকা সমস্ত রাজকীয় পোশাক খুলে তাকে পরিয়ে দেন। এটিকে সুলতানের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সম্মান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি যখন এভাবে কাউকে পোশাক পরিয়ে দেন, সেই ব্যক্তি ও তার উত্তরসূরিদের কাছে যতদিন এই পোশাক অবশিষ্ট থাকবে, তারা এর মাধ্যমে বংশানুক্রমে রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সম্মানসূচক পোশাক হচ্ছে পায়জামা। সুলতান কাজি মাজদুদ্দিনকে পোশাক অর্পণের পর তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যান। তার স্ত্রীদেরকে বলেন তার জন্য আতিথেয়তার ব্যবস্থা করতে এবং তার বরকত গ্রহণ করতে। এরপর সুলতান রাফেযি মত থেকে ফিরে আসেন এবং তার সাম্রাজ্যের সর্বত্র ফরমান জারি করে দেন, যেন লোকেরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতাদর্শের উপরেই অটল থাকে। সুলতান কাজি মাজদুদ্দিনকে অনেক উপহার-উপঢৌকন দিয়ে পরিপূর্ণ সম্মানের সাথে তাকে নিজ অঞ্চলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এই উপহারের মধ্যে অন্যতম ছিল জামকানের একশটি গ্রাম। জামকান দুই পাহাড়ের পাদদেশে উপত্যকা সদৃশ একটি জায়গা। এর দৈর্ঘ্য চব্বিশ ফারসাখ। এর মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে বিশাল একটি নদী। নদীর দুই তীরে গড়ে উঠেছে পরস্পর সংলগ্ন গ্রামগুলো।

সিরাজ শহরের মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন স্থান এই জামকান। এখানকার সবচেয়ে বড় গ্রাম মাইমানের অবস্থান সিরাজ শহরের পাশেই। এগুলো এখন কাজি মাজদুদ্দিনের অধীন। জামকানের আশ্চর্য একটি দিক হচ্ছে, তার বারো ফারসাখ আয়তনের যে অর্ধাংশ সিরাজ শহরের পাশে অবস্থিত; সেখানে তীব্র ঠান্ডা থাকে। তুষারপাতও হয়। সেখানকার গাছপালার অধিকাংশই আখরোট গাছ। অন্যদিকে হুঞ্জ, উবাল ও লার অঞ্চল সংলগ্ন জামকানের অপর অর্ধাংশে থাকে প্রচণ্ড গরম। আর সেখানকার অধিকাংশ গাছই খেজুরের।

ভারতবর্ষ থেকে ফিরে আসার সময় আমার আরেকবার কাজি মাজদুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। সেবার হুরমুজ থেকে তার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। তখন ৭৪৮ হিজরি চলছে। হুরমুজ থেকে সিরাজের দূরত্ব পঁয়ত্রিশ দিনের সফর পরিমাণ। গিয়ে দেখি তিনি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। আমি তাকে সালাম দিলে তিনি আমাকে চিনতে পারেন এবং বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে নেন। তার কনুইয়ে হাত রেখে দেখি চামড়া হাড্ডির সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে। মাঝখানে কোনো গোশত নেই। প্রথমবারের মতো এবারও তিনি তার মাদরাসায় আমার থাকা ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। একদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখি সুলতান আবু ইসহাক তার সম্মুখে কান ধরে বসে আছেন। এটি তাদের নিকট সর্বোচ্চ শিষ্টাচার হিসেবে বিবেচিত। সুলতানের সম্মুখে গেলে লোকেরা এমনটি করে থাকে। এই সুলতানের আলোচনা অচিরেই আসবে। আরেকবার মাদরাসায় এসে দরজা বন্ধ দেখতে পাই। লোকদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারি সুলতানের মা ও বোনের মাঝে উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। তারা দুজন কাজি মাজদুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তার মাদরাসায় আসেন এবং ফায়সালা কামনা করেন। তিনি শরিয়াহ অনুযায়ী তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন। সিরাজের অধিবাসীরা তাকে কাজি হিসেবে অভিহিত করে না। তারা তাকে 'মাওলানা আল আজম' অর্থাৎ শীর্ষ আলেম হিসাবে অভিহিত করে। যাবতীয় রেজিস্ট্রি ও নথিপত্রে তার নামের স্থলে এই উপাধিই লেখা হয়। তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় ৭৪৮ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে। আমার মাঝে তার আলো ও বরকত উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আল্লাহ তাআলার তার মাধ্যমে এবং তার মতো বুযুর্গদের মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন।

সিরাজের সুলতানের বিবরণ

আমি যখন সিরাজে পৌঁছাই, তখন সিরাজের সুলতান ছিলেন আবু ইসহাক বিন মুহাম্মাদ শাহ ইয়াঞ্জু। তার পিতা শায়খ আবু ইসহাক আল কাজারুনির নামে তার এই নাম রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন উত্তম একজন সুলতান। সুন্দর গড়ন-গঠন এবং সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। উদার, সজ্জন এবং বিনয়ী। বিশাল রাজত্ব এবং প্রবল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তার বাহিনীতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার তুর্কি ও অনারব সৈন্য ছিল। ইস্পাহানের অধিবাসীরা ছিল তার সবচেয়ে কাছের লোক। সিরাজের অধিবাসীদের উপর তিনি খুব একটা ভরসা করতেন না। তাদের মাধ্যমে কোনো সেবা নিতেন না, কোনো কাজে ডাকতেন না এবং তাদের কারো জন্য অস্ত্র বহনের বৈধতা দিতেন না তিনি। কারণ, সিরাজের অধিবাসীরা সচ্ছল, শক্তিশালী এবং রাজা-বাদশাহদের সম্মুখে অকুতোভয়। তাদের কারো কাছে অস্ত্র পাওয়া গেলে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। একবার তাদের এক লোককে জানদাররা (পুলিশ বাহিনী) গলায় শিকল বেঁধে তাদের প্রধানের কাছে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তার ব্যাপারে লোকদের জিজ্ঞেস করলে তারা জানায়, রাতের বেলায় তার হাতে একটি ধনুক পাওয়া গেছে। সুলতান আবু ইসহাক এমন করেই সিরাজের অধিবাসীদেরকে দমন-পীড়নের মধ্যে রেখে তাদের উপর ইস্পাহানের অধিবাসীদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সিরাজের অধিবাসীদেরকে ভয় পেতেন তিনি। ইতিপূর্বে তার পিতা মুহাম্মাদ শাহ ইয়াঞ্জু ইরাকের বাদশাহর পক্ষ থেকে সিরাজের প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ও জননন্দিত একজন শাসক। তার মৃত্যুর পর ইরাকের বাদশাহ আবু সাঈদ আমিরুল উমারা আল জুবানের পুত্র শায়খ হুসাইনকে প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করে। তার আলোচনাও অচিরেই আসবে। বাদশাহ তার সঙ্গে বিপুল সংখ্যক সৈনিকও প্রেরণ করেন। তিনি সিরাজে পৌঁছে সেখানকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং রাজস্ব বাজেয়াপ্ত করেন। রাজস্বের দিক দিয়ে সিরাজ শহরটি ছিল বিশ্বের মধ্যে অন্যতম স্থানে।

সিরাজের রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বশীল আলহাজ কিওয়ামুদ্দিন আত তামগাজি আমাকে জানিয়েছেন, তিনি দৈনিক দশ হাজার দিরহাম জমা দেওয়ার শর্তে এখানে নিয়োগ পেয়েছেন। মাগরিব অঞ্চলের মুদ্রা অনুযায়ী এর মূল্য হয় দুই হাজার পাঁচশ দিনার বা স্বর্ণমুদ্রা। নবনিযুক্ত প্রশাসক এখানে দীর্ঘ একটা সময় অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি ইরাকের বাদশাহর নিকটে যাওয়ার

ইচ্ছা করেন। সে সময় তিনি আবু ইসহাক, তার দুই ভাই রুকনুদ্দিন, মাসউদ বেক এবং তাদের মাতা তাশ খাতুনকে গ্রেফতার করেন। তার ইচ্ছে ছিল তাদেরকে ইরাকে নিয়ে গিয়ে তাদের কাছ থেকে তাদের পিতার সম্পদ বের করা। তারা যখন সিরাজের বাজারের মাঝামাঝি পৌঁছায়, তখন তাশ খাতুন তার মুখের নেকাব খুলে ফেলেন। কেউ যেন তাকে এই অবস্থায় দেখে না ফেলে এই লজ্জায় তিনি মুখ ঢেলে রেখেছিলেন। নয়তো তুর্কি মহিলারা সাধারণত চেহারা ঢেকে রাখেন না। তিনি ডেকে ডেকে সিরাজের লোকদের কাছে সাহায্য চাইতে থাকেন। বলেন, হে সিরাজের অধিবাসী, আমি অমুকের সম্মানিতা স্ত্রী। এমন করে আমাকে তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে, তোমরা কি তা মেনে নিতে পারো? তখন পাহলোয়ান মাহমুদ নামক একজন কাঠমিস্ত্রী দাঁড়িয়ে যায়। সিরাজে আসার সময় বাজারে আগেও আমি তাকে দেখেছিলাম। সে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রশাসককে বলে, আমরা কিছুতেই তাকে নিয়ে যেত দিব না। আপনি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যান। তার সঙ্গে আরো অনেকেই সাড়া দেয়। এরমধ্যেই জনতা উত্তেজিত হয়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রশাসকের বাহিনীর অনেককে হত্যা করে তাদের সম্পদ লুট করে এবং মহিলা ও তার সন্তানদেরকে মুক্ত করে আনে। প্রশাসক হুসাইন ও তার অন্য সঙ্গীরা পালিয়ে পরাজিত অবস্থায় ইরাকের সুলতান আবু সাঈদের সম্মুখে উপনীত হয়। তিনি হুসাইনকে বিরাট এক সেনাবাহিনী দিয়ে সিরাজে ফিরে গিয়ে সেখানকার জনগণের উপর যা ইচ্ছে তাই করার নির্দেশ দেন। সিরাজের অধিবাসীদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছুলে তারা বুঝতে পারে এবার আর তাদের রক্ষা নেই। তখন তারা কাজি মাজদুদ্দিনের কাছে এসে তাকে দুই পক্ষের মধ্যকার রক্তপাত বন্ধ করে সন্ধিচুক্তি করার জন্য অনুরোধ করে। কাজি মাজদুদ্দিন আমির হুসাইনের কাছে যান। তার সম্মানে প্রশাসক হুসাইন ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তাকে সালাম জানান। অতঃপর সন্ধি সম্পন্ন হয়। হুসাইন সেদিন শহরের বাইরে অবস্থান করেন। পরদিন সকালে সিরাজের অধিবাসীরা সুবিন্যস্তভাবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে। তাকে বরণ করার জন্য তারা শহরকে সুসজ্জিত করে এবং অনেক মোমবাতি প্রজ্বলিত করে। এমন জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা ও বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে দিয়ে প্রশাসক হুসাইন শহরে প্রবেশ করেন। অতঃপর শহরবাসীর সঙ্গে সদাচারের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। সুলতান আবু সাঈদের মৃত্যুর পর তাদের পরবর্তী শাসনব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে পড়ে। তখন প্রত্যেক শহরের প্রশাসক তাদের ক্ষমতা প্রয়োগে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে। এ সময় সিরাজের প্রশাসক হুসাইন তার উপর

সিরাজের অধিবাসীদের সীমালঙ্ঘনের ভয় করে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যান। অতঃপর প্রায় দেড়মাস সময়ের ব্যবধানে সুলতান আবু ইসহাক সিরাজ, ইস্পাহান এবং পারস্যের অন্য কিছু অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিজেকে সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত করেন। ধীরে ধীরে তার শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তিনি পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চল দখল করার ইচ্ছা করেন। এর শুরু করে সিরাজের সবচেয়ে কাছাকাছি শহর বাজদ দখলের মধ্য দিয়ে। বাজদ শহরটি অত্যন্ত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। এখানকার সুবিন্যস্ত বাজার দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। এই শহরে আরো দেখা যায় বহুবর্ষী প্রবহমান নদী এবং সারি সারি গাছপালার শ্যামলিমার মনমাতানো দৃশ্য। এখানকার অধিবাসীদের সিংহভাগ ব্যবসায়ী ও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। সুলতান আবু ইসহাক এই শহরটি অবরোধ করে এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। এখানকার প্রশাসক মুজাফফর শাহ শহর থেকে ছয় মাইল দূরের মরুবেষ্টিত দুর্ভেদ্য এক দুর্গে অবস্থান নিয়েছিলেন। সুলতান আবু ইসহাক সেখানে গিয়ে তাকে অবরুদ্ধ করেন। তখন মুজাফফর শাহ বিরল সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। রাত্রিবেলায় সুলতান আবু ইসহাকের বাহিনীর উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে তাদের সৈনিকদের হত্যা করে আর ছাউনিতে আগুন জ্বালিয়ে পুনরায় দুর্গে ফিরে আসেন তিনি। তাই আবু ইসহাকের বাহিনী তাকে বাগে আনতে পারছিল না। এমনি একরাতে তিনি সুলতান আবু ইসহাকের অবস্থানস্থলের কাছাকাছি হামলা চালান। সেখানে একদল সৈন্যকে হত্যা করে সুলতানের আস্তাবল থেকে দশটি ঘোড়া লুট করে আবার দুর্গে ফিরে যান। এর ফলে সুলতান আবু ইসহাক প্রতি রাতে পাঁচ হাজার সৈন্যকে প্রস্তুত করে মুজাফফর শাহের জন্য ফাঁদ পাততে বলেন। এরপর প্রতিরাতের মতো মুজাফফর শাহ বের হলে সুলতান আবু ইসহাকের গেরিলা ইউনিটের সম্মুখে পড়ে যায়। তাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। মুজাফফর শাহ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দুর্গে ফিরে যেতে সক্ষম হন। তার মাত্র একজন অনুসারী সুলতানের বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। তাকে সুলতান আবু ইসহাকের কাছে নিয়ে আসা হলে সুলতান তাকে মুক্ত করে রাজকীয় পোশাক পরান। অতঃপর তার হাতে নিরাপত্তার ফরমান দিয়ে মুজাফফর শাহর কাছে পাঠিয়ে তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। কিন্তু মুজাফফর তা অস্বীকার করেন। এরপর তাদের মধ্যে বেশ কিছু চিঠি চালাচালি হয়। মুজাফফর শাহের বীরত্ব দেখে সুলতান আবু ইসহাক তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি বলেন, আমি তাকে দেখতে চাই। তাকে দেখলেই আমি এখান থেকে ফিরে যাব। অতঃপর সুলতান দুর্গের বাইরে দাঁড়ান আর মুজাফফর শাহ দুর্গের প্রধান ফটকে সুলতানকে সালাম প্রদান করেন।

সুলতান তাকে বলেন, তুমি নিরাপত্তার সঙ্গে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো। মুজাফফর শাহ জবাবে বলেন, আমি আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি, আপনি যদি আমার দুর্গে প্রবেশ না করেন তাহলে আমি কিছুতেই আত্মসমর্পণ করব না। আপনি দুর্গে প্রবেশ করার পরই আমি নেমে আসব। সুলতান এই শর্ত মেনে তার দশজন বিশেষ সঙ্গীকে নিয়ে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

সুলতান দুর্গের দরজার কাছে পৌঁছুলে মুজাফফর শাহ খালি পায়ে নেমে এসে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে চুমো দেন। অতঃপর সুলতানের সম্মুখ দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে তাকে দুর্গে আমন্ত্রণ জানান। তারা একসঙ্গে পানাহার করেন। সুলতান ঘোড়ায় চড়ে তাদের মহল্লাতে গিয়ে অবতরণ করেন। সেখানে সুলতান মুজাফফরকে তার সঙ্গে বসান, তাকে রাজকীয় পোশাক পরিধান করান এবং বিশাল পরিমাণ সম্পদ প্রদান করেন। তাদের মাঝে এই মর্মে সন্ধিচুক্তি হয়, সুলতান আবু ইসহাকের নামে খুতবা প্রদান করা হবে। তবে শহরের শাসনক্ষমতা থাকবে মুজাফফর শাহ ও তার পিতার হাতে। এরপর সুলতান তার নিজের এলাকায় ফিরে আসেন।

সুলতান আবু ইসহাক একবার কিসরার প্রাসাদের মতো একটি প্রাসাদ নির্মাণের খায়েশ করেন। সিরাজের অধিবাসীদেরকে এর জন্য ভিত খনন করতে বললে তারা কাজ শুরু করে দেয়। তারা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে কাজ করতে থাকে। এভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারা মাটি বহন করার জন্য চামড়ার ঝুড়ি তৈরি করে সেগুলোকে কারুকার্যখচিত রেশমি কাপড় দ্বারা আবৃত করেন। গাধার পিঠে বহন করার বস্তাগুলোকেও তারা একইভাবে রেশমি কাপড়ে আবৃত করেন। তাদের একদল রূপার কুড়াল তৈরি করে এবং অনেক মোমবাতি প্রজ্বলিত করে। খনন করার সময় তারা নিজেদের সবচেয়ে ভালো পোশাকটি পরিধান করত। এর উপরে থাকত রেশমি কাপড়ের এপ্রোন। সুলতান প্রাসাদের ব্যালকনি থেকে তাদের এই কর্মযজ্ঞ দেখতেন। আমি এই স্থাপনাটি দেখতে পাই। তখন এটি মাটি থেকে ত্রিশ হাত উঁচু পর্যন্ত উঠেছিল। ভিত্তি নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে শহরের অধিবাসীদেরকে কাজ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর মজুরির বিনিময়ে শ্রমিকরা কাজ শুরু করে। প্রায় হাজারখানেক শ্রমিক এই কাজের জন্য জড়ো হয়। শহরের প্রশাসক আমাকে জানান, তাদের রাজস্বের সিংহভাগই এই ইমারত নির্মাণের পেছনে ব্যয় হয়েছে। আমির জালালুদ্দিন ইবনুল ফালাকি

আত তাওরিজিকে এর দেখভালের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট একজন ব্যক্তি। তার পিতা ছিলেন শাহ জিলান নামে পরিচিত সুলতান আবু সাঈদের উজিরের নায়েব। আমির জালালুদ্দিনের হিবাতুল্লাহ নামে যোগ্য এক ভাইও ছিল। যার উপাধি ছিল বাহাউল মুলক। আমি যখন হিন্দুস্তানে গিয়েছিলাম, তিনিও তখন সেখানে গিয়েছিলেন। বাখতের আমির শারফুল মুলকও আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। হিন্দুস্তানের সুলতান আমাদের সম্মানসূচক পোশাক পরিধান করিয়ে দেন এবং প্রত্যেককেই যথোপযুক্ত কাজে নিয়োগ করে বেতন-ভাতা ও উপহার নির্ধারিত করে দেন। অচিরেই তা উল্লেখ করব। সুলতান আবু ইসহাক চাইতেন বদান্যতা ও উদারতায় তাকে হিন্দুস্তানের সুলতানের সঙ্গে তুলনা করা হোক। কিন্তু তাদের দুজনের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। সুলতান আবু ইসহাকের বদান্যতার সবচেয়ে বড় যে ঘটনাটি আমরা শুনেছি, তা হচ্ছে, শায়খ জাদাহ আল খুরাসানীকে তিনি সত্তর হাজার দিনার প্রদান করেছিলেন। এই শায়খ তার কাছে হেরাতের বাদশাহর প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন। এদিকে হিন্দুস্তানের সুলতানের এমন দানশীলতার ঘটনা অগণিত। তিনি খুরাসান ও অন্যান্য অঞ্চলের অসংখ্য মানুষকে অহরহ এর কয়েকগুণ দান করেছেন।

একটি ঘটনা

খুরাসানের অধিবাসীদের সাথে হিন্দুস্তানের সুলতানের বদান্যতার একটি বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ করছি। একবার আমির আবদুল্লাহ নামক খোরাসানের এক ফকিহ তার কাছে আসেন। তার জন্ম হেরাতে হলেও বসবাস করেন খাওয়ারিজমে। খাওয়ারিজমের শাসক কুতলুদমুরের স্ত্রী খাতুন তুরাবেক উপহার-উপঢৌকন দিয়ে তাকে হিন্দুস্তানের সুলতানের কাছে পাঠিয়েছেন। সুলতান এই উপহার গ্রহণ করে বিনিময় হিসেবে এর কয়েকগুণ উপহারসামগ্রী খাতুন তুরাবেকের কাছে পাঠিয়ে দেন। এদিকে আমির আবদুল্লাহ কিছুদিন সুলতানের কাছে থাকার ইচ্ছা করেন। সুলতান তাকে নিজস্ব উপদেষ্টাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। হঠাৎ একদিন সুলতান তাকে বলেন, আপনি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রবেশ করে যে পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা বহন করতে সক্ষম, তা এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আমির আবদুল্লাহ তার ঘরে ফিরে এসে তেরোটি ব্যাগ নিয়ে যান। এরপর সেগুলো যথাসম্ভব বুঝাই করে প্রতিটি ব্যাগকে নিজের একেকটি অঙ্গের সঙ্গে বাঁধেন।

তিনি ছিলেন বেশ সবল ও শক্তিশালী। সেগুলো নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ান। কিন্তু কোষাগার থেকে বের হতেই তিনি পড়ে যান। আর উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না। সুলতান আমির আবদুল্লাহর সঙ্গে থাকা স্বর্ণমুদ্রাগুলোকে ওজন দিতে বলেন। ওজন করে দেখা যায়, সবমিলিয়ে দিল্লীর পরিমাপ অনুযায়ী তেরো মন স্বর্ণমুদ্রা হয়েছে। মিসরীয় পরিমাপে একমনে পঁচিশ রিতিল সমান হয়ে থাকে। সুলতান তাকে সবগুলো স্বর্ণমুদ্রাই নিয়ে যেতে বলেন।

অনুরূপ একটি ঘটনা

একবার বাখতের আমির শারাফুদ্দিন আল খুরাসানী অসুস্থ হয়ে যান। তার কথা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুলতান তাকে দেখার জন্য গেলে শারাফুদ্দিন উঠে দাঁড়াতে চান। তখন সুলতান তাকে শপথ করিয়ে খাট থেকে নামতে নিষেধ করেন। সুলতানের জন্য বসার আসন পাতা হয়। যেটিকে তারা 'মোড়া' বলে থাকে। সুলতান সেটির উপর বসেন। অতঃপর স্বর্ণমুদ্রা ও দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আসতে বললে সেগুলো হাজির করা হয়। তিনি অসুস্থ শারাফুদ্দিনকে দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় বসতে বলেন। শারাফুদ্দিন বলেন, জাহাঁপনা, আপনি এমনটি করতে বলবেন তা আগে থেকে জানলে আমি অনেকগুলো পোশাক পরিধান করতাম। সুলতান বলেন, তাহলে এখন আপনার যত পোশাক আছে সবগুলো পরিধান করুন। তখন তিনি তুলোয় ঠাসা শীত নিবারণের পোশাক পরিধান করে দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় বসেন আর অপর পাল্লায় রাজদরবারের লোকেরা স্বর্ণমুদ্রা দিতে থাকে। এভাবে স্বর্ণমুদ্রার ওজন তার চেয়ে বেশি হয়ে গেলে সুলতান বলেন, আপনি এগুলো গ্রহণ করুন এবং জানের সদকা হিসেবে দান করে দিন। এই বলে তিনি সেখান থেকে বের হয়ে যান।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা

ফকিহ আবদুল আজিজ আল আরদাবিলি দামেস্কে হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি সুলতানের কাছে এলে তার জন্য দৈনিক একশ দিরহাম করে বেতন নির্ধারণ করা হয়। স্বর্ণমুদ্রার মান অনুযায়ী তার মূল্য পঁচিশ স্বর্ণমুদ্রা সমপরিমাণ। একদিন তিনি সুলতানের দরবারে হাজির হলে সুলতান একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি একই

অর্থের অনেকগুলো হাদীস টানা মুখস্থ বলে যান। তার স্মরণশক্তি দেখে সুলতান যারপরনাই বিস্মিত হন এবং তাকে শপথ করিয়ে বলেন, সুলতান এখন যা করতে যাচ্ছেন সেটি না দেখে তিনি যেন দরবার থেকে প্রস্থান না করেন। এরপর সুলতান তার সিংহাসন থেকে নেমে ফকিহ আবদুল আজিজের পায়ে চুম্বন করেন এবং স্বর্ণের একটি পাত্র নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। পাত্রটি দেখতে একটি ছোট্ট বোলের মতো। তিনি সেটিতে করে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। তারপর সেগুলোকে ফকিহ আবদুল আজিজের উপর ঢেলে দিয়ে বলেন, এই পাত্রসহ সব স্বর্ণমুদ্রা আপনার। আরেকবার ইবনুশ শায়খ আবদুর রহমান আল ইসফারায়িনি নামক খোরাসানের অপর এক ব্যক্তি তার কাছে আসেন। তার পিতা ছিলেন বাগদাদের নিবাসী। সুলতান তাকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম, একটি ঘোড়া, একটি গোলাম এবং রাজকীয় সম্মানসূচক পোশাক প্রদান করেন। হিন্দুস্তানের আলোচনার সময় এই সুলতানের এমন আরো অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ করব। এখানে প্রসঙ্গক্রমে এই ঘটনাগুলো এজন্য উল্লেখ করলাম যে, সুলতান আবু ইসহাক বদান্যতার দিক দিয়ে তার সঙ্গে তুলনা করতে চান। যদিও তিনি বেশ উদার ও সজ্জন, কিন্তু হিন্দুস্তানের সুলতানের মতো উদার ও বদান্য তিনি এখনো হতে পারেননি।

সিরাজের কিছু স্থাপনার বিবরণ

এখানে আছে আলী ইবনে আবু তালিব রা.-এর বংশধর আলী রেজা বিন মুসার ভাই আহমাদ বিন মুসার সমাধি। সিরাজের লোকেরা এই সমাধিকে খুবই ভক্তির চোখে দেখে থাকে। এর মাধ্যমে বরকত কামনা করে। এর উসিলা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে। সুলতানের মা তাশ খাতুন এই সমাধিকে কেন্দ্র করে একটি বড় মাদ্রাসা এবং খানকা নির্মাণ করেছেন। সমাধির দর্শনার্থীদের জন্য খানকায় থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। সমাধির পাশে কারীগণ সর্বদা কুরআন তেলাওয়াতে মগ্ন থাকেন। তাশ খাতুন প্রতি সোমবার সন্ধ্যায় সমাধি জিয়ারতে আসেন। সে রাতে শহরের কাজি, ফকিহ এবং গুণীজন এখানে এসে সমবেত হন। সিরাজে অনেক গুণীজনের অবস্থান। এ নিয়ে কোনো তালিকা করা হলে সিরাজ পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থানে থাকবে। বেশ কজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে আমি শুনেছি, প্রায় চৌদ্দশরও বেশি গুণীজনের জন্য ভাতা বরাদ্দ রয়েছে। তাদের মধ্যে ছোট-

বড় সবাই অন্তর্ভুক্ত। তাদের নকিব বা প্রধান হচ্ছেন আজুদুদ্দিন আল হুসাইনী। তারা সমাধি প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে সম্মিলিতভাবে দেখে দেখে কুরআন খতম করেন। কারীগণ অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করে থাকেন। অতঃপর খাবার, ফলমূল ও মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হয়। আহার পর্ব শেষ হলে শুরু হয় ওয়াজের মজলিস। আগত ওয়ায়েজগণ একে একে ওয়াজ-নসীহত করেন। যোহর নামাযের পর থেকে নিয়ে ইশার নামায পর্যন্ত এই আয়োজন হয়ে থাকে। তাশ খাতুন এ সময় মসজিদের উপরের জানালাবিশিষ্ট একটি কামরায় অবস্থান করেন। এই পর্ব শেষ হয়ে গেলে সমাধির প্রবেশদ্বারে ঢোল-তবলা ও বাঁশি বাজানো হয়। যেমনটি রাজপ্রাসাদগুলোতে করা হয়ে থাকে। সেখানে আরো আছে আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ আবু আবদিল্লাহ বিন খাফিফের সমাধি। সিরাজের অধিবাসীরা সবাই তাকে শায়খ নামে চিনে। তিনি পুরো পারস্য অঞ্চলের একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব। তাই সমাধিকে লোকেরা অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে থাকে। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় এসে তা স্পর্শ করে। কাজি মাজদুদ্দিনকেও দেখেছি, তিনি এই শায়খের কবর জিয়ারত করেছেন এবং চুমো খেয়েছেন। প্রতি শুক্রবার রাতে তাশ খাতুন এই সমাধিতে আসেন। এই সমাধিকেও কেন্দ্র করে একটি খানকা ও মাদরাসা নির্মাণ করা হয়েছে। বিচারক, ফকিহ এবং গুণীজনরাও সেই রাতে এখানে সমবেত হন এবং আহমাদ বিন মুসার সমাধির আয়োজনের মতো এখানেও একই আয়োজন করা হয়। আমি উভয় স্থানেই উপস্থিত হয়েছিলাম। এই সমাধির পাশেই রয়েছে সুলতানের পিতা মুহাম্মাদ শাহ ইয়াঞ্জুর সমাধি। শায়খ আবু আবদিল্লাহ বিন খাফিফ ছিলেন অনেক বড় এবং প্রসিদ্ধ একজন আল্লাহর ওলি। তিনিই হিন্দুস্তান থেকে শ্রীলঙ্কার শরনদীপ পাহাড়ে (আদম পাহাড়) যাওয়ার পথ আবিষ্কার করেছিলেন।

এই শায়খের কারামত

বর্ণিত আছে, একবার তিনি ত্রিশজন সঙ্গীকে নিয়ে শরনদীপের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। পথিমধ্যে ঘরবাড়িহীন বিরান এক জায়গায় তারা ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে তারা শায়খকে বলেন, তিনি যেন তাদেরকে একটি ছোট্টো হাতি ধরে জবাই করে খাওয়ার অনুমতি দেন। সেখানে ছিল এমন অনেক হাতির অভয়ারণ্য। সেখান থেকে ভারতবর্ষে হাতি পাঠানো হতো। শায়খ তাদেরকে এই কাজ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু

ক্ষুধার জ্বালায় টিকতে না পেরে তারা শায়খের আদেশ অমান্য করে একটি ছোট্টো হাতি ধরে জবাই করে এর গোশত ভক্ষণ করে। শায়খ তাদেরকে এই গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন। সেই রাতে তারা ঘুমিয়ে গেলে সেই অঞ্চলের সব হাতি জড়ো হয়ে তাদেরকে ঘিরে ধরে। ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে একজন একজন করে তারা কাফেলার সবাইকে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু শায়খের ঘ্রাণ শুঁকে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। একটি হাতি তাকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে তার পিঠে নিয়ে রাখে। অতঃপর যেদিকটায় জনবসতি আছে, সেখানে নিয়ে আসে। এই দৃশ্য দেখে সেখানকার অধিবাসীরা খুবই আশ্চর্য হয়। তারা ব্যাপারটি ভালোভাবে দেখার জন্য শায়খের নিকটে আসে। তারা কাছাকাছি চলে এলে হাতিটি পুনরায় শায়খকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে সবার সামনেই মাটিতে এনে রাখে। এরপর সবাই মিলে শায়খকে তাদের রাজার কাছে নিয়ে যান। তাকে এই আশ্চর্য ঘটনার ব্যাপারে অবহিত করেন। সেখানকার অধিবাসীরা ছিল অমুসলিম। শায়খ কিছুদিন তাদের কাছে অবস্থান করেন। এই জায়গাটির অবস্থান ব্যাম্বু খাওয়ার নামক নদীর তীরে। তাদের ভাষায় খাওয়ার মানে নদী। একই জায়গা থেকে স্থানীয়রা মুক্তো আহরণ করে থাকে। বর্ণিত আছে, শায়খ একদিন স্থানীয় রাজার সম্মুখে সেই মুক্তোর খনিতে ডুব দেন। তারপর দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে উঠে রাজাকে বলেন যেকোনো একটি হাত বেছে নিতে। রাজা ডান হাত বেছে দিলে শায়খ সেই হাতে যা ছিল তা রাজার দিকে নিক্ষেপ করেন। সেখানে ছিল দুর্লভ অমুল্য তিনটি ইয়াকুত পাথর। এখনো এই পাথর তিনটি রাজার মুকুটে সংরক্ষিত আছে। তারা বংশপরম্পরায় এটির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। আমি এই শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলাম। সেখানকার অধিবাসীরা বিধর্মী হলেও মুসলিম আগন্তুকদের সম্মান-সমাদর করে থাকে। তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়িতে আশ্রয় দেয়। খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে। মুসলিমরা তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথেই সেখানে অবস্থান করে। তবে ভারতবর্ষের বিধর্মীরা মুসলিমদের কাছে টানতে চায় না। নিজেদের ঘরের আঙিনায় নিয়ে খাবারও খাওয়ায় না। তবে তারা মুসলিমদের কষ্ট দেয় না, তুচ্ছতাচ্ছিল্যও করে না। আমরা এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যাই যে, তাদের কয়েকজন বাধ্য হয়ে আমাদের জন্য গোশত রান্না করেছিল। তারা গোশতের ডেগ নিয়ে এসে আমাদের কাছ থেকে দূরে বসত। তারপর কলাপাতা এনে সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে এর উপর প্রথমে ভাত, তারপর তরকারি

পরিবেশন করে রেখে যেত। তারা চলে যাওয়ার পর আমরা খেয়ে নিতাম। যা অতিরিক্ত হতো সেগুলো খেতো কুকুর আর পাখি। তাদের কোনো অবুঝ শিশু সেখান থেকে খেয়ে ফেললে তারা তাকে মারধর করত। তারপর গরুর গোবর খাইয়ে দিত। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এই গোবরই তাকে পবিত্র করতে পারবে। সিরাজে অবস্থিত সমাধিগুলোর উল্লেখযোগ্য একটি সমাধি হচ্ছে আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ শায়খ রুজবিহান আল বাকলি। একটি জামে মসজিদে তার কবরের অবস্থান। এই জামে মসজিদের কাজি মাজদুদ্দিন নামায পড়ান। এই মসজিদে বসেই আমি তার কাছ থেকে দীর্ঘ সনদসহ ইমাম শাফেয়ী রহ. মুসনাদ গ্রন্থ শ্রবণ করেছি। ইমাম শাফেয়ী থেকে যথাক্রমে রবিহ বিন সুলাইমান আল মুরাদি, আবু আব্বাস বিন ইয়াকুব আল আসাম্ম, কাজি আবু বকর আহমাদ ইবনুল হাসান আল হারাশী, আবুল হাসান আল মাক্কি বিন মুহাম্মাদ বিন মানসুর বিন আল্লান আল উরাদি, যুরআ তাহির বিন মুহাম্মাদ বিন তাহির আল মাকদীসী, আবু আবদিল্লাহ আল হুসাইন বিন আবু বকর বিন মুবারক আজ জাবিদি এবং সর্বশেষে ওয়াজিরা বিনতে আমর বিন মানজা, এই সূত্রে তার কাছ থেকে আমরা এই গ্রন্থটি শ্রবণ করেছি। ইমাম আবুল ফাজায়িল আল হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন হাসান আস সাগানি রচিত মাশারিকুল আনওয়ার গ্রন্থটিও আমি এই মসজিদে বসে কাজি মাজদুদ্দিনের কাছ থেকে শ্রবণ করেছি। লেখক থেকে যথাক্রমে ইমাম নিজামুদ্দিন মাহমুদ বিন আমর আল হিরাবি, তার থেকে শায়খ জালালুদ্দিন আবু হাশিম মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল হাশিমি আল কুফির সূত্রে তিনি এই হাদীস গ্রন্থ শ্রবণ করেছেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য সমাধি হচ্ছে বুযুর্গ শায়খ জারকুবের সমাধি। এটির পাশে একটি খানকা নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে অতিথিদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

এই সকল সমাধির অবস্থান শহরের ভেতরে। এমনিভাবে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কবরের অবস্থান শহরের ভেতরেই। সিরাজের কোনো ব্যক্তির সন্তান, স্ত্রী অথবা অন্য কেউ মারা গেলে বাড়ির একটি অংশে তাকে কবর দেওয়া হয়। পুরো বাড়িজুড়ে লম্বা চাটাই বিছিয়ে মৃত ব্যক্তির মাথা ও পায়ের কাছে জ্বালানো হয় অনেকগুলো মোমবাতি। মৃত ব্যক্তির বাড়ির জন্য অত্যন্ত সরু একটি দরজা এবং লোহার জানালা তৈরি করা হয়। কারীগণ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করেন। আমার মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে সিরাজের অধিবাসীদের কুরআত তেলাওয়াত সবচেয়ে

সুন্দর। এভাবেই বাড়ির লোকেরা সমাধিতে চাটাই বিছিয়ে দেয় এবং সেখানে বাতি প্রজ্বলিত করে রাখে। কেমন যেন মৃত ব্যক্তির দুনিয়া থেকে প্রস্থান হয়নি। এও শুনেছি যে, তারা প্রতিদিন মৃত ব্যক্তির খাবারের অংশও রান্না করে। অতঃপর সেটুকু তার পক্ষ থেকে দান করে দেয়।

একটি ঘটনা

একদিন আমি সিরাজের এক বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে মজবুতভাবে নির্মিত চমৎকার মেঝেবিশিষ্ট একটি মসজিদ চোখে পড়ে। এর ভেতরে পবিত্র কুরআনের মুসহাফগুলোকে রেশমের ব্যাগের ভেতরে রেখে একটি আসনের উপর রাখা হয়েছে। মসজিদের উত্তরপ্রান্তে ছিল একটি কক্ষ, যার জানালা দিয়ে বাজারের দৃশ্য দেখা যায়। সেখানে অত্যন্ত সুদর্শন এবং সুন্দর পোশাক পরিহিত একজন শায়খ বসে কুরআন খুলে তেলাওয়াত করছিলেন। আমি তাকে সালাম জানিয়ে তার পাশে বসি। তিনি আমাকে আগমনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাকে তা জানাই। অতঃপর তাকে এই মসজিদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। তিনি জানান, এই মসজিদটির নির্মাতা তিনিই এবং এখানকার কারীগণ ও অন্যদের জন্য তিনি অনেক সম্পদ ওয়াকফ করেছেন। আর যে কক্ষটিতে তিনি বসে আছেন, আল্লাহ চাহেতু এই শহরে তার মৃত্যু হলে এখানেই তাকে কবর দেওয়া হবে। এরপর তিনি তার নিচ থেকে একটি কার্পেট উঠিয়ে দেখান কাঠের তক্তা দিয়ে সেই কবরকে ঢেকে রাখা হয়েছে। তার পাশে থাকা একটি সিন্দুক দেখিয়ে বলেন, এই সিন্দুকে আমার কাফনের কাপড়, মৃতদেহের জন্য ব্যবহৃত সুগন্ধি আর কিছু দিরহাম রয়েছে। এক ব্যক্তির কূপ খননের কাজ করে এই দিরহামগুলো উপার্জন করেছি। সেগুলোকে আমার দাফন-কাফনের খরচ হিসেবে রেখে দিয়েছি। আর অতিরিক্ত যা আছে সেগুলো আমি সদকা করে দিই। তার এই অবস্থা দেখে আমি খুবই মুগ্ধ ও বিস্মিত হই। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে আসার ইচ্ছে করলে সেই শায়খ আমাকে জোর করে বসিয়ে সেখানেই মেহমানদারি করান। সিরাজের বাইরেও বেশ কিছু বুযুর্গের সমাধি আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শায়খ সাদী নামক এক বুযুর্গের কবর।[১] তিনি ছিলেন নিজ সময়ে ফারসি ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবি। মাঝে মাঝে তার পঙ্‌ক্তিতে আরবি ভাষাও ব্যবহার করতেন তিনি। এর পাশেই একটি খানকা

---

[১] গুলিস্তা ও বোস্তার লেখক। যিনি আমাদের কাছে শেখ সাদী নামে পরিচিত।–অনুবাদক

রয়েছে। যা তিনি জীবদ্দশায় এখানে নির্মাণ করে গিয়েছিলেন। খানকার স্থাপনাটি খুবই সুন্দর। পাশেই রয়েছে মনোরম একটি বাগান। যার অবস্থান রুকনাবাদ নদীর তীরঘেঁষে। তিনি সেখানে কাপড় ধোঁয়ার জন্য মর্মর পাথরের ছোট ছোট কিছু হাউজও নির্মাণ করেছিলেন। লোকেরা শহর থেকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে তার আতিথেয়তা উপভোগ করত। এরপর নদী থেকে তাদের কাপড়চোপড় ধৌত করে নিয়ে যেত। আমিও সেখানে গিয়ে এমনটি করেছি। এখান থেকে কাছেই আরেকটি খানকা রয়েছে। যেটি শামসুদ্দিন আস সাম্মানি নামক একজন ব্যক্তির কবরের পাশে অবস্থিত। খানকার পাশেই একটি মাদরাসার নির্মাণ কাজ চলছে। শামসুদ্দিন আস সাম্মানি ছিলেন একজন ফকিহ ও সুলতানের সভাসদ। নিজ অসিয়ত অনুযায়ী তাকে এখানে সমাহিত করা হয়।

সিরাজের অন্যতম একজন ফকিহ হচ্ছেন শরিফ মাজদুদ্দিন। তার উদারতা দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। মাঝে মাঝে তিনি নিজের কাছে থাকা সবকিছু, এমনকি পরনের পোশাকটিও দান করে দিতেন। তারপর পুরনো তালিযুক্ত একটি পোশাক পরে থাকতেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে তাকে এই অবস্থায় দেখে তার পোশাকের ব্যবস্থা করতেন। সুলতানের পক্ষ থেকে তার জন্য দৈনিক পঞ্চাশ দিরহাম করে ভাতা বরাদ্দ ছিল। অতঃপর আমি কাজরুনে অবস্থিত শায়খ আবু ইসহাক আল কাজরুনির সমাধি জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সিরাজ থেকে বেরিয়ে পড়ি। এখান থেকে কাজরুনের দূরত্ব ছিল দুইদিনের সফর সমান। প্রথমদিনের সফর শেষে শুল নামক একটি এলাকায় অবতরণ করি। এখানে একদল অনারব পারসিক লোক বাস করে। তাদের মধ্যে বেশ কজন বুযুর্গ ব্যক্তিও রয়েছেন।

তাদের কোনো এক বুযুর্গের উদারতা

সিরাজের কোনো একটি মসজিদে একদিন যোহর নামাযের পর আমি কুরআন তেলাওয়াতের জন্য বসেছি। তখন মনে মনে ভাবলাম, যদি আমার ব্যক্তিগত একটি মুসহাফ থাকত, তাহলে আমি সেটি দেখে দেখে তেলাওয়াত করতে পারতাম। সে সময় একজন যুবক এসে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'এই নিন, ধরুন।' আমি মাথা উঁচিয়ে তার দিকে তাকাই। সে আমার কোলে একটি মুসহাফ রেখে সেখান থেকে চলে যায়। কুরআন তেলাওয়াত শেষ করে মুসহাফটি ফেরত দেওয়ার জন্য আমি যুবকের

অপেক্ষা করতে থাকি। কিন্তু তার ফিরে আসার কোনো নাম নেই। আমি লোকদের কাছে যুবকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা আমাকে জানায়, তার নাম বাহলুল আশ শুলী। এরপর আমি তাকে আর দেখিনি। সফরের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময়ে কাজরুনে পৌঁছেই আমি শায়খ আবু ইসহাকের খানকা জিয়ারত করার উদ্দেশে চলে যাই। সেই রাতে সেখানেই অবস্থান করি। সেখানে আগত সকল অতিথির জন্য গোশত, আটা ও ঘি দ্বারা তৈরি হারিসা নামক বিশেষ একপ্রকার খাবার ও পাতলা রুটির মাধ্যমে আপ্যায়ন করানো হয়। সেখানে পৌঁছার পর সবার জন্য ন্যূনতম তিনদিনের আতিথেয়তার ব্যবস্থা রয়েছে। এর আগে কাউকে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হয় না। কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে সেখানকার গদিনশিন শায়খকে জানানো হয়। তিনি সেখানে নিয়োজিত সেবকদের বললেই তারা ব্যবস্থা করে দেয়। এখানে এমন শতাধিক সেবক রয়েছে। তারা এখানে অবস্থান করে সারাদিন শায়খ আবু ইসহাকের সমাধির পাশে কুরআন তেলাওয়াত ও তাসবিহ-তাহলিলে মগ্ন থাকে। তাদের মধ্যে অনেকে বিবাহিত, আবার অনেক স্বেচ্ছায় চিরকুমারত্ব বরণ করেছে। শায়খ আবু ইসহাক ভারতবর্ষ ও চীনের অধিবাসীদের কাছে খুবই সম্মানিত ও শ্রদ্ধার পাত্র। যারা চীন সাগরে যাত্রা করে প্রতিকূল আবহাওয়ার মুখে পড়ে যায় এবং জলদস্যুদের হামলার আশঙ্কায় থাকে, তারা শায়খ আবু ইসহাকের নামে মানত করে। প্রত্যেকেই নিজের করা সেই মানত লিখে রাখে। অতঃপর নিরাপদে স্থলে পৌঁছানোর পর খানকার সেবকরা তাদের জাহাজে উঠে প্রত্যেক মানতকারীর কাছ থেকে তাদের মানতের বস্তু সংগ্রহ করে নেয়। এমন করে ভারতবর্ষ অথবা চীন থেকে আসা প্রতিটি জাহাজ থেকেই কমপক্ষে একহাজার দিনারের মতো সংগ্রহ হয়। খানকার খাদেমের প্রতিনিধিরা এসে সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। অনেক অসহায় ব্যক্তি শায়খের কাছ থেকে কিছু দান-সদকা নিতে। তাদের জন্য একটি কাগজে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংক প্রদানের কথা লিখে শায়খের রৌপ্যের সিলমোহরের মাধ্যমে লাল রঙের সিল মেরে দেওয়া হয়। কাগজের উপর সেই সিলের ছাপ অক্ষত থেকে যায়। শায়খের জন্য মানতকৃত সম্পদের ভান্ডারের দায়িত্বশীলের কাছ সেই কাগজ নিয়ে গেলে তিনি সেই পরিমাণ সম্পদ তাকে দিয়ে দেন। লোকদের অসহায়ত্বের দিকে লক্ষ্য করে একশ থেকে এক হাজার দিরহাম পর্যন্ত দেওয়া হয়ে থাকে। যাদের কাছে মানতকৃত বস্তু থাকে, তাদের কাছ থেকে সেটি গ্রহণ করে

একটি রসিদ লিখে দেওয়া হয়। একবার হিন্দুস্তানের সুলতান শায়খ আবু ইসহাকের জন্য দশ হাজার দিনার মানত করেছিলেন। খানকার সেবকদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তাদের একজন হিন্দুস্তানে এসে সেই সম্পদ নিয়ে পুনরায় খানকায় ফিরে যায়।

কাজরুন থেকে প্রস্থান করে এবার জায়দাইন শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। শহরের এই নামকরণের কারণ হচ্ছে, এখানে দুই আনসারি সাহাবি জায়েদ বিন সাবিত এবং জায়েদ বিন আরকাম রা.-এর কবর রয়েছে। শহরটি খুবই সুন্দর। অনেক বাগান ও জলাধারের সমারোহ রয়েছে এখানে। বাজারগুলো দেখতে বেশ মনোরম। মসজিদগুলোও মনোমুগ্ধকর। এখানকার অধিবাসীরা সৎ, বিশ্বস্ত ও ধার্মিক। তাদেরই একজন কাজি নুরুদ্দিন আজ জায়দানি। তিনি হিন্দুস্তানে চলে যান এবং সেখানে মালয় দ্বীপপুঞ্জের কাজি নিযুক্ত হন। অনেকগুলো দ্বীপের সমন্বয়ে এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হয়েছে। এখানকার শাসক ছিলেন জালালুদ্দিন বিন সালাহুদ্দিন সালিহ। কাজি নুরুদ্দিন এই শাসকের বোনকে বিয়ে করেন। তার এবং তার মেয়ে খাদিজা—যিনি জালালুদ্দিনের মৃত্যুর পর এই দ্বীপপুঞ্জের শাসক হয়েছিলেন—তাদের আলোচনা সামনে আসবে। সেখানেই কাজি নুরুদ্দিন জায়দানির মৃত্যু হয়। জায়দান থেকে আমরা হুয়াইজা শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। শহরটি বেশ ছোট। এখানে সব অনারব পারসিকদের বসবাস। এখান থেকে বসরা শহরের দূরত্ব মাত্র চার দিনের সফর পরিমাণ। আর কুফার দূরত্ব পাঁচদিনের সফর পরিমাণ। এখানকার সম্মানিত অধিবাসীদের একজন বুযুর্গ শায়খ জামালুদ্দিন আল হুয়াইজানি। তিনি কায়রোর 'সাইদুস সাআদা' খানকার শায়খ। এখান থেকে মরুর পথ ধরে আমরা কুফার উদ্দেশে যাত্রা করি। এই পথে শুধু আত তারফাওয়ি নামক জায়গায় পানি পাওয়া যায়। সফরের তৃতীয় দিন আমরা এখানে উপনীত হই। এখান থেকে পুনরায় যাত্রা করে দ্বিতীয় দিন আমরা কুফা শহরে পৌঁছাই।

কুফা শহরের বিবরণ

ইরাকের প্রধানতম শহরগুলোর একটি কুফা। অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি এখানে সমাহিত হয়েছেন। বসবাস করেছেন আরো অনেক আলেম ও আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণ। আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব রা.-এর পরশধন্য এই শহর। কিন্তু পার্শ্ববর্তী আরব গোত্র খাফাজার

লোকদের বিশৃঙ্খলা, সীমালঙ্ঘন ও ডাকাতির কবলে পড়ে শহরটি এখন বিরান প্রায়। শহরটির কোনো নগরপ্রাচীর নেই। ঘরবাড়িগুলো ইটের মাধ্যমে তৈরি। বাজারগুলো বেশ সুবিন্যস্ত। সেখানে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় খেজুর আর মাছ। শহরের পবিত্র জামে মসজিদটি খুবই বিশাল আয়তনের। খোদাইকৃত পাথরের খণ্ড একটি আরেকটির উপর বসিয়ে সিসার প্রলেপের মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত করে তৈরি করা দীর্ঘকায় মোটা মোটা স্তম্ভের উপর মসজিদের সাতটি করিডোর দাঁড়িয়ে আছে। এই মসজিদে বেশ কিছু পবিত্র স্থান রয়েছে। মসজিদের মিহরাবের পাশে ডানদিকে রয়েছে একটি ঘর। বলা হয়, এটি ছিল নবী ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আ.-এর ইবাদতগাহ। এর কাছেই টিক কাঠের খুঁটির মাধ্যমে নির্মিত উঁচু আরেকটি মিহরাব রয়েছে। আলী রা. এই মিহরাবে বসে খুতবা প্রদান করতেন। নরাধম ইবনে মুলজিম এখানেই তাকে আঘাত করে শহীদ করেছিল। লোকেরা এখানে নামায পড়ার জন্য। মসজিদের করিডোর একপ্রান্তে টিক কাঠের খুঁটির মাধ্যমে নির্মিত ছোট্ট আরেকটি মসজিদের মতো জায়গা রয়েছে। কথিত আছে, নুহ আ.-এর মহাপ্লাবনের সময় এখানেই চুলার নিচ থেকে পানি বেরিয়েছিল। মসজিদের পেছনদিকে বাইরের অংশে একটি ঘর রয়েছে। যেটিকে নুহ আ.-এর ঘর বলে ধারণা করা হয়। এর পাশেই আরেকটি ঘর রয়েছে, যেটিকে ইদরিস আ.-এর ইবাদতগাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এর পাশেই মসজিদের দক্ষিণদিকের দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে একটি উন্মুক্ত প্রান্তর। কথিত আছে, নুহ আলাইহিস সালাম এখানেই তার জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন। প্রান্তরের একেবারে শেষে রয়েছে আলী রা.-এর ঘর। যে ঘরে তাকে গোসল দেওয়া হয়েছে সেই ঘরটি। পাশেই আরেকটি ঘর রয়েছে, যেটিকে নুহ আ.-এর ঘর হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এসব তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। মসজিদ থেকে পূর্বদিকে উঁচু একটি ঘর রয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে সেটিতে আরোহণ করতে হয়। মুসলিম বিন আকিল রহ. এখানে সমাহিত হয়েছে। এর কাছেই মসজিদের বাইরের অংশে রয়েছে হুসাইন রা.-এর দুই মেয়ে আতিকা ও সুকাইনার কবর। আর সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. কুফায় যে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, এখন কেবল সেটির ভিত্তিমূলটুকু অক্ষত আছে। কুফা থেকে পূর্বদিকে অর্ধ ফারসাখ দূরত্বে ফোরাত নদী বয়ে চলছে। শহরটি পরস্পর সংলগ্ন নিরবচ্ছিন্ন খেজুর বাগান দিয়ে ঘেরা। কুফার সমাধিস্থল থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত খোলা জায়গার মাঝে খুবই কালো একটি

জায়গা দেখেছিলাম। পরে জানতে পারি হতভাগা ইবনে মুলজিমকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছে। কুফাবাসীরা প্রতিবছর একবার অনেক অনেক লাকড়ি নিয়ে এসে টানা সাত দিন ইবনে মুলজিমের কবরের স্থানে আগুন প্রজ্বলিত করে। এর কাছেই একটি ছাউনি রয়েছে। জানতে পারি মুখতার বিন আবি উবাইদ আস সাকাফির কবরের উপর এটি নির্মাণ করা হয়েছে।

অতঃপর কুফা থেকে যাত্রা করে আমরা বিরু মাল্লাহা নামক স্থানে উপনীত হই। এটি খেজুরবাগান বেষ্টিত অত্যন্ত সুন্দর ও পরিপাটি একটি শহর। আমরা শহরের বাইরেই অবস্থান নিই। এখানকার অধিবাসীরা উগ্র রাফেযি হওয়ার কারণে এর ভেতরে যাওয়া পরিহার করি। পরদিন সকালে এখান থেকে যাত্রা করে আমরা হিল্লা শহরে পৌঁছাই। ফোরাত নদীর তীরঘেঁষে অবস্থিত এই শহরটির আয়তন খুবই দীর্ঘ। শহর থেকে পূর্বদিকে ফোরাতের অবস্থান। এখানে আছে চমৎকার সুবিন্যস্ত বাজার। যেখানে প্রয়োজনীয় সবকিছুই পাওয়া যায়। শহরটিতে প্রচুর পরিমাণ লোকের বসবাস। পুরো শহরটি ভেতর ও বাইরে থেকে খেজুরবাগানের মাধ্যমে বেষ্টিত। খেজুরবাগানের ভেতরে ভেতরেই শহরটির বাড়িঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে বিরাট একটি সেতু রয়েছে। অনেকগুলো নৌকাকে পরস্পর একসঙ্গে বেঁধে নদীর দুই তীরে কাঠের প্রকাণ্ড স্তম্ভ গেঁথে সেটির সঙ্গে লোহার শিকল যুক্ত করে এই নৌকাগুলোকে বেষ্টন করে দেওয়া হয়েছে। এই শহরের অধিবাসীরা সবাই শিয়া ইসনা আশারিয়্যা ইমামিয়্যা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে আবার দুটি ভাগ। একভাগ পরিচিত কুর্দি নামে। আরেকভাগের নাম আহলুল জামিয়াইন বা দুই জামে মসজিদের অনুসারী। তাদের মাঝে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। শহরের বড় বাজারের নিকটে তাদের মাঝে লড়াই সংঘটিত হয়। এই শহরে একটি মসজিদ রয়েছে, যার দরজায় রেশমি কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মসজিদকে তারা সাহিবুজ্জামান[১]-এর সমাধি হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাদের একটি রীতি হচ্ছে, প্রতি রাতে তাদের মধ্য হতে একশ জন লোক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তরবারি হাতে নিয়ে পায়চারিতে বের হয়। এজন্য আসর নামাযের পর তারা শহরের গভর্নরের কাছে এসে তার কাছ থেকে লাগাম পরিহিত ও সজ্জিত

---

[১] শিয়াদের একটি পরিভাষা। তাদের বারোতম ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল আসকারিকে তারা এই উপাধি দিয়েছে।–অনুবাদক

একটি ঘোড়া অথবা খচ্চর নিয়ে যায়। তারপর সেই বাহনের সামনে তারা ঢোল-তবলা বাজাতে থাকে। এই বাহনের আগে থাকে পঞ্চাশজন। তাদের পেছনে ও ডানে-বায়ে আরো অনেক মানুষ তাদের অনুসরণ করে। তারা সাহিবুজ্জামানের কথিত সমাধির কাছে উপস্থিত হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলত, 'আল্লাহর নামে আপনি বেরিয়ে আসুন ওহে সাহিবুজ্জামান। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে। বেড়ে গেছে জুলুম-অত্যাচার। এখনই আপনার বেরিয়ে আসার সময়। আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করবেন। এভাবে তারা মাগরিব নামায পর্যন্ত ডাকতে থাকে। আর ঢোল-তবলার বাদ্য বাজাতে থাকে। তারা বলে, মুহাম্মাদ বিন হাসান আল আসকারি এই মসজিদের ভেতরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। অচিরেই তিনি বের হয়ে আসবেন। তিনিই তাদের প্রতীক্ষিত ইমাম। ইরাকের সুলতান আবু সাঈদের মৃত্যুর পর মক্কার গভর্নর মুহাম্মাদ বিন রুমাইসা বিন আবি নুমাই হিল্লা শহরের নিয়ন্ত্রণ দখল করে নিয়েছিল। বেশ কয়েকবছর সে এখানে শাসনও চালায়। সে ছিল সদাচারী। ইরাকবাসীদের মুখে তার প্রশংসা শুনা যায়। অতঃপর ইরাকের পরবর্তী সুলতান শায়খ হাসান তাকে বন্দী করে শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এরপর তাকে হত্যা করে তার সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ দখল করে নেন। কুফা থেকে প্রস্থান নিয়ে আমরা হুসাইন রা. সমাধিস্থল ঐতিহাসিক কারবালার উদ্দেশে যাত্রা করি। ফোরাত নদীর তীরের ঘন খেজুরবাগানবেষ্টিত ছোট্ট একটি শহর কারবালা। হুসাইন রা.-এর পবিত্র সমাধিটি শহরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিরাট একটি মাদরাসা। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একটি খানকা। যেখানে আগত মেহমানদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। সমাধির দরজায় টহলরত প্রহরী বাহিনী রয়েছে। তাদের অনুমতি ব্যতীত কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। ভেতরে প্রবেশ করে দর্শনার্থীরা সমাধির রৌপ্যনির্মিত চৌকাঠে চুমো দেয়। সমাধির উপরে স্বর্ণ ও রূপার তৈরি বেশ কয়েকটি প্রদীপদানি রয়েছে। দরজাগুলোতে ঝুলানো হয়েছে রেশমি কাপড়ের পর্দা। এই শহরের অধিবাসীরাও দুইভাগে বিভক্ত। একদল রখিকের বংশধর। আরেকদল ফায়িজের বংশধর। তাদের মধ্যেও সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকে। এরা সকলেই শিয়া ইমামিয়্যা মতাদর্শী। তাদের পূর্বপুরুষ একই। তাদের এই বিশৃঙ্খলার কারণে কারবালা শহরটি এখন প্রায় ধ্বংসের মুখে। অতঃপর কারবালা থেকে প্রস্থান নিয়ে আমরা বাগদাদের উদ্দেশে যাত্রা করি।

বাগদাদ শহরের বিবরণ

শান্তি ও শৃঙ্খলার শহর বাগদাদ। মুসলিমবিশ্বের রাজধানী। সুনাম-সুখ্যাতি ও সম্মানে অদ্বিতীয়। বহু খলিফা সমাহিত হয়েছেন এই শহরের মাটিতে। হাজারো আলেমের নিবাস এই ভূমি। আবুল হাসান বিন জুবাইর রহ. বলেন, প্রাচীন এই শহরটি যদিও এখনো আব্বাসি খেলাফতের রাজধানী এবং কুরাইশ বংশীয়দের নেতৃত্বের কেন্দ্র হিসেবে অব্যাহত আছে, তবুও এই শহর এখন প্রায় জৌলুসহীন হয়ে পড়েছে। এখন শুধু বাগদাদ নামটিই এই শহরের সোনালি ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে আছে। কালের বিপর্যয়ের মুখোমুখি হওয়ার আগে শহরটির যে জমজমাট অবস্থা ছিল, তার সঙ্গে তুলনা করলে বর্তমানের বাগদাদকে মনে হবে বিলুপ্ত ধ্বংসাবশেষ। যার সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন মুছে গিয়েছে। অথবা মনে হবে কোনো ভূতুড়ে নগরী। এমন কোনো সৌন্দর্য শহরের বুকে অক্ষত নেই, যা দেখে চোখ আটকে যাবে। হতবিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকার মতো কোনো দুর্লভ দৃশ্যও চোখে পড়ে না এখানে। সৌন্দর্য বলতে এটুকুই, শহরটির পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝে দজলা নদী তার আঁচল বিছিয়ে আছে। যেন তা দুটি ফ্রেমে বাঁধা উজ্জ্বল এক আয়না অথবা রমণীর বক্ষযুগলের মধ্য দিয়ে বিছিয়ে রাখা মুক্তোর মালা। এই নদী আছে বলেই বাগদাদ শহরকে তৃষ্ণার যন্ত্রণা পোহাতে হয় না। মরীচিকাহীন স্বচ্ছ আয়নার মতো এই নদীর জলরাশি। বাগদাদের হাওয়া আর জলে যেন এখানকার নারীদের সৌন্দর্যগাথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ইবনে জুজাই বলেন, কবি আবু তাম্মাম হাবিব তার নিজ চোখে এই শহরের শেষ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে বলেছিলেন,

বাগদাদে নেমে এসেছে মৃত্যুর নিঠুর ঘোষক
কাঁদো মন, কালের ধুলোয় বিধ্বস্ত হওয়া এই শহরের তরে,
তার জলরাশিতে বিপন্ন হয়ে যেত যুদ্ধের দামামা
আর তার অলিগলিতে নিভে যেত বিদ্রোহের শিখা,
আশা ছিল আবার আসবে ফিরে সেই গৌরবময় দিন
সেই আশার প্রাসাদে আজ বিরাজ করছে নৈরাশ্যের হাহাকার,
বাগদাদ এখন বিগত যৌবনা অশীতিপর বৃদ্ধার মতো
হারিয়ে গেছে তার ভুবনমোহিনী সেই রূপসুষমা।

বাগদাদের প্রশংসা ও সৌন্দর্যের বিবরণ দিতে গিয়ে রচিত হয়েছে শত শত কবিতা। তার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তারা লিখে গেছেন লাইনের পর লাইন।

তাকে নিয়েই কাজি আবু মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহহাব বিন আলী ইবনে নাসর আল মালিকি আল বাগদাদী লিখে গেছেন কালজয়ী পঙ্‌ক্তি। যা আমার সম্মানিত পিতার কাছ থেকে বেশ কবার শুনার সৌভাগ্য হয়েছে। আল্লাহ তার প্রতি দয়াশীল হোন।

বাগদাদের উৎকৃষ্ট সুঘ্রাণ আমায় মোহিত করে
আবদ্ধ করে রাখে তার বাহুডোরে
যদিও ভাগ্যলিপি ঘটায় প্রতিবন্ধকতা,
আজ আমি তাকে কী করে ছেড়ে যাই
অথচ এখন তার বুকে দুই ঘ্রাণের সমাহার।
কাজি আবু মুহাম্মাদ আরো লিখেছেন,
প্রতিটি নিবাস থেকে বাগদাদকে জানাই সালাম
আরো দ্বিগুন সালাম এখনো রয়ে গেছে বাকি,
খোদার কসম, তার প্রতি বিরূপ হিয়ে আমি করিনি প্রস্থান
তার দুই তীরেই আমার হৃদয়ে বেঁধে রাখি,
কিন্তু তা প্রশস্ত হয়েও আমার জন্য হয়ে গেছে সংকীর্ণ
সেখানে ছিল না আমার ভাগ্যলিপির কোনো প্রতিকার
সে ছিল প্রেমাস্পদের মতো, যাকে কাছে পেতে ছিলাম ব্যাকুল
কিন্তু তার স্বভাব ছিল তার রূপের বিপরীত।

বাগদাদের প্রতি রুষ্ঠ হয়েও তিনি পঙ্‌ক্তি লিখেছেন। এটিও আমার পিতা আমাকে অনেকবার শুনিয়েছেন।

বাগদাদ সম্পদশালীদের উদারচিত্তে বরণ করে নেয়
আর দরিদ্রদের জন্য হয়ে উঠে আবদ্ধ ও সংকীর্ণ,
কতইনা হেঁটেছি তার অলিগলিজুড়ে
নিজেকে তখন মনে হয়েছে জিন্দিকের ঘরে থাকা কুরআনের মতো।

কাজি আবুল হাসান আলী ইবনুন নাবিহ বাগদাদকে নিয়ে লেখেন,

ইরাকের বুকে সে যেন পূর্ণিমার চাঁদ
আঁধার চিড়ে বের হওয়া দ্বিপ্রহরের প্রখর আলো,
ধীরে ধীরে তাকে ব্যাপ্ত করে নেয় বাগদাদের মিষ্টি ঘ্রাণ
ভ্রমণের ক্লান্তি না থাকলে সে বুঝি আনন্দে উড়েই যেত তখন,
আমার মনে পড়ে যায় কারখের তৃণভূমির উদ্যানের কথা

যার সতেজতা আর নির্মল জলধারা শেষ হয় ন কখনো,
সে যেন ধারণ করে নিয়েছে মুহাওওয়াল পাহাড়ের ফুলের সৌন্দর্য
আর আলোকিত হয়েছে তাজ পাহাড়ের শিখরের শিখরের সূর্যের কিরণে।
বাগদাদের কোনো এক নারী এই শহরের স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন,
মনে পড়ে বাগদাদের কথা, মনে পড়ে যায় ইরাক
মনে পড়ে সেথাকার হরিণ, তাদের জাদুময় চোখ,
ফোরাতের তীরঘেঁষে তারা সন্তর্পণে হেঁটে চলে
নতুন চাঁদের মতো ভেসে উঠে তাদের মুখচ্ছবি।

বাগদাদে হিল্লা শহরের মতো বেঁধে রাখা দুইটি সেতু রয়েছে। দিন-রাত অবিরাম লোকেরা তার উপর দিয়ে যাতায়াত করে। এভাবেই নিরবচ্ছিন্নভাবে সেতু দুটির উপকার ভোগ করে। বাগদাদে এগোরোটি জামে মসজিদ রয়েছে। যেগুলোতে জুমার নামায পড়ানো হয় ও খুতবা দেওয়া হয়। এর মধ্য হতে শহরের পশ্চিমপ্রান্তে রয়েছে আটটি মসজিদ আর পূর্বপ্রান্তে রয়েছে তিনটি মসজিদ। এছাড়াও আরো অসংখ্য ছোট ছোট মসজিদ রয়েছে। এমনিভাবে এখানে বিপুল পরিমাণ মাদরাসাও রয়েছে। তবে সেগুলোর বেশিরভাগই এখন বিরান পড়ে আছে। বাগদাদে অনেক গোসলখানাও রয়েছে, যেগুলো দেখতে বেশ নজরকাড়া। এগুলোর অধিকাংশেই আলকাতরার মাধ্যমে প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। দূর থেকে দেখে মনে হয় এগুলো কালো মার্বেল পাথরের মাধ্যমে তৈরি। কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী খনি এই আলকাতরা সংগ্রহ করা হয়। সেখান থেকে অনবরত আলকাতরা আহরণ করা হয়। সেগুলো কাদার মতো খনির একপাশে জমে থাকে। সেখান থেকে উঠিয়ে এরপর বাগদাদে রপ্তানি করা হয়। প্রতিটি গোসলখানাতেই রয়েছে অনেকগুলো কক্ষ। সবগুলো কক্ষের মেঝেতেই রয়েছে আলকাতরার প্রলেপ এবং দেয়ালের নিচের অর্ধেকটাও আলকাতরা প্রলেপযুক্ত। আর উপরের অর্ধাংশ সাদা চুনের প্রলেপযুক্ত। এভাবে সেখানে দুইটি বিপরীত রঙকে একত্র করা হয়েছে। প্রতিটি কক্ষের ভেতরে রয়েছে একটি মার্বেল পাথরের হাউজ। প্রতিটি হাউজে রয়েছে দুটি করে পাইপ। একটি দিয়ে বের হয় গরম পানি, অন্যটি দিয়ে বের হয় ঠান্ডা পানি। একটি কক্ষে একজন করে লোক প্রবেশ করতে পারে। প্রতিটি কক্ষের একপ্রান্তে গোসল করার জন্য মার্বেল পাথরের আরেকটি হাউজ রয়েছে। তাতেও গরম ও ঠান্ডা পানির দুইটি পাইপ রয়েছে। কক্ষে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের তিনটি

করে রুমাল দেওয়া হয়। একটি পরিধান করে ভেতরে প্রবেশ করার সময়। একটি পরিধান করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে। আর তৃতীয় রুমালটি দিয়ে সে গোসলের পর তার শরীর মুছে নেয়। আমি বাগদাদ ব্যতীত অন্য কোনো শহরে এমন বিস্তৃত আয়োজন দেখিনি। তবে কিছু শহরে এর কাছাকাছি ব্যবস্থা রয়েছে।

বাগদাদের পশ্চিমপ্রান্তের বিবরণ

বাগদাদের পশ্চিমপ্রান্তই প্রথমে আবাদ করা হয়েছিল। বর্তমানে এর অধিকাংশই বিরান হয়ে গেছে। শুধুমাত্র তেরোটি মহল্লা অক্ষত আছে। প্রতিটি মহল্লাই যেন একেকটি শহর। সবকটিতেই দু-তিনটি করে হাম্মাম তথা গোসলখানা রয়েছে। আটটিতে রয়েছে জামে মসজিদ। একটি মহল্লার বাব আল বসরা। সেখানে খলিফা আবু জাফর মানসুর নির্মিত জামে মসজিদ ও হাসপাতাল রয়েছে। বাব আল বসরা ও আশ শারি মহল্লার মাঝামাঝি দজলা নদীর তীরঘেষে নির্মিত বিশাল একটি প্রাসাদে হাসপাতালটির অবস্থান। তবে প্রাসাদটি এখন ভগ্ন প্রায়। এর ধ্বংসাবশেষটাই কেবল মাটির বুকে উঁকি দিয়ে আছে। এই পশ্চিমপ্রান্তে বেশ কিছু প্রসিদ্ধ সমাধি। তন্মধ্যে অন্যতম প্রখ্যাত বুযুর্গ মারুফ কারখী রহ.-এর সমাধি। এটি বাব আল বসরা মহল্লায় অবস্থিত। এই মহল্লায় যাওয়ার পথে চমৎকার স্থাপনাবিশিষ্ট আরেকটি সমাধি রয়েছে। যার ভেতরের কবরটি বেশ উঁচু ও প্রশস্ত। সেখানে পাথরের ফলকে লেখা আছে, এটি আলী রা.-এর সন্তান আওন-এর কবর। এই প্রান্তেই মুসা আল কাযিম ইবনে জাফর আস সাদিক রহ.-কে কবর দেওয়া হয়েছে। তার পাশেই রয়েছে আল জাওয়াদের কবর। এই দুটি কবরের অবস্থান একটি সমাধিকক্ষের ভেতরে। এর উপরে রূপার ফলকযুক্ত কাঠের তক্তার আবরণ দেওয়া হয়েছে।

বাগদাদের পূর্বপ্রান্তের বিবরণ

এই পূর্বপ্রান্তটিই এখন জমজমাট। এখানে রয়েছে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও চমৎকারভাবে বিন্যস্ত কয়েকটি বাজার। সবচেয়ে বড় বাজারটি সুক আস সুলাসা নামে পরিচিত। সেখানে প্রতিটি শিল্পের জন্য আলাদা আলাদা দোকানের সারি রয়েছে। এই বাজারের মাঝেই প্রসিদ্ধ মনোমুগ্ধকর নেযামিয়া মাদরাসার অবস্থান। যা তার সৌন্দর্যে প্রবাদতুল্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

আর বাজারের শেষপ্রান্তে আল মাদরাসাতুল মুসতানসিরিয়্যাহর অবস্থান। খলিফা আল মুসতানসির বিল্লাহ এটি নির্মাণ করেছেন। এই মাদরাসা চার মাযহাবের অনুসারীদেরই শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি মাযহাবের অনুসারীদের জন্য একটি করে নির্দিষ্ট ভবন রয়েছে। সেই ভবনে মসজিদ, ক্লাসরুম ও হলরুম সবই রয়েছে। শিক্ষকগণের জন্য রয়েছে কাঠের ছাউনিযুক্ত চেয়ারের ব্যবস্থা। সেগুলোর উপর গদি বিছানো হয়। শিক্ষকরা কালো কাপড় ও পাগড়ি পরিধান করে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সাথে আরামদায়কভাবে সেই চেয়ারে বসে দরস প্রদান করেন। তার ডানে-বামে দুজন সহকারী নিযুক্ত থাকেন। তিনি যা বলেন, তারা দুজন সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন। চার মাযহাবের প্রতিটি শ্রেণীকক্ষই এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই মাদরাসার ভেতরে তালিবে ইলমদের জন্য গোসলখানা ও অযুখানা রয়েছে। বাগদাদের এই পূর্বপ্রান্তে তিনটি জামে মসজিদ রয়েছে। যেগুলোতে জুমার নামায আদায় করা হয়। একটি খলিফার জামে মসজিদ। এটির অবস্থান খলিফার প্রাসাদের সঙ্গে। মসজিদটি বেশ বড়। এর মাঝে অযু ও গোসলের জন্য অনেকগুলো হাউজ ও কক্ষ রয়েছে। এই মসজিদেই ইরাকের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য আলেম শায়খ সিরাজুদ্দিন আবু হাফস উমর বিন আলী বিন উমর আল কাজবীনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য হয়। এখানে আমি তার কাছ থেকে আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন ফজল ইবনে বাহরাম আদ দারেমীর মুসনাদ গ্রন্থের পুরোটা শ্রবণ করেছি। ৭২৭ হিজরির রজব মাসে আমার এই সৌভাগ্য হয়। তিনি শায়খ আদ দারেমী থেকে যথাক্রমে আবু ইমরান ইসা বিন উমর বিন আব্বাস আস সমরকন্দি, আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হামাওয়িহ আস সারাখসী, আবুল হাসান আবদুর রহমান বিন মুজাফফর আদ দাউদী, আবুল ওয়াক্ত আবদুল আউয়াল বিন শুআইব আস সানজারি আস সুফি, আবু বকর মুহাম্মাদ বিন মাসউদ বিন বাহারজুর আত তাবিব আল মারিসতানি থেকে সর্বশেষ বিনতুল মুলুক ফাতিমা বিনতে আদল তাজুদ্দিন আবুল হাসান আলী বিন আলী বিন আবিল বাদর-এর সূত্রে এই হাদীস গ্রন্থটি বর্ণনা করেন। দ্বিতীয় জামে মসজিদটির নাম জামে আস সুলতান। এটির অবস্থান শহরের বাইরে। সেখানে মসজিদের পাশেই রয়েছে সুলতানী প্রাসাদ। তৃতীয় মসজিদটির নাম জামে আর রুসাফা। জামে আস সুলতান ও এই মসজিদের মধ্যকার দূরত্ব এক মাইল।

বাগদাদে খলিফা, আলেম ও বুযুর্গদের কবরের বিবরণ

আব্বাসি খলিফাদের কবরগুলোর অবস্থান রুসাফায়। প্রতিটি কবরের পাশেই ফলক স্থাপন করে তাতে সমাহিত খলিফার নাম লেখা হয়েছে। খলিফা মাহদী, আল হাদী, আল আমিন, আল মু'তাসিম, আল ওয়াসিক, আল মুতাওয়াক্কিল, আল মুনতাসির, আল মুস্তাইন, আল মু'তাজ্জ, আল মুহতাদি, আল মু'তামিদ, আল মু'তাযিদ, আল মুকতাফি, আল মুতি লিল্লাহ, আত তায়ি, আল কায়িম, আল কাদির, আল মুসতাযহির, আল মুসতারশিদ, আর রাশিদ, আল মুক্বতাফি, আল মুসতানজিদ, আল মুসতাজি, আন নাসির, আয যাহির, আল মুসতানসির এবং সর্বশেষ খলিফা আল মুসতাসিম এখানে সমাহিত হয়েছেন। আল মুসতাসিমের খেলাফতকালেই তাতাররা বাগদাদে আক্রমণ চালায় এবং তারা শহরে প্রবেশের কয়েকদিনের মধ্যেই খলিফা আল মুসতাসিমকে নির্দয়ভাবে জবাই করে হত্যা করে। এর মধ্য দিয়েই বাগদাদের আকাশ থেকে ইসলামি খেলাফতের সূর্য চিরতরে বিদায় নেয়। ইতিহাসের নৃশংসতম এই ট্রাজেডি ঘটেছিল ৬৫৪ হিজরিতে।[১] রুসাফার নিকটেই সমাহিত হয়েছেন ইমাম আবু হানিফা রহ.। তার সমাধির উপর নির্মাণ করা হয়েছে বিশাল একটি গম্বুজ। সেখানে একটি খানকাও নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে আগত দর্শনার্থীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে বাগদাদ শহরে একমাত্র এই খানকাতেই মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা রয়েছে। সেই সত্তা কতইনা মহান, যিনি নিমিষেই সবকিছুর পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। আবু হানিফা রহ.-এর সমাধির কাছেই রয়েছে আরেক জগদ্বিখ্যাত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর কবর। তার কবরের কোনো গম্বুজ বা ছাউনি নির্মাণ করা হয়নি। লোকমুখে শুনা যায়, বেশ কবার তার কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতে প্রতিবারই অলৌকিকভাবে ভেঙে গেছে। বাগদাদের অধিবাসীদের কাছে তার কবর অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানিত। এখানকার অধিকাংশ লোকই তার মাযহাবের অনুসারী। এখান থেকে কাছেই বিখ্যাত কজন সুফি ও আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের কবর রয়েছে। যথাক্রমে, আবু বকর শিবলি, সির আস সাকাতি, বিশর হাফি, দাউদ আত তায়ি এবং আবুল কাসিম জুনাইদ (জুনাইদ বাগদাদী) রহ.। বাগদাদের অধিবাসীরা প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে

---

[১] সঠিক তারিখ হচ্ছে ৬৫৬ হিজরি মোতাবেক ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ।–অনুবাদক

একদিন এক বুযুর্গের কবর জিয়ারত করেন। পরদিন আরেক বুযুর্গের কবর জিয়ারত করেন। এভাবে সপ্তাহের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা নিয়ম করে সব বুযুর্গেরই কবর জিয়ারত করেন। বাগদাদে এমন অসংখ্য আল্লাহওয়ালা আলেম ও বুযুর্গ সমাহিত হয়েছেন। বাগদাদের এই পূর্বপ্রান্তে কোনো ফলমূলের গাছ নেই। সকল প্রকার গাছপালার বাগান ও উদ্যানের সমাহার শহরের পূর্বপ্রান্তে। সেখান থেকে এখানে ফলমূলে নিয়ে আসা হয়। আমি যখন বাগদাদে পৌছাই, ঘটনাক্রমে ইরাকের সুলতানও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এখন তার কথা উল্লেখ করব।

দুই ইরাক ও খোরাসানের সুলতানের বিবরণ

তার নাম সুলতান আবু সাঈদ বাহাদুর খান। খান শব্দের অর্থ হচ্ছে রাজা বা বাদশাহ। তিনি সুলতান মুহাম্মাদ খোদাবান্দার পুত্র। তিনি মূলত ছিলেন তাতার। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার নামের উচ্চারণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ তার নাম খোযাবান্দাও বলে থাকেন। বান্দা শব্দটি নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। এই নামের অর্থ হয় আল্লাহর বান্দা। কারণ, ফারসি ভাষায় খোদা বা খোযা শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা। আর বান্দা শব্দের অর্থ হচ্ছে গোলাম। কারো কারো মতে, তার নাম খারুবান্দা। ফারসি ভাষায় খারু শব্দের অর্থ হচ্ছে গাধা। এই হিসেবে তার নামের অর্থ হবে গাধার গোলাম। দুই মতের মধ্যে কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য! তবে শেষোক্ত মতটিই অধিক প্রসিদ্ধ। প্রথম নামটি হয়তো ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে পালটে ফেলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তার নাম খারুবান্দা রাখার কারণ হলো, তাতারদের রীতি ছিল কোনো বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে, তার নামে সদ্যভূমিষ্ঠ বাচ্চার নাম রাখা হবে। এই সুলতান জন্ম নেওয়ার পর প্রথম প্রবেশ করে একজন গাধাচালক। তারা গাধাচালককে বলত খারুবান্দা। ব্যস, সুলতানের কাঁধেও এই নাম পড়ে গেল। এই খারুবান্দার ভাইয়ের নাম ছিল কাজগান। যেটিকে লোকেরা কাজান উচ্চারণ করে থাকে। কাজগান শব্দের অর্থ হচ্ছে রান্না করার ডেগ। তার এই নামকরণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তার জন্মের সময় এক দাসী ডেগ নিয়ে প্রবেশ করেছিল। সেজন্য তাকে এই নাম দেওয়া হয়েছে। সুলতান খোযাবান্দা ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণ, ইসলাম গ্রহণের পর লোকদের জোরপূর্বক রাফেযিদের মতবাদে দীক্ষিত করা, অতঃপর কাজি

মাজদুদ্দিনের সঙ্গে তার ঘটনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মৃত্যুর পর রাজ্যের ক্ষমতাগ্রহণ করেন তার পুত্র আবু সাঈদ বাহাদুর খান। তিনি ছিলেন অল্পবয়সী, উদারপ্রাণ ও সদাচারী একজন শাসক। বাগদাদে আমি তাকে দেখেছি। দেখতে অত্যন্ত সুদর্শন। গালে কোনো পশমের চিহ্ন ছিল না। সে সময় তার উজির ছিলেন আমির গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ বিন খাজা রশিদ। তার পিতা ছিলেন একজন অভিবাসী ইহুদি। সুলতান খোদাবান্দার সময়েই তিনি উজির হিসেবে নিযুক্ত হন। একদিন আমি সুলতান ও উজিরকে দজলা নদীর বুকে একটি নৌযানে দেখতে পাই। এই নৌযান তাদের কাছে শাব্বারা নামে পরিচিত। তখন তাদের সামনে ছিলেন সুলতান আবু সাঈদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা মন্ত্রী জুবানের পুত্র দিমাশক খাজা। তাদের ডানে-বায়ে ছিল আরো দুটি শাব্বারা। যেগুলোতে গায়ক, বাদক ও নর্তকীরা অবস্থান করছিল। সেদিন আমি সুলতানের উদারতার একটি কীর্তি প্রত্যক্ষ করি। অন্ধদের একটি দল তার কাছে এসে তাদের দুর্দশার অভিযোগ করলে তিনি তাদের প্রত্যেকের জন্য পোশাক, হাঁটাচলার জন্য একটি গোলাম এবং তাদের খরচের জন্য ভাতা বরাদ্দ করে দেন। সুলতান আবু সাঈদ ক্ষমতাগ্রহণের পর বয়সে ছোট হওয়ায় মন্ত্রীপরিষদের প্রধান জুবান তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তার ব্যয়কে সীমাবদ্ধ করে দেয়। আবু সাঈদ তখন শুধু নামমাত্র সুলতান হিসেবে থাকেন। এও শোনা যায়, কোনো এক ঈদে খরচ করার জন্য সম্পদের প্রয়োজন হলে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ লাভের কোনো উপায় তার হাতে ছিল না। তখন এক ব্যবসায়ীর কাছে এ কথা জানিয়ে দূত প্রেরণ করলে সেই ব্যবসায়ী তাকে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ প্রদান করেন। এভাবেই দিন যেতে থাকে। একদিন সুলতান আবু সাঈদের সৎ মা দুনিয়া খাতুন তার কাছে এসে বলেন, আমরা যদি পুরুষ হতাম, তাহলে জুবান আর তার ছেলে যা করে বেড়াচ্ছে, তা কখনোই হতে দিতাম না। আবু সাঈদ দুনিয়া খাতুনকে এই কথার জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, জুবানের পুত্র দিমাশক খাজার সীমালঙ্ঘন এতই বেড়েছে যে, সে এখন তোমার পিতার স্ত্রীদেরকেও অসম্মান করছে। গতরাত সে তুগা খাতুনের কাছে কাটিয়েছে। আজ আমার কাছে সংবাদ পাঠিয়ে বলেছে, আজ রাত সে আমার কাছে কাটাতে চায়। এখন তোমার একমাত্র করণীয় মন্ত্রী ও সৈনিকদের একত্র করা। তারপর সে যখন রাত্রিযাপনের জন্য নিভৃতে দুর্গে চলে যাবে, তখন তুমি তাকে গ্রেফতার করে নিবে। আর তার পিতার বিষয়ে

আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট হবেন। সে সময় মন্ত্রী জুবান ছিলেন খোরাসানে। দুনিয়া খাতুনের এই কথা শুনে সুলতান আবু সাঈদের আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠে। কীভাবে কী করা যায়, এই নিয়ে তিনি চিন্তা করতে থাকেন। দিমাশক খাজা দুর্গে গিয়েছে এই মর্মে জানতে পেরে তিনি মন্ত্রীপরিষদ ও সৈন্যদের নির্দেশ দেন তাকে চারদিক থেকে ঘিরে নিতে। পরদিন দিমাশক খাজা আল হাজ আল মিশরি নামক এক সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গ থেকে বের হতে গিয়ে দেখে দুর্গের দরজায় শিকল দিয়ে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাই দিমাশক খাজার জন্য ঘোড়ায় চড়ে বের হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। আল হাজ আল মিশরি তখন তরবারি দিয়ে শিকলে আঘাত করে তা ছিন্ন করে ফেলে। অতঃপর দুজন একসঙ্গে দুর্গ থেকে বের হতেই তাদেরকে সৈনিকরা ঘেরাও করে ফেলে। মিসর খাজা নামক একজন দেহরক্ষী প্রধান এবং লুলু নামক একজন যুবক এসে তাদের দুজনকে হত্যা করে তাদের মাথা আবু সাঈদের কাছে নিয়ে আসে। আবু সাঈদ তাদের মাথা তার ঘোড়ার সম্মুখে নিক্ষেপ করেন। চরম শত্রুদের সঙ্গে তারা এমনটিই করে থাকে। এরপর সুলতান দিমাশক খাজার ঘর লুট করার নির্দেশ দেন। তার কোনো খাদেম অথবা গোলাম এতে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদেরকেও হত্যা করে ফেলতে বলেন। খোরাসানের অবস্থানরত জুবানের কাছে পুত্রহত্যার এই সংবাদ পৌঁছে যায়। সেখানে তার সঙ্গে জ্যেষ্ঠপুত্র মীর হাসান এবং অপর দুই পুত্র তালিশ ও জালু খানও উপস্থিত ছিল। জালু খান ছিল জুবানের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। সুলতান আবু সাঈদের বোন সাতি বেকের গর্ভে তার জন্ম। সেখানে জুবানের সঙ্গে তার রক্ষীবাহিনী এবং বেশকিছু তাতার সেনাবাহিনীও উপস্থিত ছিল। তারা সবাই মিলে সুলতান আবু সাঈদের সঙ্গে লড়াই করার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। দুইবাহিনী মুখোমুখি হলে তাতার বাহিনী সুলতান আবু সাঈদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জুবানকে একাকী অবস্থায় দেয়। এ দেখে জুবানের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে। সে পালিয়ে সিজিস্তানের গভীর মরু এলাকায় চলে যায়। অতঃপর সে হেরাতের বাদশাহ গিয়াসুদ্দিনের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার ইচ্ছা করে। পূর্বে কোনো একসময়ে জুবান গিয়াসুদ্দিনের উপকার করেছিলেন। কিন্তু জুবানের দুই পুত্র মীর হাসান ও তালিশ তার এই প্রস্তাবে সম্মত হয় না। তারা বলে, এই গিয়াসুদ্দিন কোনো অঙ্গীকার পূর্ণ করে না। ফিরোজ শাহ তার কাছে আশ্রয় নেওয়ার পর সে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু জুবান তার সংকল্পে অনড় থাকে। তার দুই পুত্র তাকে

ছেড়ে চলে যায়। এদিকে জুবান কনিষ্ঠ জালু খানকে নিয়ে চলে যায় গিয়াসুদ্দিনের রাজ্য হেরাতের উদ্দেশে। গিয়াসুদ্দিন তাকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে বের হন। সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক তার সামনে খালি পায়ে হাঁটেন। অতঃপর নিরাপত্তার সাথে তাকে হেরাত শহরে নিয়ে আসেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই বিশ্বাসঘাতকতা করে গিয়াসুদ্দিন জুবান ও তার কনিষ্ঠ সন্তানকে হত্যা করে তাদের মুণ্ডু সুলতান আবু সাঈদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এদিকে মীর হাসান ও তালিশ চলে যায় খাওয়ারিজমের সুলতান মুহাম্মাদ উজবেকের কাছে। তিনি তাদের জন্য উত্তম আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু একসময় তারা এমন অপরাধ করে বসে, যার অনিবার্য শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ফলে তাদেরকে হত্যা করা হয়। জুবানের দুমুরতাশ নামক আরেকটি পুত্র ছিল। সে পালিয়ে মিসরে চলে যায়। সেখানকার সুলতান আল মালিকুন নাসির তাকে সম্মান জানিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার ক্ষমতা প্রদান করতে চান। কিন্তু দুমুরতাশ তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে আমি আবু সাঈদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিতে চাই। আল মালিকুন নাসির যখন দুমুরতাশের উদ্দেশ্যে সম্মানসূচক পোশাক প্রেরণ করেন, তখন দামারতাশ আল মালিকুন নাসিরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার জন্য সেই পোশাকের বাহককে অপেক্ষাকৃত উত্তম পোশাক প্রদান করেন এবং এমন আচরণ করেন, যা তার মৃত্যুদণ্ডকে অনিবার্য করে। ফলে তাকেও হত্যা করে তার মাথা সুলতান আবু সাঈদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমরা ইতিপূর্বে তার এবং কারা সুনকুরের মধ্যকার একটি ঘটনা উল্লেখ করেছি। এরপর জুবান ও তার দুই পুত্রের লাশকে মক্কায় আরাফার ময়দানে নেওয়া হয়। অতঃপর মদিনায় নেওয়া হয় জুবানের নিজ হাতে নির্মিত সমাধিতে তাকে দাফন করার জন্য। কিন্তু এটি করতে নিষেধ করা হলে শেষে তাকে বাকিউল গারকাদে দাফন করা হয়। এই জুবানই পবিত্র মক্কা নগরীতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করার পর সুলতান আবু সাঈদ জুবানের মেয়েকে বিয়ে করতে চান। অনিন্দ্য সুন্দরী সেই মেয়ের নাম ছিল বাগদাদ খাতুন। তার বিয়ে হয়েছিল শায়খ হাসানের সঙ্গে। এই শায়খ হাসান আবু সাঈদের মৃত্যুর পর রাজত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। সে ছিল সুলতান আবু সাঈদের ফুফাত ভাই। সুলতান আবু সাঈদের নির্দেশে শায়খ হাসান বাগদাদ খাতুনকে তালাক প্রদান করে। অতঃপর আবু সাঈদ তাকে বিয়ে করেন। আবু সাঈদ

অন্য স্ত্রীদের তুলনায় তাকেই বেশ প্রাধান্য দিত। তুর্কি এবং তাতারদের মাঝে তাদের স্ত্রীরা খুবই ক্ষমতাশালী হয়ে থাকে। তারা কোনো ফরমান লিখলে সেটিতে সুলতানের সঙ্গে তার স্ত্রীদের কথাও উল্লেখ করে দেয়। প্রতি স্ত্রীর অধীনে অনেক শহর, প্রাদেশিক অঞ্চল এবং বিপুল পরিমাণ রাজস্বের নিয়ন্ত্রণ থাকে। সুলতানের সঙ্গে সফর করার সময় তার স্ত্রীর জন্য আলাদা তাঁবুও বরাদ্দ থাকে। বাগদাদ খাতুন সুলতান আবু সাঈদকে মোহাবিষ্ট করে নেয়। আবু সাঈদ অন্য স্ত্রীদেরকে ছেড়ে বাগদাদ খাতুনকে নিয়েই মজে থাকতে পছন্দ করতেন। এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবু সাঈদ দিলশাদ নাম্নী অপর এক নারীকে বিয়ে করেন এবং নিজেকে তার ভালোবাসায় উজাড় করে দেন। বাগদাদ খাতুন হয়ে পড়েন ব্রাত্য। এতে বাগদাদ খাতুনের মনে দাউদাউ করে ক্ষোভের অনল জ্বলে উঠে। সে রুমালের মধ্যে বিষ মাখিয়ে রাখে। তার সঙ্গে সঙ্গম করার পর সুলতান সেই রুমাল দিয়ে শরীর মুছে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে বেশ বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের আমির ও মন্ত্রীরা তখন স্বাধীনভাবে শাসন চালাতে থাকে। যার বিবরণ সামনে উল্লেখ করা হবে।

একসময় আমির ও মন্ত্রীরা জানতে পারে বাগদাদ খাতুন সুলতানকে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত করে হত্যা করেছে। তখন তারা সবাই মিলে বাগদাদ খাতুনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। এই কাজের জন্য তারা খাজা লুলু নামক বিশিষ্ট আমিরকে নির্বাচিত করে। গোসলখানায় থাকাকালীন অবস্থায় বাগদাদ খাতুনকে হত্যা করা হয়। বেশ কিছুদিন তাকে সেখানেই ফেলে রাখা হয়। এ সময় শুধু একটি কাপড়ের টুকরোর মাধ্যমে তার সতর ঢাকা ছিল। এরপর শায়খ হাসান ইরাকের একচ্ছত্র শাসনক্ষমতা লাভ করে সুলতান আবু সাঈদের রূপসী স্ত্রী দিলশাদকে বিয়ে করেন। যেমনিভাবে সুলতান আবু সাঈদ তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন।

সুলতান আবু সাঈদের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখলকারীদের বিবরণ

তাদের একজন আবু সাঈদের ফুফাতো ভাই শায়খ হাসান। যার আলোচনা মাত্রই অতিবাহিত হলো। তিনি সমগ্র ইরাকে আরব অঞ্চলের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। আরেকজন হলেন ইবরাহিম বিন আমির সুনাইতা। তিনি দখল করেছিলেন মসুল ও দিয়ারবাকির অঞ্চল। আরেকজন হলেন

আমির আরতানা। তিনি দখল করেছিলেন তুর্কমানদের অধ্যুষিত অঞ্চল। যা বিলাদুর রোম অর্থাৎ রোমীয় অঞ্চল নামেও পরিচিত। আরেকজন হাসান খাজা বিন দুমুরতাশ বিন জুবান। তিনি দখল করেছিলেন তাবরিজ, আস সুলতানিয়া, হামাদান, কুম, কাশান, রায়, ওয়ারামিন, ফারগানা এবং আল কারাজ অঞ্চল। আমির তুগাইতিমুর দখল করেন খোরাসানের কিছু অংশ। আমির হাসান বিন আমির গিয়াসুদ্দিন দখল করেন হেরাত ও খোরাসানের অধিকাংশ। মালিক দিনার দখল করেন মাকরান ও কিজ অঞ্চল। মুহাম্মাদ শাহ বিন মুজাফফর দখল করেন ইয়াজদ, কিরমান ও ওয়ারকু অঞ্চল। মালিক কুতুবুদ্দিন তামতাহান দখল করেন হুরমুজ, কিশ, কাতিফ, বাহরাইন ও কালহাত অঞ্চল। সুলতান আবু ইসহাক (যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) দখল করেন সিরাজ, ইস্পাহান এবং ফারস রাজত্ব। সবমিলিয়ে তার রাজত্বের দৈর্ঘ্য ছিল পঁয়তাল্লিশ দিনের সফর পরিমাণ। আর সুলতান আফরাসিয়াব আতাবেক দখল করে ইজেহ ও অন্যান্য অঞ্চল। যার বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(এখন আমরা আগের কথায় ফিরে যাই) বাগদাদ থেকে বের হয়ে আমরা সুলতান আবু সাঈদের মহল্লার উদ্দেশে গমন করি। আমার উদ্দেশ্য ছিল সুলতান আবু সাঈদের জীবনাচার লক্ষ্য করা। তিনি যখন এখানে অবস্থান করেন তখন কেমন জীবনাচার অবলম্বন করেন আর কোথাও সফরে যাওয়ার সময় অথবা যুদ্ধের উদ্দেশে যাওয়ার সময় কী করেন এবং কেমন প্রস্তুতি নেন, তা মনোযোগ দিয়ে দেখা। তারা সাধারণত ভোরের আলো ফুটে উঠার সময় যাত্রা করে। অতঃপর পূর্বাহ্নের সময় তারা বিশ্রামের জন্য অবতরণ করে। তাদের বিন্যাস হচ্ছে, প্রথমে প্রত্যেক আমির তার বাহিনী ও বাদক দল ও পতাকাবাহী দল নিয়ে ডানে বা বায়ে নির্দিষ্ট একটি স্থানে এসে দাঁড়ান। সেখান থেকে একটুও নড়েন না। এভাবে সবাই এসে উপস্থিত হলে ও তাদের কাতার পূর্ণ হয়ে গেলে সুলতান তার বাহনে উঠে বসেন। তখন যাত্রার সময়ের বাধ্য বাজানো হয়। এরপর প্রতিজন আমির এসে সুলতানকে সালাম জানিয়ে পুনরায় তার নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে যান। এরপর সুলতানের দেহরক্ষী ও সেনানায়করা সামনে এগিয়ে যায়। বাদক দল তাদের অনুসরণ করে। তাদের সদস্য সংখ্যা একশজনের মতো। সুলতানের বাহন থাকে তাদের পেছনেই। বাদক দলের সম্মুখে থাকে গায়ে তবলা ঝুলানো দশজন অশ্বারোহী। আরো পাঁচজন অশ্বারোহীর কাছে থাকে সুরনায়াতি নামক

একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। যা আমাদের কাছে গাইতা নামে পরিচিত। তারা সেই তবলা ও সুরনায়াতির বাদ্য বাজায়। তারা থামলে আসে অপর দশজনের পালা। এভাবে পালা করে মোট দশবার বাদ্য বাজানো শেষ হলে তারা বিশ্রামের জন্য অবতরণ করে। যাত্রার সময় সুলতানের ডানে-বায়ে প্রায় পঞ্চাশজন বিশিষ্ট আমির থাকেন। তার পেছনে থাকে পতাকাবাহী ও বাদকদের দল। এরপর থাকে সুলতানের ক্রীতদাসদের দল। তারপর অন্যান্য আমিরগণ তাদের স্তর অনুযায়ী অবস্থা করেন। প্রত্যেকে আমিরের সঙ্গেই পতাকাবাহী ও বাদকদল থাকে।

এই পুরো বিন্যাসের দায়িত্বে থাকেন সেনাপ্রধান। তার সঙ্গে থাকে বড় একটি দল। কেউ তার বাহিনী বা দল থেকে পিছিয়ে গেলে শাস্তি হিসেবে তাদের জুতো নিয়ে নেওয়া হয়। অতঃপর বিরতি নেওয়া পর্যন্ত তাদেরকে খালি পায়ে হাঁটানো হয়। বিরতির সময় তাকে সেনাপ্রধানের কাছে হাজির করা হয়। তার চেহারা মাটির দিকে দিয়ে পিঠে পঁচিশটি বেত্রাঘাত করা হয়। উচ্চস্তরের হোক বা নিম্নস্তরের, সবার জন্য একই শাস্তি। এক্ষেত্রে তারা কাউকেই সামান্য ছাড় দেয় না। বিশ্রামের সময় সুলতান ও তার ক্রীতদাসরা আলাদা ছাউনিতে অবস্থান নেয়। সুলতানের প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য আলাদা আলাদা তাঁবু বরাদ্দ থাকে। প্রত্যেকের জন্যই ইমাম, মুয়াযযিন, কারী ও বাজারের লোক নিয়োগ করা হয়। উজির, কেরানি ও অন্যদের জন্য পৃথক ছাউনি বরাদ্দ থাকে। এছাড়াও প্রত্যেক আমিরের জন্য থাকে পৃথক পৃথক ছাউনি। আসর নামাযের পর সবাই নিজ দায়িত্বে লেগে পড়েন এবং ইশার নামাযের পর তারা পুনরায় যাত্রার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। তখন তাদের সম্মুখে থাকে মশালধারী বাহিনী।

রওনা করার সময় চলে এলে বিরাটাকারের একটি তবলা বাজানো হয়। এরপর প্রথমে রানি তথা সুলতানের প্রধান স্ত্রীর তবলা বাজানো হয়। তারপর একে একে বাজানো হয় অন্য স্ত্রীদের তবলা। এরপর বাজানো হয় প্রধান উজিরের তবলা। তারপর একসঙ্গে অন্য উজিরদের তবলা বাজানো হয়। অতঃপর অগ্রবাহিনীর অধিনায়ক ও তার বাহিনী তাদের বাহনে উঠে বসে। তাদের পরেই সুলতানের স্ত্রীগণ বাহনে চড়েন। এরপর যথাক্রমে সুলতানের আসবাবপত্র অতঃপর তার স্ত্রীদের আসবাবপত্র বাহনে উঠানো হয়। আসবাবপত্র উঠানোর সময় দায়িত্বরত লোকদের ছাড়া অন্য কারো সেখানে যাওয়ার অনুমতি নেই। এরপর ধীরে ধীরে অন্য সবাই তাদের বাহনে উঠে

যাত্রা শুরু করে। আমি দশদিন এই মহল্লায় অবস্থান করি। তারপর আমির আলাউদ্দিন মুহাম্মাদের সঙ্গে তাবরিজ শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। আমির আলাউদ্দিন একজন সম্মানিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। দশদিনের সফর শেষে আমরা তাবরিজ শহরে পৌঁছাই। শহরের উপকণ্ঠে আশ শাম নামক একটি জায়গায় আমরা অবস্থান করি। ইরাকের সুলতান কাজানকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছে। একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি চমৎকার মাদরাসা। আছে খানকা। যেখানে আগত দর্শনার্থীদেরকে রুটি, গোশত, ঘিয়ে ভাজা ভাত ও মিষ্টান্নের মাধ্যমে আপ্যায়ন করানো হয়। আমির আলাউদ্দিন এই খানকায় আমার থাকার ব্যবস্থা করেন। খরস্রোতা নদী আর ঘন গাছপালার মাঝে এই খানকার অবস্থান।

পরদিন সকালে আমরা বাগদাদ ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশ করি। প্রথমেই উপনীত হই বিশাল একটি বাজারে। যা সুকু কাজান বা কাজানের বাজার নামে পরিচিত। এ যেন পৃথিবীর বুকের সবচেয়ে সুন্দর ও সুবিন্যস্ত বাজার। প্রতিটি শ্রেণীর পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা দোকানের সারি নির্দিষ্ট রয়েছে। একশ্রেণীর পণ্যের দোকানের সঙ্গে আরেক শ্রেণীর দোকান মিশ্রিত হয় না। অলংকারের দোকানসারির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকালে হরেক রকমের অলংকারের সমাহার দেখে বিস্ময়ে আমার চোখ উলটে যাওয়ার দশা। চমৎকার পোশাক ও রেশমি কাপড়ের ব্যাজ পরিহিত সুশ্রী চেহারার কিছু গোলাম এই সকল অলংকার পাহারায় নিয়োজিত আছে। তারা ব্যবসায়ীদের সামনেই তুর্কি মহিলাদের কাছে অলংকার খুলে খুলে দেখাচ্ছিল। আর তুর্কি নারীরাও একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সেই অলংকার কিনে নিচ্ছিল। সবমিলিয়ে এটি ছিল ফেতনামুখর এক পরিবেশ। যা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাইতে হয়। এরপর প্রবেশ করে সুগন্ধির বাজারে। সেখানেও একইরকম বা আরো খারাপ পরিস্থিতি দেখতে পাই। এরপর চলে যাই উজির আলী শাহ নির্মিত জামে মসজিদে। যিনি জিলান নামে পরিচিত। মসজিদের বাইরে কেবলামুখী মিহরাবের ডানদিকে একটি মাদরাসা রয়েছে। আর এর বামে রয়েছে একটি খানকা। মসজিদের মেঝেতে বিছানো হয়েছে মর্মর পাথর আর দেয়াল সজ্জিত করা হয়েছে কাশানি কারুকার্যের মাধ্যমে। যা দেখতে মাগরিব অঞ্চলের জেলিজ কারুকার্যের মতো। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি নদী। এখানে রয়েছে হরেক রকম গাছপালা, আঙুরের ঝাঁকা আর জেসমিন গাছের সমারোহ। প্রতিদিন আসর নামাযের পর তারা মসজিদ

প্রাঙ্গণে সূরা ইয়াসিন, সূরা ফাতহ, আর আম্মা পারা তেলাওয়াত করে থাকে। শহরের সব মানুষ এই আমলে অংশগ্রহণ করে। তাবরিজে আমরা একরাত অবস্থান করি। পরদিন আমির আলাউদ্দিনের কাছে সুলতানের পক্ষে থেকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ এলে আমিও তার সঙ্গে ফিরে আসি। কোনো আলেমের সঙ্গে তাবরিজে আমার সাক্ষাৎ হয়নি।

অতঃপর সফর করে আমরা সুলতানের মহল্লায় পৌছাই। আমির আলাউদ্দিন আমাকে সুলতানের কাছে গিয়ে তাকে আমার অবস্থান সম্পর্কে জানান। সুলতান আমাকে আমার দেশের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করেন। পোশাক ও বাহন উপহার দেন। আমির আলাউদ্দিন তাকে জানান, আমি পবিত্র হেজাজের ভূমিতে সফর করতে ইচ্ছুক। সুলতান তখন আমার জন্য পাথেয়, সফরের বাহন এবং প্রয়োজনীয় সামান প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে বাগদাদের আমির খাজা মারুফকে নির্দেশনা দিয়ে একটি চিঠিও লিখে দেন। তারপর আমি বাগদাদে ফিরে আসি এবং সুলতান যা যা নির্দেশ করেছেন সবকিছুই বুঝে পাই। তখনো সফর শুরু করার দুই মাস বাকি। তাই আমি এই ফাঁকে মসুল ও দিরারবাকির অঞ্চল ঘুরে আসার চিন্তা করি। হেজাজ সফরের সময় যখন ঘনিয়ে আসবে, তখন বাগদাদে ফিরে আসব। বাগদাদ থেকে যাত্রা করে দুজাইল নদীর তীরে এক জায়গায় বিরতি নিই। এটি দজলার শাখা নদী। এখান থেকে নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলোতে পানি সরবরাহ করা হয়। দুইদিন পর হারবা নামক বড় একটি গ্রামে অবতরণ করি। গ্রামটি বেশ উর্বর ও প্রশস্ত। সেখান থেকে যাত্রা করে দজলা নদীর পাড়ে নির্মিত আল মাশুক নামক দুর্গের কাছাকাছি স্থানে আমরা বিরতি নিই। এই দুর্গের পূর্ব দিকে তাকালে দেখা প্রসিদ্ধ সুররা মান রা শহর। যাকে সামাররা অথবা সামরাহ নামেও ডাকা হয়। ফারসি ভাষায় রাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে পথ। তাই সামরাহ শব্দের অর্থ হয় শামের পথ। শহরটি এখন বিলুপ্ত প্রায়। এর খুব অল্প অংশই এখন অক্ষত আছে। এই কালের অনেক দুর্যোগের শিকার হওয়া সত্ত্বেও শহরটি এখনো তার যৌবনের অনিন্দ্য সৌন্দর্যের সাক্ষ্য বহন করে। তার আবহাওয়াও বেশ চমৎকার। হিল্লা শহরের মতো এখানেও সাহিবুজ্জামানের সমাধি রয়েছে। এরপর এক মারহালা পরিমাণ সফর করে আমরা তিকরিত শহরে চলে আসি। এটি বেশ প্রশস্ত ও বড় একটি শহর। এখানে আছে চমৎকার কিছু বাজার এবং অনেক মসজিদ। এখানকার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দর। শহরের

উত্তর দিক দিয়ে বয়ে গেছে প্রসিদ্ধ দজলা নদী। নদীর তীরেই শহরের সুরক্ষিত দুর্গটির অবস্থান। শহরের স্থাপনাগুলো বেশ প্রাচীন। চারদিক দিয়ে শহরকে বেষ্টন করে নেওয়া নগরপ্রাচীরও রয়েছে এখানে। অতঃপর পুনরায় সফর শুরু করে দুই মারহালা অতিক্রম করে আমরা দজলার পাড়ের আল আকর নামক বড় একটি পল্লীতে এসে নামি। এর উচ্চপ্রান্তে একটি টিলা রয়েছে। যেখানে পূর্বে একটি দুর্গ অবস্থিত ছিল। আর টিলার পাদদেশেই রয়েছে খান আল হাদিদ নামক প্রসিদ্ধ একটি সরাইখানা। এই সরাইখানার স্থাপনাটি অত্যন্ত মজবুত ও নান্দনিক। এর উপর টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। এখান থেকে মসুল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন গ্রাম ও জনবসতি রয়েছে। অতঃপর দজলার তীরের নিকটবর্তী আল কাইয়ারা নামক গ্রামে অবতরণ করি। সেখানে আলকাতরার খনিবিশিষ্ট বিস্তীর্ণ একটি কালো জায়গা রয়েছে। আলকাতরা সংরক্ষণ করার জন্য সেখানে অনেকগুলো হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। হাউজগুলোতে যখন আলকাতরা এনে রাখা হয়, সেগুলোকে দেখতে ধূসর বর্ণের পিচ্ছিল কাদার মতো মনে হয়। তবে এর ঘ্রাণটি বেশ সুন্দর। আলকাতরার খনিগুলোকে ঘিরে বিশাল পুকুরের মতো রয়েছে। যার উপরে কালো রঙের পাতলা শৈবালের মতো কিছু ভেসে উঠে। এগুলো পুকুরের একপাশে সরে গিয়ে আলকাতরায় পরিণত হয়। এখান থেকে কাছেই অপেক্ষাকৃত বড় আরেকটি খনি রয়েছে। এখান থেকে আলকাতরা সংগ্রহ করার সময় এর ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আগুনের তাপে তখন আলকাতরার আদ্রতা দূর হয়ে সেগুলো জমে যায়। তারপর সেগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো করে সংগ্রহ করা হয়। ইতিপূর্বে বসরা ও কুফার মধ্যবর্তী আলকাতরার খনির আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর খনিবিশিষ্ট এই স্থান থেকে সফর করে দুই মারহালা অতিক্রম করার পর আমরা মসুল শহরে এসে উপনীত হই।

মসুল শহরের বিবরণ

অত্যন্ত প্রাচীন, উর্বর ও সমৃদ্ধ শহর মসুল। এখানকার প্রসিদ্ধ আল হাদবা দুর্গ তার বিশালতা ও দুর্ভেদ্যতায় বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করেছে। দুর্গটি ঘিরে নির্মাণ করা হয়েছে উঁচু টাওয়ার বিশিষ্ট মজবুত প্রাচীর। এর পাশেই সুলতানের প্রাসাদের অবস্থান। শহরের উচ্চপ্রান্ত থেকে নিম্নপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ ও প্রশস্ত একটি সড়ক এই দুর্গ ও প্রাসাদকে মূল শহর থেকে আলাদা

করেছে। শহরে মোট দুইটি মজবুত প্রাচীর রয়েছে। দুটিতেই রয়েছে কাছাকাছি অবস্থানে নির্মিত অনেকগুলো টাওয়ার। প্রাচীরের দেয়ালের সঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে অনেকগুলো কক্ষ। যার একটির উপর আরেকটির অবস্থান। কক্ষগুলোর ভেতরটা বৃত্তাকার এবং দরজাও বেশ প্রশস্ত। ফলে তা বেশ সহজেই খোলা যায়। এর আগে শুধু দিল্লীর নগরপ্রাচীরেই আমি এমন দৃশ্য দেখেছিলাম। মসুলের শহরতলীটিও অত্যন্ত বিশাল ও সমৃদ্ধ। সেখানে অনেক মসজিদ, গোসলখানা এবং বাজারে অনেক হোটেল রয়েছে। সেখানে দজলার তীরে লোহার প্রাচীরঘেরা একটি জামে মসজিদ রয়েছে। লোহার প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে কিছু তেপায়া। সেখানে বসে উপভোগ করা দজলার হৃদয়ছোঁয়া মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। এর সামনেই রয়েছে একটি হাসপাতাল। শহরের অভ্যন্তরে রয়েছে আরো দুইটি জামে মসজিদ। একটি প্রাচীন ও আরেকটি সাম্প্রতিক সময়ে নির্মিত। নতুন মসজিদটির প্রাঙ্গণে একটি গম্বুজ স্থাপন করা হয়েছে। যার ভেতরে মার্বেল পাথরের একটি খুঁটির উপর মার্বেল পাথরের ছোট্ট একটি হাউজ স্থাপন করা হয়েছে। এখান থেকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে পানি বের হয়ে প্রায় একপুরুষ পরিমাণ উপরে উঠে যায়। যা চমৎকার এক দৃশ্যের সৃষ্টি করে। মসুলের ব্যবসায়ীদের মার্কেটটিও বেশ চমৎকার। এতে লোহার দরজা ব্যবহার হয়েছে। এর ভেতরে রয়েছে অনেকগুলো দোকান ও কক্ষ। যেগুলোকে একটির উপর আরেকটি এমন করে অত্যন্ত মজবুতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এই শহরেই নবী জরজিস আলাহিস সালামের সমাধির অবস্থান।[১] এটি কেন্দ্র করে নির্মাণ করা হয়েছে একটি মসজিদ। তার একপ্রান্তে কবরের অবস্থান। যা মসজিদের প্রবেশকালে ডানদিকে তাকালে চোখে পড়ে। শহরের নতুন মসজিদ এবং বাব আল জিসর ফটকের মাঝে এই সমাধির অবস্থান। এই সমাধি জিয়ারত করে মসজিদে নামায পড়ার সৌভাগ্য হয় আমাদের। এজন্য আল্লাহ তাআলার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। নবী ইউনুস আ. যে পাহাড়ে অবস্থান করতেন, এই শহরের ছিল সেই পাহাড়ের অবস্থান। মসুল থেকে একমাইল দূরে ইউনুস আ.-এর নামের একটি ঝরনা রয়েছে। জানা যায়, তিনি তার জাতিকে এই ঝরনার পানিতে পবিত্রতা অর্জন করতে বলেন। অতঃপর পাহাড়ের উপরে উঠে তারা সম্মিলিতভাবে দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর থেকে আযাব দূর করে দেন। সেই ঝরনা থেকে নিকটেই রয়েছে বড় একটি গ্রাম। গ্রাম থেকে কাছেই চোখে পড়ে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত

---

[১] তিনি নবী ছিলেন কি না এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।–অনুবাদক

অঞ্চল। ধারণা করা হয়, এটিই ইউনুস আ.-এর শহর নিনুয়া। শহরটির প্রাচীর ও ফটকের স্থানের ধ্বংসাবশেষ এখনো স্পষ্ট। এই পাহাড়ে বিশাল একটি ইমারত রয়েছে। যেটি মূলত রিবাত তথা অসহায় লোকদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর ভেতরে অনেকগুলো ঘর, কক্ষ এবং পবিত্রতা অর্জন ও পানি পানের স্থান রয়েছে। এই পুরো ইমারতের দরজা মাত্র একটি। এর মধ্যখানে রেশমি কাপড়ের পর্দাঘেরা একটি ছাউনি রয়েছে। যার একটি সুসজ্জিত দরজা রয়েছে। বর্ণিত আছে, ইউনুস আ. এই জায়গাটিতেই অবস্থান করতেন। আর এই ছাউনির মিহরাব সম্পর্কে বলা হয়, এখানে ইউনুস আ. ইবাদত করতেন। মসুলের লোকেরা প্রতি শুক্রবার রাতে এখানে এসে ইবাদত-বন্দেগী করে। মসুলের অধিবাসীরা নির্মল চরিত্রশোভা ও কোমল বাচনভঙ্গির অধিকারী। আগন্তুকদের প্রতি তারা অনেক আন্তরিক ও মনোযোগী। আমি যখন মসুলে যাই তখন শহরের আমির ছিলেন সাইয়িদ আলাউদ্দিন আলী বিন শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ। হায়দার ছিল তার উপাধি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও বহুগুণের অধিকারী একজন ব্যক্তি। তার গৃহে নিয়ে গিয়ে তিনি আমার আতিথেয়তা করেছেন এবং তার কাছে যতদিন অবস্থান করেছি ততদিন আমার প্রয়োজনীয় খরচাদির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি অনেক দান-সদকা করে থাকেন এবং তার অনেক অবদান রয়েছে।

সুলতান আবু সাঈদ তাকে অনেক সম্মান করেন। তাই তার হাতে মসুল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসনভার ন্যস্ত করেছেন। তার অশ্বারোহী দাস ও সৈন্যদের মাধ্যমে সজ্জিত বিশাল শোভাযাত্রায় তিনি আরোহণ করেন। শহরের গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তাকে এসে সালাম জানায়। তিনি বেশ প্রতাপশালী ও আধিপত্যের অধিকারী। এই লেখাটি যখন লিখছি, তার ছেলে তখন অবস্থান করছেন ফেজ শহরে। যেখানে রয়েছে অসহায়দের আশ্রয়স্থল। বিভিন্ন জাতির নিবাস এবং অভিযাত্রী দলের বিশ্রামস্থল। আমাদের মহান সুলতানের[১] উসিলায় আল্লাহ তাআলা এই শহরকে আরো আলোকিত ও সমৃদ্ধ করুন। তার প্রতিটি প্রান্ত ও কোণকে করুন নিরাপদ।

মসুল থেকে পুনরায় শুরু হয় আমাদের যাত্রা। আইনুর রাসাদ নামক একটি গ্রামে এসে আমরা যাত্রাবিরতি করি। গ্রামটির অবস্থান একটি নদীর তীরে।

---

[১] সুলতান আবু আল্লাম।

নদীর উপরে নির্মাণ করা হয়েছে একটি সেতু। এখানে রয়েছে বড় একটি সরাইখানা। সেখান থেকে যাই আল মুওয়াইলিহা নামক একটি গ্রামে। তারপর অবতরণ করি জাযিরাতু ইবনে উমর (Cizre)[১] শহরে। শহরটি বেশ বড় ও সুন্দর। উপত্যকাবেষ্টিত হওয়ার কারণে এটির নাম দেওয়া হয়েছে জাযিরা তথা দ্বীপ। শহরের অধিকাংশই এখন বিরান পড়ে আছে। এখানে রয়েছে বেশ চমৎকার একটি বাজার। রয়েছে প্রাচীনকালে নির্মিত পাথরের মজবুত একটি মসজিদ। শহরের প্রাচীরটিও পাথরের তৈরি। এখানকার অধিবাসীরা সজ্জন ও ভদ্র। আগন্তুক মুসাফিরদের তারা খুবই যত্ন করেন। এখানে অবতরণের দিন আমরা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত জুদি পাহাড় অবলোকন করি।[২] যে পাহাড়ে এসে নুহ আ.-এর জাহাজ থেমে গিয়েছিল। এটি বেশ উঁচু ও দীর্ঘকায় একটি পাহাড়।

অতঃপর দুই মারহালা অতিক্রম করে আমরা নাসিবিন[৩] শহরে পৌঁছাই। এটি মধ্যমাকৃতির বেশ প্রাচীন ও বিশাল একটি শহর। যার অধিকাংশই এখন বিলুপ্তির মুখে। দিগন্তবিস্তৃত প্রশস্ত এক ভূখণ্ডের মাঝে শহরটির অবস্থান। এখানে রয়েছে প্রবহমান জলধারা, ঘন ঘন বাগান, নিরবচ্ছিন্ন গাছপালা এবং প্রচুর ফলমূলের সমাহার। এখানে গোলাপজল প্রস্তুত করা হয়। উৎকৃষ্ট সুগন্ধির দিকে দিয়ে তার জুড়ি মেলা ভার। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সরু একটি নদী। যা নিকটবর্তী পাহাড়ি এক ঝরনা থেকে সৃষ্ট হয়ে অলংকারের মতো শহরটিকে বেষ্টন করে রেখেছে। নদীটি বেশ কিছু শাখায় বিভক্ত হয়ে পৌঁছে গেছে শহরের বাগানগুলোর কাছে। আরেকটি শাখা মূল শহরের দিকে চলে গিয়ে মহাসড়ক ও ঘরবাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শহরের বিশাল জামে মসজিদের চত্বরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দুইটি হাউজে গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছে। একটি হাউজের অবস্থান মসজিদ প্রাঙ্গণের মাঝামাঝি। আরেকটির অবস্থান পূর্বদিকের ফটকের কাছে। এখানে একটি হাসপাতাল ও দুইটি

---

[১] তুরস্কের আনাতোলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সিরনাক প্রদেশের একটি জেলা শহর।–অনুবাদক

[২] আয়াতটি এই, وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ابْلَعِي مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ অতঃপর বলা হলো, 'হে জমিন! তোমার পানি গিলে ফেলো, আর হে আকাশ, থেমে যাও।' অতঃপর পানি জমিনে বসে গেল, কার্য সমাপ্ত হলো, নৌকা জুদী পর্বতে এসে ভিড়ল, আর বলা হলো, 'অত্যাচারীরা ধ্বংস হোক!' [সূরা হুদ : ৪৪]

[৩] বর্তমান নাম নুসাইবিন। তুরস্কের মারদিন প্রদেশে অবস্থিত।–অনুবাদক

মাদরাসা রয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা ভদ্র, সজ্জন, ধার্মিক, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। কবি আবু নাওয়াস সত্যিই বলেছেন,

'একদিন নাসিবিন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিল, আমিও হয়েছিলাম তার প্রতি প্রসন্ন। হায়! যদি পৃথিবীর অংশ থেকে নুসাইবিন আমার ভাগ্যে জুটত!'

ইবনে জুজাই বলেন, লোকেরা নাসিবিন শহরের অস্বাদু পানি এবং অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার কথা বলে থাকে। এ নিয়ে কোনো এক কবি বলেন,

কতইনা অদ্ভূত এই নাসিবিন

সবকিছুই যেন জানায় সাদর আমন্ত্রণ,
কিন্তু টকটকে লাল গোলাপটিও
এখানে ধূসর সাদা বর্ণে ছেয়ে যায়।

অতঃপর আমরা সিনজার শহরে পৌঁছাই। বিশাল আয়তনের এই শহরটিতে প্রচুর ফলমূল, গাছপালা, প্রবহমান জলধারা ও নদীনালার সমাহার। পাহাড়ের পাদদেশে শহরটি নির্মাণ করা হয়েছে। নদীনালা ও বাগানের প্রাচুর্যের দিক দিয়ে এই শহরের সঙ্গে দামেস্কের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। শহরের জামে মসজিদটির বরকতের কথা সুপ্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই মসজিদে দোয়া করলে কবুল করা হয়। মসজিদের পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে মসজিদ প্রাঙ্গণকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে। সিনজারের অধিবাসীরা কুর্দি জাতির। তারা যেমন বীর, তেমনি উদারপ্রাণ। সেখানে বেশ কজন বুযুর্গের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাদের একজন হলেন দুনিয়াবিমুখ আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিত্ব শায়খ আবদুল্লাহ আল কুরদি। তিনি অনেক কারামতের অধিকারী। তার ব্যাপারে জানা যায়, তিনি টানা চল্লিশদিন পর একবার ইফতার করেন। সেই ইফতারি হয় একটিমাত্র রুটির অর্ধেকটা দিয়ে। সিনজারের পাহাড়ের উঁচুতে নির্মিত খানকায় আমি তার সান্নিধ্যের সৌরভ পাই। তিনি আমার জন্য দোয়া করেন। পাথেয়স্বরূপ কিছু দিরহামও হাদিয়া প্রদান করেন। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে, হিন্দুস্তানি একদল ছিনতাইকারী কাফেরের কবলে পড়ে আমি সেগুলো হারিয়ে ফেলি। সিনজার থেকে যাত্রা করে চলে যাই দারা শহরে। এটিও বেশ প্রাচীন ও বড় একটি শহর। চারদিকে তাকালে চোখে পড়ে অপার শুভ্রতা। এখানে রয়েছে উঁচু একটি দুর্গ। শহরটি বর্তমানে বিরান। অভ্যন্তরে নেই কোনো জনবসতি।



তবে শহরের বাইরে একটি গ্রামে জনবসতি রয়েছে। আমরা সেখানেই অবস্থান নিই। সেখান থেকে চলে যাই মারদিন শহরে। পাহাড়ের পাদদেশে অত্যন্ত চমৎকার পরিবেশে অবস্থিত বেশ সুন্দর, ছিমছাম ও গোছালো একটি শহর মারদিন। শহরের বাজারগুলোও বেশ সুবিন্যস্ত। সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এটি মুসলিম শহরগুলোর মধ্যে শীর্ষ সারিতে অবস্থান করবে। এখানে ছাগল ও ভেড়ার পশমের মাধ্যমে একপ্রকার বিশেষ পোশাক তৈরি করা হয়। যা এই শহরের নামে পরিচিত। শহরের দুর্গটির অবস্থান তার পাহাড়ের চূড়ায়। এই দুর্গটিও প্রসিদ্ধ দুর্গসমূহের তালিকায় নিজের নাম লিখিয়ে নিয়েছে। ইবনে জুজাই বলেন, মারদিন শহরের এই দুর্গকে বলা হয় আশ শাহবা। ইরাকের প্রসিদ্ধ কবি সাফিউদ্দিন আবদুল আজিজ বিন সারায় আল হিল্লী তার এক কবিতার স্তবকে এর উল্লেখ করে বলেন,

ছেড়ে আসো হিল্লার প্রশস্ত উপত্যকার বুক
উঠে বসো জাওরার উটের পিঠে,
থেমে যেও না মসুলের বাঁকা পথে
ধাবমান হও আশ শাহবার জ্যোতির দিকে
যুগে যুগে যা বিচূর্ণ করেছে অশুভ শয়তানকে।

হালাবের দুর্গটিকেও আশ শাহবা বলা হয়। সাফিউদ্দিন আল হিল্লীর রচিত এই স্তবকটি বেশ চমৎকার। মারদিনের সুলতান আল মালিকুল মানসুর এটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি ছিলেন মহৎ হৃদয়ের খ্যাতিমান একজন সুলতান। টানা পঞ্চাশ বছর তিনি মারদিন শাসন করেছেন। পেয়েছিলেন তাতার বাদশাহ কাজানের শাসনকাল। নিজ কন্যা দুনিয়া খাতুনকে বিয়ে দিয়েছিলেন ইরাকের সুলতান মুহাম্মাদ খোদাবান্দার কাছে।

আমাদের অবস্থানের সময়ে মারদিনের সুলতানের বিবরণ

আমরা যখন মারদিনে প্রবেশ করি, তখন এখানকার সুলতান ছিলেন আল মালিকুল মানসুরের পুত্র আল মালিকুস সালিহ। তার পিতার কথাই একটু আগে উল্লেখ করা হলো। স্বীয় পিতার কাছ থেকে তিনি ক্ষমতা লাভ করেন। তার অনেক প্রশংসনীয় অবদান রয়েছে। ইরাক, শাম ও মিসরে তার মতো মহৎ হৃদয়ের অধিকারী কোনো সুলতান নেই। কবি ও অসহায় ব্যক্তিরা দলে দলে তার কাছে আসে। স্বীয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি তাদেরকে

অকাতরে দান করেন। একবার আন্দালুসের অন্ধ কবি আবু উবাইদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন জাবির আল আন্দালুসি আল মারওয়ি এসেছিলেন এই সুলতানের প্রশংসামূলক একটি কাব্য শোনাতে। সুলতান তাকে বিশ হাজার দিরহাম পুরস্কার হিসেবে প্রদান করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি অনেক দান-সদকা করেছেন। মাদরাসা ও সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার উজিরও ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য ও মর্যাদাবান একজন ব্যক্তি। তিনি হলেন নিজ সময়ের অদ্বিতীয় আলেম জামালুদ্দিন আস সিনজারি। তাবরিজ শহরে তিনি পড়াশোনা করেন। সেখানে অনেক জগদ্বিখ্যাত আলেমের সান্নিধ্য লাভ করেন তিনি। মারদিন কাজিউল কুজাত প্রধান বিচারক ছিলেন আরেক অভিজ্ঞ আলেম বুরহানুদ্দিন আল মাওসিলি। তিনি প্রসিদ্ধ বুযুর্গ শায়খ ফাতাহ আল মাওসিলির শিষ্য। কাজি বুরহানুদ্দিন ছিলেন একজন খোদাভীরু, ধার্মিক ও উদারপ্রাণ ব্যক্তি। পশমের তৈরি সাধারণ মানের পোশাক পরিধান করতেন তিনি। যার মূল্য দশ দিরহামের বেশি হবে না। মাথায় পরিধান করতেন এমনই সাধারণ মানের কাপড়ের পাগড়ি। অধিকাংশ সময় তিনি বিচারকার্যের জন্য মাদরাসার বাইরে মসজিদ প্রাঙ্গণে বসতেন। এই মসজিদে তিনি ইবাদত করতেন। অচেনা কেউ এলে তাকে প্রধান বিচারকের কোনো সেবক বা সহচর মনে করে ভুল করে ফেলত।

একটি ঘটনা

একবার এক মহিলা কাজি বুরহানুদ্দিনের কাছে আসে। তিনি তখন মসজিদের বাইরে বসে ছিলেন। মহিলাটি তাকে আগে থেকে চিনত না। তার কাছে এসে মহিলাটি বলে, হে শায়খ, কাজি সাহেব কোথায় বসেন বলতে পারেন? তিনি বলেন, তার কাছে আপনার কী কাজ? মহিলাটি বলে, আমার স্বামী আমাকে প্রহার করেছে। তার আরো একজন স্ত্রী-ও আছে। সে আমাদের মাঝে সমতা বিধান করে না। আমি তাকে আসার জন্য বলেছিলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করেছে। আর আমি তো একজন অবলা নারী। আমার কাছে তেমন টাকা-পয়সা নেই যে, বিচারালয়ের লোকদের তা প্রদান করে তাকে কাজি সাহেবের কাছে এনে হাজির করাব। কাজি বুরহানুদ্দিন তখন বলেন, আপনার স্বামীর বাড়ি কোথায়? মহিলাটি বলে, শহরের বাইরে আল মাল্লাহিন গ্রামে। তিনি বলেন, আমি আপনার সঙ্গে তার কাছে যাব। মহিলাটি বলে, কিন্তু বিনিময় হিসেবে দেওয়ার মতো কিছু যে

আমার কাছে নেই। তিনি বলেন, আমি বিনিময় হিসেবে কিছুই নেব না। আপনি গ্রামের দিকে চলে যান। তারপর গ্রামের বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করুন। আমি আপনার পেছনে পেছনে আসছি। মহিলাটি কথামতো আগে চলে গিয়ে তার অপেক্ষা করতে থাকে। কাজি বুরহানুদ্দিন একাই সেখানে চলে যান। তার অভ্যাস ছিল তিনি কাউকে তার পিছু পিছু আসতে দিতেন না। অতঃপর মহিলাটি তাকে নিয়ে তার স্বামীর গৃহে নিয়ে যায়। সে কাজিকে দেখে মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমার সঙ্গের এই রোগাপটকা বৃদ্ধ লোকটি কে? কাজি বুরহানুদ্দিন তাকে বলেন, আমি এমনই। তা দেখে তোমার কোনো কাজ নেই। কিন্তু তোমার উচিত আগে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা। এই নিয়ে তাদের মধ্যে আলাপ দীর্ঘ হতে থাকে। অতঃপর আশপাশের লোকেরা এসে কাজি বুরহানুদ্দিনকে চিনে ফেলে তাকে সালাম জানায়। এই দেখে মহিলার স্বামীটি বেশ ভয় পেয়ে যায় ও লজ্জিত হয়। কাজি বুরহানুদ্দিন তাকে বলেন, ভয় পেতে হবে না। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মীমাংসা করে নাও। অতঃপর লোকটি তার স্ত্রীর সঙ্গে মীমাংসা করে নেয়। কাজি বুরহানুদ্দিন তাদেরকে দুজনকে সেদিনের খরচ প্রদান করে ফিরে আসেন। এই কাজির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। নিজ গৃহে নিয়ে তিনি আমার আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেছিলেন।

অতঃপর মারদিন থেকে আমি পুনরায় বাগদাদের উদ্দেশ্যে সফর করি। মসুলে পৌঁছে শহরের বাইরে অবস্থানরত বাগদাদগামী একটি হজকাফেলাকে পেয়ে যাই। তাদের মধ্যে সিত্ত যাহিদা নামক একজন নেককার নারীও ছিলেন। তিনি খলিফার বংশধর। একাধিকবার হজ করেছেন এবং বছরের প্রায়দিনই রোযা রাখে। আমি তাকে সালাম জানাই। আমি তার পাশেই ছিলাম। তার সঙ্গে ছিল একদল খাদেম। সফরকালীন অবস্থান জারওয়াদ নামক স্থানে তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়। অতঃপর আমি বাগদাদে এসে পৌঁছাই। এসে দেখি এখানকার সকল হাজি সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন আমি আমির খাজা মারুফের কাছে গিয়ে সুলতান আবু সাঈদ আমাকে যা যা দিতে বলেছেন, তা তলব করি। তিনি আমার জন্য একটি উটের হাওদা, তার খোরাক এবং আরো চারজন লোকসহ তাদের পানি বরাদ্দ করেন। একটি কাগজে এগুলোর কথা লিখে হাজিদের কাফেলার আমির পালোয়ান মুহাম্মাদ আল হাওয়িহের কাছে পাঠিয়ে দেন। তার সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল। তাই তিনি আমার

ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দেন। সফরের সময় আমি সর্বক্ষণ তার পাশেই অবস্থান করেছি। তিনি উত্তমরূপে আমার দেখভাল করেছেন। তাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে বেশিই করেছেন। কুফা থেকে বের হওয়ার সময় আমি ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলে তারা একদিনে আমাকে অনেকবার হাওদা থেকে নামিয়েছে। আমির এসে আমার খোঁজখবর নিয়েছেন এবং সেবকদের আমার দেখভালের নির্দেশনা দিয়েছেন। অসুস্থ অবস্থাতেই আমি পবিত্র মক্কা মুকাররমায় উপনীত হই। আল্লাহ তাআলার এই শহরের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। অতঃপর পবিত্র কাবাঘরের নিকটে এসে তাওয়াফে কুদুম সম্পন্ন করি। অসুস্থ থাকার কারণে আমি ফরয নামাযগুলো বসে আদায় করতাম। ফলে আমি আমির হাওয়ির ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাই সম্পন্ন করি। সে বছর সোমবার দিন আমরা আরাফায় অবস্থান করি। মিনায় অবতরণ আমি কিছুটা সুস্থতা অনুভব করি। হজ শেষ করে আমি সে বছর মক্কার প্রতিবেশী হয়ে কাটিয়ে দেই। সে বছর মন্ত্রণালয় পরিদর্শক আমির আলাউদ্দিন বিন হিলাল মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি বনু শাইবা ফটকের নিকটে সুগন্ধি বিক্রেতাদের বাজারের পাশে নির্মিত অযুখানার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন। মিসরীয় বিশিষ্ট আলেমদের একটি দলও সে বছর মক্কায় অবস্থান করেন। তাদের মধ্যে তাজুদ্দিন বিন কুয়াইক, নুরুদ্দিন আল কাজি, জাইনুদ্দিন বিন আসিল, ইবনে খালিলি এবং নাসিরুদ্দিন আল আসইয়ুতি প্রমুখ ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য। সে বছর আমি আল মাদরাসাতুল মুজাফফরিয়্যায় অবস্থান করি। আল্লাহ আমাকে অসুস্থতা থেকে মুক্তি দান করেন। আমি খুব স্বাচ্ছন্দ্যে আরাম-আয়েশে দিন কাটাতে থাকি। ফাঁকে উমরাও আদায় করে নিই। সে বছর সইদে মিসর থেকে একটি হজকাফেলা আসে। তাদের সঙ্গে শায়খ নাজমুদ্দিন আল উসফুনিও আসেন। এটিই ছিল তার প্রথম হজ সফর। এই কাফেলায় আরো ছিলেন মিসরের প্রসিদ্ধ কাজি নাজমুদ্দিন আল বালিসির দুই পুত্র আলাউদ্দিন আলী ও সিরাজুদ্দিন উমর এবং আরো একদল লোক। যিলকদ মাসের মাঝামাঝি সময়ে আসেন আমির সাইফুদ্দিন ইয়ালামলাক। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তার সঙ্গে আমার শহর তানজা (টাঙ্গিয়ার) থেকে একদল লোক আসেন। আল্লাহ তাআলা এই শহরকে সুরক্ষিত রাখুন। তাদের মধ্যে ফকিহ আবু আবদিল্লাহ বিন আতাউল্লাহ, ফকিহ আবু মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ আল হাজারি, ফকিহ আবু আবদিল্লাহ আল মুরসি, আবুল

আব্বাস বিন ফকিহ আবু আলী আল বালানসি, আবু মুহাম্মাদ বিন কাবিলা, আবুল হাসান আল বিয়ারি, আবুল আব্বাস বিন নাফুত, আবুস সাবর আইয়ুব আল ফাখখার এবং আহমাদ বিন হুকামা প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও কাসর আল মাজাজ শহরের ফকিহ আবু যায়েদ আবদুর রহমান বিন কাজি আবুল আব্বাস বিন খালুফ এবং কাসর আল কাবির শহরের ফকিহ আবু মুহাম্মদ বিন মুসলিম, আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন ইয়াহইয়া ও তার সন্তানও এসেছিলেন। এছাড়াও সে বছর মিসর থেকে আরো এসেছিলেন মামলুক সুলতানের দেহরক্ষী আমির সাইফুদ্দিন তুকজাদমুর, আমির মুসা বিন কিরমান, মামলুকদের সেনা পরিদর্শক ও কেরানি কাজি ফখরুদ্দিন, তাজু আবু ইসহাক এবং সুলতান আল মালিকুন নাসিরের অন্দরমহলের তত্ত্বাবধানকারী নারী হাদাক। তারা সবাই পবিত্র হারাম শরিফে এসে অনেক দান-সদকা করেন। সবচেয়ে বেশি দান করেছিলেন কাজি ফখরুদ্দিন। ৭২৮ হিজরির এই হজের সময়ে আমাদের আরাফার অবস্থান হয় শুক্রবার দিন। হজ শেষ করে ৭২৯ হিজরি বর্ষটিও আমি মক্কাতে কাটিয়ে দেই। এই বছর ইরাকের হাজিদের কাফেলার আমির মুহাম্মাদ আল হাওয়ির সঙ্গে আমির রুমাইসার পুত্র আহমাদ, আমির উতাইফার পুত্র মোবারক, শায়খজাদা আল হারবাওয়ি এবং শায়খ দানিয়াল হজ করতে আসেন। তারা ইরাকের সুলতান আবু সাঈদের পক্ষ থেকে মক্কায় অবস্থানকারী মুসাফির ও স্থানীয় অধিবাসীদের বিশাল পরিমাণ দান-সদকা নিয়ে আসেন। সে বছর মামলুক সুলতান আল মালিকুন নাসিরের পর সুলতান আবু সাঈদের নামও খুতবায় উচ্চারণ করা হয়। জমজম কূপের গম্বুজের উঁচুতে দাঁড়িয়ে তার জন্য দোয়া করা হয়। তাদের পর উল্লেখ করা হয় ইয়েমেনের সুলতান আল মালিকুল মুজাহিদ নুরুদ্দিনের নাম। আমির উতাইফা এই বিষয়টি নিয়ে অসম্মতি প্রকাশ করেন। সহোদর ভাই মানসুরকে প্রেরণ করেন ইয়েমেনের সুলতানের নাম উচ্চারণের বিষয়টি আল মালিকুন নাসিরকে জানানোর জন্য। কিন্তু আমির রুমাইসার নির্দেশে মানসুরকে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু আমির উতাইফা তাকে দ্বিতীয়বার জেদ্দার পথে পাঠায়। এবার মানসুর আল মালিকুন নাসিরের কাছে গিয়ে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানায়। ৭২৯ হিজরির হজের সময় আরাফার অবস্থান হয় মঙ্গলবার দিন। এই হজ শেষ হয়ে গেলে ৭৩০ হিজরি বর্ষটিও আমি মক্কায় কাটাই। এই বছরের হজের মৌসুমে মক্কার আমির উতাইফা এবং আইদুমুর আমির জানদার আন

নাসিরির মাঝে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। ইয়েমেনের একদল ব্যবসায়ীর কাফেলায় চুরির ঘটনা থেকে এর সূত্রপাত ঘটে। ব্যবসায়ীরা আইদুমুরের কাছে অভিযোগ জানালে আইদুমুর আমির উতাইফার পুত্র মুবারককে বলে, যাও, ওই চোরদের ধরে নিয়ে আসো। মুবারক উত্তরে বলে, আমি তো তাদের চিনি না। কী করে ধরে আনব? তারপর কথা হচ্ছে, ইয়েমেনের অধিবাসীরা আমাদের শাসনাধীন। আপনার কোনো ক্ষমতা নেই তাদের ব্যাপারে। যদি মিসর অথবা শামের অধিবাসীদের কাফেলায় চুরি হয়, তাহলে আপনি আমার কাছে বিচার চাইতে পারেন। তখন আইদুমুর মুবারককে গালিগালাজ করে বলে, তুমি আমার সঙ্গে কোন সাহসে এমন করে কথা বলছ? এই বলে সে মুবারকের বুকে আঘাত করলে মুবারক পড়ে যায়। তার মাথা থেকে পাগড়িটিও পড়ে যায়। এই দেখে মোবারকের ক্রীতদাস বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। তখন আইদুমুর বাহনের পিঠে চড়ে তার বাহিনীর উদ্দেশ্যে যাওয়ার ইচ্ছা করে। কিন্তু মুবারক ও তার দাস পিছন থেকে তাকে ধরে তাকে ও তার সন্তানকে সেখানেই হত্যা করে। এর জের ধরে পবিত্র হেরেমে ফেতনা ছড়িয়ে পড়ে। আল মালিকুন নাসিরের চাচাতো ভাই আমির আহমাদ তখন মক্কাতেই ছিলেন। তুর্কিদের তিরের আঘাতে এক নারীর মৃত্যু হয়। বলা হয়, এই নারী মক্কার অধিবাসীদেরকে যুদ্ধের জন্য উসকানি দিচ্ছিল। তখন হজ কাফেলায় থাকা সকল তুর্কি তাদের ঘোড়ায় চড়ে বসে। তাদের আমির ছিলেন খাস তুর্ক নামক একজন ব্যক্তি। এদিকে মক্কার বিচারক, সম্মানিত ইমাম ও অন্যান্য প্রতিবেশীগণ তাদের মাথায় পবিত্র কুরআনের কপি নিয়ে তুর্কিদের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করেন। এরপর মিসরের হজ কাফেলা তাদের আসবাবপত্র নিয়ে মিসরে ফিরে যায়। সুলতান আল মালিকুন নাসিরের কাছে এই সংবাদ পৌঁছুলে তিনি খুবই ব্যথিত হন। অতঃপর তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে বাহিনী প্রেরণ করেন। এই খবর পেয়ে আমির উতাইফা ও তার ছেলে মুবারক পালিয়ে যায়। এদিকে উতাইফার ভাই রুমাইসা ও তার সন্তানরা চলে যায় ওয়াদি নাখলা উপত্যকায়। মামলুক বাহিনী মক্কায় পৌঁছুলে আমির রুমাইসা নিরাপত্তার আবেদন জানিয়ে তার এক পুত্রকে প্রেরণ করেন। তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়। অতঃপর আমির রুমাইসার হাতে মক্কার শাসনভার দিয়ে সেনাবাহিনী মিসরে ফিরে যায়। সুলতান আল মালিকুন নাসির ছিলেন একজন উদার ও সহনশীল ব্যক্তি।

দক্ষিণ আরব, পূর্ব আফ্রিকা ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল

মক্কায় এই অবস্থা চলার সময়ে আমি মক্কা থেকে ইয়েমেনের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। মক্কা ও জেদ্দার মাঝামাঝি হাদ্দা নামক স্থানে গিয়ে বিরতি গ্রহণ করি। সেখান থেকে পৌঁছাই জেদ্দায়।

এটি সমুদ্র উপকূলীয় বেশ প্রাচীন একটি শহর। পারসিকদের হাতে শহরটির গোড়াপত্তন হয়। শহরতলীতে রয়েছে প্রাচীন কিছু কারখানা। এখানে শক্ত পাথর খোদাই করে নির্মিত পরস্পর সংলগ্ন অসংখ্য জলাধার রয়েছে। এই বছর বৃষ্টি হয়েছিল খুবই কম। একদিন পরিমাণ দূরত্ব থেকে জেদ্দায় পানি আনা হয়েছিল। আর হাজিরা পিপাসায় কাতর হয়ে বাড়িঘরের লোকদের কাছে পানি চাইতে বাধ্য হয়েছিল।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

জেদ্দায় আমার সঙ্গে বেশ আশ্চর্য একটি ঘটনা ঘটে। আমি যেখানে থাকতাম, একদিন সেই ঘরের দরজায় এক অন্ধ ভিক্ষুক এসে পানি পান করতে চান। এক বালকের হাত ধরে তিনি হাঁটা-চলা করেন। আমাকে সালাম দিয়ে তিনি আমার নাম বলেন। তারপর আমার হাতটি ধরেন। এর আগে আমাদের কখনো দেখা হয়নি। না আমি চিনতাম তাকে, না তিনি চিনতে আমাকে। এই দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। তিনি তখন আমার হাতের একটি আঙুল ধরে বলেন, আংটিটা কই? মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় অপর এক ভিক্ষুকের সঙ্গে দেখা। তিনি আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে আংটিটাই দিয়ে দেই। এছাড়া অন্য কিছু তখন আমার কাছে ছিল না। তাই অন্ধ ভিক্ষুকের এই প্রশ্নের জবাবে আমি বলি, সেটি এক ভিক্ষুককে দিয়ে দিয়েছি। তখন অন্ধ ভিক্ষুক আমাকে বলেন, আবার ফিরে গিয়ে সেই আংটির সন্ধান করুন। তাতে কিছু নাম লেখা রয়েছে। সেগুলোতে পাওয়া যাবে একটি রহস্যের সমাধান। আমি তখন আরো আশ্চর্য হয়ে যাই। এই অন্ধ ব্যক্তি এ কথা কী করে জানলেন! তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

জেদ্দায় জামে আবনুস নামক একটি জামে মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি বরকতময় হিসেবে প্রসিদ্ধ। এখানে দোয়া করলে কবুল করা হয় বলেও সমাদৃতি রয়েছে। তখন জেদ্দার গভর্নর ছিলেন আবু ইয়াকুব বিন আবদির রাজ্জাক। আর শহরের প্রধান বিচারক ও খতিব ছিলেন ফকিহ আবদুল্লাহ। তিনি মক্কার অধিবাসী। শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। জুমার দিন প্রথমে লোকেরা এসে সমবেত হয়। তারপর মুয়াযযিন এসে আযান দেন। জেদ্দার স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে এই ঘোষণা দেওয়া আছে যে, যদি কমপক্ষে চল্লিশজন মুসল্লি এসে উপস্থিত হয়, তাহলে খুতবা দিয়ে জুমার নামায পড়ানো হবে। এর কম হলে চার রাকাত যোহরের নামায আদায় করা হবে। জেদ্দার বাইরের যত লোকই উপস্থিত হোক না কেন, তাদেরকে হিসাবের মধ্যে ধর্তব্য করা হবে না।

জেদ্দা থেকে জালবা নামক নৌযানে করে শুরু হয় আমাদের সমুদ্রযাত্রা। নৌযানটির মালিকের নাম রশিদুদ্দিল আল আলফি আল ইয়েমেনি। মূলত তিনি হাবশি বংশোদ্ভূত। মক্কার শরিফ তথা গভর্নর মানসুর বিন আবি নুমাই উঠেন আরেকটি জালবায়। তিনি চেয়েছিলেন আমিও যেন তার সঙ্গে একই জালবায় উঠি। কিন্তু আমি রাজি হইনি। কারণ, তিনি তার জালবায় অনেকগুলো উটও উঠিয়েছিলেন। তাই আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ইতিপূর্বে আমি কখনো সমুদ্রযাত্রা করিনি। সেখানে ইয়েমেনের অনেক অধিবাসী ছিলেন। যারা সফরের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আসবাবপত্র নিয়ে জালবায় উঠেছেন।

সমুদ্রবক্ষে একটি ঘটনা

সমুদ্রবক্ষে আমাদের যাত্রা শুরু হওয়ার পর শরিফ মানসুর তার এক গোলামকে নির্দেশ দেন উটকে খাওয়ানোর জন্য ময়দা ও ঘি দিয়ে তৈরি আদিলা নিয়ে আসতে। ইয়েমেনের বাসিন্দাদের জালবা থেকে এই আদিলা সংগ্রহ করা যায়। তার কথামতো গোলাম আদিলা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। তখন বেশকিছু ব্যবসায়ী কান্নারত অবস্থায় আমার কাছে এসে বলেন, আদিলার মধ্যে দশ হাজার দিরহাম রৌপ্যমুদ্রা ছিল। তারা আবেদন জানায়, আমি যেন শরিফের সঙ্গে আলাপ করে সেগুলো ফিরিয়ে নিয়ে আসি। আমি শরিফের কাছে এসে তার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করি। তাকে বলি, এই আদিলার মাঝে ব্যবসায়ীদের কিছু মূল্যবান বস্তু রয়েছে। তিনি বলেন, যদি

নেশাজাতীয় কিছু হয় তাহলে আমি কখনোই ফেরত দেব না। অন্য কিছু হলে তাদের জিনিস তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সেটি খুলে দিরহাম পাওয়া গেলে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। শরিফ মানসুর আমাকে বলেন, আমার জায়গায় আজলান হলে কিছুতেই এগুলো ফিরিয়ে দিত না। আজলান তার ভাই রুমাইসার পুত্র। একবার সে ইয়েমেনের উদ্দেশে সফররত অবস্থায় দামেস্কের এক ব্যবসায়ীর ঘরে প্রবেশ করে অধিকাংশ আসবাবপত্র ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল। আমাদের সফরের সময় আজলান মক্কার আমির পদে নিযুক্ত হয়েছে। পূর্বের পাপাচার থেকে নিজেকে পবিত্র করে ন্যায়পরায়ণভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় নিজেকে নিরত করেছে।

অতঃপর সমুদ্রবক্ষে অনুকূল মৃদু বাতাসে দুইদিন আমাদের সফর চলমান থাকে। তৃতীয়দিন বাতাসের গতিপথ ঘোরে গিয়ে আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে যাওয়ার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ এসে আছরে পড়তে থাকে আমাদের নৌযানের ভেতরে। যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়েই আমরা রা'সুদ দাওয়ায়ির নামক পোতাশ্রয়ে চলে আসি। এটির অবস্থান আইদাব ও সাওয়াকিনের মাঝামাঝি অবস্থানে। আমরা এখানে অবতরণ করি। উপকূলে এসে আমরা মসজিদ আকৃতির নলখাগড়ার ছাউনি দেখতে পাই। সেখানে উটপাখির ডিমের অনেক খোসা পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে ছিল। আমরা সেগুলো থেকে পান করি। অতঃপর কিছু খাবার রান্না করি। এখানে এসে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়ার মতো দৃশ্যের মুখোমুখি হই। দেখতে পাই সমুদ্র থেকে একটি শাখা সৃষ্টি হয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। লোকেরা একটি কাপড়ের দুই প্রান্ত ধরে এর ভেতরে ডুবিয়ে পুনরায় বের করে নিয়ে আসে। তখন দেখা যায়, কাপড়ের ভেতরটা মাছ দিয়ে ভর্তি। একেকটা মাছ একহাত সমান লম্বা। স্থানীয়দের কাছে এই মাছগুলো বুরি নামে পরিচিত। লোকেরা সেখানে বেশ পরিমাণ মাছ রান্না করে এবং কিনেও নিয়ে আসে বেশ কিছু। সেখানে বুজাত গোত্রের একদল লোক আমাদের কাছে আসে। তারা এখানকার স্থানীয় অধিবাসী। গায়ের রঙ কালো। হলুদ রঙের পোশাক পরিহিত আর মাথায় বাঁধা লাল রঙের পট্টি। তারা বেশ সুঠাম দেহের অধিকারী এবং সাহসিকতায় দুর্দান্ত। তির-ধনুক আর তরবারি তাদের সঙ্গে থাকে। উটের বহর চালিয়ে তারা জীবিকানির্বাহ করে। এগুলোকে তারা সুহুব বলে থাকে। আমরা তাদের কাছ থেকে উট

ভাড়া করে মরুময় পথ দিয়ে চলতে থাকি। সেখানে অনেক হরিণের দেখা মেলে। বুজাতরা হরিণের গোশত ভক্ষণ করে না। তাই হরিণরা মানুষের কাছাকাছিই থাকে। ভয় পায় না। সফরের দুইদিন পর আমরা আরবের একটি পল্লীতে এসে উপনীত হই। স্থানীয়দের কাছে এটি আওলাদু কাহিল নামে পরিচিত। এখানকার লোকেরা বুজাতদের সঙ্গে চলাফেরায় অভ্যস্ত এবং তাদের ভাষাও বুঝতে পারে। সেদিনই আমরা সাওয়াকিন দ্বীপে পৌছাই। উপকূল থেকে ছয় মাইল দূরত্বে এর অবস্থান। সেখানে কোনো পানি, চাষযোগ্য জমি, গাছপালা কিছুই নেই। নৌযানে করে এখানে খাবার পানি সরবরাহ করা হয়। রয়েছে অনেকগুলো হাউজ। যেগুলোতে বৃষ্টির পানি জমা হয়। দ্বীপটি আয়তনে বেশ বড়। এখান থেকে উটপাখি, হরিণ ও বন্য গাধার গোশত ক্রয় করা যায়। আরো রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ছাগল। সেগুলো থেকে অনেক দুধ ও ঘি আহরণ করে মক্কায় রপ্তানি করা হয়। এখানকার প্রধান খাদ্যশস্য জারজুর। যা আকারে বেশ বড় হয়ে থাকে। এটিও মক্কায় রপ্তানি করা হয়।

স্থানীয় সুলতানের বিবরণ

আমাদের অবস্থানের সময়ে সাওয়াকিন দ্বীপের সুলতান ছিলেন শরিফ জায়েদ বিন আবি নুমাই। তার পিতা ছিলেন মক্কার গভর্নর। পরবর্তীতে তার ভাই উতাইফা ও রুমাইসা মক্কার গভর্নর হয়েছে। তাদের কথা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। বুজাতদের সহযোগীয় তিনি এই দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছেন। বুজাতরা মায়ের দিক থেকে তার আত্মীয়। তার সঙ্গে বুজাত, আওলাদু কাহিল ও জুহাইনা গোত্রের আরবদের সমন্বয়ে গঠিত সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে। সাওয়াকিন থেকে আমরা পুনরায় ইয়েমেনের উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা শুরু করি। এই সাগরে অনেক পাথর থাকায় রাতের বেলায় সফর করা যায় না। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সফর করা হয়। তারপর কাছাকাছি উপকূলে নোঙর করে রাত্রিযাপন করা হয়। সকাল হয়ে গেলে পুনরায় যাত্রা শুরু হয়। নৌযানের প্রধানকে তারা রুব্বান (নাবিক) বলে থাকে। তিনি সবসময় নৌযানের সম্মুখভাগে থাকেন এবং মাঝিদেরকে পাথরের ব্যাপারে সতর্ক করেন। এই পাথরগুলোকে তারা বলে থাকে নাবাত। সাওয়াকিন থেকে যাত্রা শুরু করার ছয়দিন পর আমরা হালি নামক শহরে এসে পৌছাই। এটি ইবনে ইয়াকুব নামেও পরিচিত। ইবনে ইয়াকুব ছিলেন ইয়েমেনের একজন

সুলতান। অনেক আগে তিনি এখানে অবস্থান করেছেন। শহরটি বেশ বড়। এখানকার ঘরবাড়িগুলোও বেশ সুন্দর। বনু হারাম ও বনু কিনানা নামের দুইটি আরবগোত্র এখানে বসবাস করে। এখানকার জামে মসজিদটি পৃথিবীর চমৎকার মসজিদগুলোর একটি। একদল লোক সেখানে সর্বদা ইবাদতে নিরত থাকে। তাদের মধ্যে শায়খ কাবুলা আল হিন্দী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন নেককার বুযুর্গ ব্যক্তি। তালিযুক্ত কাপড় এবং পাতলা টুপি পরিধান করেন। মসজিদের পাশেই রয়েছে তার একান্ত কক্ষ। সেখানে আলাদা কোনো চাটাই বা বিছানা নেই। মাটিতেই তিনি শয়ন করেন। একটি অযুর পাত্র, খেজুর কাণ্ডের একটি মাদুর, যেটিতে ছিল শুকনো রুটির কিছু টুকরো। লবণ ও মারজোরাম রাখা একটি পাত্র ব্যতীত অন্য কিছু সেই কক্ষে দেখতে পাইনি। কেউ তাকে দেখতে গেলে তিনি সেগুলোই তাদের সামনে পরিবেশন করেন। মেহমানের আগমনের কথা জানতে পারলে তার সঙ্গীরাও নিজেদের কাছে যা আছে নিঃসংকোচে সেগুলো এনে উপস্থাপন করে। আসর নামায সমাপ্ত করে তারা শায়খের সামনে বসে মাগরিব পর্যন্ত যিকির-আযকারে মগ্ন থাকেন। মাগরিব নামায শেষ করে সবাই নফল নামাযে দাঁড়িয়ে ইশার নামায পর্যন্ত ইবাদত করেন। ইশার নামায শেষ করে রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত করে তারা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। রাতের শেষভাগে তারা পুনরায় মসজিদে ফিরে এসে ফজর পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেন। অতঃপর ইশরাকের সময় হওয়া পর্যন্ত তারা যিকির করেন। ইশরাক নামায আদায় আদায় করে চলে যান যার যার কাজে। কেউ কেউ একেবারে চাশতের নামায শেষে করে মসজিদ থেকে উঠেন। এটিই তাদের রোজকার নিয়ম। বাকিজীবন তাদের সঙ্গে কাটিয়ে দিতে মনে চেয়েছিল আমার। কিন্তু সেই সৌভাগ্য হয়নি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার দয়া ও তাওফিকের নেয়ামত দান করুন।

হালি-র সুলতানের বিবরণ

এখানকার সুলতান বনু কিনানা গোত্রের আমের বিন যুওয়াইব। তিনি একজন প্রতিভাবান, সাহিত্যরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ও কবি। মক্কা থেকে জেদ্দা পর্যন্ত আমি তার সঙ্গী হয়েছিলাম। ৭৩০ হিজরিতে তিনি হজ করেছিলেন। তার শহরে আসার পর তিনি আমার খুব সম্মান-সমাদর করেন। বেশ কিছুদিন আমি তার আতিথেয়তায় অবস্থান করি। অতঃপর তার নিজস্ব

একটি নৌযানে চড়ে সারজা শহরে পৌঁছাই। এটি বেশ ছোট একটি শহর। আওলাদুল হালবি গোত্রের কিছু লোক এখানে বসবাস করে। তারা মূলত ইয়েমেনের ব্যবসায়ীদের একটি দল। যাদের অধিকাংশ বাস করে সানা শহরে। তারা বেশ মহৎ ও উদার। প্রাণ খোলে আগন্তুকদের আপ্যায়নের আয়োজন করেন। হজ গমনেচ্ছুদের সাহায্য-সহযোগিতা করেন। তাদের যাতায়াতের জন্য নিজেদের যানবাহন দিয়ে দেন। নিজেদের সম্পদ থেকে তাদের পাথেয় প্রস্তুত করে দেন। এজন্য তারা বেশ সুনাম ও সুপরিচিত লাভ করেছেন। আল্লাহ তাআলাও তাদের সম্পদে প্রাচুর্য দান করুন এবং কল্যাণকর কাজে তাদের সহায় হোন। এই মহান কাজে একমাত্র শায়খ বদরুদ্দিন আন নাক্কাশই তাদের সমতুল্য হতে পারেন। তিনি বাস করেন আল কাহমা শহরে। তিনিও সারজার অধিবাসীদের মতো এমন কল্যাণকর কাজে নিজেকে নিবেদিত করেছেন। এই মহান লোকদের আতিথেয়তায় সারজায় একরাত অবস্থান করি। অতঃপর উপনীত হই আল হাদীস বন্দরে। তবে সেখানে অবতরণ করিনি। সেখান থেকে যাই আল আবওয়াব বন্দরে। তারপর উপনীত হই প্রসিদ্ধ জাবিদ শহরে। এটি ইয়েমেনের প্রসিদ্ধতম বড় একটি শহর। এখান থেকে রাজধানী সানার দূরত্ব চল্লিশ ফারসাখ পরিমাণ। সানার পর এটিই ইয়েমেনের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শহর। এখানকার অধিবাসীরা বেশ সচ্ছল ও ধনী। এখানে আছে অগণিত প্রশস্ত বাগান, প্রচুর জলাধার এবং অনেক ফলমূলের সমাহার। এটি কোনো উপকূলীয় শহর নয়। স্থলের মাঝেই এর অবস্থান। ব্যস্ত এই শহরে রয়েছে অনেক ঘর-বাড়ি। সবমিলিয়ে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে এই শহর ইয়েমেনের বুকে অন্যতম অবস্থানে রয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা বেশ নম্র, কোমল স্বভাব এবং সৌন্দর্যের অধিকারী। আর এখানকার নারীরা সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট অর্জন করে নিবে অনায়াসে। এটিই সেই উর্বর উপত্যকা, যার ব্যাপারে কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়ায় যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজ বিন জাবাল রা.-কে বলেছিলেন, 'হে মুআজ, যখন তুমি উর্বর উপত্যকায় উপনীত হবে, তখন হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিবে।' এখানকার অধিবাসীরা তাদের খেজুর আহরণের উৎসবের জন্য বিখ্যাত। খেজুর পরিপক্ব হওয়ার সময়ে প্রতি শনিবার দিন তারা দলবেঁধে খেজুর বাগানে চলে যায়। শহরে তখন একটি কাকপক্ষীও অবশিষ্ট থাকে না। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য থাকে বাদকদের দল। বাজারের ব্যবসায়ীরা যায় খেজুর ও মিষ্টান্ন ক্রয় করার জন্য। নারীরাও

উটের পিঠে চড়ে হাওদার ভেতরে অবস্থান করে। তাদের আকর্ষণীয় সৌন্দর্যের কথা তো আগেই বললাম। সৌন্দর্যের পাশাপাশি তারা বেশ উদার ও সদাচারিণী। মুসাফিরদের প্রতি তাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। তাদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে কোনো আপত্তি করে না। আমাদের মাগরিবের অঞ্চলের নারীদের মাঝে এমনটি দেখা যায় না। বিয়ে করার পর মুসাফির ব্যক্তি যদি পুনরায় সফরের ইচ্ছা করেন, তার নবপরিণীতা স্ত্রী তার সঙ্গে বের হয়ে তাকে বিদায় জানিয়ে আসেন। ইত্যবসরে যদি তাদের কোনো সন্তান হয়, তখন মা-ই সন্তানের লালনপালন ও ভরণপোষণের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। স্বামী সফর থাকাকালীন তাদের খরচ ও ভরণপোষণের জন্য কোনো সম্পদের দাবি জানান না। আর স্বামী যখন অবস্থান করেন, তখন তারা স্বল্প খরচেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু তারা কখনো নিজেদের শহর ছেড়ে বের হন না। শহর থেকে বের হওয়ার বিনিময়ে যদি তাদেরকে আপনি অঢেল সম্পদও দান করেন, তবুও তারা এই প্রস্তাবে সম্মত হবে না। এই অঞ্চলের আলেম ও ফকিহগণ বেশ নেককার, ধর্মপরায়ণ, বিশ্বস্ত, উদার ও উত্তম চরিত্রবান। জাবিদ শহরে আমি শায়খ আবু মুহাম্মাদ আস সানআনি, ফকিহ ও সূফি আবুল আব্বাস আল ইবয়ানি এবং ফকিহ ও মুহাদ্দিস আবু আলী আয যাবিদি প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ আলেমের সান্নিধ্য লাভ করি। তারা আমার যথেষ্ট সমাদর করেছেন এবং আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেছেন। আমি ইচ্ছেমতো তাদের খেজুর বাগানে ঘুরে বেড়িয়েছি। তাদেরই একজনের কাছে গিয়ে আমি প্রসিদ্ধ আলেম ও ফকিহ কাজি আবু জায়েদ আবদুর রহমান আস সুফির সাক্ষাৎ লাভ করি। তিনি পুরো ইয়েমেনজুড়ে প্রসিদ্ধ একজন আলেম। তখন তিনি আরেক প্রসিদ্ধ আলেম ও বুযুর্গ আহমাদ বিন উজাইল আল ইয়েমেনির স্মৃতিচারণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ ও কারামতের অধিকারী।

তার কারামত

বর্ণিত আছে, একবার জায়দিয়্যাহ মাযহাবের কিছু ফকিহ শায়খ আহমাদ বিন উজাইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি তাদেরকে খানকার বাইরে বসতে বলেন। তার শিষ্যগণ তাদেরকে স্বাগত জানান। কিন্তু শায়খ নিজের স্থান থেকে উঠে আসেননি। তারা এসে শায়খকে সালাম দিলে তিনি তাদের সঙ্গে মুসাফাহা করেন ও স্বাগত জানান। অতঃপর কদর তথা ভাগ্যের বিষয়ে

তাদের মাঝে আলোচনা চলতে থাকে। জায়দিয়্যাহ মাযহাবের ফকিহদের মত হচ্ছে ভাগ্য বলতে কিছু নেই।[১] বান্দাই তার যাবতীয় কর্মের স্রষ্টা। তখন শায়খ আহমাদ বিন উজাইল তাদেরকে বলেন, যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আপনারা এখান থেকে উঠে দাঁড়ান। তারা বারবার উঠার চেষ্টা করেও উঠতে সক্ষম হয় না। শায়খ তাদেরকে এই অবস্থায় রেখেই খানকার ভেতরে চলে যান। তারা এভাবেই থাকে। এর মাঝে প্রচণ্ড গরম পড়ে যায়। তারা সূর্যের তাপে অতিষ্ঠ হয়ে যন্ত্রনায় চিৎকার শুরু করে। তখন শায়খের শিষ্যগণ তার কাছে গিয়ে বলেন, ওই লোকেরা আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করে তাদের পূর্বের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে ফিরে এসেছে। তখন শায়খ বেরিয়ে এসে তাদেরকে হাতে ধরে উঠান এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে ফিরে এসে সত্যকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। অতঃপর তাদেরকে খানকার ভেতরে নিয়ে যান। তারা তিনদিন শায়খের আতিথেয়তায় অবস্থান করে নিজেদের এলাকায় ফিরে যায়।

আমি এই মহান বুযুর্গের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। জাবিদের উপকণ্ঠে গাসসানা নামক এক পল্লীতে তার কবর অবস্থিত। সেখানে তার সুযোগ্য পুত্র আবুল ওয়ালিদ ইসমাইলের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আমার আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। সেখানেই রাত্রিযাপন করি। অতঃপর শায়খের সমাধি জিয়ারত করি। মোট তিনদিন আমি শায়খ আবুল ওয়ালিদ ইসমাইলের সান্নিধ্যে অবস্থান করি। তার সঙ্গে গিয়ে ফকিহ আবুল হাসান আয যাইলায়ির সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হয়। তিনিও একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তি। ইয়ামের হাজিগণ হজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় তার সান্নিধ্য নিয়ে যান। এই অঞ্চলের অধিবাসী এবং বেদুইনরাও তাকে অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। তার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে আমরা যাই জাবালা শহরে। খুবই সুন্দর, ছোট্ট ও গোছালো একটি শহর। খেজুর গাছে, ফলমূল ও নদীনালায় ভরপুর। শায়খ আবুল ওয়ালিদের আগমন সংবাদ পেয়ে শায়খ আবুল হাসান

---

[১] ইবনু বতুতা এখানে ভুলবশত জায়দিয়্যাহ মাযহাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা ভাগ্যকে অবিশ্বাস করে না। এ ব্যাপারে তারা মুতাযিলাদের মতের অনুসারী। তাদের মত হচ্ছে, বান্দাই তার যাবতীয় কর্মের স্রষ্টা। কিন্তু এই সৃষ্টির ক্ষমতা আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন। আর যারা কদর তথা ভাগ্যকে অস্বীকার করে তারা হচ্ছে কাদরিয়্যাহ গোষ্ঠী। মাবাদ আল জুহানির অনুসারী। জায়দিয়্যারা মূলত ছিল মুতাযিলা মতাদর্শের অনুসারী। তাদের ইমাম জায়েদ বিন আলী জাইনুল আবেদিন ছিলেন মুতাযিলাদের প্রধান ওয়াসিল বিন আতার শিষ্য।

আয যাইলায়ি তাকে স্বাগত জানানোর জন্য বের হন। অতঃপর তাকে সসম্মানে নিজ খানকায় নিয়ে আসেন। সেখানে আমি শায়খ আবুল হাসানকে সালাম জানাই। তার এখানে আমাদের চমৎকার তিনটি দিন কাটে। তারপর আমরা ফিরে আসি। শায়খ আমাদের সঙ্গে একজন সেবকও প্রেরণ করেন। এবার আমাদের গন্তব্য তাইজ শহর। যা ছিল ইয়েমেনের তৎকালীন সুলতানের রাজধানী। এটিও ইয়েমেনের সুন্দর এবং বড় শহরগুলোর একটি। এখানকার বেশ কঠোর, রুঢ় প্রকৃতির ও অহংকারী স্বভাবের। রাজা-বাদশাহ, সুলতানরা যে সকল শহরে বসবাস করে, প্রায় সব শহরের অধিবাসীদের স্বভাব এমনই হয়ে থাকে। তাইজ শহরে তিনটি মহল্লা রয়েছে। একটিতে সুলতান তার ক্রীতদাস, ভৃত্য ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে বসবাস করেন। এটির নাম আমার ঠিক মনে নেই। দ্বিতীয়টিতে বসবাস করে মন্ত্রী-আমলা ও সৈনিকরা। এটির নাম আদিনা। আর তৃতীয়টিতে বসবাস করে সাধারণ জনগণ। এখানেই শহরের বিরাট বাজারের অবস্থান। এই মহল্লার নাম আল মাহালিব।

ইয়েমেনের সুলতানের বিবরণ

তার নাম সুলতান আল মুজাহিদ নুরুদ্দিন আলী ইবনুস সুলতান আল মুওয়াইয়িদ হিজবারুদ্দিন দাউদ ইবনুস সুলতান আল মুজাফফর ইউসুফ বিন আলী বিন রাসূল। তার দাদা রাসূল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কারণ, কোনো এক আব্বাসি খলিফা তাকে ইয়েমেনে রাসূল বা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। এখানকার গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। অতঃপর তার সন্তানরা স্বাধীন রাজত্বের অধিকারী হয়। দরবারে বসার সময় আর কোথাও যাওয়ার সময় এই সুলতান অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জা অবলম্বন করেন। শায়খ আবুল হাসান আয যাইলায়ির পাঠানো সেবকের সঙ্গে এই শহরে আসার পর সেই সেবক আমাকে নিয়ে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও বিচারক সফিউদ্দিন আত তাবারি আল মাক্কির কাছে নিয়ে যান। আমরা গিয়ে তাকে সালাম জানাই। তিনি আমাদের স্বাগত জানান। অতঃপর তিনদিন তার বাড়িতে আতিথেয়তা উপভোগ করি। চতুর্থ দিন ছিল বৃহস্পতিবার। সেদিন ইয়েমেনের সুলতান সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে কথাবার্তার উদ্দেশ্যে সভার আয়োজন করেন। সেদিন কাজি সফিউদ্দিন আমাকে সুলতানের কাছে নিয়ে যান। আমি তাকে সালাম জানাই। তাকে সালাম জানানোর নিয়ম হচ্ছে,

প্রথমে তর্জনী দিয়ে মাটি ছুঁয়ে সেই আঙুলকে মাথা বরাবর নিয়ে বলতে হবে, আল্লাহ তাআলা আপনার সম্মান অক্ষুণ্ন রাখুন। কাজি সফিউদ্দিন যা যা করেছেন আমি তাই করেছি। অতঃপর তিনি সুলতানের ডান দিকে বসে যান। আমাকে বসতে বললে আমি তার সামনে বসে যাই। অতঃপর সুলতান আমাকে মাতৃভূমি, আমাদের মহান সুলতান আবু সাঈদ আল মাজিনি, মিসরের সুলতান, ইরাকের সুলতান এবং লুর অঞ্চলের সুলতানের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করেন। আমিও যদ্দুর সম্ভব তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করি। এ সময় তার উজিরও ছিলেন সামনে উপবিষ্ট। সুলতানে তাকে আমার খাতিরদারি করার জন্য নির্দেশ দেন। কার্পেট বিছানো ও রেশমি কাপড়ে সজ্জিত একটি মঞ্চে স্থাপিত আসনে তিনি উপবেশন করেন। তার ডানে-বামে থাকে অস্ত্রধারী দেহরক্ষী। তাদের পাশে থাকে তলোয়ার ও তির-ধনুকধারী সৈনিকরা। তাদের সম্মুখে ডানে-বামে বসেন সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ আমলা-মন্ত্রী, সচিব, কেরানি ও প্রহরী প্রধান। সুলতান যখন তার কুরসিতে বসেন, তারা সমস্বরে উচ্চ আওয়াজে বলে উঠে বিসমিল্লাহ। উঠে দাঁড়ানোর সময়েও তারা এর পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এর ফলে দরবারে উপস্থিত সবাই বুঝতে পারে সুলতান কখন বসেছেন আর কখন উঠেছেন। তিনি আসনে বসার পর সবাই একে একে গিয়ে সালাম জানিয়ে ডানে-বামে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। কেউই তার নির্দিষ্ট জায়গা অতিক্রম করে না। যাদেরকে বসার নির্দেশ দেওয়া হয় কেবল তারাই বসতে পারে। সুলতান প্রহরীপ্রধানের মাধ্যমে একেকজনকে বসার নির্দেশ দেন। তারা সেখানে দণ্ডায়মান ব্যক্তিরা সম্মুখে বিছিয়ে রাখা বিছানায় বসে পড়েন। কেউ ডানদিকে, কেউ বামদিকে। অতঃপর খাবার হাজির করা হয়। খাবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি সাধারণ, আরেকটি বিশেষ প্রকারের। সুলতান, প্রধান বিচারক এবং বিশিষ্ট ফকিহ ও অতিথিগণের জন্য বিশেষ প্রকারের খাবার বরাদ্দ থাকে। আর সাধারণ খাবার বরাদ্দ থাকে অন্যান্য আমলা-মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ফকিহ, বিচারক ও বিভিন্ন দলের সৈনিকদের জন্য। প্রত্যেক ব্যক্তির আহার গ্রহণের নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। কেউ সেই স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে গিয়ে বসে না। এ নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো চাপাচাপি হয় না। হিন্দুস্তানের সুলতানের দরবারেও খাবারের সময় আমি একই বিন্যাস দেখেছি। জানি না, হিন্দুস্তানের সুলতান কি ইয়েমেনের সুলতানকে দেখে এমন বিন্যাস অবলম্বন করেছেন, নাকি ইয়েমেনের সুলতান হিন্দুস্তান থেকে

এই নিয়ম জেনে এসেছেন। এভাবে ইয়েমেনের সুলতানের আতিথেয়তার বেশ কিছুদিন কেটে যায়। তিনি আমার বেশ আদর-যত্ন করেন। অতঃপর বাহন প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর আমি সফর করে সানআ শহরে চলে আসি। এটি ছিল ইয়েমেনের প্রাচীন রাজধানী। আয়তনে বেশ বড়। বাড়িঘরগুলো বেশ সুন্দর। ইট ও চুনার প্রলেপের মাধ্যমে এগুলো তৈরি করা হয়েছে। প্রচুর গাছপালা, ফলমূল আর কৃষিজমি মিলিয়ে সানা শহরটি বেশ সমৃদ্ধ। এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং পানিও সুপেয়। আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে, ভারতবর্ষ, ইয়েমেন ও আবিসিনিয়ায় কেবল গ্রীষ্মকালেই বৃষ্টিপাত হয়। আর বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায়, যোহর নামাযের পর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তাই দ্বিপ্রহরে সূর্য ঢলে পড়ার সময় শহরের অধিবাসী ও মুসাফিররা প্রবল বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে নিরাপদ থাকতে নিরাপদ অবস্থানে চলে যায়। সানা শহরের পুরোটাই পাকা করা। বৃষ্টি হলেই শহরের অলিগলি ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। এই শহরে জামে মসজিদটিও অনিন্দ্য সুন্দর মসজিদগুলোর একটি। এর ভেতরে একজন নবীর কবর রয়েছে।

অতঃপর সানা থেকে সফর করে ইয়েমেনের বন্দর নগরী এডেনে চলে আসি। বিশাল এক সাগরের পাড়ে এই বন্দরের অবস্থান। পাহাড়ের সারি শহরটিকে বেষ্টন করে রেখেছে। মাত্র একটি দিক দিয়ে শহরে প্রবেশ করা যায়। সবমিলিয়ে এডেন শহরটি আয়তনে বিশাল। কিন্তু এখানে কোনো ফসল উৎপন্ন হয় না, পাওয়া যায় না গাছপালার দেখা, নেই সুপেয় পানির ব্যবস্থা। তবে এখানে বেশ কিছু হাউজ রয়েছে। বৃষ্টির মৌসুমে সেগুলোতে পানি জমা হয়। শহর থেকে বেশ দূরে জলাধারের অবস্থান। সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করতে গেলে প্রায়ই বেদুইনরা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি সম্পদ অথবা পোশাকের বিনিময়ে তাদেরকে রাজি করাতে হয়। এডেন শহরে প্রচণ্ড গরম পড়ে। হিন্দুস্তানের ব্যবসায়ীরা তাদের বাণিজ্যিক জাহাজ নিয়ে এসে এখানে নোঙর করে। খাম্বাত, তানাহ, কুলাম, কালিকুট, ফান্দারাইনা, শালিয়াত, মানজারুর (ব্যাঙ্গালোর), ফাকানুর, হিনাওয়ার ও গোয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে বাণিজ্যের জন্য আসে। হিন্দুস্তান ও মিসরের অনেক ব্যবসায়ী এখানে বসবাস করে। এডেনের অধিবাসীদের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক পাওয়া যায়। ব্যবসায়ী, কুলি আর জেলে। তাদের মধ্য হতে ব্যবসায়ীরা অঢেল ধন-সম্পদের মালিক। মাঝেমাঝে দেখা যায়, একটি বিরাট জাহাজের সকল পণ্য একজন

ব্যবসায়ীরই হয়ে থাকে। এতে অন্য কারো অংশীদারত্ব থাকে না। এ নিয়ে ব্যবসায়ীদেরকে প্রতিযোগিতা ও বড়াই করতে দেখা যায়।

একটি ঘটনা

একবার এক ব্যবসায়ী তার গোলামকে দুম্বা ক্রয় করার জন্য পাঠায়। সেদিন আরেক ব্যবসায়ীও তার গোলামকে একই উদ্দেশ্যে বাজারে পাঠায়। ঘটনাক্রমে সেদিন পুরো বাজারে মাত্র একটি দুম্বাই ছিল। ফলে দুই গোলাম প্রতিযোগিতা করে দুম্বার দাম বাড়াতে থাকে। অবশেষে চারশ দিনার দিয়ে এক গোলাম সেটি ক্রয় করে নেয় এবং বলে, আমার মোট সম্পদের পরিমাণই চারশ দিনার। এখন আমার মনিব যদি এই দুম্বার মূল্য আমাকে দেয়, তাহলে ভালো। নয়তো অপরপক্ষকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য আমার নিজের সম্পদ ব্যয় হয়ে যায়, এতে আমার কোনো দুঃখ নেই। অতঃপর সে দুম্বা নিয়ে তার মনিবের কাছে চলে যায়। মনিব তার ঘটনা জানতে পেরে তাকে আযাদ করে আরো এক হাজার দিনার প্রদান করে। এদিকে অপর গোলাম ব্যর্থ হয়ে তার মনিবের কাছে ফিরে গেলে মনিব তাকে প্রহার করে। তার সম্পদ কুক্ষিগত করে তাকে বিতাড়িত করে দেয়।

এডেনে নাসিরুদ্দিন আল ফা'রি নামক এক ব্যবসায়ীর কাছে অবস্থান করি। প্রতিদিন রাতে তার খাবারের আয়োজনে বিশজনের মতো ব্যবসায়ী উপস্থিত হতেন। তার গোলাম ও পরিবারকের সংখ্যা ছিল আরো বেশি। তবে এত ধনাঢ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা ছিলেন ধার্মিক, বিনয়ী, উদার ও সুচরিত্রবান। মুসাফিরদের প্রতি তারা সদয়। অসহায়দের প্রতি তারা খুবই যত্নবান। নিজ সম্পদের যাকাত দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেন তারা। শহরের বিচারক সালিম বিন আবদিল্লাহ আল হিন্দির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার পিতা ছিলেন একজন ক্রীতদাস ও কুলি। নিজের ছেলেকে তিনি ইলম অর্জনে নিয়োজিত করেন। অতঃপর সেই ছেলে ইলমে আমলে নিজেকে উন্নত অবস্থানে নিয়ে যায়। একসময় বিচারকের আসন অলংকৃত করেন। আমরা এই বিচারকের আতিথেয়তায় তিনদিন অবস্থান করি। এডেন থেকে যাত্রা করে চার দিনের সামুদ্রিক সফর শেষে আমরা জাইলা শহরে পৌছাই। এখানে বারবার উপজাতির লোকেরা বসবাস করে। তারা সুদানের একটি দল। শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। মরুভূমির মাঝে প্রায় দুই মাসের সফর

পরিমাণ অঞ্চলে তারা বসবাস করে। তন্মধ্যে প্রথম শহরটি হচ্ছে এই জাইলা। আর শেষ শহর হচ্ছে মোগাদিসু। উটের পিঠে চড়ে তারা যাতায়াত করে থাকে। আর তাদের ভেড়াগুলোও এত মোটাতাজা যে, অন্য অঞ্চলে এগুলোর কথা বেশ প্রসিদ্ধ। জাইলা শহরের অধিবাসীদের গাত্রবর্ণ কালো। তাদের অধিকাংশই রাফেযি। শহরটি আয়তনে বেশ বড়। বাজারটিও বিশাল। কিন্তু পৃথিবীতে এর চেয়ে নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত শহর দ্বিতীয়টি আছে বলে আমার মনে হয় না। জাইলা শহর থেকে আবার আমাদের সমুদ্রযাত্রা শুরু হয়। টানা পনেরো রাতের সফরের পর আমরা মোগাদিসু শহরে পৌঁছাই। এই শহরটি এতই বড় যে, তার সীমারেখা পরিমাপ করা যায় না। এখানে প্রচুর পরিমাণ উট রয়েছে। শহরের অধিবাসীরা প্রতিদিন শত শত উট জবাই করে। তাদের অনেক ভেড়া-বকরিও রয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা সমৃদ্ধশালী ব্যবসায়ী। এখানে একপ্রকার উৎকৃষ্ট কাপড় উৎপন্ন করা যায়। সারাবিশ্বে যা অদ্বিতীয়। মিসর ও অন্যান্য অঞ্চলে এই কাপড় রপ্তানি করা হয়। এই শহরের অধিবাসীদের একটি প্রথা হচ্ছে, যখনই কোনো জাহাজ তাদের বন্দরে গিয়ে পৌঁছায়, তখন তাদের বেশ কিছু যুবক নৌকায় করে ঢেকে রাখা খাবার নিয়ে গিয়ে সেই জাহাজের ব্যবসায়ীদের কাছে পরিবেশন করে আর বলে, এই নিন, আমাদের মেহমানদারি। প্রত্যেক যুবকের হাতেই খাবার থাকে। তারা একেকজন একেক ব্যবসায়ীকে নিয়ে চলে যায় নিজ গৃহে মেহমানদারি করানোর জন্য। তবে যে সকল ব্যবসায়ী এখানে আগে অনেকবার এসেছে ও এই শহরের অবস্থা সম্পর্কে জানে, তারা যেখানে মনে চায় সেখানে গিয়েই অবস্থান করতে পারে। অতঃপর এই ব্যবসায়ীরা যখন তার মেজবানের কাছে গিয়ে অবস্থান করে, তখন এই মেজবানই প্রয়োজনীয় পণ্য বেচাকেনা করে দেয়। যদি কখনো মেজবানের অনুপস্থিতি বিক্রি করে ফেলে, তাহলে তাদের নিয়ম অনুযায়ী এই বেচাকেনা সঠিক হয় না। যথারীতি আমাদের জাহাজেও এই যুবকরা উঠে আসে। তাদের একজন আমার কাছে চলে এলে আমার সাথীরা তাকে বলে, ইনি একজন ফকিহ। কোনো ব্যবসায়ী নন। তখন সেই যুবক চিৎকার করে তার অন্য সঙ্গীদের জানায়, এই ব্যক্তি বিচারকের মেহমান। তাদের মধ্যে একজন ছিল বিচারকের অনুচর। সে বেশ কজন ছাত্র নিয়ে সমুদ্র উপকূলে এসে উপস্থিত হয়। একজনকে পাঠায় আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অতঃপর আমি ও আমার সঙ্গীরা গিয়ে বিচারক ও তার অনুচরদের সালাম জানাই।

বিচারক বলেন, আল্লাহর নামে আমরা এই সালাম শায়খের জন্য নিবেদন করছি। আমি বললাম, কে এই শায়খ? তিনি বললেন, আমাদের সুলতান। তারা সুলতানকে শায়খ বলে থাকেন। আমি বললাম, আমি এখানে নেমেই সুলতানের জন্য সালাম পেশ করেছি। তিনি বলেন, কোনো ফকিহ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অথবা বুযুর্গ এলে আগে তাকে সুলতানের কাছে নিয়ে যেতে হয়। প্রথমে সুলতান তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর পরপরই তাদের যাবতীয় মেহমানদারির ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর আমরা তাদের কথামতো তাদের সঙ্গে যাই।

মোগাদিসুর সুলতানের বিবরণ

মাত্রই বললাম, মোগাদিসুর সুলতানলে স্থানীয়রা শায়খ বলে থাকে। তার নাম আবু বকর ইবনুশ শায়খ উমর। তিনি বারবার বংশোদ্ভূত। কথা বলেন মোগাদিসুর স্থানীয় ভাষায়। তবে তিনি আরবি ভাষাও জানেন। তার কিছু নিয়ম হচ্ছে, বন্দরে কোনো জাহাজ এসে ভিড়লেই সুলতানের নিয়োজিত লোকেরা নৌকা নিয়ে সেই জাহাজের লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে, তারা কোথা থেকে এসেছে? কেন এসেছে? জাহাজের নাবিক কে, মাঝি কতজন, কতজন ব্যবসায়ী আর কতজন অন্যান্য যাত্রী, এইসকল তথ্য তারা টুকে রাখে। অতঃপর সুলতানের কাছে পেশ করে। সুলতান যাদেরকে উপযুক্ত মনে করেন তাদের জন্য শাহী আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। মোগাদিসুর কাজি ইবনুল বুরহান নামে পরিচিত। মিসরীয় বংশোদ্ভূত। আমি তার সঙ্গে সুলতানের প্রাসাদে গেলে এক ভৃত্য বেরিয়ে এসে কাজিকে সালাম জানায়। তিনি তাকে বলেন, আমাদের শায়খের কাছে গিয়ে সংবাদ জানান, এই ব্যক্তি হেজাজ থেকে এসেছেন। ভৃত্য গিয়ে এই সংবাদ জানায়। অতঃপর পান-সুপারি সজ্জিত একটি পাত্র নিয়ে ফিরে আসে। সেখান থেকে আমাকে দশটি পান ও অল্প কিছু সুপারি দেওয়া হয়। অনুরূপ কাজিকেও দেওয়া হয়। অতঃপর পাত্রের অবশিষ্ট পান-সুপারি দেয় আমার সঙ্গী ও কাজির ছাত্রদেরকে। অতঃপর সে দামেস্কের গোলাপজল ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে এসে আমার ও কাজির উপর ছিটিয়ে দিয়ে বলে, আমাদের শায়খ আপনাদেরকে দারে তলাবায় অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। দারে তলাবা নির্মাণ করা হয়েছে মূলত ছাত্রদের মেহমানদারি করানোর জন্য। কাজি সাহেব আমাকে হাতে ধরে সেখানে নিয়ে যান। সুলতানের প্রাসাদের কাছেই

সেটির অবস্থান। পুরোটাই পাকা মেঝে বিশিষ্ট এবং প্রয়োজনীয় সবকিছুই সেখানে রয়েছে। অতঃপর সুলতানের প্রাসাদ থেকে আমাদের জন্য খাবার আনা হয়। সুলতানের একজন উজির আমাদের মেহমানদারির দেখভাল করেন। তিনি এসে বলেন, আমাদের শায়খ আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন। বলেছেন, আপনাদের আগমন শুভ হোক। অতঃপর আমাদের সম্মুখে খাবার পরিবেশন করা হয়। আমরা আহার করি। তারা ঘি দিয়ে ভাত রান্না করে কাঠের বড় একটি পাত্রে রাখে। সেটির উপর রাখা হয় তরকারির বাটিগুলো। সেখানে থাকে মাছ, মুরগী ও মাংসের তরকারি ও সবজি। কাচাকলা দোহনকৃত দুধে ডুবিয়ে তারা একধরনের খাবার রান্না করে। এই খাবারও একটি পাত্রে দেওয়া হয়। আরেক পাত্রে দেওয়া হয় ঘন দুধ। সেই ঘন দুধের উপর ছিল লেবুর টুকরো, সিরকায় ডুবানো লবণ মাখানো ফালি করা মরিচের টুকরো এবং আনার। আনার দেখতে অনেকটা আপেলের মতো। কিন্তু এর ভেতরটা দানায় ভর্তি। এই ফল পরিপক্ব হয়ে গেলে অনেক মিষ্টি হয় এবং অন্য ফলের মতো কেটে খাওয়া হয়। তবে পরিপক্ব হওয়ার আগে এটি লেবুর মতো টক থাকে। তারা সেগুলো ভিনেগারে ডুবিয়ে রাখে। তারা এক লোকমা ভাত খাওয়ার পর এই সিরকা ও লবণযুক্ত পানীয় পান করে থাকে।[১]

মোগাদিসুর একজন ব্যক্তি যা আহার করে, তা আমাদের একদলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এটিই তাদের অভ্যাস। স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে তারা বেশ মোটাতাজা ও বিশাল বপুর অধিকারী। খাবার পর্ব শেষে কাজি আমাদের কাছ থেকে প্রস্থান গ্রহণ করেন। আমরা এখানে তিনদিন অবস্থান। তাদের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন তিনবেলা আমাদের কাছে খাবার পরিবেশন করা হতো।

চতুর্থ দিন ছিল শুক্রবার। সেদিন কাজি, তার কিছু ছাত্র এবং শায়খের একজন উজির আমার কাছে তাদের রাজকীয় পোশাক নিয়ে আসেন। তাদের এই পোশাকের মধ্যে থাকে একটি রেশমি কাপড়ের ধুতি। যা তারা পায়জামার পরিবর্তে ব্যবহার করে। পায়জামার ব্যবহার সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। আরো থাকে মিসরীয় কাপড়ে তৈরি সূচিকর্মযুক্ত ফতোয়া, জেরুজালেমের কাপড়ের তৈরি একটি পশমি আবায়া এবং

---

[১] বর্তমান সময়ের বোরহানির মতো।–অনুবাদক

সূচিকর্মযুক্ত মিসরীয় পাগড়ি। আমার সঙ্গীদের জন্যও তারা তাদের স্তর উপযোগী পোশাক নিয়ে আসে। অতঃপর আমরা জামে মসজিদে উপস্থিত হয়ে সুলতানের মাকসুরা বা সুরক্ষিত স্থানে পেছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করি। নামায শেষে সুলতান মাকসুরা থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমি কাজির সনে তাকে সালাম জানাই। তিনি উত্তর প্রদান করেন। অতঃপর কিছুক্ষণ কাজির সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় কথায় বলেন। তারপর আরবিতে বলেন, আপনার আগমনে আমরা ধন্য। ধন্য আমাদের মাটি। এই বলে তিনি মসজিদ প্রাঙ্গণে গিয়ে তার পিতার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া করে। অতঃপর উজির, মন্ত্রীবর্গ ও সৈনিকরা এসে উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম জানায়। তাদের সালাম দেওয়ার পদ্ধতি ইয়েমেনের লোকদের মতোই। প্রথমে তর্জনী দিয়ে মাটি স্পর্শ করে সেটিকে মাথা বরাবর নিয়ে যায়। তারপর সুলতানকে উদ্দেশ্য করে বলে, আল্লাহ তাআলা আপনার সম্মান অক্ষুণ্ন রাখুন। অতঃপর সুলতান মসজিদের ফটক দিয়ে বের হয়ে জুতো পরিধান করেন। কাজি সাহেব ও আমাকে জুতো পরিধান করাতে বলেন। তারপর পায়ে হেঁটেই প্রাসাদের উদ্দেশ্যে যেতে থাকেন। মসজিদ থেকে কাছেই প্রাসাদের অবস্থান। অন্য সবাই হেঁটে যায় খালি পায়ে। সুলতানের মাথার উপর রঙিন রেশমি কাপড়ের চারটি ছাউনি উত্তোলন করে। প্রতিটি ছাউনির উপরেই স্বর্ণের মাধ্যমে তৈরি পাখির আকৃতি রয়েছে। সেদিন সুলতান জেরুজালেমের কাপড়ের তৈরি সবুজ রঙের লম্বা একটি আবায়া পরিধান করেছিলেন। এর নিচে ছিল মিসরীয় কাপড়ের তৈরি চমৎকার সূচিকর্মযুক্ত পোশাক। এর নিচে ছিল রেশমি কাপড়ের ধুতি। আর তার মাথায় ছিল বড় একটি পাগড়ি। এ সময় তার সম্মুখে ঢোল-তবলা ও বাদ্য বাজানো হয়। সামনে পেছনে তিনি উজির, আমলা-মন্ত্রী ও সৈনিক পরিবেষ্টিত ছিলেন। প্রাসাদে পৌছানোর পর কাজি সাহেবের জন্য একটি পৃথক চাটাই বিছানো হয়। যার উপর তিনি একাই বসেন। তার পাশেই ফকিহ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। আসর নামায পর্যন্ত তারা এখানে অবস্থান করেন। সুলতানের সঙ্গে আসর নামায আদায় শেষে সকল সৈনিক এসে উপস্থিত হয়ে যার যায় অবস্থান অনুযায়ী দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর ঢোল-তবলা ও বাদ্য বাজানো হয়। এই বাদ্য বাজানোর সময় কেউ একটুও নড়াচড়া করত না। তখন কেউ হেঁটে গেলে সেও সোজা দাঁড়িয়ে যেত। সামনে পেছনে কোনো নড়াচড়া করত না। বাদ্য বাজানো শেষ হলে তারা আগের মতো করে সালাম জানায়। অতঃপর যার যার ঠিকানায় ফিরে

যায়। প্রতি শুক্রবারে এটিই তাদের নিয়ম। শনিবার দিন জনগণ সুলতানের প্রাসাদের দরজায় এসে উপস্থিত হয়ে প্রাসাদের বাইরের করিডোরে অবস্থান নেয়। অতঃপর কাজি, ফকিহ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও হজ আদায় করে আসা ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় দরবারকক্ষে গিয়ে তাদের জন্য স্থাপিত আসনগুলোতে বসেন। কাজি বসেন পৃথক আসনে। প্রত্যেকের জন্যই এমন আসন নির্ধারিত রয়েছে। অতঃপর সুলতান এসে মূল দরবারে নিজ আসনে উপবিষ্ট হোন। তিনি এসে কাজিকে ডেকে পাঠান। কাজি গিয়ে তার বামপাশে বসেন। অতঃপর একে একে অন্যান্য ফকিহ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, উলামা-মাশায়েখ, হাজি, আমির-উমরা ও সেনাপ্রধানরা সেখানে প্রবেশ করে সুলতানকে সালাম জানিয়ে সামনে বসে পড়েন। কোনো মেহমান থাকলে তাকে সুলতানের ডানপাশে বসানো হয়। অতঃপর খাবার পরিবেশন করা হয়। সবার আগে সুলতান, কাজি ও সামনে উপবিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একসঙ্গে আহার করেন। সুলতান তার আমির-উমারাদের মধ্য হতে বিশিষ্ট কাউকে সম্মানিত করতে চাইলে তাকে ডেকে পাঠান। অতঃপর তিনিও তাদের সঙ্গে আহার করেন। এছাড়া অন্য যারা আছেন তাদের সবার খাবারের জন্য আলাদা খাবারের কক্ষ রয়েছে। তারা একে একে গিয়ে সেখান খাবার গ্রহণ করেন। অতঃপর সুলতান চলে যান তার প্রাসাদে। এদিকে কাজি, উজির-নাজির, সুলতানের ব্যক্তিগত সচিব এবং চারজন বিশিষ্ট মন্ত্রী বসেন জনগণের অভিযোগ শুনে ফায়সালা করার জন্য। শরিয়তের কোনো বিধানসংক্রান্ত অভিযোগ হলে ফায়সালা দেন কাজি। অন্য সব বিষয়ে উজির ও আমিরগণের মাধ্যমে গঠিত পরামর্শ সভা থেকে ফায়সালা দেওয়া হয়। সুলতানের কাছে কোনো পরামর্শের প্রয়োজন হলে তাকে কাগজে লিখে জানানো হয়। তৎক্ষণাৎ কাগজের অপর পিঠে সুলতান নিজের অভিমত ও পরামর্শ লিখে পাঠান। এমনটিই তাদের রীতি।

অতঃপর মোগাদিসু থেকে বিদায় নিয়ে আমি উপকূলীয় অঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। এবার আমার গন্তব্য জানজ অঞ্চলের কুলওয়া শহর। এই যাত্রায় প্রথমে উপনীত হই মাম্বাসা[১] নগরীতে। এটি বেশ বড় একটি শহর। এখান থেকে দুইদিন সামুদ্রিক সফর শেষে উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছানো যায়। স্থলপথে সফর করা যায় না। মাম্বাসায় প্রচুর পরিমাণে কলা, লেবু ও কমলা

---

[১] বর্তমান কেনিয়ার একটি বন্দর নগরী। জানজ অঞ্চল বলতে বুঝায় উত্তর আফ্রিকার নির্দিষ্ট একটি অংশকে। এখান থেকেই বর্তমান জাঞ্জিবার রাষ্ট্রের উৎপত্তি।—অনুবাদক

গাছ রয়েছে। এ ছাড়া জাম নামক আরেকটি ফল রয়েছে। যা দেখতে অনেকটা জায়তুনের মতো এবং এর মতোই দানাবিশিষ্ট। তবে এই জাম খেতে খুব মিষ্টি। মাম্বাসার অধিবাসীরা এমনিতে কোনো চাষাবাদ করে না। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে এখানে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়। অধিকাংশ সময় তারা কলা ও মাছ খেয়েই জীবনধারণ করে। এখানকার অধিবাসীর শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। বেশ ধার্মিক ও ন্যায়-নীতিবান। তাদের মসজিদগুলো কাঠের তৈরি এবং বেশ মজবুত। মসজিদগুলোর প্রতিটি দরজার সম্মুখেই একটি দুটি কূপ থাকে। এইসব কূপের গভীরতা একগজ থেকে দুইগজ পরিমাণ হয়ে থাকে। একহাত পরিমাণ চিকন লাঠিযুক্ত কাঠের পাত্রে করে তারা কূপ থেকে পানি উঠিয়ে আনে। কূপের আশপাশের জায়গা ও মসজিদের মেঝে পাকা করে দেওয়া হয়েছে। তাই মসজিদে প্রবেশের আগে সবাই দুই পা ধৌত করে নেয়। মসজিদের দরজায় মোটা চাটাইয়ের টুকরো ঝুলানো থাকে। সেটির মাধ্যমে সবাই পা মুছে নেয়। অযু করার সময় তারা কাঠের পাত্রটিকে দুই রানের মাঝে আটকে রাখে দুই হাতের উপর পানি ঢেলে অযু করে। এখানকার সবাই খালি পায়ে চলাফেরা করে। এই দ্বীপে আমরা একরাত অবস্থান করি। অতঃপর কুলওয়া শহরের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে রওনা দেই। কুলওয়া বেশ বড় একটি উপকূলীয় শহর। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষ্ণবর্ণের নিগ্রো। তাদের চেহারায় ট্যাটুর চিহ্ন রয়েছে। যেমনটি জানাদার[১] লিমি গোত্রের লোকদের চেহারায়। এক ব্যবসায়ী আমাকে জানিয়েছেন, কুলওয়া শহর থেকে সুফালা শহরের দূরত্ব পনেরো দিনের সফর পরিমাণ। আর সুফালা ও লিমিদের অঞ্চলে অবস্থিত ইউফি শহরের মধ্যকার দূরত্ব এক মাসের সফর পরিমাণ। ইউফি থেকেই সুফালায় স্বর্ণের টুকরো আমদানি করা হয়। কুলওয়া শহরটি বেশ চমৎকার এবং মজবুত স্থাপনাবিশিষ্ট। এখানকার সব স্থাপনাই কাঠের। বাড়ির ছাদে ব্যবহৃত হয়ে দিস নামক একপ্রকার নলখাগড়া। এখানে অনেক বৃষ্টি হয়। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে জিহাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। কারণ তারা জানজ গোত্রীয় কাফেরদের সঙ্গে একই ভূখণ্ডে বসবাস করেন। তারা শাফেয়ী মাযহাবের অনুসরণ করেন এবং তাদের প্রায় সকলেই ধার্মিক ও উদারপ্রাণ।

---

[১] বর্তমান গিনি রাষ্ট্র।—অনুবাদক

কুলওয়ার সুলতানের বিবরণ

তখন কুলওয়ার সুলতান ছিলেন আবুল মুজাফফর হাসান। তিনি অনেক উদার ও অনেক দান-সদকা করে থাকেন। তাই তাকে আবুল মাওয়াহিব তথা দানের পিতা উপনামেও ডাকা হয়। জানজ গোত্রীয় কাফেরদের সঙ্গে তিনি অনেক যুদ্ধ করেছেন। তাদের উপর হামলা করে গণিমতের সম্পদ লাভ করেছেন। সেগুলো থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করে পবিত্র কুরআনে তা যে খাতে ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে ব্যয় করতেন। আত্মীয়দের অংশ রাখতেন আলাদা কোষাগারে। সাম্রাজ্যে আগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে সেখান থেকে উপহার দেওয়া হতো। ইরাক, হেজাজ ও আরো দূরের অঞ্চল থেকে সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ তার কাছে আসতেন। আমি তার কাছে হেজাজের একদল জ্ঞানীগুণী লোককে দেখতে পেয়েছিলাম। তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন জাম্মাজ, মানসুর বিন লুবাইদা বিন আবি নুমাই এবং মুহাম্মাদ বিন শুমাইলা বিন আবি নুমাই প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। মোগাদিসুতে থাকার সময় উতাইল বিন কুবাইশ বিন জাম্মাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনিও কুলওয়ার সুলতানের কাছে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। এই সুলতান অত্যন্ত বিনয়ী একজন মানুষ। অসহায়-দরিদ্র লোকদের সঙ্গে বসে আহার গ্রহণ করেন। ধার্মিক ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের অনেক সম্মান ও সমাদর করেন।

তার বদান্যতার ঘটনা

এক শুক্রবার দিন আমি তার কাছে উপস্থিত হই। তখন জুমার নামায আদায় শেষে তার প্রাসাদের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। পথে ইয়েমেনের একজন অসহায় ব্যক্তি তার কাছে এসে বলে, ওহে আবুল মাওয়াহিব। তিনি বলেন, আমি উপস্থিত। বলুন, আপনার কী প্রয়োজন? লোকটি বলে, আপনার পরিধানকৃত পোশাকটি আমাকে দিয়ে দিন। সুলতান বলেন, অবশ্যই আমি তোমাকে এটি দিয়ে দেব। লোকটি বলে, এই মুহূর্তেই দিন। সুলতান বলেন, আচ্ছা এখনই দিচ্ছি। এই বলে তিনি মসজিদের দিকে ফিরে গিয়ে খতিবের গৃহে গিয়ে সেই পোশাক খোলে অন্য একটি পোশাক পড়েন। অতঃপর অসহায় লোকটিকে বলেন, যান। ভেতরে গিয়ে সেটি নিয়ে নিন। লোকটি ভেতরে গিয়ে সেই পোশাকটি নিয়ে একটি রুমালে বেঁধে তার মাথার উপরে করে নিয়ে চলে যায়। সুলতানের এই বিনয় ও উদারতা দেখে লোকেরা তার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যায়। সুলতানের ছেলে ও তার

স্থলাভিষিক্ত দশটি ক্রীতদাসের বিনিময়ে লোকটির কাছ থেকে সেই পোশাকটি নিয়ে নেয়। এদিকে এই কাজের জন্য লোকদের এত এত প্রশংসা শুনে সুলতানও সেই অসহায় লোকটির কাছে দশটি ক্রীতদাস ও দুই বোঝা মূল্যবান হাতির দাঁত প্রেরণের নির্দেশ দেন। উপহার হিসেবে তাদের মাঝে হাতির দাঁতের প্রচলনই বেশি। স্বর্ণের ব্যবহার খুবই কম।

মহান এই সুলতানের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় বসে তার ভাই দাউদ। কিন্তু সে ছিল পুরোই বিপরীত প্রকৃতির। তার কাছে এসে কেউ কিছু চাইলে সে বলত, যে দান করত সে মারা গেছে। তার পরের লোকেরা যে দান করবে, এমন কিছু তিনি রেখে যাননি। তখন আগত ব্যক্তিরা অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করত। এর ফলে বাধ্য হয়ে সে সামান্য পরিমাণ দান করত। এরপর আগত ব্যক্তিরা চলে যেত।

কুলওয়া থেকে আমরা সমুদ্রপথে আমরা জাফার আল হুমুদ শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। এটি ভারত মহাসাগরের উপকূলে ইয়েমেনের সর্বশেষ অঞ্চল। এখান থেকেই ভারতবর্ষে ঘোড়া রপ্তানি করা হয়। সমুদ্রপথে বাতাস অনুকূলে থাকলে এখান থেকে একমাসেই ভারতবর্ষে পৌঁছানো যায়। এর আগে একবার অনুকূল বাতাসের সাহায্যে ভারতবর্ষের কালিকুট থেকে যাত্রা করে আটাশ দিনে আমি জাফারে এসে পৌঁছেছিলাম। এইসময় দিন-রাতের কোনো অংশেই আমাদের যাত্রায় কোনো বিঘ্নতা ঘটেনি। এখান থেকে মরুর স্থলপথে এডেনের দূরত্ব একমাসের। হাদরামাউতের দূরত্ব ষোলো দিনের। আর আম্মানের দূরত্ব বিশ দিনের।

জাফার শহরটির অবস্থান একেবারে মরুভূমির মাঝে। এখানে নেই কোনো সুবিন্যস্ত জনপদ। নেই কোনো স্বনির্ভর ব্যবস্থাপনা। বাজারের অবস্থান শহরতলীর হারজা নামক স্থানে। এমন নোংরা ও দুর্গন্ধময় বাজার আমি খুব কমই দেখেছি। আর কোথাও আমি এত মাছি ভনভন করতে দেখিনি। প্রচুর ফলমূল ও মাছ বিক্রি করার ফলে এখানে অনেক মাছি এসে ভিড় জমায়। এখানে সারডিন নামক একপ্রকার মাছ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার এই মাছগুলো অনেক মোটাতাজা হয়ে থাকে। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, এখানকার লোকদের বাহনজন্তু ও মেষপালের খাবারও প্রস্তুত করা হয় এই সারডিন মাছ থেকে।[১] এমনটি আমি অন্য কোথাও দেখিনি। বাজারের

---

[১] সারডিন মাছের অনেক প্রজাতি হয়ে থাকে। দেখতে অনেকটা ইলিশ মাছের মতোও আকার ছোট। বাংলাদেশেও ইন্ডিয়ান প্রজাতির সারডিন মাছ সচরাচর পাওয়া যায়। মূল্য অল্প হলেও খেতে খুব সুস্বাদু। কিছু অঞ্চলে এটিকে চৌক্কা নামেও ডাকা হয়।

অধিকাংশ বিক্রেতা হচ্ছে দাসী। তারা কালো কাপড় পরিধান করে। এখানকার প্রধান শস্য হচ্ছে বাজরা।[১] দূরের কূপ থেকে তারা শস্যক্ষেত্রে পানি সিঞ্চন করে থাকে। বড় একটি বালতি নিয়ে তার মধ্যে অনেকগুলো রশি বেঁধে পানি টেনে এনে তারা জমিনে সেচ দেয়। প্রতিটি রশির গোড়া একজন ক্রীতদাস বা চাকরের কোমরে বাঁধা থাকে। কূপের উঁচু থেকে বালতি নিক্ষেপ করে পানি উত্তোলন করে একটি হাউজে নিয়ে রাখা হয়। অতঃপর সেই হাউজ শস্যক্ষেত্রে পানি সিঞ্চন করা হয়। আলাস নামক অপর এক ধরনের গমজাতীয় শস্যও তারা উৎপাদন করে থাকে। যা মূলত বার্লি বা যবেরই একটি প্রকার। ভারতবর্ষ থেকে এখানে চাল আমদানি করা হয়। এই চালই এখানকার প্রধান খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই শহরের মুদ্রা তামা ও টিনের তৈরি। যা শুধুমাত্র এই অঞ্চলেই সচল। অন্য কোথাও এটি মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। এখানকার অধিবাসীদের একমাত্র জীবিকা ব্যবসা। তাদের প্রথা হচ্ছে, যখন ভারতবর্ষ অথবা অন্য কোনো স্থান থেকে তাদের বন্দরে জাহাজ এসে পৌঁছায়, তখন এখানকার সুলতানের কিছু ভৃত্য ছোট নৌকায় চড়ে সেই জাহাজে যায়। তাদের সঙ্গে থাকে জাহাজের মালিক অথবা প্রতিনিধি এবং নাবিক ও কেরানির জন্য পোশাক। অতঃপর তাদের জন্য তিনটি ঘোড়া আনা হয়। সেগুলোর উপর চড়ে তারা সমুদ্র উপকূল থেকে সুলতানের প্রাসাদের উদ্দেশ্যে যেতে থাকেন। এ সময় তাদের সম্মুখে ঢোল-তবলা বাজানো হয়। প্রাসাদে পৌঁছে তারা উজির ও সেনাপতিকে সালাম জানান। অতঃপর জাহাজের সকল যাত্রীকে তিনদিন মেহমানদারি করানো হয়। তিনদিন পর তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয় সুলতানের ব্যক্তিগত প্রাসাদে।

জাহাজের যাত্রীদের মনোতুষ্টির জন্য তারা এমনটি করে থাকেন। স্বভাবগতভাবে তারা বিনয়ী, সুচরিত্রবান ও উদার। আগত মুসাফিরদের প্রতি তারা খুব ভালোবাসা লালন করেন। তারা সুতি পোশাক পরিধান করে থাকেন। ভারতবর্ষ থেকে এই সুতো আমদানি করা হয়। পায়জামার

মধ্যযুগীয় আরেক পরিব্রাজক ইবনুল মুজাওয়ির বলেন, 'এই অঞ্চলের গৃহপালিত প্রাণীর খাবার হচ্ছে সারডিন মাছের শুটকি। এমনকি এই মাছকেই এই অঞ্চলের জমিনে সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।' –অনুবাদক

[১] বাজরা (Pearl Millet) ঘাসজাতীয় একটি দানাদার শস্য। এটি গ্লুটেনমুক্ত, ফাইবার শস্যসমৃদ্ধ, পুষ্টিকর এবং সহজে হজমযোগ্য সুপারফুড হিসেবেও বিবেচিত। এটি আকার ও আকৃতির দিক থেকে বার্লির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে এতে ফাইবার আছে বার্লির চেয়েও বেশি। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে ভারত ও আফ্রিকায় এটির ব্যাপক চাষ হয়ে আসছে। –অনুবাদক

পরিবর্তে তারা ধুতি পরিধান করেন। প্রচণ্ড গরমের কারণে তাদের অধিকাংশ লোক কোমড়ের নিচে ধুতি পরিধান করে শরীরের উপরে একটি কাপড় দিয়েও রাখেন। দৈনিক কয়েকবার গোসল করতে হয় তাদের।

এই শহরে অনেক মসজিদ রয়েছে। প্রতিটি মসজিদে রয়েছে অনেকগুলো প্রক্ষালনকক্ষ। সেখানে গোসল করার ব্যবস্থাও রয়েছে। এখানে রেশমি, সুতি ও লিলেন কাপড়ের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও চমৎকার পোশাক তৈরি করা হয়।

এখানকার অধিকাংশ নারী ও পুরুষ এলিফেন্টিয়াসিস (Elephantiasis)[১] নামক এক রোগে আক্রান্ত। এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে দুই পা অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যাওয়া। এছাড়াও এখানকার অধিকাংশ পুরুষ হার্নিয়া[২] রোগে আক্রান্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন। তাদের প্রশংসনীয় একটি স্বভাব হচ্ছে, প্রতিদিন ফজর ও আসর নামাযের পর তারা পরস্পর মুসাফাহা করে। প্রথম কাতারের মুসল্লিরা পিঠ পেছনে দিয়ে পরের কাতারের মুসল্লিদের সঙ্গে মুসাফাহা করে। এমনিভাবে জুমার নামাযের পরেও তারা এমনটি করে থাকে। এই শহরের আশ্চর্য একটি বিষয় হচ্ছে, কেউ যদি এই শহরের কোনো অনিষ্ট করার ইচ্ছে করে, তবে তার কোনো না কোনো ক্ষতি হয়ে যায়। ফলে সে আর তার ইচ্ছে বাস্তবায়ন করতে পারে না।

জানা যায়, হুরমুজের সুলতান কুতুবুদ্দিন তামতাহান বিন তুরান শাহ একবার জল ও স্থল দুইদিক থেকেই এই শহরে অবরোধ করেছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এমন ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করেন, যা তার নৌবহরের জাহাজগুলো তছনছ করে দেয়। অতঃপর তিনি অবরোধ উঠিয়ে এখানকার রাজার সঙ্গে সন্ধি করে ফিরে যান।

এমনিভাবে ইয়েমেনের সুলতান আল মালিকুল মুজাহিদও তার এক চাচাতো ভাইকে বিশাল এক বাহিনীসমেত এই শহর দখল করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বাহিনী নিয়ে বের হওয়ার পর পথিমধ্যে তিনিসহ একদল সৈন্যের উপর দেয়াল ধসে পড়লে সেখানেই তাদের মৃত্যু হয়। তখন ইয়েমেনের সুলতান জাফার দখলের ইচ্ছা থেকে বিরত হন। জাফারের সুলতান ছিলেন তার আরেক চাচাতো ভাই।

---

[১] এটি লিম্প্যাথিক ফাইলেরিসায়িস (Lymphatic Filariasis) নামেও পরিচিত। মূল আরবিতে এটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে দাউল ফিল (داء الفيل) বা হাতির রোগ। –অনুবাদক

[২] আরবিতে এই রোগের নাম উল্লেখ করা হয়েছে الأدر। এই রোগের কারণে দুই অণ্ডকোষ ফুলে যায়। –অনুবাদক

আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, এখানকার অধিবাসীদের আচরণ ও কাজকর্মে মাগরিব অঞ্চলের লোকদের সাথে খুব সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এখানে আমি শহরের বিশাল জামে মসজিদের খতিব ইসা বিন আলীর গৃহে অবস্থান করেছিলাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ও সম্মানিত ব্যক্তি। তার কিছু দাসী ছিল। যাদের নাম ছিল মাগরিব অঞ্চলের দাসীদের নামের মতোই। এক দাসীর নাম ছিল বুখাইতাহ। আরেক দাসীর নাম ছিল যাদুল মাল। অন্য কোথাও আমি এমন নাম শুনিনি। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীর মাথা উন্মুক্ত থাকে। তারা পাগড়ি-টুপি পরিধান করে না। প্রতিটি ঘরেই খেজুর গাছের পাতার মাধ্যমে তৈরি করা জায়নামাজ ঝুলানো থাকে। যার উপর দাঁড়িয়ে তারা নামায আদায় করে। মাগরিব অঞ্চলেও এমনটি দেখা যায়। এছাড়াও তাদের প্রধান শস্য হচ্ছে বাজরা। এতসব মিল দেখে একটি কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, মাগরিব অঞ্চলের সানহাজি ও অন্যান্য গোত্রের মূল হচ্ছে হিমইয়ার।

শহর থেকে নিকটেই বাগানঘেরা একটি জায়গায় রয়েছে জাফারের অধিবাসী বুযুর্গ শায়খ আবু মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বিন ইসার খানকা। শহরের অধিবাসীদের কাছে এই খানকা খুবই সম্মানিত। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তারা এখানে আসে ও আশ্রয় কামনা করে। একবার কোনো আশ্রয়প্রার্থী এখানে প্রবেশ করলে, তার উপর সুলতানের কোনো ক্ষমতা থাকে না। আমি সেখানে একটি লোককে দেখতে পাই। জানতে পারি দীর্ঘদিন ধরে তিনি এখানে শরণার্থী হিসেবে আছেন। সুলতানের পক্ষ থেকে তাকে কোনো ধরপাকড়ের মুখোমুখি হতে হয়নি।

আমার জাফারে অবস্থানকালীন সময়ে সুলতানের কেরানি খানকায় গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং বেশ কিছুদিন অবস্থান করে। অবশেষে সুলতান ও তার মাঝে সমঝোতা সম্পন্ন হয়। আমি এই খানকায় গিয়ে আলোচিত শায়খ আবু বকরের দুই সন্তান শায়খ আবুল আব্বাস আহমাদ ও আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদের আতিথেয়তায় অবস্থান করি। সেখানে তাদের আশ্চর্য বিনয় ও উদারতা লক্ষ্য করি। খাবার শেষ করে হাত ধৌত করার পর শায়খ আবুল আব্বাস এসে আমাদের হাত ধোঁয়া পানি নিয়ে গিয়ে নিজে পান করেন এবং খাদেমের মাধ্যমে বাকি অংশটুকু ভেতরে পাঠিয়ে দেন তার পরিবারের সদস্যদের পান করানোর জন্য। তাদের কাছে আগত যে সকল মেহমান

থেকে তারা কল্যাণের আশা করেন, তাদের প্রতি তারা এমনই করে থাকেন। এমনিভাবে জাফারের কাজি আবু হাশিম আবদুল্লাহ আজ জাবিদিও আমার মেহমানদারি করেছেন। তিনি নিজ হাতে আমার খাবার পরিবেশন করেছেন ও আমার হাত ধৌত করে দিয়েছেন। অন্য কাউকে এই কাজ করতে দেননি। শায়খ আবু বকরের খানকার নিকটেই রয়েছে সুলতান আল মালিকুল মুগিসের সমাধি। এটিও স্থানীয়দের কাছে অনেক সম্মানিত স্থান। সেখানে গিয়ে কেউ তার প্রয়োজনের কথা বলে প্রার্থনা করলে তার প্রয়োজন পূরণ করা হয়। এখানকার সৈনিকরা যদি মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও তাদের বেতন-ভাতা না পেতো, তারা এই সমাধিতে গিয়ে প্রার্থনা করত। অতঃপর তাদের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা হলে তারা সেটি নিয়ে ফিরে যেত।

জাফার থেকে অর্ধ দিনের দূরত্বে অবস্থিত ঐতিহাসিক আল আহকাফ শহর। যেখানে ছিল কুরআনে বর্ণিত আদ জাতির লোকদের বসবাস। এখানে রয়েছে একটি খানকা এবং সমুদ্র উপকূলীয় অংশে রয়েছে একটি মসজিদের অবস্থান। এর আশপাশে রয়েছে জেলেদের পল্লী। উল্লিখিত খানকায় রয়েছে একটি কবর। যার ফলকে লেখা আছে, এটি হুদ আ.-এর কবর। এর আগে শুনেছিলাম, দামেস্কের জামে মসজিদেও হুদ আ.-এর কবর লেখা একটি স্থান রয়েছে। তবে তার কবর আহকাফে অবস্থিত হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ, তিনি এখানে বসবাস করেছিলেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

জাফারি শহরের বাগানগুলোতে বড় আকারের অনেক কলা উৎপন্ন হয়। আমার সম্মুখেই একটি কলার পরিমাপ করলে দেখা যায় সেটির ওজন হয়েছে বারো আউন্স। এই কলা খেতে অনেক সুস্বাদু ও মিষ্টি। এখানে অনেক পান এবং নারিকেলও পাওয়া যায়। এর আগে কেবল ভারতবর্ষেই এই দুটি দেখেছি। জাফারের অবস্থান ভারতবর্ষের কাছাকাছি হওয়ায় এখানেও এগুলো উৎপন্ন হতে দেখা যাচ্ছে। তবে জাবিদ শহরে সুলতানের বাগানে আমি ছোট ছোট নারিকেল গাছ দেখেছিলাম। পান আর নারিকেলের কথা যখন এসেই গেল, তাহলে এই দুটির বিবরণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

পানের বিবরণ

আঙুর ফলের ঝোপের মতোই পানের ছড়া রোপণ করতে হয়। এরজন্য বাঁশ অথবা নলখাগড়ার মাধ্যমে ঝাঁপা তৈরি করা হয়। যেমনটি আঙুর ফলের

ঝোপের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। কখনো কখনো নারিকেল গাছের পাশেও পানগাছ রোপণ করা হয়। তখন এর লতা নারিকেল গাছে বইতে শুরু করে। যেভাবে আঙুর গাছকেও বেয়ে উঠতে দেখা যায়। তবে পানগাছের কোনো ফল হয় না। এই গাছের পাতাই মূল। এই পাতা দেখতে অনেকটা রাসবেরি গাছের পাতার মতো। হলুদ রঙের পাতা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। প্রতিদিন এই গাছ থেকে পাতা আহরণ করা হয়। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের পান খুবই মূল্যবান। বাড়িতে কোনো মেহমান এলে তাকে প্রথমে পাঁচটি দেওয়া হয়। তাদের অভিব্যক্তি হয় এমন, যেন তাকে পুরো পৃথিবীটাই দিয়ে ফেলেছে। বিশেষ করে কোনো গণ্যমান্য লোক এলে তাকে এই পানের মাধ্যমে সমাদর করা হয়। তাদের কাছে এটি স্বর্ণ-রূপার চেয়েও অধিক মূল্য রাখে। পান খাওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে সুপারি নিয়ে সেটিকে টুকরো টুকরো করে মুখে নিয়ে চিবোতে হয়। এই সুপারি দেখতে অনেকটা গোল মরিচের মতো। অতঃপর পানের পাতার উপর সামান্য জর্দা মাখিয়ে সেটি মুখে দিয়ে সুপারির সঙ্গে চর্বণ করতে হয়। এর বিশেষত্ব হচ্ছে, এটি মুখের দুর্গন্ধ দূর করে নিঃশ্বাসকে সুরভিত করে। খাবার হজমে সহায়ক হয়। খালি পেটে পানি পান করার ক্ষতিকর প্রভাব দূর করে। খাবারের চাহিদা বাড়ায় এবং সহবাসে উৎসাহিত করে। লোকেরা তাদের মাথার কাছেই এই পান রেখে দেয়। ঘুম থেকে উঠার পর এটি মুখে দিলে দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। আমি শুনেছিলাম, ভারতবর্ষের সুলতান ও আমলা-মন্ত্রীদের দাসীরা পান ছাড়া আর কিছুই খায় না। ভারতবর্ষের কথা আলোচনা করার সময় আমি তাদের কথা উল্লেখ করব।

নারিকেলের বিবরণ

এটিকে বলা যায় ভারতবর্ষের আখরোট। নারিকেলের গাছ দেখতে খুবই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর উচ্চতাসম্পন্ন। দেখতে অনেকটা খেজুর গাছের মতোই। খুব একটা পার্থক্য করা যায় না। তবে নারিকেল গাছ থেকে হয় আখরোটের মতো ফল। আর খেজুর গাছ থেকে হয় খেজুর। নারিকেল দেখতে অনেকটা মানুষের মাথার মতো। এর মধ্যে দুই চোখ ও মুখের মতো আকৃতি রয়েছে। এটি যখন সবুজ থাকে, তখন এর ভেতরটা থাকে মস্তিষ্কের মতো। এর উপরে থাকে চুলসদৃশ পাতা। এই পাতার মাধ্যমে রশি বানিয়ে নৌযানে লোহার পেরেকের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। এমনকি এই রশি নৌযান

বেঁধে রাখার জন্যও ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে মালদ্বীপের নারিকেলগুলো হয়ে থাকে মানুষের মাথার সমান। কথিত আছে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের এক পণ্ডিত কোনো এক রাজার খুবই কাছের লোক ছিলেন। রাজা তাকে খুবই সম্মান-সমাদর করতেন। সেই রাজার ছিল এক উজির। এই উজির আর পণ্ডিতের মাঝে ছিল শত্রুতা। একদিন পণ্ডিত রাজাকে বলেন, যদি এই উজিরের মাথা কর্তন করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয় তাহলে সেটি থেকে খেজুর গাছের মতো একটি গাছ বের হবে। আর তার ফল হবে অনেক বড়। শুধু ভারতবর্ষের লোক কেন, সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যই এটি অনেক উপকারী হবে। তখন রাজা পণ্ডিতকে বলেন, যদি উজিরের মাথা থেকে আপনার কথামতো গাছ বের না হয় তখন কী হবে? পণ্ডিত জবাব দেন, তাহলে আপনি আমার মাথা কেটে উজিরের মাথার মতো পুঁতে দিবেন। রাজা তখন উজিরের মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। পণ্ডিত সেই মাথা নিয়ে এর মধ্যে খেজুরের দানা গেঁথে দেয়। সেই দানা থেকে গাছ বেরিয়ে আসে। অতঃপর তা থেকে নারিকেল উৎপন্ন হয়। এটি কাল্পনিক গল্প। কিন্তু তাদের কাছে এটি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করায় উল্লেখ করলাম। নারিকেলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি শরীরের বল বৃদ্ধি করে, দ্রুত স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় এবং চেহারাকে ফর্সা করে। এছাড়া মেজাজ ঠান্ডা করার ক্ষেত্রেও এটি খুব সহায়ক হয়। এর আশ্চর্য দিক হচ্ছে, প্রাথমিক সময়ে এটি সবুজ রঙের থাকে। তখন এটি গাছ থেকে কেটে এনে ছুরি দিয়ে এর খোসার অগ্রভাগ ছিদ্র করে অত্যন্ত শীতল ও সুমিষ্ট পানি পান করা যায়। যাদের মেজাজ গরম তারা এই পানি পান করে নিমিষেই ঠান্ডা হয়ে যায়। পানি পান শেষে এর খোসার টুকরোকে চামচের মতো বানিয়ে নারিকেলের শক্ত আবরণের ভেতর থেকে নরম পদার্থ বের করে আনা হয়। তা খেলে অনেকটা আধাসেদ্ধ ডিমের মতো স্বাদ অনুভূত হয়। এই নারিকেলের মাধ্যমে খাবারও প্রস্তুত করা হয়। মালদ্বীপে টানা দেড়বছর অবস্থানের সময় আমি এই খাবার খেয়েছি।

এর আরেকটি আশ্চর্য দিক হচ্ছে, এর মাধ্যমে তেল, দুগ্ধজাতীয় তরল পানীয় এবং মধুও তৈরি করা হয়। মধু তৈরি করার পদ্ধতিটি বলি। যারা নারিকেল গাছের পরিচর্যা করে তাদেরকে বলা হয় ফানজানিয়া। নারিকেল গাছের পানি দিয়ে মধু তৈরি করার সময় তারা গাছে উঠে গাছের যে অংশ থেকে ফল উৎপন্ন হয় সেখানে কেটে দুই আঙুল পরিমাণ ফাঁকা জায়গা রেখে এর নিচে

একটি ছোট পাত্র বেঁধে দেয়। অতঃপর সেই পাত্রে ফোঁটা ফোঁটা করে পানি পড়তে থাকে। সকালে পাত্র বেঁধে দিয়ে তারা সন্ধ্যায় দুইটি পাত্র নিয়ে গাছে উঠে। একটি পাত্র থাকে পানিভর্তি। গাছের রসগুলো একপাত্রে ঢেলে অপর পাত্রের পানি দিয়ে তারা গাছে ঝুলিয়ে রাখা পাত্রটিকে ধৌত করে পুনরায় ঝুলিয়ে দেয়। অতঃপর সকাল-সন্ধ্যা তাদের এই প্রক্রিয়া চলমান থাকে। এভাবে যখন বেশ পরিমাণ গাছের রস জমা হয়, তখন তারা সেগুলোকে আঙুরের রসের মতো জাল দেয়। অতঃপর এগুলো উপকারী ও রসালো স্বাদের মধুতে পরিণত হয়। ভারতবর্ষ, ইয়েমেন ও চীনের ব্যবসায়ীরা এগুলো ক্রয় করে নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে এগুলোর মাধ্যমে মিষ্টান্ন তৈরি করে। আর দুগ্ধজাতীয় তরল পানীয় তৈরির পদ্ধতিটি বলি এবার। মহিলাদের হাতে একটি লাঠি থাকে, যার অগ্রভাগে থাকে ধাতব বস্তু থাকে। অতঃপর নারিকেল কেটে ফাঁকা করে সেই ধাতব বস্তু দিয়ে নারিকেলের ভেতরে যা থাকে তা বের করে একটি পাত্রে জমা রাখা হয়। এর সঙ্গে পানি মিশ্রণ করলে তা দুধশুভ্র আকার ধারণ করে। স্বাদও হয় দুধের মতো। এগুলো তারা সস হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এবার বলি তেল তৈরি করার পদ্ধতি। নারিকেল পরিপক্ব হয়ে গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার পর তারা এর খোসাগুলো ছাড়িয়ে নারিকের মূল অংশ টুকরো টুকরো করে রোদে শুকাতে দেয়। পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার পর সেগুলোকে ডেকচিতে নিয়ে জাল দিয়ে তেল তৈরি করা হয়। এই তেল মাথায় ব্যবহার করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

জাফারের সুলতানের বিবরণ

জাফারের সুলতানের নাম আল মালিকুল মুগিস ইবনুল মালিক আল ফায়িজ। তিনি ইয়েমেনের সুলতানের চাচাতো ভাই। তার পিতা ইয়েমেনের সুলতানের পক্ষ থেকে জাফারের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার প্রতি ইয়েমেনের সুলতানের কাছে বাৎসরিক নির্দিষ্ট একটি উপঢৌকন হিসেবে পাঠানোর নির্দেশ ছিল। অতঃপর বর্তমান সুলতান আল মালিকুল মুগিস নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বাৎসরিক উপঢৌকন পাঠাতে অস্বীকৃতি জানায়। ইয়েমেনের সুলতান তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে তিনি আরেক চাচাতো ভাইকে সেনাবাহিনীসমেত পাঠিয়েও ছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তার উপর দেয়াল ধসে পড়ে। যে

আলোচনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। শহরের অভ্যন্তরে রয়েছে সুলতানের বিরাট প্রাসাদ। যার নাম আল হিসন। প্রতিদিন আসরের নামাযের তার প্রাসাদের ফটকে ঢোল-তবলা ও বাদ্য বাজানো হয়। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনী প্রাসাদে এসে দরবার হলের বাইরে কিছুক্ষণ অবস্থান নিয়ে আবার ফিরে যায়। কেবলমাত্র শুক্রবার দিনই সুলতান জনসম্মুখে আসেন। জামে মসজিদের নামায আদায় করে পুনরায় ফিরে আসেন প্রাসাদে। তবে দরবার হলে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। দেহরক্ষীবাহিনীর প্রধান হলের ফটকে দাঁড়িয়ে থাকেন। তার কাছে সবাই যার যার প্রয়োজন অথবা অভিযোগের কথা জানিয়ে যায়। অতঃপর তিনি সুলতানকে অবগত করেন এবং তৎক্ষণাৎ উত্তর নিয়ে আসেন। সুলতান কখনো বাইরে যেতে চাইলে তার লোকেরা গিয়ে শহরের বাইরে থেকে একটি উট নিয়ে আসে। যার উপরে থাকে স্বর্ণের জরিযুক্ত সাদা কাপড়ের পর্দাবিশিষ্ট হাওদা। সুলতান ও তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা তাতে এমনভাবে উঠে বসেন, যেন তাদের বাইরে থেকে দেখা না যায়। বাগানে গিয়ে ঘোড়ায় চড়তে ইচ্ছে করলে তিনি উট থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়তেন। তার নিয়ম ছিল পথে কেউ তাকে দেখার জন্য অথবা কোনো প্রয়োজন, অভিযোগ ইত্যাদি জানানোর জন্য থামাতে পারবে না। কেউ এমনটি করার সাহস দেখালে তাকে বেদম প্রহার করা হয়। তাই মানুষ যখন সুলতানের বাইরে বের হওয়ার সংবাদ শুনে, তখন তারা দ্রুত রাস্তা থেকে সরে যায়।

এই সুলতানের উজিরের নাম ফকিহ মুহাম্মাদ আল আদানি। তিনি ছিলেন শিশুদের শিক্ষক। এই সুলতানকে তিনিই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, যদি সে সুলতান হয় তাহলে তাকে উজির বানাবে। অতঃপর সুলতান আল মালিকুল মুগিস ক্ষমতায় বসে তার এই শিক্ষককে উজির হিসেবে নিযুক্ত করে। কিন্তু এই পদের যথোপযুক্ত ছিলেন না। তিনি নামে উজির থাকলেও মূল ক্ষমতা ছিল অন্যের হাতে।

জাফার থেকে প্রস্থান নিয়ে আমাদের এবারের গন্তব্য আম্মান। মাসিরা দ্বীপের অধিবাসী আলী বিন ইদরিস আল মাসিরি নামক এক ব্যক্তির ছোট নৌযানে চড়ে আমরা আম্মানের উদ্দেশে যাত্রা করি। যাত্রার দ্বিতীয় দিন আমরা হাসিক পোতাশ্রয়ে অবতরণ করি। সেখানে একদল আরব অবস্থান করে। পেশায় তারা জেলে। তাদের এখানে লোবান গাছ উৎপন্ন হয়। এই গাছের পাতা অনেক চিকন। পাতা ঝরে যাওয়ার সময় গাছ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় দুধের

মতো কষ পড়তে থাকে। যা পরে আঠালো গামে পরিণত হয়। এই গামকেই বলা হয় লোবান বা ধূপ। এখানে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এখানকার বাসিন্দাদের একমাত্র জীবিকা হচ্ছে মৎস শিকার। তাদের জালে আল লাখম নামক একপ্রকার মাছ বেশি ধরা পড়ে। এটি দেখতে সামুদ্রিক ডগফিশের মতো। এটিকে কেটে রোদে শুকিয়ে খাবারের উপযুক্ত করা হয়। তাদের বাড়িগুলো তৈরি করা হয় মাছের হাড্ডি দিয়ে। আর ছাদে ব্যবহার করা হয় উটের চামড়া।

হাসিক থেকে প্রস্থান নিয়ে টানা চারদিন সফর করে আমরা লুমআন পাহাড়ে পৌঁছাই। বিশাল সমুদ্রের মধ্যখানে এই পাহাড়ের অবস্থান। পাহাড়ের উপরে পাথরের মাধ্যমে নির্মিত একটি আশ্রম। যার ছাদে ব্যবহার করা হয়েছে মাছের চামড়া। আশ্রমের বাইরে রয়েছে একটি পুকুর। যার মধ্যে বৃষ্টির পানি জমা হয়।

এই পাহাড়ে পাওয়া আল্লাহর একজন ওলির কথা

পাহাড়ের নিচে নৌযান বেঁধে রেখে আমরা উপরের আশ্রমে উঠি। সেখানে একজন শায়খকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পাই। তাকে সালাম জানালে তিনি জেগে উঠেন এবং ইশারায় আমাদের সালামের উত্তর দেন। আমরা তার সঙ্গে কথা বলি, কিন্তু তিনি কোনো কথা বলেন না। শুধু মাথা ঝুঁকান। আমাদের নৌযানের যাত্রীরা তার কাছে খাবার নিয়ে আসলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন আমরা তার কাছে দোয়া চাইলে তিনি ঠোঁট নাড়িয়ে কী যেন পড়তে থাকেন। আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তার পরনে ছিল একটি তালিযুক্ত জামা। মাথায় ছিল ছেঁড়া টুপি। তার এখানে কোনো চামড়ার থলে, কোনো জগ বা পাত্র ছিল না। এমনকি জুতোও ছিল না। নৌযানের যাত্রীরা বলে, আগে কখনো তাকে দেখতে পাইনি। সে রাতে আমরা এই পাহাড়ের উপকূলে অবস্থান করি। তার সঙ্গে আসর ও মাগরিবের নামায আদায় করি। তার জন্য আলাদা করে খাবার নিয়ে আসি। ইশার নামাযও তার সঙ্গে আদায় করি। তার কণ্ঠস্বর, আযান ও তেলাওয়াত ছিল খুবই সুন্দর। ইশার নামায শেষে তিনি আমাদের ইঙ্গিতে ফিরে যেতে বলেন। আমরা তাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসি আর তার ব্যাপার নিয়ে আশ্চর্যবোধ করতে থাকি। ফিরে আসার পর আমি আবার তার কাছে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার কাছে যেতেই আমার ভেতরে ভয় জেগে উঠে। তখন আমি সাথীদের কাছে ফিরে আসি।

অতঃপর পুনরায় শুরু হয় আমাদের সমুদ্রযাত্রা। দুদিন পর আমরা পৌঁছাই জাযিরাতুত তাইর অর্থাৎ পাখিদের দ্বীপে। এখানে কোনো জনবসতি নেই। তীরে নোঙর ফেলে দ্বীপে উঠে এসে দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। শালিকের মতো দেখতে হলেও এগুলো আকারে বড়। যাত্রীরা সেই পাখির কিছু ডিম এনে সিদ্ধ করে ভক্ষণ করে। তারা বেশ কিছু পাখিও শিকার করে আনে। সেগুলোকে জবাই করা ছাড়াই রান্না করে খেতে শুরু করে দেয়। আমার সঙ্গে মাসিরা দ্বীপের একজন ব্যবসায়ী ছিল। সে জাফারে থাকে। তার নাম মুসলিম। তাকেও এই পাখি খেতে দেখে আমি আপত্তি জানাই। সে ভীষণ লজ্জা পেয়ে বলে, আমি ভেবেছিলাম তারা এগুলো জবাই করে নিয়েছে। এরপর সে লজ্জায় আমার কাছ থেকে দূরে চলে যায়। না ডাকলে আমার কাছে আসত না। এই যাত্রার সময়ে আমাদের খাবার ছিল খেজুর আর মাছ। নৌকার যাত্রীরা সকাল-সন্ধ্যা এক ধরনের মাছ শিকার করত। ফারসি ভাষায় যেটির নাম ছিল শের মাহি। এর অর্থ হয় মাছের সিংহ। শের মানে সিংহ আর মাহি মানে মাছ।[১] এটি দেখতে আমাদের অঞ্চলের তারাজ মাছের মতো। এই মাছ টুকরো টুকরো করে প্রত্যেক যাত্রীকে এক টুকরো করে দেওয়া হতো। এর বেশি কাউকে দেওয়া হতো না। এমনকি নৌকার মালিককেও না। অতঃপর খেজুরের সঙ্গে মিশিয়ে তারা এই মাছ ভক্ষণ করত। আমি জাফার থেকে রুটি আর বিস্কুটও নিয়ে এসেছিলাম। এগুলো শেষ হয়ে গেলে আমিও সবার সঙ্গে এই মাছ খাওয়ার উপর নির্ভরশীল হই। সেবার সমুদ্রের বুকেই কুরবানির ঈদ কাটাতে হয়। ঈদের দিন ভোরবেলায় ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। সূর্যোদয়ের পর সমুদ্র শান্ত হয়। ঝড়ো হাওয়ায় আমরা প্রায় ডুবেই যাচ্ছিলাম।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

নৌকায় আমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের একজন হাজি ছিলেন। তার নাম ছিল খিজির। তাকে মাওলানা নামে ডাকা হাতে। কারণ, তিনি ছিলেন কুরআনের হাফেয এবং শরীয়তের জ্ঞানসম্পন্ন। সমুদ্রের ভয়াবহ অবস্থা দেখে তিনি তার আবায়ার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই দুর্যোগ থেকে উদ্ধারের পর আমি তাকে বলি, হে

---

[১] এর ইংরেজি নাম King mackerel।

মাওলানা খিজির, আপনি কী দেখলেন? তিনি বলেন, 'বিপদের সময় আমি চোখ খুলে জান কবজকারী ফেরেশতাগণ এসেছে কি না তা দেখার চেষ্টা করেছিলাম। তাদেরকে দেখতে না পেয়ে আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যদি ডুবে যেতাম, তাহলে অবশ্যই তারা আমাদের জান কবজ করার জন্য আসত। এভাবেই আমি একবার চোখ খুলেছি ও একবার বন্ধ করেছি। যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন।' সেদিন আমাদের আগে থাকা এক ব্যবসায়ীর নৌকা ডুবে গিয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র একজন লোক বেঁচেছিল। সে অনেক কষ্টে সাঁতরে নিজের জান বাঁচাতে পেরেছিল।

এই নৌকায় আমি এমন এক খাবার খেয়েছি, যা আগে কখনো খাইনি। আম্মানের এক ব্যবসায়ী এই খাবার তৈরি করেছিলেন। বাজরা না পিষেই এর উপর খেজুরের রস ঢেলে এই খাবার প্রস্তুত করা হয়। আমরা তা খেয়ে তৃপ্তি লাভ করি। অতঃপর আমরা মাসিরা দ্বীপে এসে পৌঁছাই। আমাদের নৌকার মালিক এই দ্বীপেরই অধিবাসী। এটি বেশ বড় একটি দ্বীপ। এখানকার অধিবাসীরা কেবল মাছ ধরেই জীবিকা নির্বাহ করে। নোঙর ফেলার স্থান উপকূল থেকে অনেক দূরে হওয়ায় আমরা এই দ্বীপে অবতরণ করিনি। পাখি জবাই না করেই খেতে দেখে তাদের প্রতি আমার ঘৃণা তৈরি হয়। সেখানে আমরা একদিন অবস্থান করি। নৌকার মালিক তার বাড়িতে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসে। অতঃপর একদিন ও একরাতের যাত্রাশেষে আমরা সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত সুর নামক বড় একটি গ্রামে এসে নোঙর ফেলি। সেখান থেকে আমরা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত কালহাত[১] শহর দেখতে পাই। মনে হয় শহরটি আমাদের খুবই কাছে। আমরা এই পোতাশ্রয়ে ঠিক দুপুর বেলায় অথবা এর কিছুক্ষণ আগে এসে পৌঁছেছিলাম। কালহাত শহরটি দেখে আমি হেঁটে হেঁটে সফর করে সেখানে গিয়ে রাত্রিযাপনের ইচ্ছা করি। নৌকার যাত্রীদের সঙ্গ নিতে আমার মন চাচ্ছিল না। তাই লোকদের কাছ পথ জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারি, আসর নাগাদ আমি সেখানে পৌঁছুতে পারব। আমি একজন স্থানীয় মাঝিকে ভাড়া করি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মাওলানা খিজিরও আমার সঙ্গী হন। আমার আসবাবপত্র নৌকায় অন্য যাত্রীদের সঙ্গে রেখে আসি। পরদিনই কালহাতে গিয়ে তারা আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। শুধু

---

[১] ওমানের উত্তরপূর্বাঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন একটি শহর।–অনুবাদক

আমার কিছু পোশাক নিয়ে পথনির্দেশক ব্যক্তিটির কাছে দিয়ে দেই। যেন আমাকের এগুলোর বোঝা বইতে না হয়। আমার হাতে একটি বর্শা রাখি। অতঃপর সেই পথনির্দেশক মাঝি আমার জামাকাপড় নিয়ে পালানোর ইচ্ছা করে। এজন্য সে আমাদেরকে সমুদ্র থেকে সৃষ্ট একটি শাখানদীর কাছে নিয়ে আসে। নদীতে ছিল অনেক জোয়ার-ভাটার টান। সে আমার পোশাক নিয়ে এই নদী পার হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করে। আমি তাকে বলি, পোশাক আমার কাছে রেখে তুমি একা পার হয়ে যাও। আমার যদি পারি তাহলে তো পার হয়ে গেলাম, নয়তো আরো এগিয়ে গিয়ে হাঁটুজল দেখে পার হব। তখন সে ফিরে আসে। অতঃপর কিছু লোককে সাঁতরে নদী পার হতে দেখে নিশ্চিত হই আমাদের ডুবিয়ে আমার পোশাকগুলো নিয়ে পালানোই ছিল এই বেটার মতলব। আমি তখন সেই লোকের সঙ্গে বর্শা উঁচিয়ে দেখিয়ে বেশ ক্রুদ্ধ স্বরে কথা বলি। এতে সে ভয় পেয়ে আমার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। অতঃপর আমরা আরো উপরে গিয়ে নদীতে টান জায়গা পেয়ে যাই। নদী পার হয়ে দেখি বিশাল এক মরু। যেখানে কোনো পানির চিহ্ন মরু। আমাদের জন্য এই সফর বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন আল্লাহ তাআলা একদল অশ্বারোহীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটান। তাদের একজনের হাতে ছিল পানির মশক। আমি ও আমার সঙ্গী সেখান থেকে পান করি। শহরকে নিকটে মনে করে আমরা এই সফরে বেরিয়েছিলাম। এখন বেরিয়ে দেখি শহর ও আমাদের মধ্যকার পথে একের পর এক গর্ত। এর মধ্য দিয়েই আমরা অনেক মাইল পথ হেঁটে চলি। সন্ধ্যা হয়ে এলে পথনির্দেশক ব্যক্তিটি আমাদেরকে সমুদ্র উপকূলের দিকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু সেটি শহরের পথ নয়। আমি তাকে বলি, আমরা যে পথে আছি সেই পথ ধরেই এগিয়ে যাব। শহর আর সমুদ্রের মাঝে দূরত্ব ছিল এক মাইলের মতো। রাতের আঁধার ছেয়ে যাওয়ার পর সে আমাদের বলে, আমরা শহরের কাছে চলে এসেছি। চলুন তাড়াতাড়ি হেঁটে আমরা শহরে গিয়েই রাত্রিযাপন করি। আমার আশঙ্কা হয়, যদি পথে কোনো ডাকাতের পাল্লায় পড়ে যাই? যেহেতু তখনও কতদূর পথ বাকি আছে তা নিশ্চিত ছিলাম না তাই আমি তাকে বলি, এখন আমাদের উচিত সফর থেকে বিরতি নিয়ে কোথাও ঘুমানো। সকাল হওয়ার পর ইনশাআল্লাহ আমরা শহরে পৌঁছতে পারব। সেখানে এক পাহাড়ের পাদদেশে কিছু লোককে দেখে আমি ডাকাত মনে করে আমি বলি, এখন লুকিয়ে থাকাই উত্তম। কিন্তু আমার সঙ্গী মাওলানা খিজির তখন খুবই তৃষ্ণার্ত ছিলেন। তাই তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। কিন্তু আমি রাস্তা থেকে নেমে এসে একটি গাছের কাছে যাই। যদিও আমি খুব কাহিল হয়ে

পড়েছিলাম, কিন্তু তবুও আমি পথনির্দেশক লোকটিকে ভয় দেখানোর জন্য কিছুটা শক্তি ও বল দেখাই। এদিকে আমার সঙ্গী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তার গায়ে একটুও শক্তি নেই। তখন আমি পথনির্দেশক ব্যক্তিকে আমার ও সঙ্গীর মাঝে শুতে বলি। পোশাকগুলোকে আমার শরীর ও দেহের মাঝে বেঁধে রেখে হাতে বর্শা নিয়ে রাখি। এর মধ্যে আমার সঙ্গী ও পথনির্দেশক লোকটি ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আমি জেগে থাকি। যতবারই লোকটি নড়াচড়া করেছে আমি তার সঙ্গে কথা বলে বুঝিয়েছি, আমি ঘুমাইনি। জেগে আছি। সকাল পর্যন্ত এভাবেই কাটিয়ে দেই।

অতঃপর আমরা পুনরায় রাস্তায় চলে যাই। দেখতে পাই একদল লোক বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে শহরের দিকে যাচ্ছে। আমি পথনির্দেশক লোকটিকে পাঠাই তাদের কাছ থেকে পানি চেয়ে আনার জন্য। আমার সঙ্গী তখন পোশাকগুলো নেয়। তখনও শহরে যেতে আমাদের খানাখন্দক পেরোতে হবে। পথনির্দেশক পানি নিয়ে এলে আমরা পানি পান করি। তখন ছিল গরমের সময়। অবশেষে অনেক কষ্ট-ক্লেশের পর আমরা কালহাত শহরে গিয়ে পৌঁছাই। আমার পায়ের সঙ্গে স্যান্ডেল এমনভাবে লেগে গিয়েছিল যে, চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসতে চাইছিল। অবশেষে শহরের প্রধান ফটকে পৌঁছে আমাদের কষ্টের সমাপ্তি ঘটে। তখন ফটকের প্রহরী আমাকে বলেন, আপনাকে এখনই আমার সঙ্গে গভর্নরের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তাকে আপনার ব্যাপারে এবং আপনি কোথা থেকে এসেছেন তা জানাতে হবে। তার সঙ্গে গভর্নরের কাছে যাই। তিনি বেশ নম্র, ভদ্র ও উদার মনের মানুষ। আমাদের খোঁজখবর নিয়ে থাকা ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। ছয়দিন আমরা তার আতিথেয়তায় কাটাই। এ সময়ে ব্যথায় পায়ের উপর ভর করে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও ছিল না।

কালহাত শহরের অবস্থান সমুদ্র উপকূলে। এখানকার বাজারটি বেশ চমৎকার। মসজিদটিও অনিন্দ্য সুন্দর। মসজিদের দেয়ালে রয়েছে কাশানি কারুকার্য। যা আমাদের অঞ্চলের জেলিজ কারুকার্যের মতো। মসজিদটি বেশ উঁচুতে অবস্থিত। এখান থেকে সাগর ও পোতাশ্রয় চোখে পড়ে। নেককার নারী বিবি মরিয়ম এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। বিবি শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বাধীন সম্ভ্রান্ত নারী। এই শহরে এসে আমি এমন এক সুস্বাদু মাছ ভক্ষণ করি, যা ইতিপূর্বে কোনো অঞ্চলেই দেখিনি। আমার কাছে সকল প্রকার গোশত থেকে এই মাছের স্বাদ শ্রেষ্ঠ মনে হয়। তাই আমি এছাড়া অন্য কিছুই খাইনি। তারা এই মাছকে গাছের পাতা দিয়ে মাখিয়ে ভেজে

তারপর ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করে। ভারতবর্ষ থেকে এখানে ভাতের চাল আমদানি করা হয়। এখানকার অধিবাসীরা ব্যবসায়ী। ভারত মহাসাগরে চলমান বাণিজ্যিক জাহাজগুলো থেকে প্রাপ্ত আয়ের মাধ্যমে তারা জীবিকানির্বাহ করে থাকে। তাদের এখানে কোনো জাহাজ এসে পৌঁছালে তাদের খুশির সীমা থাকে না। আরব হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভাষা অতো বিশুদ্ধ নয়। তাদের প্রতিটি কথার সঙ্গে লা (لا) শব্দটি থাকবেই। যেমন, لا تأكل (খাও) لا تمشي (হাঁটো) لا تفعل كذا (ওটা করো)। তাদের অধিকাংশই খারেজি মতাদর্শী। কিন্তু হুরমুজের সুলতান কুতুবুদ্দিন তামতাহানের শাসনাধীন হওয়ার কারণে তারা এই মতাদর্শ প্রকাশ করতে পারে না। কুতুবুদ্দিন তামতাহান আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী। কালহাতের কাছেই অনিন্দ্য সুন্দর ও চমৎকার পরিবেশের মাঝে তিবি গ্রামের অবস্থান। প্রবহমান নদী, ঘন গাছপালার নিবিড় ছায়া আর অনেক বাগানের সমাহার এখানে। এখান থেকে কালহাত শহরে ফলমূল রপ্তানি করা হয়। এখানে মাড়ওয়ারি নামক বিশেষ একপ্রকার কলা উৎপন্ন হয়। ফারসি মারওয়ারি শব্দের অর্থ হচ্ছে মুক্তাময়। এখানে প্রচুর পরিমাণে এই কলা পাওয়া যায় এবং হুরমুজ প্রভৃতি শহরে রপ্তানি করা হয়। এখানেও পান পাওয়া যায়। তবে পাতাগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে থাকে। আম্মান থেকে এই সকল অঞ্চলে খেজুর আমদানি করা হয়।

কালহাত থেকে আমরা ওমানের উদ্দেশে যাত্রা করি। মরুভূমির মাঝ দিয়ে টানা ছয় দিন সফর করে সপ্তম দিন ওমানে গিয়ে উপনীত হই। নদীনালা, গাছপালা, বাগান-উদ্যান এবং খেজুর ও অন্যান্য ফলমূলের সমাহারে সমৃদ্ধ অত্যন্ত উর্বর এক দেশ ওমান। আমরা এখানকার রাজধানী নাজওয়ায় এসে পৌঁছাই। এটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি শহর। অনেক বাগান ও নদীনালা বেষ্টিত। এখানকার লোকেরা তাদের নিজ নিজ খাবার নিয়ে এসে মসজিদ চত্বরে সম্মিলিতভাবে আহার করে। এখানে আগত অতিথিদের জন্যও এখানেই খাবারের আয়োজন করা হয়। এখানকার অধিবাসী খুব সাহসী ও বীরত্বের অধিকারী। তাদের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ লেগেই থাকে। তারা ইবাদিয়্যাহ মতাদর্শের অনুসারী। জুমার নামাযের পরিবর্তে যোহরের চার রাকাত নামায আদায় করে। নামায শেষে ইমাম দাঁড়িয়ে কুরআন থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেন। অতঃপর খুতবার মতো করে কিছু আলোচনা করেন। সেখানে তিনি আবু বকর ও উমর রা.-এর প্রতি আল্লাহ তাআলার

সন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু উসমান ও আলী রা.-এর নাম এড়িয়ে যান। আলী রা.-এর আলোচনার সময় তারা সরাসরি নাম উল্লেখ না করে ইঙ্গিতসূচকভাবে বলে। যেমন তারা বলে, লোকটি থেকে এমন বর্ণিত আছে অথবা লোকটি এমন কথা বলেছে। তারা আলী রা.-এর হত্যাকারী নরাধম ইবনে মুলজিমের প্রশংসা করে থাকে। তার ব্যাপারে তারা বলে, সে ছিল ফেতনা নির্মূলকারী উত্তম এক বান্দা। এখানকার নারীরা অনেক ঝগড়া-ফাসাদ করে থাকে। আত্মসম্ভ্রম বলতে কিছু নেই তাদের মধ্যে। কেউ এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না। এর প্রমাণস্বরূপ সামনে একটি ঘটনা উল্লেখ করব।

ওমানের সুলতানের বিবরণ

এখানকার সুলতান আরবের আজদ ইবনুল গাওস গোত্রের লোক। আবু মুহাম্মাদ বিন নাবহান নামে পরিচিত। ওমানের প্রত্যেক সুলতানের নামের আগে আবু মুহাম্মাদ উপাধিটি থাকে। যেমন লুর অঞ্চলের সুলতানদের নামের আগে থাকে আতাবেক উপাধি। তিনি বাসভবনের ফটকের বাইরে বসেই সবার সঙ্গে আলাপ করেন। তার কোনো দেহরক্ষী অথবা কোনো উজির নেই। দরিদ্র, অপরিচিত অথবা আগন্তুক কোনো ব্যক্তির তার কাছে গমনে নিষেধাজ্ঞা নেই। অন্যান্য আরবদের মতোই তিনি অতিথিদের খুব সমাদর করেন, যথাযথ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন এবং নিজের সাধ্য অনুযায়ী উপহার প্রদান করেন। চারিত্রিক দিক থেকেও তিনি উত্তম। তার খাবারের তালিকায় গৃহপালিত গাধার গোশত থাকে। বাজারেও এই গোশত বিক্রি করা হয়। কারণ, তারা এই গোশতকে হালাল বলার প্রবক্তা। তবে আগত মেহমানদের কাছে তারা এই কথা গোপন রাখে। তাদের সম্মুখে এই গোশত পরিবেশনও করে না। ওমানের একটি শহরের নাম জাকি। আমি সেখানে যাইনি। তবে শুনেছি এটি খুব বড় একটি শহর। এমন আরো কিছু শহর হচ্ছে আল কুরাইয়াত, সুবা, কালবা, খুরফাকান ও সুহার। প্রতিটিতেই রয়েছে অনেক নদীনালা, বাগান, গাছপালা এবং খেজুর গাছের সমাহার। এগুলোর অধিকাংশ হুরমুজের সুলতানের শাসনাধীন।

একটি ঘটনা

একদিন আমি সুলতান আবু মুহাম্মাদ বিন নাবহানের কাছে বসে আছি। এমন সময় অল্পবয়সী, সুশ্রী ও চেহারা উন্মুক্ত করে রাখা একটি মেয়ে তার

সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, হে আবু মুহাম্মাদ, শয়তান আমার মাথায় বিদ্রোহ করেছে। আবু মুহাম্মাদ তাকে বলেন, যাও গিয়ে শয়তানকে তাড়িয়ে দাও। মেয়েটি তাকে বলে, আমি তা পারব না। আমি তো আপনার নিরাপত্তায় আছি। তখন আবু মুহাম্মাদ তাকে বলেন, যাও গিয়ে যা ইচ্ছা তাই করো। শুনেছি এই মেয়ে অথবা তার মতো আরো যারা সুলতানের নিরাপত্তায় থেকে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলায় জড়িত হয়, তাদের পিতা অথবা নিকটাত্মীয় কারো তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। যদি তাকে হত্যা করা হয়, তবে তাদেরকেও হত্যা করা হবে। কারণ, সে সুলতানের নিরাপত্তায় রয়েছে।

অতঃপর ওমান থেকে হুরমুজের উদ্দেশে যাত্রা করি। হুরমুজ সমুদ্র উপকূলীয় একটি শহর। এটিকে মুগিস্তানও বলা হয়। এর সম্মুখে সমুদ্রের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা শহরকে বলা হয় নতুন হুরমুজ। দুই শহরের মাঝে সমুদ্রপথে তিন ফারসাখ পরিমাণ দূরত্ব। আমরা প্রথমে নতুন হুরমুজে এসে পৌছাই। এটি মূলত একটি দ্বীপ। এর মূল শহরের নাম জারাওয়ান। খুবই সুন্দর ও বৃহৎ আয়তনের একটি শহর। এখানকার বাজারটিও বেশ জমজমাট। ভারতবর্ষ ও সিন্ধুর ব্যবসায়ীদের জাহাজগুলো এখানে নোঙর করে। এখান থেকেই ইরাকে আরব, ইরাকে আজম এবং পারস্য ও খোরাসানে ভারতবর্ষের পণ্যগুলো পাঠানো হয়। এই শহরেই সুলতানের বাসভবন। আর যে দ্বীপটিতে এই শহরের অবস্থান, সেটির আয়তন সবমিলিয়ে একদিনের সফর পরিমাণ। যার অধিকাংশ জুড়েই রয়েছে লবণের জলাভূমি ও টিলা। এই লবণকে বলা হয় দারানি লবণ। এর মাধ্যমে তারা আলঙ্কারিক পাত্র ও প্রদীপদানি তৈরি করে থাকে। তাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে মাছ এবং ওমান ও বসরা থেকে আমদানিকৃত খেজুর। এই খাবার প্রসঙ্গে তারা নিজেদের ভাষায় বলে থাকে, খুরমা ওয়া মাহি লুতি বাদশাহি। এর মানে হচ্ছে, খেজুর ও মাছ হচ্ছে বাদশাহদের খাবার। এই দ্বীপে পানির অনেক যত্ন করা হয়। এখানে বেশ কিছু ঝরনা ও কৃত্রিম হাউজ রয়েছে। হাউজগুলোতে বৃষ্টির পানি জমা হয়। এগুলোর অবস্থান শহর থেকে বেশ দূরে। এখানকার অধিবাসীরা মশক অথবা বালতি ইত্যাদি পিঠে বহন করে নিয়ে সমুদ্রে যায়। অতঃপর সেগুলোকে নৌকায় ভরে শহরে নিয়ে আসে। এখানকার জামে মসজিদের ফটকে আমি আশ্চর্য একটি বস্তু দেখতে পাই। মসজিদের ফটক ও বাজারের মাঝে টিলার মতো বিশাল একটি মাছের মাথা রাখা। এর চোখ দুটি ছিল দুটি দরজার মতো। এর মধ্য দিয়েই কেউ ভেতরে যাচ্ছে। কেউ বেরিয়ে আসছে।

এই শহরে বুযুর্গ শায়খ আবুল হাসান আল আকতারানির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন রোমের অধিবাসী। তিনি আমার মেহমানদারি করেন, আমাকে দেখতে আসেন এবং পোশাক উপহার দেন। সাহচর্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি আমাকে একটি কোমরবন্ধনিও প্রদান করেন। এটি কোমরে বেঁধে নিলে বসতে সুবিধা হয়। মনে হয় যেন কিছুতে ভর দিয়ে আছে। অনারব অঞ্চলের অধিকাংশ দরিদ্র লোক এটি পরিধান করে থাকে। এই শহর থেকে ছয় মাইল দূরে একটি মাজার রয়েছে। যেটিকে খিজির ও ইলয়াস আ.-এর মাজার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কথিত আছে, তারা দুজন সেখানে ইবাদত করেন। এই মাজারের অনেক বরকত এবং আশ্চর্য বিষয়ও প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে একটি খানকাও রয়েছে। তাতে একজন শায়খ বসবাস করেন এবং আগত দর্শনার্থীদের সেবা করেন। আমরা একদিন তার কাছে অবস্থান করি। সেখান থেকে আমরা অপর এক আল্লাহর ওলির সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছে করি। যিনি এই দ্বীপের শেষপ্রান্তে জনমানবহীন এক স্থানে বসবাস করেন। থাকার জন্য তিনি একটি গুহা বানিয়ে নিয়েছেন। সেখানে তার খানকা ও ছোট্ট ঘর রয়েছে। একজন দাসী তার সেবা করে আর একজন দাস গুহার বাইরে তার বকরি ও মেষপাল চড়ায়। এই বুযুর্গ ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। বাইতুল্লাহর হজ করার পর তিনি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সেখানেই আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য থেকে যান। সকল সম্পদ দিয়ে দেন তার এক ভাইকে। তার হয়ে ব্যবসা করার জন্য। আমরা তার এখানে এক রাত অবস্থান করি। তিনি আমাদের অত্যন্ত সমাদর ও যথাযথ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কল্যাণ ও ইবাদতের চিহ্ন যেন তার চেহারায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

হরমুজের সুলতানের বিবরণ

তার নাম সুলতান কুতুবুদ্দিন তামতাহান তুরান শাহ। তিনি একজন মহান সুলতান। অত্যন্ত বিনয়ী ও সুচরিত্রবান। তার দরবারে আগত সকল ফকিহ, নেককার বুযুর্গ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তিনি নিজে দেখভাল করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তার শহরে প্রবেশ করার পর আমরা দেখতে পাই তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। চাচাতো ভাই নিজামুদ্দিনের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়েই ব্যস্ত সময় পার করছিলেন। প্রায় প্রতি রাতেই তিনি তখন যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। এই শহর ছিল তখন

দুর্ভিক্ষের কবলে। তখন সুলতানের উজির শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আলী, তার কাজি ইমাদুদ্দিন আশ-শুনকারি ও গণ্যমান্য কিছু লোক এসে আমাদের কাছে বিনীতভাবে তাদের যুদ্ধপীড়িত অবস্থার কথা ব্যক্ত করেন। আমরা তাদের কাছে ষোলো দিন অবস্থান করি। ফিরে আসার সময় আমি এক সঙ্গীকে বলি, এই সুলতানকে না দেখে আমরা কী করে ফিরে যাই? অতঃপর আমরা উজিরের কাছে যাই। আমরা যে খানকায় অবস্থান করেছি তার পাশেই ছিল উজিরের বাসভবন। তাকে বলি, আমি মহামান্য সুলতানকে সালাম জানাতে চাই। তিনি বলেন, তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে চলুন। তিনি আমার হাতে ধরে সুলতানের বাসভবনের দিকে নিয়ে যান। সমুদ্রসৈকতের কোলঘেঁষে সুলতানের বাসভবনের অবস্থান। গিয়ে দেখি একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি জীর্ণ ও পুরোনো লম্বা একটি জামা পরে বসে আছেন। মাথায় পাগড়ী পরিহিত। কোমরে বাঁধা ছিল একটি কোমরবন্ধনী। উজির গিয়ে তাকে সালাম জানালে আমিও সালাম জানাই। তখনও জানতাম না তিনিই সুলতান। তার চাচাতো ভাই আলী শাহ বিন জালালুদ্দিন আল কিজি তার পাশেই উপবিষ্ট ছিল। তার সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় ছিল বিধায় আমি তার সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করি। তখন উজির আমাকে সুলতানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আমি তাকে বাদ দিয়ে তার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ শুরু করায় লজ্জিত হই এবং ওজর প্রকাশ করি। অতঃপর সুলতান উঠে দাঁড়িয়ে তার বাসভবনে প্রবেশ করেন। অন্যান্য আমলা-মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তার অনুসরণ করে। আমিও উজিরের সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করি। গিয়ে দেখি তিনি সিংহাসনে বসে আছেন। পরনের কাপড় পরিবর্তন করেননি। তার হাতে ছিল মুক্তোর তৈরি চমৎকার একটি তাসবিহ। এমন অনিন্দ্য বস্তু আমি আগে কখনো দেখিনি। এই সুলতানের অধীনেই রয়েছে মুক্তোর খনি। একজন আমির সুলতানের পাশে বসেন। আমি সেই আমিরের পাশে গিয়ে বসি। তিনি আমার খোঁজখবর নেন। কেন এলাম, কার কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, এসব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। আমিও তাকে যথাযথ উত্তর দেই। অতঃপর খাবার আনা হলে উপস্থিত সবাই আহারে বসে যায়। তবে তিনি তাদের সঙ্গে খেতে বসেননি। অতঃপর তিনি সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালে আমি তাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসি।

চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে তার এই যুদ্ধের সূত্রপাত হচ্ছে, একবার তিনি অবসর কাটানোর জন্য তার বাসস্থান নতুন হুরমুজ থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পুরাতন

হুরমুজে আসার ইচ্ছা করেন। আগেই বলেছি দুই শহরের মধ্যকার দূরত্ব ছিল তিন ফারসাখ। তিনি যখন সমুদ্রে সফর করছেন, সে সময়েই তার চাচাতো ভাই নিজামুদ্দিন তার বিরোধিতা করে বসে। দ্বীপের অধিবাসী এবং সৈনিকরাও তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নেয়। তখন সুলতান কুতুবুদ্দিন নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কা করে তার অধীনে থাকা কালহাত শহরে চলে যান। সেখানে এক মাস অবস্থান করে নৌবাহিনী নিয়ে হুরমুজ দ্বীপে আসেন। এখানকার অধিবাসীরা তার ভাইয়ের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করে। ফলে তিনি পুনরায় কালহাতে ফিরে যান। এমন কয়েকবারই তিনি আক্রমণ করে ব্যর্থ হন। অবশেষে কোনো উপায় না পেয়ে তার কোনো এক ভাইয়ের স্ত্রীকে প্রেরণ করেন। সে ওই বিদ্রোহী চাচাতো ভাইকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। অতঃপর সুলতান কুতুবুদ্দিন হুরমুজে প্রবেশ করেন। তার দুই চাচাতো সাম্রাজ্যের ধনদৌলত ও সেনাবাহিনী পালিয়ে যায় কাইস দ্বীপে। সেখানেই রয়েছে মুক্তোর খনি। তারা ভারতবর্ষ ও সিন্ধু থেকে হুরমুজের উদ্দেশে গমনরত প্রতিটি জাহাজে ডাকাতি শুরু করে এবং উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে একের পর এক হামলা করে। এর ফলে তার সাম্রাজ্যের অধিকাংশই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে যায়।

নতুন হুরমুজের জারাওয়ান শহর থেকে আমরা খুনজুবাল শহরের একজন বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে যাত্রা করি। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমরা এখানকার স্থানীয় এক তুর্কি লোকের বাহনজন্তু ভাড়া করি। তাদের সাহসিকতা ও এই অঞ্চলের পথঘাট তাদের নখদর্পণে থাকায় তাদের সঙ্গে নিয়ে সফর করাই উত্তম। এই পথে চারদিন মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলতে হয়। সেখানে কিছু অসভ্য বেদুইন পথচারীদের কাছ থেকে চুরি-ডাকাতি করে। জুন ও জুলাই মাসে সেখানে সাইমুম নামক ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়। যারাই এর কবলে পড়বে মৃত্যুই হবে তাদের অনিবার্য পরিণতি। শুনেছি এই হাওয়ার কবলে পড়ে যাদের মৃত্যু হয়, সাথীরা তাদের গোসল দিতে গিয়ে দেখে তাদের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদা হয়ে গেছে। সেখানে এই ঝড়ের কবলে নিহত হওয়া ব্যক্তিদের অনেক কবর দেখা যায়। আমরা তখন রাতের বেলায় সফর করেছি। সূর্যোদয় হতেই কোনো এক উম্মে গাইলান গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি। অতঃপর আসরের পর থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত পুনরায় সফর করেছি। এই মরুভূমি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জামালুল লুক নামক কুখ্যাত এক দস্যু পথচারীদের কাছ থেকে ডাকাতি করে।

জামালুল লুকের ঘটনা

জামালুল লুক ছিল সিজিস্তানের অধিবাসী। পারসিক বংশোদ্ভূত। লুক শব্দের অর্থ হচ্ছে পঙ্গু। কোনো এক যুদ্ধে তার একহাত কাটা গিয়েছিল। তার সঙ্গে আরব ও অনারব অনেক অশ্বারোহী ছিল। তাদের সঙ্গে নিয়ে সে ডাকাতি করত। একই সঙ্গে সে খানকা-সরাইখানা ইত্যাদিও নির্মাণ করত। সেখানে লোকদের কাছ থেকে ডাকাতি করে নেওয়া সম্পদের মাধ্যমে সে আগত অতিথিদের খাবার-দাবারের আয়োজন করে। জানা যায়, সে এমনও দাবি করেছে যে, সে কেবল তাদের কাছ থেকেই ডাকাতি করেছে, যারা নিজেদের সম্পদের যাকাত দেয় না। এভাবেই সে দীর্ঘসময় ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহ করে। সে তার সঙ্গীদের নিয়ে মরুভূমির এমন পথ দিয়ে হামলা চালাত, যে পথের সঙ্গে শুধু তারাই পরিচিত ছিল। সেখানে তারা পানির মশক মাটির নিচে লুকিয়ে রাখত। কখনো সুলতানের বাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করলে তারা মরুতে গিয়ে নিজেদের লুকিয়ে রাখা পানি বের করে নিত। এদিকে সুলতানের বাহিনী মরুর মাঝে নিজেদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার ভয়ে ফিরে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেত না। দীর্ঘ একটা সময় সে এভাবে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ইরাক অথবা অন্য কোনো অঞ্চলের সুলতান তাকে বাগে আনতে পারেনি। অতঃপর সে তাওবা করে আল্লাহ তাআলার খালেস বান্দা হয়ে ইবাদতে মগ্ন হয়। এই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়ে। তার শহরের লোকেরা তার কবর জিয়ারত করে থাকে। মরুর এই দুর্গম পথ ধরে আমরা নদীনালা ও বাগান বেষ্টিত ছোট্ট শহর কাওরিস্তানে পৌঁছাই। এখানে তখন প্রচণ্ড গরম। অতঃপর এখান থেকে যাত্রা করে মরুভূমির মধ্য দিয়ে আগের মতো টানা তিন দিন সফর করে পৌঁছাই সুবিশাল লার শহরে। এই শহরে প্রচুর পরিমাণ ঝরনা, প্রবহমান জলাশয় ও বাগান রয়েছে। রয়েছে একাধিক সুবিন্যস্ত বাজার। এখানে আমরা বুযুর্গ শায়খ আবু দুলাফ মুহাম্মাদের খানকায় অবতরণ করি। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার লক্ষ্যেই আমরা খুনজুবাল শহরের উদ্দেশে যাত্রা করেছি। এই খানকার গদিনিশীন হচ্ছেন তার পুত্র আবু জায়েদ আবদুর রহমান। একদল খাদেমকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এখানে অবস্থান করেন। প্রতিদিন আসর নামাযের পর তারা খানকা প্রাঙ্গণে একত্র হয়। অতঃপর শহরের বাড়িঘরে ঘুরে ঘুরে খাবার সংগ্রহ করে। প্রতিটি ঘর থেকে তাদেরকে একটি-দুটি করে রুটি দেওয়া হয়। এখান থেকেই অতিথিদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এখানকার

অধিবাসীরা এই হিসেবে করেই খাবার রান্না করে। প্রতি শুক্রবার রাতে শহরের নেককার ব্যক্তিগণ এই খানকায় এসে সমবেত হন। প্রত্যেকেই নিজেদের সাধ্যমতো কিছু দিরহাম নিয়ে এসে একত্র করেন। সেগুলো দিয়ে সেই রাতের খাবারের আয়োজন করা হয়। অতঃপর তারা নামায, যিকির, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি ইবাদতে মগ্ন হয়ে রাত কাটিয়ে দেন। ফজরের নামাযের পর যার যার গৃহে ফিরে যান।

লার শহরের সুলতানের বিবরণ

এই শহরের সুলতানের নাম জালালুদ্দিন। তুর্কি বংশোদ্ভূত। তার সঙ্গে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। তবে তিনি আমাদের জন্য আতিথেয়তাস্বরূপ খাবার-দাবার প্রেরণ করেছিলেন।

অতঃপর আমরা খুনজুবাল শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। আমাদের কাঙ্ক্ষিত শায়খ আবু দিলফ মুহাম্মাদ এখানেই বাস করেন। আমরা গিয়ে তার খানকায় অবস্থান করি। খানকায় প্রবেশ করে দেখি তিনি এককোণে মাটির উপর বসে আছেন। তখন তিনি সবুজ রঙের জীর্ণ একটি পশমি জুব্বা পরিহিত ছিলেন। মাথায় ছিল কালো রঙের পশমি পাগড়ি। আমরা তাকে সালাম জানাই। তিনি উত্তমরূপে জবাব দেন। আমার খোঁজখবর নেন এবং আতিথেয়তার ব্যবস্থা করে। তার এক নেককার পুত্রের মাধ্যমে তিনি আমাদের কাছে খাবার ও ফলমূল প্রেরণ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু ও বিনয়ী। বছরব্যাপী রোযা রাখতেন। প্রচুর পরিমাণে নামায পড়তেন। শায়খ আবু দিলফকে দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। এই খানকার জন্য তাকে বিরাট সম্পদ ব্যয় করতে হয়। এমনিভাবে তিনি আগত অতিথিদেরকে অনেক উপহার ও পোশাক দেন। তাদের সাওয়ারির ব্যবস্থা। আগত প্রত্যেক মেহমানকেই তিনি যথাযথ সমাদর করেন। এই অঞ্চলে তার মতো বদান্য ও মহান হৃদয়ের মানুষ আমি খুব একটা দেখিনি। ভাই ও সাথীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদই ছিল তার আয়ের একমাত্র উৎস। তাই অনেকেই ধারণা করে তার কাছে জাগতিক সম্পদের ভান্ডার রয়েছে। সেখান থেকে তিনি খরচ করেন। তার এই খানকায় আল্লাহর একজন ওলি ও বুযুর্গ শায়খ দানিয়ালের কবর রয়েছে। তিনি এই অঞ্চলে খুবই প্রসিদ্ধ। তার কবরের উপর নির্মাণ করা হয়েছে বিশাল একটি গম্বুজ। সুলতান কুতুবুদ্দিন তামতাহান বিন তুরান শাহ এটি নির্মাণ করেন। শায়খ আবু দুলাফের কাছে

আমি মাত্র একদিন অবস্থান করতে পারি। এরমধ্যেই আমার সঙ্গীরা তাড়াহুড়ো শুরু করে দেয়। শুনেছিলাম এই খুনজুবাল শহরে আরেকটি খানকা রয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকজন বুযুর্গ লোক অবস্থান করেন। সন্ধ্যায় আমি সেই খানকায় গিয়ে তাদের প্রধান শায়খ ও সকলকে সালাম জানাই। সেখানে একদল বরকতময় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাদের সবার মাঝেই ইবাদতের চিহ্ন জ্বলজ্বল করছিল। তাদের গাত্রবর্ণ হলদেটে ও দৈহিক আকৃতি শীর্ণকায়। অধিক পরিমাণে কান্না ও অশ্রুপাতের চিহ্ন তাদের মাঝে স্পষ্ট। আমি তাদের কাছে যাওয়ার পর তারা খাবারের ব্যবস্থা করেন। তখন প্রধান শায়খ বলেন, আমার ছেলে মুহাম্মাদকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো। মুহাম্মাদ তখন খানকার একপাশে নিভৃতে ইবাদত করছিলেন। অতঃপর তিনি আমাদের কাছে আসেন। দেখে মনে হলো, তিনি যেন এইমাত্র কবর থেকে বেরিয়ে এলেন। এতই ইবাদতে মগ্ন থাকেন তিনি। তিনি এসে সালাম দিয়ে বসে পড়েন। তার পিতা তাকে বলেন, হে পুত্র, মেহমানদের সঙ্গে তুমিও খাবারে শরিক হয়ে তাদের বরকত নাও। তিনি ছিলেন রোযাদার। আমাদের সঙ্গে খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ইফতার করেন। তারা শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। খাবারের পর্ব শেষ হলে তারা আমাদের জন্য দোয়া করেন। আমরা ফিরে আসি।

অতঃপর আমরা কাইস শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। এই শহরকে সাইরাফও বলা হয়। এটি ভারত মহাসাগর, ইয়েমেন সাগর ও পারস্য সাগরের সংযোগস্থলে সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। এটিকে পারস্যের অন্তর্ভুক্ত একটি শহর হিসেবে গণ্য করা হয়। আয়তনে খুবই প্রশস্ত এবং অত্যন্ত উর্বর। পুরো শহরজুড়ে রয়েছে অনেক মনোরম বাগান। সেগুলোতে বিভিন্ন সুগন্ধি গাছসহ অনেক প্রকার চমৎকার গাছপালা রয়েছে। এখানকার অধিবাসীদের পানির উৎস পর্বতশ্রেণী থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা ঝরনার পানি। তাদের অধিকাংশই অনারব পারসিক সম্ভ্রান্ত বংশের। বনু সাকিফের একদল আরবও এখানে বসবাস করেন। তারা মূলত খনি থেকে মুক্তো সেঁচে আনেন।

মুক্তোর খনির বিবরণ

সাইরাফ শহর ও দুই সাগরের মধ্যবর্তী বিরাট উপত্যকার মতো আবদ্ধ একটি জায়গায় মুক্তোর খনির অবস্থান। এপ্রিল-মে মাসে এখানে অনেক নৌকার সমাগম হয়। সেগুলোতে পারস্য, বাহরাইন ও কুতাইফ অঞ্চলের

ব্যবসায়ী এবং ডুবুরিরা থাকে। ডুবুরিরা মুক্তো আহরণের সময় তাদের মুখে কচ্ছপের চামড়া দিয়ে তৈরি মুখোশ পরিধান করে। এই চামড়া দিয়েই কেঁচির মতো একটি আকৃতি তৈরি করা হয়। যেটি ডুবুরির নাকের উপর পরিধান করে। অতঃপর তারা কোমরে রশি বেঁধে সাগরের বুকে ডুব দেয়। পানিতে তারা অনেকক্ষণ থাকতে পারে। কেউ কেউ একঘণ্টা-দু ঘণ্টাও থাকতে পারে। সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে ছোট ছোট পাথরের মাঝে মাঝে এক ধরনের আবরণ খুঁজে খুঁজে সেগুলোকে নিয়ে তাদের গলার সঙ্গে ঝুলানো চামড়ার ব্যাগে রাখে। শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে সে রশি নড়াচড়া করে। তখন নৌকায় রশির অপরপ্রান্ত ধরে রাখা ব্যক্তই তা টের পেয়ে ডুবুরিকে টেনে নৌকায় তুলে। অতঃপর তার কাছ থেকে ব্যাগ নিয়ে সেই আবরণগুলো খোলা হয়। এর ভেতরে গোশতের টুকরোর মতো বস্তু পাওয়া যায়। সেটিকে কেঁচি দিয়ে কর্তন করা হয়। অতঃপর বাতাসের সংস্পর্শে এলে সেগুলো জমে গিয়ে মুক্তায় পরিণত হয়।[১] অতঃপর ছোট-বড় সবগুলো মুক্তা একত্র করা হয়। সুলতান সেখান থেকে পাঁচভাগের একভাগ নিয়ে যান। বাকি অংশ উপস্থিত ব্যবসায়ীরা বিক্রি করে। তবে এগুলোর অধিকাংশই চলে যায় ডুবুরিদের পারিশ্রমিক দিতে গিয়ে।

অতঃপর সাইরাফ থেকে বাহরাইনের উদ্দেশে যাত্রা করি। এটি বাগান, গাছপালা ও নদীনালা বেষ্টিত বৃহৎ আয়তনের চমৎকার একটি শহর। এখানকার মাটির খুব কাছেই পানির স্তর। হাত দিয়ে খনন করেই পানি পাওয়া যায়। খেজুর, আনার ও কমলার অনেক বাগান রয়েছে এখানে। বাণিজ্যিকভাবে হয় তুলো চাষ। এখানে প্রচণ্ড গরম পড়ে ও অনেক ধুলোবালি উড়ে। মাঝেমাঝে এখানকার অনেক ঘরবাড়িও বালি দিয়ে ঢেকে যায়। বাহরাইন ও ওমানের মাঝে একটি যাতায়াতসড়ক ছিল। কিন্তু বালির আধিক্যের কারণে সেটি এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তা এখন ওমান থেকে বাহরাইনে আসার একমাত্র পথ হচ্ছে সমুদ্র। বাহরাইন থেকে কাছেই রয়েছে দুইটি বিশাল পাহাড়। একটির নাম কুসাইর। এটির অবস্থান পশ্চিমপ্রান্তে। আরেকটির নাম উয়াইর। এটির অবস্থান পূর্বপ্রান্তে। পাহাড় দুটির নামে

---

[১] আগের মানুষেরা এভাবেই মুক্তা তৈরি হওয়ার কথা কল্পনা করত। কিন্তু এটি সঠিক নয়। বরং কোনো বালুকণা ঝিনুকের খোলে ঢুকে পড়লে তখন ঝিনুক নেকর বা শুক্তিপুট নামের এক পদার্থ দিয়ে সেটা ঢেকে ফেলে। যাকে বলে মাদার অব পার্ল। কয়েক বছরের মধ্যে এর ওপরে পড়তে থাকে একটার পর একটা আবরণ। এভাবে প্রক্রিয়া করে তৈরি হয় মুক্তা।

একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে। সেটি হচ্ছে কুসাইর ও উয়াইর, দুটির একটিও ভালো নয়।

বাহরাইন থেকে চলে যাই খেজুরগাছে ঘেরা কুতাইফ শহরে। এটিও আয়তনে বেশ বড়। একদল আরব এখানে বসবাস করে। তারা উগ্র রাফেযি মতাদর্শী। কাউকে পরোয়া না করেই প্রকাশ্যে তারা সাহাবিদের গালিগালাজ করে। তাদের মুয়াযযিন আযানে আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ বলার পর 'আশহাদু আন্না আলিয়্যান ওলিয়্যুল্লাহ' বাড়িয়ে বলে। আর হাইয়া আলাস সলাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার পর তারা 'হাইয়া আলা খাইরিল আমল' এই অংশটুকু বৃদ্ধি করে। আর সর্বশেষ তাকবির বলার পর 'মুহাম্মাদুন ওয়া আলেয়্যুন' খাইরুল বাশার' বাক্যটি বৃদ্ধি করে। এর বিপরীত করলেই তাদের দৃষ্টিতে কাফের হিসেবে গণ্য হয়।

সেখান থেকে আমরা হাজার শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। বর্তমানে সেটিকে বলা হয় আল হাসা। এই শহরের কথাই প্রবাদে বলা বলা হয়েছে, 'হাজারের খেজুরের ঝাঁপির মতো।' এখানে এত বেশি খেজুর গাছ রয়েছে যে, অন্য কোথাও এমনটি দেখা যায় না। এমনকি তারা বাহনজন্তুকেও খেজুর খাইয়ে থাকে। এখানকার অধিবাসীরাও আরব। তাদের অধিকাংশই কাইস বিন আফজা গোত্রের লোক।

অতঃপর আমরা চলে যাই নদীনালা ও গাছপালা সুশোভিত সুন্দর শহর ইয়ামামায়। এখানেও একদল আরব বসবাস করে, যাদের অধিকাংশ বনু হানিফা গোত্রের। প্রাচীনকাল থেকেই তারা এখানে বসবাস করছে। তাদের আমিরের নাম তুফাইল বিন গানিম। এই আমিরের সঙ্গে আমরা ৭৩২ হিজরির হজের উদ্দেশ্যে রওনা দেই এবং নিরাপদে মক্কায় গিয়ে পৌঁছাই। এ বছর মিসরের সুলতান আল মালিকুন নাসির ও তার কিছু মন্ত্রী হজ করে। এটিই ছিল সুলতানের শেষ হজ। তিনি মক্কা-মদিনার স্থানীয় অধিবাসী ও এখানে অবস্থানকারীদের জন্য অনেক সম্পদ ওয়াকফ করেন। এ বছরই সুলতান আল মালিকুন নাসির আমির আহমাদকে হত্যা করেন। কথিত আছে, সে ছিল সুলতানেরই সন্তান। এছাড়াও তার প্রধান আমির বাকতামুর আস সাকিও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়।

একটি ঘটনা

সুলতান আল মালিকুন নাসির বাকতামুর আস সাকিকে একটি দাসী দিয়েছিলেন। বাকতামুর সেই দাসীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে চাইলে দাসী তাকে বলে, সুলতান আল মালিকুন নাসিরের সন্তান আমার গর্ভে। বাকতামুর তখন দাসীর কাছ থেকে সরে যান। অতঃপর দাসীটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। বাকতামুর তার নাম রাখেন আমির আহমাদ। সে বাকতামুরের কাছেই বড় হতে থাকে। বিকাশকাল থেকেই তার বুদ্ধি ও জ্ঞানের কথা সবার কাছে ছড়িয়ে পড়ে এবং সে আল মালিকুন নাসিরের সন্তান হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়ে যায়। কিন্তু এই হজের সময়ে আমির আহমাদ ও বাকতামুর দুজন মিলে সুলতান আল মালিকুন নাসিরের উপর গুপ্তহামলা করে আমির আহমাদকে ক্ষমতায় বসানোর ফন্দি করে। বাকতামুর তার সঙ্গে সাম্রাজ্যের পতাকা, ঢোল-তবলা, পোশাক ও অনেক সম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এই খবর পৌঁছে যায় আল মালিকুন নাসিরের কানে। প্রচণ্ড গরমের এক দিনে তিনি আমির আহমাদকে তার কাছে ডেকে পাঠান। আমির আহমাদ এসে দেখে সুলতানের সম্মুখে অনেকগুলো পানীয়ের পাত্র। সুলতান সেখান থেকে একটি পান করেন। আর আমির আহমাদকে ধরিয়ে দেন অপর একটি পাত্র। যেটি ছিল বিষমিশ্রিত। আমির আহমাদ সেটি পান করে। সে সময়ই সুলতান সময় কাজে লাগানোর জন্য সবাইকে মক্কা থেকে প্রস্থানের জন্য বলেন। সফর করে পরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই আমির আহমাদের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর ফলে বাকতামুর শোকাগ্রস্ত হয়ে তার কাপড়চোপড় ছিঁড়ে ফেলে। ছেড়ে দেয় নাওয়া-খাওয়া। আল মালিকুন নাসিরের কাছে এই সংবাদ গেলে তিনি নিজে তাকে দেখতে আসেন এবং নানাভাবে তাকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা প্রদান করেন। অতঃপর বিষমিশ্রিত একটি পানীয়ের পাত্র নিয়ে বাকতামুরের হাতে দিয়ে বলেন, 'আমার জীবনের কসম করে বলছি, এই পানীয় পান করতেই তোমার অন্তরের আগুন নিভে যাবে।' বাকতামুর সেটি পান করে এবং তৎক্ষণাৎ মারা যায়। তার কাছে সুলতানের সম্মানসূচক পোশাক ও অনেক সম্পদ পাওয়া যায়। এ থেকে সুলতানের কাছে তাদের ব্যাপারে উত্থাপিত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

এশিয়া মাইনর

হজ শেষ হওয়ার পর সমুদ্রপথে ইয়েমেন ও হিন্দুস্তানে সফরের লক্ষ্যে আমি জেদ্দার উদ্দেশ্য সফর করি। কিন্তু জেদ্দায় যাওয়ার পর কোনো সঙ্গী না পাওয়ায় এই সফর হয়ে উঠে না। জেদ্দায় আমি চল্লিশ দিনের মতো অবস্থান করি। সেখানে আবদুল্লাহ আত তিউনিসি নামক এক ব্যক্তির একটি জাহাজ ছিল। তারা তখন কুস প্রদেশের আল কুসাইর শহরের উদ্দেশে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমি তাদের অবস্থা দেখার জন্য জাহাজে উঠি। কিন্তু তাদের সঙ্গে সফর করতে আমার মন সায় দেয়নি। এটি ছিল আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহ। তারা জেদ্দা থেকে সফর শুরু করে। রা'সু আবি মুহাম্মাদ নামক স্থানে মাঝসমুদ্রে তাদের জাহাজটি ডুবে যায়। জাহাজের মালিক ও কিছু ব্যবসায়ী জাহাজে থাকা ছোট নৌকায় করে তাদের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হন। আর বাকিদের সমুদ্রবক্ষেই সলিল সমাধি রচিত হয়। সেই জাহাজে সত্তরজনের মতো হাজি ছিলেন।

কিছুদিন পর আমি আইদাবে যাওয়ার উদ্দেশে সুম্বুক নামক নৌযানে আরোহণ করি। যাত্রা শুরু করার পর প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটা আমাদেরকে রা'সু দাওয়ায়ির নামক পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে আসে। সেখান থেকে আমরা বুজাতদের সঙ্গে মরুপথে সফর করি। অনেক উটপাখি ও হরিণের দেখা পাই এই পথে চলতে গিয়ে। জুহাইনা ও বনু কাহিল গোত্রের আরবরা এখানে বসবাস করে। তারা বুজাতদের আনুগত্য করে থাকে। পথিমধ্যে আমরা মাফরুর ও আল জাদিদ নামক দুটি জলাশয়ের কাছে বিশ্রাম নিই। ইতিমধ্যে আমাদের পাথেয় ফুরিয়ে আসে। দেখতে পাই একদল বুজাত মরুর মাঝে মেষপাল নিয়ে বসে আছে। তাদের কাছ থেকে আমরা গোশত ক্রয় করি। সেখানে আরবের একজন শিশুর সঙ্গে আমার দেখা হয়। সে বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলে। সে আমাকে জানায়, বুজাতরা তাকে বন্দি করেছে। একবছর ধরে সে শুধুমাত্র উটের দুধ খেয়েই বেঁচে আছে। অতঃপর আমাদের ক্রয়কৃত গোশতও ফুরিয়ে যায়। আমার কাছে তখন এক বোঝার মতো সাইহানি ও বারনি খেজুর ছিল। আমি সেগুলো আমার সাথীদের মাঝে উপহার হিসেবে বণ্টন করে দেই। তিনদিন আমরা

সেগুলো খেয়ে কাটাই। রা'সু দাওয়ায়ির থেকে সফরের নয়দিন পর আমরা আইদাবে এসে পৌঁছাই। আমাদের কিছু সঙ্গী আগেই এখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তারা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রুটি, খেজুর ও পানির মাধ্যমে মেহমানদারি করেন। এখানে আমরা কিছুদিন অবস্থান করি।

অতঃপর উট ভাড়া নিয়ে দুগাইম গোত্রের একদল আরবের সঙ্গে আমাদের পুনরায় সফর শুরু হয়। পথিমধ্যে আল জুনাইব অথবা আল খুবাইব নামক জলাশয়ের কাছে বিরতি নিয়ে হুমাইসিরা নামক স্থানে এসে অবতরণ করি। এখানে প্রসিদ্ধ আল্লাহর ওলি আবুল হাসান আশ-শাজিলির কবর রয়েছে। আমি দ্বিতীয়বার তার কবর জিয়ারতের সুযোগ লাভ করি। রাতটুকু এখানে কাটিয়ে আমরা চলে যাই আল আতওয়ানি নামক পল্লীতে। এটির অবস্থান নীলনদের তীরে। এর ওপারে সইদে মিসরের আদফু শহর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা নীলনদ পাড়ি দিয়ে প্রথমে আসনা শহরে পৌঁছাই। সেখান থেকে আরমানত শহর হয়ে আল আকসুর শহরে উপনীত হই। এখানে শায়খ আবুল হাজ্জাজ আল আকসুরির সমাধি দ্বিতীয়বারের মতো জিয়ারত করি। আকসুর থেকে পরবর্তী গন্তব্য ছিল কুস শহর। সেখান থেকে যাই কিনায়। শায়খু আবদুর রহিম আল কিনাবির কবর দ্বিতীয়বার জিয়ারত করি। অতঃপর একে একে ইখমিম, আসইয়ুত, মানফালুত, মানলাবি, আশমুনিন, মুনইয়া ইবনুল খাসিব, বাহনাসা, বুশ ও মুনইয়া আল কায়িদ শহরগুলো অতিক্রম করে মিসরে গিয়ে পৌঁছাই। এখানে কয়েকদিন অবস্থান করে বিলবিসের পথ ধরে যাত্রা করি শামের উদ্দেশে। আলহাজ আবদুল্লাহ বিন আবু বকর ইবনুল ফারহান আন নাওজারি ছিলেন আমার সঙ্গী। তিনি আমার সঙ্গে বেশ কিছু বছর ছিলেন। ভারতবর্ষে থেকে ফেরার পথে সান্দাবুর নামক স্থানে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনা অচিরেই উল্লেখ করা হবে।

প্রথমে আমরা গাজা শহরে পৌঁছাই। সেখান থেকে ইবরাহিম আ.-এর স্মৃতিধন্য শহর আল খলিলে। দ্বিতীয়বারের মতো সুযোগ হয় ইবরাহিম আ.-এর কবর জিয়ারতের। সেখানে থেকে যাই বাইতুল মুকাদ্দাস তথা জেরুজালেমে। অতঃপর আক্কা ও ত্রিপোলি অতিক্রম করে জাবলেহ শহরে পৌঁছাই। সেখানে দ্বিতীয়বার ইবরাহিম বিন আদহাম রহ.-এর সমাধি জিয়ারত করি। তারপর চলে যাই লাজিকিয়া শহরে। এইসকল শহরের বিবরণ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। লাজিকিয়া থেকে জেনোয়ার বণিকদের বড়

একটি বাণিজ্যিক জাহাজে চড়ে আমরা তুর্কি অঞ্চলের উদ্দেশে যাত্রা করি। যেটি বিলাদুর রোম বা রোমীয় অঞ্চল নামেও পরিচিত। কারণ, পূর্বে এই অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন রোমক ও গ্রিকরা এই অঞ্চল আবাদ করেছেন। অতঃপর মুসলিমরা এখানে বিজয় লাভ করেছে। এখনো এই অঞ্চলে অনেক খ্রিস্টান রয়েছে। যারা মুসলিম শাসকের অধীনে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে। সমুদ্রের বুকে অনুকূল বাতাসে আমরা দশদিন সফর করি। জাহাজের খ্রিস্টান মালিক ও মাঝি-মাল্লারা আমাদের খুব খাতিরদারি করে। এমনকি আমাদের কাছ থেকে ভাড়াও নেয়নি। যাত্রার দশম দিনে আমরা আল আলায়া শহরে পৌঁছাই। এটিই বিলাদুর রোম অঞ্চলের প্রথম শহর। এই বিলাদুর রোম অঞ্চল পৃথিবীর বুকে সৌন্দর্যে অতুলনীয়। আল্লাহ তাআলা এখানে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক সৌন্দর্যের সমাহার ঘটিয়েছেন। অন্য কোনো অঞ্চলে একসঙ্গে এত সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটেনি। এখানকার অধিবাসীরা সুন্দর চেহারার অধিকারী। তাদের পরিধেয় পোশাকে ফুটে উঠে পরিচ্ছন্নতা ও রুচিবোধের ছাপ। খাবারে রয়েছে অপূর্ব স্বাদ। আর অন্তরের কোমলতার দিকে দিয়ে তারাই পৃথিবীর শীর্ষস্থানে থাকবে। এজন্যই বলা হয়, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি পাবে শামে, আর দয়া ও কোমলতার জন্য যাবে রোমে। এখানে এই অঞ্চলের লোকদের কোমলতার কথাই বলা হয়েছে। এই অঞ্চলে এসে আমরা যখনই কোনো খানকা, সরাইখানা অথবা কারো গৃহে অবতরণ করেছি, আশপাশের পুরুষ ও নারী প্রতিবেশীগণ আমাদের খোঁজখবর নিয়েছেন। তারা পর্দা করেন না। ফেরার পথে তারা আমাদের এমনভাবে বিদায় জানিয়েছেন, যেন তারা আমাদের পরিবার বা কাছের মানুষজন। এমনকি নারীগণ আমাদের কেঁদেও পর্যন্ত দিয়েছেন। এখানকার লোকেরা সপ্তাহে একদিনই পুরো সপ্তাহের রুটি তৈরি করে। সেদিন লোকেরা আমাদের কাছে গরম গরম রুটি নিয়ে এসে বলে, আমাদের স্ত্রীরা আপনাদের জন্য পাঠিয়েছে। তারা আপনাদের কাছে দোয়া কামনা করে। এখানকার সকল অধিবাসী ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব মেনে চলা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী। কাদরিয়্যা, রাফেযি, মুতাযিলা, খারেজি অথবা অন্য কোনো বিদআত সৃষ্টিকারী দলের অবস্থান তাদের মাঝে নেই। নিশ্চয়ই তাদের প্রতি এটি আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত। তবে তারা হাশিশ নামক একধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করে। এটিকে অবৈধ মনে করে না।

আল আলায়া শহরটির অবস্থান সমুদ্র উপকূলে। আয়তনে বেশ বড়। তুর্কি জাতির লোকেরা এখানে বসবাস করে। মিসর, আলেকজান্দ্রিয়া ও শাম থেকে এখানে ব্যবসায়ীরা ভিড় জমায়। এখানে প্রচুর পরিমাণ কাঠ পাওয়া যায়। এগুলো আলেকজান্দ্রিয়া ও দিমইয়াত প্রভৃতি শহরে রপ্তানি করা হয়। সেখান থেকে চলে যায় সমগ্র মিসরে। শহরের উঁচু ভূমিতে রয়েছে অত্যন্ত চমৎকার দুর্ভেদ্য একটি দুর্গ। মহান সুলতান আলাউদ্দিন আর রুমি এটি নির্মাণ করেছিলেন। শহরের বিচারক জালালুদ্দিন আরজানজানির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি শুক্রবার দিন আমাকে সেই দুর্গে নিয়ে যান। আমরা সেখানে জুমার নামায আদায় করি। তিনি আমার জন্য উত্তম আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। শামসুদ্দিন ইবনুর রুজাইহানি নামক এক ব্যক্তিও আমার আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেছিলেন। তার পিতা আলাউদ্দিন সুদান অঞ্চলের মালিতে মৃত্যুবরণ করেন।

আল আলায়া শহরের সুলতানের বিবরণ

শনিবার দিন কাজি জালালুদ্দিনের সঙ্গে আমি আল আলায়া শহরের সুলতানের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে যাই। তার নাম ইউসুফ বেক বিন কারামান। বেক শব্দের অর্থ হচ্ছে রাজা। শহর থেকে দশ মাইল দূরে তার বাসস্থান। আমরা গিয়ে দেখেই তিনি নিভৃতে সমুদ্রপাড়ের একটি টিলার উপর বসে আছেন। উজির-নাজির ও আমলা-মন্ত্রীরা দাঁড়িয়ে আছে সেই টিলার নিচে। আর ডানে-বামে দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করছে কিছু সৈন্য। তার চুলে সাদা-কালোর মিশ্রণ ঘটেছে। আমি তাকে সালাম জানাই। তিনি আমার খোঁজখবর নেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে আসি। তিনি আমার জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

অতঃপর আল আলায়া থেকে আনাতোলিয়া[১] শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। শহরটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। অনেক প্রশস্ত ও বিশাল আয়তনবিশিষ্ট। এখানকার বাড়িঘর ও স্থাপনা খুবই চমৎকার ও সুবিন্যস্ত। যা অন্য কোথাও খুব কমই চোখে পড়ে। প্রতিটি শ্রেণীর লোকদের বসবাসের জন্য পৃথক পৃথক স্থান রয়েছে। খ্রিস্টান ব্যবসায়ীরা বাস করে মিনা নামক স্থানে। তাদের মহল্লা একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। রাতের বেলা ও জুমার

[১] বর্তমান তুরস্কের একটি পর্যটন শহর।–অনুবাদক

নামাযের সময় প্রাচীরের ফটকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখানকার প্রাচীন অধিবাসী রোমীয়রা বাস করে আলাদা একটি স্থানে। তাদের মহল্লাটিও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ইহুদিরা বাস করে আরেক জায়গায়। তাদের মহল্লাতেও প্রাচীর রয়েছে। আর এখানকার রাজা ও তার আমলা মন্ত্রী এবং ক্রীতদাসরা বাস করে মূল শহর থেকে পৃথক ভিন্ন একটি শহরে। সেখানেও রয়েছে একটি প্রাচীর, যা তাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করেছে। আর মুসলিমরা বসবাস করে শহরের মূল অংশে। সেখানে একটি জামে মসজিদ, মাদরাসা, অনেকগুলো গোসলখানা ও কয়েকটি চমৎকার সুবিন্যস্ত বাজার রয়েছে। পুরো শহরকে ঘিরে রেখেছে নগরপ্রাচীর। যার ভেতরে পূর্বোল্লিখিত স্থানগুলোও রয়েছে। এখানে অনেক বাগান রয়েছে। পাওয়া অনেক উৎকৃষ্ট ফলমূল। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় এখানকার এপ্রিকট ফলের কথা। যেটিকে এখানকার লোকেরা কামারুদ্দীন নামে ডেকে থাকে। এর বীজটি বাদামের মতো এবং খেতে খুব মিষ্টি। এই ফল রোদে শুকানো হয়। অতঃপর মিসর অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়। সেখানে এই ফলের অনেক চাহিদা রয়েছে। আনাতোলিয়া শহরের ঝরনাগুলোর পানি খুব মিষ্টি ও উৎকৃষ্ট মানের। গ্রীস্মকালেও এখানকার পানি শীতল থাকে। আমরা এই শহরের মাদরাসায় অবস্থান করি। শায়খ শিহাবুদ্দিন আল হামাবি ছিলেন এই মাদরাসার পরিচালক। জামে মসজিদে প্রতিদিন আসর নামাযের পর একদল শিশু সুললিত স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করে। আর মাদরাসাতেও ফরয নামাযের পর সূরা ফাতহ, সূরা মুলক ও সূরা নাবা তেলাওয়াতের আমল করা হয়।

আখিয়্যাতুল ফিতইয়ান (যুবক ভাইদের) কথা

বিলাদুর রোম অঞ্চলের প্রতিটি শহর ও জনপদে আমি এমন অনেক যুবক ভাইদের দেখা পেয়েছি, যারা আগন্তুক অতিথিদের অনেক সমাদর করেন ও যত্ন নেন। অল্পসময়ের মধ্যেই তারা খাবার প্রস্তুত করে নিয়ে আসেন এবং খুব দ্রুতই অতিথির অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেন। আন্তরিকতায় তারা পৃথিবীর অন্য সকল অঞ্চলের লোকদের চেয়ে নিশ্চয়ই এগিয়ে থাকবেন। অত্যাচারী শাসকের প্রতিরোধ ও দুশ্চরিত্রের পুলিশ সদস্যদের শায়েস্তা করতেও তারা তৎপর। একজন যুবক থাকেন সবার সর্দার। তাকে সবাই আখি (আমার ভাই) সম্বোধন করে। সমমনা ও সমপেশার সকল

অবিবাহিত যুবক তার কাছে এসে জড়ো হয়। এ লক্ষ্যে তারা একটি খানকা নির্মাণ করে সেখানে চাটাই, বাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা করেছে। দিনের বেলা সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত থাকে। আসর নামাযের পর থেকে তারা খানকায় এসে জড়ো হতে শুরু করে। সবাই যার যার সাধ্যমতো ফলমূল ও খাবার নিয়ে উপস্থিত হয়। শহরে যদি সেদিন নতুন কোনো অতিথি আসে, তারা আতিথেয়তার ব্যবস্থা করে। সেই অতিথি ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তাদের কাছেই অবস্থান করে। অন্য কোনো নতুন অতিথি না এলেও। অতঃপর যুবক ভাইরা একসঙ্গে বসে খাবার খায় ও সঙ্গীতের আসর জমায়। পরদিন ভোরেই তারা ফিরে যার যার কাজে। আবার আসরের পর খানকায় চলে আসে। তাদেরকে বলা হয় ফিতইয়ান অর্থাৎ যুবক। আর তাদের প্রধানকে বলা হয় আখি। যা একটু আগে বলেছি। তাদের মতো এমন চমৎকার সংঘবদ্ধ কার্যক্রম আমি এর আগে কোথাও দেখিনি। এক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে সিরাজ ও ইস্পাহানের অধিবাসীদের তুলনা করা যায়। কিন্তু অতিথিদের প্রতি হৃদয়জ আন্তরিকতা, সমাদর ও যত্নে এই যুবক ভাইরাই এগিয়ে থাকবে।

আনাতোলিয়ায় পৌঁছানোর দ্বিতীয় দিনই একজন যুবক ভাই শায়খ শিহাবুদ্দিন হামাবির কাছে এসে তার সঙ্গে তুর্কি ভাষায় কথাবার্তা বলে। আমি তাদের আলাপের কিছুই বুঝতে পারিনি। যুবক ভাইটি ছিলেন জীর্ণ পোশাক পরিহিত। মাথায় ছিল ছেঁড়া টুপি। তখন শায়খ শিহাবুদ্দিন আমাকে বলেন, এই ভাইটি কী বলছেন, তা কি বুঝতে পারছেন? আমি বললাম, না, কিছুই বুঝতে পারিনি। শায়খ আমাকে বললেন, তিনি আপনাকে তাদের মেহমানদারির আয়োজনে নিয়ে যেতে চাইছেন। আপনাকে তাদের সঙ্গেই রাখতে চায়। আমি তখন খুব অবাক হলেও তাকে বললাম, অবশ্যই, কেন নয়? যুবক ভাইটি ফিরে গেলে আমি শায়খ শিহাবুদ্দিনকে বলি, লোকটিকে দেখে খুবই দুর্বল মনে হচ্ছে। তেমন সামর্থ্যবান মনে হচ্ছে না। তাই আমরা তাকে কষ্টে ফেলতে চাই না। তখন শায়খ হেসে উঠে বলেন, এই ব্যক্তি হচ্ছেন জুতো মেরামতকারী পেশার যুবকদের সর্দার। তিনি খুবই আন্তরিক মানুষ। এই পেশার প্রায় দুইশ যুবক তাকে নিজেদের সর্দার হিসেবে মান্য করে। তারা সবাই মিলে অতিথিদের আদর-আপ্যায়নের জন্য একটি খানকা নির্মাণ করেছে। দিনের বেলায় তারা যা আয় করে, রাত্রিবেলায় খরচ করে। মাগরিব নামায আদায় শেষে সেই যুবক ভাই পুনরায় আসেন। আমরা তার

সঙ্গে খানকায় চলে যাই। গিয়ে দেখি খানকাটি খুবই সুন্দর ও গোছালো। মেঝেতে বিছানো হয়েছে সুন্দর রোমীয় কার্পেট। ইরাকি কাঁচের তৈরি ছোট ছোট অনেক বাতির আলোয় পুরো খানকাটি আলোকিত হয়ে আছে। ভেতরের কক্ষে রয়েছে তিন পায়া বিশিষ্ট তামার তৈরি পাঁচটি দীপাধার। এর উপরে রয়েছে তামার তৈরি বাতি। যার ভেতরে রয়েছে সলিতা ও গলিত চর্বি। এর পাশেই রয়েছে চর্বিভর্তি একটি তামার পাত্র ও সলিতা কেটে ঠিক করার জন্য একটি কেঁচি। এসব কিছুর দেখাশোনা করার জন্য একজন লোক নিয়োজিত রয়েছে। তাদের ভাষায় যাকে বলা হয় চেরাগজি। একদল যুবক কক্ষে বসে আছে। তাদের পরনে ছিল লম্বা জুব্বা। পায়ে ছিল জুতো। প্রত্যেকের কোমরেই বাঁধা ছিল দুইহাত দৈর্ঘ্যের একটি করে ছুরি। মাথায় ছিল সাদা রঙের পশমি টুপি। প্রতি টুপির উপরে এক হাত দৈর্ঘ্য এবং দুই আঙুল প্রস্থবিশিষ্ট একটি কাপড়ের টুকরো সংযুক্ত ছিল। মজলিসে এসে বসার পর তাদের প্রত্যেকে সেই টুপি খুলে নিজেদের সামনে রাখে। তখন তাদের মাথায় থাকে আরেকটি জারদাখানি টুপি। বেশ সুন্দর একটি দৃশ্যের অবতারণা হয় তখন। তাদের মজলিসের মধ্যখানে আগত মেহমানদের জন্য আলাদা একটি জায়গা থাকে। আমরা তাদের মজলিসে গিয়ে বসার পর তারা অনেক খাবার, ফলমূল ও মিষ্টান্ন নিয়ে আসে। এরপর তারা সঙ্গীত ও নৃত্যের আসর জমায়। আমারা তাদের উদারতা ও আন্তরিকতা দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হই। শেষরাতের দিকে আমরা তাদের খানকা থেকে ফিরে আসি।

আনাতোলিয়ার সুলতানের বিবরণ

তার নাম খিজির বেক বিন ইউনুস বেক। আমরা যখন আনাতোলিয়া পৌঁছাই, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখি তিনি অসুস্থ হয়ে বিছানায় শোয়ে আছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত কোমল স্বরে চমৎকার ভঙ্গিতে কথা বলেন। আমরা তাকে বিদায় জানিয়ে চলে আসার পর তিনি আমাদের জন্য উপহার প্রেরণ করেন।

অতঃপর আমরা চলে যাই বুরদুর শহরে। আয়তনে ছোট হলেও এই শহরে রয়েছে অনেক বাগান ও নদীনালা। উঁচু এক পাহাড়ের চূড়ায় শহরটির দুর্গের অবস্থান। আমরা এখানকার খতিবের বাড়িতে উঠি। এখানেও কিছু যুবক ভাইয়ের দেখা পাই। তারা আমাদের আতিথেয়তার আয়োজন করতে চাইলে

খতিব সাহেব তাদেরকে নিষেধ করেন। শহরের একটি বাগানে আমাদের মেহমানদারির আয়োজন করা হয়। আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছুলে সবাই আমাদের দেখে অনেক আনন্দ প্রকাশ করে। তা দেখে আমাদের আশ্চর্যের সীমা থাকে না। না তারা আমাদের ভাষা জানে, না আমরা জানি তাদের ভাষা। এমনকি আমাদের মাঝে কোনো দোভাষীও নেই। তবুও তাদের আন্তরিকতা ও উদযাপনে কোনো বিঘ্ন ঘটছে না। তাদের কাছে একদিন অবস্থান করে আমরা বিদায় নিই।

এখান থেকে চলে যাই সাবারতা (স্পার্তা) শহরে। চমৎকার ভবন ও সুবিন্যস্ত বাজারবিশিষ্ট এই শহরেও অনেক বাগান ও নদীনালা রয়েছে। এখানকার দুর্গটির অবস্থানও উঁচু এক পাহাড়ের চূড়ায়। সন্ধ্যার দিকে আমরা এখানে এসে পৌঁছাই এবং এখানকার বিচারকের বাড়িতে গিয়ে উঠি। তারপর চলে যাই আকরিদুর (এগেরদির) শহরে। এই শহরটি আয়তনে বেশ বড়। এখানে রয়েছে অনেক বাড়িঘর, সুবিন্যস্ত বেশ কয়েকটি বাজার এবং অনেক বাগান ও নদীনালা। মিষ্টি পানির একটি হ্রদও রয়েছে এখানে। এখান থেকে নৌযানে করে দুই দিনের মধ্যে আকশেহির, বেশেহির ও অন্যান্য কিছু শহর ও গ্রামে যাওয়া যায়। আমরা শহরের বিশাল জামে মসজিদের মুখোমুখি অবস্থানে নির্মিত মাদরাসায় গিয়ে উঠি। এখানকার প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন শায়খ মুসলেহুদ্দিন। তিনি মিসর ও শামে পড়াশোনা করেছেন এবং দীর্ঘ একটা সময় ইরাকে অবস্থান করেছেন। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধভাষী ও চমৎকার বাচনভঙ্গির অধিকারী। বিস্ময়কর প্রতিভাধারী। আমাদের সমাদর ও মেহমানদারিতে তিনি চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেননি।

আকরিদুরের সুলতানের বিবরণ

এখানকার সুলতানের নাম আবু ইসহাক বেক বিন দুনদার বেক। তিনি এই অঞ্চলের মহান একজন সুলতান। পিতার শাসনামলের সময় তিনি মিসরে ছিলেন। সেখান থেকে হজ করেছিলেন। ছিলেন চারিত্রিক সৌন্দর্যের অধিকারী। জামে মসজিদে প্রতিদিন আসর নামায আদায় করার পর তিনি মসজিদের কিবলামুখী দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেন। তার সম্মুখে উঁচু কাঠের টেবিলে বসেন কারীগণ। তারা হৃদয়গ্রাহী স্বরে পবিত্র কুরআন থেকে সূরা ফাতহ, সূরা মুলক ও সূরা নাবা তেলাওয়াত করেন। যা শুনে হৃদয় বিগলিত হয়, শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায় আর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করে।

তেলাওয়াত শেষ হলে সুলতান তার বাসভবনে ফিরে যান। তার এখানে থাকতেই রমযান মাস চলে আসে। সন্ধ্যাবেলায় তিনি জমিনের উপর পাতানো একটি বিছানায় বড় একটি বালিশে হেলান দিয়ে বসতেন। তার পাশেই বসতেন ফকিহ মুসলেহুদ্দিন। তারপর বসতাম আমরা। আমাদের পর বসতেন রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আমির-উমারাগণ। অতঃপর খাবার পরিবেশন করা হতো। সবার আগে সারিদ নামক খাবারের মাধ্যমে ইফতার করা হতো। একটি ছোট্ট পাত্রে উপরে ডাল এবং ঘি ও চিনিযোগে এই খাবার পরিবেশন করা হতো। বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তারা সবার আগে এই খাবার গ্রহণ করত। তারা বলত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খাবারকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। তাই আমরা নবীজির প্রতি সম্মান জানিয়ে এই খাবার দিয়ে ইফতার শুরু করি। অতঃপর অন্য সব খাবার নিয়ে আসা হতো। রমযানের প্রতি সন্ধ্যায় এমনই ছিল তাদের আয়োজন।

সে সময়েই একদিন সুলতানের পুত্রসন্তানের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাদেরকে মৃতের রূহের মাগফেরাতের জন্য তেমন কোনো আয়োজন করতে দেখা যায়নি। মিসর এবং শাম অঞ্চলেও এমন কোনো আয়োজন করা হয় না। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত লুর অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের সুলতানের সন্তানের মৃত্যু হলে তাকে সমাহিত করার পর সুলতান ও ছাত্ররা মিলে ধারাবাহিক তিনদিন ফজর নামাযের পর তার কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত করে।

সন্তানকে সমাহিত করার পরদিন আকরিদুরের সুলতান লোকদের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। তখন তিনি আমাকে হেঁটে হেঁটে যেতে দেখে একটি তিনি একটি ঘোড়া পাঠিয়ে দেন এবং আমার হেঁটে চলার ব্যাপারে নিজের দুঃখবোধ প্রকাশ করেন। আমি মাদরাসায় পৌঁছে ঘোড়াটি তার কাছে পাঠিয়ে দিই। তিনি তা এই বলে ফিরিয়ে দেন যে, 'আমি এটি তাকে উপহার হিসেবে দিয়েছি। ভাড়া হিসেবে নয়।' অতঃপর তিনি আমার কাছে রাজকীয় সম্মানসূচক পোশাক এবং বেশকিছু দিরহামও পাঠিয়ে দেন।

অতঃপর আমরা আকরিদুর থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি কুলহিসার শহরে। চারদিক থেকে পানিবেষ্টিত ছোট্ট একটি শহর কুলহিসার। এর জলভাগে অনেক নলখাগড়ার ছড়াছড়ি। নলখাগড়া ও পানির মাঝ দিয়ে তৈরি করা

সেতুর মতো একটি সরুপথই শহরে প্রবেশের একমাত্র রাস্তা। এইপথে একবারে মাত্র একজন অশ্বারোহী যেতে পারে। জলভাগের মাঝামাঝি একটি উপত্যকায় শহরের অবস্থান। তাই শহরটি খুবই দুর্ভেদ্য। কেউ এখানে আক্রমণ করতে সফল হতে পারে না। এখানে আমরা যুবক ভাইদের নির্মিত খানকায় এসে অবস্থান নিই।

কুলহিসারের সুলতানের বিবরণ

এখানকার সুলতানের নাম মুহাম্মাদ জালাবি। জালাবি শব্দটি রোমক ভাষার। এর অর্থ হচ্ছে আমার নেতা। তিনি আকরিদুরের সুলতান আবু ইসহাকের সহোদর ভাই। আমরা যখন কুলহিসারে পৌঁছাই, তখন তিনি শহরে ছিলেন না। কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি এসে আমাদের অনেক সমাদর করেন। আমাদের সাওয়ারী এবং পাথেয়ের ব্যবস্থাও করে দেন।

কুলহিসার থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কারা আগাজের পথ ধরে পরবর্তী গন্তব্যপানে চলতে থাকি। কারা অর্থ কালো আর আগাজ শব্দের অর্থ হচ্ছে কাঠ। এটি একটি সবুজ শ্যামল মরুভূমির নাম। তুর্কি জাতির কিছু লোক এখানে বসবাস করে। কুলহিসারের সুলতান আমাদের সঙ্গে একদল অশ্বারোহী সৈনিকও পাঠিয়েছিলেন। যারা আমাদেরকে লাজিক শহরে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কারণ, এই মরুভূমিতে জারমিয়ান নামক একদল ডাকাত রয়েছে। যারা ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়ার বংশধর বলে জানা যায়। তাদের নিয়ন্ত্রণে কুতাহিয়া নামক একটি শহরও রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

আমরা নিরাপদে লাজিক শহরে গিয়ে পৌঁছাই। এটিকে দুন গুজলুহ নামেও ডাকা হয়। যার অর্থ হয় শূকরের দেশ। শহরটি খুবই বিশাল ও অত্যন্ত চমৎকার। এখানে রয়েছে সাতটি জামে মসজিদ। রয়েছে দৃষ্টিনন্দন বেশকিছু বাগান, প্রবহমান নদীনালা এবং ঝরনাধারা। এখানকার বাজারগুলোও সুন্দর। এখানে স্বর্ণের পাড়যুক্ত একপ্রকার সুতি কাপড় তৈরি করা হয়, যা পৃথিবীর বুকে অদ্বিতীয়। মানসম্পন্ন সুতো ও চমৎকার বুননের কারণে এই কাপড় অনেকদিন টেকসই হয়। যা এই শহরের নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এই কাপড়ের অধিকাংশ কারিগর রোমক নারী। এখানে রোমের অনেক জিম্মির বসবাস। তারা সুলতানকে জিযিয়া প্রদান করে এখানে বাস

করে। তাদেরকে চেনার উপায় হচ্ছে তাদের মাথায় লাল অথবা সাদা রঙের লম্বা টুপি থাকে। আর তাদের মহিলাদের মাথায় থাকে বড় পাগড়ি। এই শহরের লোকেরা অসৎকাজে বাঁধা প্রদান করে না। বরং এই অঞ্চলের পুরোটা জুড়েই দেখা যায় এমন চিত্র। এখানে সুন্দরী দাসীদের বেচাকেনা হয় এবং তাদেরকে পতিতাবৃত্তির জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেক দাসীকেই তার মনিবের কাছে আয়ের নির্দিষ্ট পরিমাণ একটি অংশ জমা দিতে হয়।

এমনও শুনেছি যে, এখানকার দাসীরা পুরুষদের সঙ্গে গোসলখানায় প্রবেশ করে। অতঃপর সেখানেই তারা অপকর্মে লিপ্ত হয়। কেউ তাদেরকে নিষেধ করে না। এমনকি এখানকার বিচারকেরও এমন কিছু দাসী রয়েছে বলে আমাদের জানানো হয়। শহরে প্রবেশ করার পরপরই একদল লোক এসে উন্মুক্ত ছুরি নিয়ে আমাদের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে। অতঃপর আরেকদল এসে তাদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেয়। আমরা তাদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আতঙ্কিত অবস্থায় আমাদের ধারণা হয়, এরা বুঝি সেই জারমিয়ান নামক ডাকাত দল। আমরা কী তাদের শহরে এসে পড়লাম নাকি? মনে হয় তারা ডাকাতি করে আমাদের সব ছিনিয়ে নিবে। ইত্যবসরে একজন হাজির আগমন ঘটে। তিনি আরবি ভাষা জানতেন। তাকে আমি এই লোকদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তারা হচ্ছে যুবক সংঘের সদস্য। যারা প্রথমে আমাদের কাছে এসেছিল তারা হচ্ছে যুবক সর্দার সিনানের অনুসারী। আর পরের দল যুবক সর্দার তুমানের অনুসারী। প্রত্যেক দলই চাচ্ছে আপনাদেরকে তাদের কাছে নিয়ে মেহমানদারি করাতে। আমরা তাদের এমন উদারতা দেখে যারপরনাই বিস্মিত হই। অতঃপর লটারির মাধ্যমে তাদের মধ্যে সমঝোতার সিদ্ধান্ত হয়। লটারিতে যাদের নাম উঠবে তারা আমাদেরকে নিয়ে যাবে। তখন যুবক সর্দার সিনানের নাম উঠে। তিনি এই সংবাদ পেয়ে আরো একদল অনুসারী নিয়ে এসে আমাদেরকে সালাম জানিয়ে তার খানকায় নিয়ে যান। উপস্থিত করা হয় হরেক রকম খাবার। এরপর তিনি আমাদেরকে গোসলখানায় নিয়ে যান। তিনি আমার সেবায় নিয়োজিত হন। আর তার অন্যান্য সাথীরা নিয়োজিত হয় আমার সাথীদের সেবায়। তিন-চারজন মিলে একজনের সেবায় নিয়োজিত ছিল। গোসল সেরে বের হওয়ার পর তারা খাবারের বিরাট আয়োজন করে। সঙ্গে মিষ্টান্ন ও অনেক প্রকার ফলমূলও হাজির করে। খাবার পর্ব শেষ হলে কারীগণ পবিত্র কুরআন থেকে

তেলাওয়াত করেন। এরপর তারা মগ্ন হয় সঙ্গীত ও নৃত্যের আসরে। এখানকার সুলতানকেও তারা আমাদের আগমনের ব্যাপারে অবহিত করে। পরদিন সন্ধ্যায় সুলতান আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমরা প্রথমে তার সঙ্গে এবং তার পুত্রের সঙ্গে দেখা করি। এর বিবরণ সামনে আসবে। অতঃপর আমরা খানকায় ফিরে এসে দেখি অপর যুবক সর্দার তুমান তার সঙ্গীদের নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা আমাদেরকে তাদের খানকায় নিয়ে আসে। আগের দিনের মতোই আমাদের জন্য নাস্তা ও গোসলের আয়োজন করে তারা। গোসল সেরে বেরিয়ে আসার পর তারা আমাদের উপর গোলাপজলও ছিটিয়ে দেয়। এরপর আমাদের খানকায় নিয়ে এসে তারাও খাবার, মিষ্টান্ন ও ফলমূলের বিরাট আয়োজন করে। অতঃপর আগের রাতের মতোই কুরআন তেলাওয়াত এবং সঙ্গীত ও নৃত্যের আসর করা হয়। আমরা বেশ কিছুদিন তাদের এই খানকায় অবস্থান করি।

লাজিকের সুলতানের বিবরণ

তার নাম ইয়ানানজ বেক। তিনিও বিলাদুর রোম অঞ্চলের মহান একজন সুলতান। যুবক সর্দার সিনানের খানকায় অবস্থান করার সময় তিনি প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ ও আলেম আলাউদ্দিন আল কাসতামুনিকে আমাদের কাছে প্রেরণ করেন। তার সঙ্গে করে আমাদের জন্য ঘোড়াও প্রেরণ করেন। আমরা তার সঙ্গে এসে সুলতানকে সালাম প্রদান করি। তখন রমযান মাস চলছিল।

এই অঞ্চলের সুলতানদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা মেহমানদের সঙ্গে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা দেখান, কোমল ভাষায় কথা বলেন এবং অল্প পরিমাণ উপহার প্রদান করেন। অতঃপর সুলতানের পুত্র মুরাদ বেকও আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি তখন অবস্থান করছিলেন শহরের বাইরের এক বাগানবাড়িতে। ফলমূল আহরণের সময় এলে তিনি সেখানে চলে যান। তিনিও তার বাবার মতো আমাদের সকলের জন্য ঘোড়া পাঠিয়ে দেন। আমরা তার বাগানে এসে উপস্থিত হই এবং রাতটুকু সেখানেই অবস্থান করি। তার এখানে একজন ফকিহ ছিলেন। তিনি আমাদের কথার অনুবাদ করে দিতেন। পরদিন সকালে আমরা তার এখান থেকে ফিরে আসি। এই শহরেই আমরা ঈদুল ফিতর উদযাপন করি। ঈদগাহে নামায পড়ার জন্য যাই। সুলতান আসেন তার বাহিনী নিয়ে। আর যুবক সংঘের

সদস্যরা সবাই আসে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে। এখানকার প্রতি পেশার লোকদের কাছে ঢোল-তবলা ও বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। এগুলো নিয়ে তাদের মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতাও চলে। প্রত্যেক পেশার লোকেরাই সেদিন বকরি, মেষ ও পাত্র বোঝাই করে রুটি নিয়ে আসে। অতঃপর গোরস্থানে পশু জবাই করে এর গোশত ও রুটি সদকা করে দেয়। প্রথমে তারা গোরস্থানে যায়। সেখানে থেকে ঈদগাহে আসে।

ঈদের নামায আদায় শেষে আমরা সুলতানের সঙ্গে তার বাসভবনে যাই। সেখানে খাবার পরিবেশন করা হয়। ফকিহ, শায়খ এবং যুবক সংঘের ভাইদের জন্য আলাদা দস্তরখান এবং অসহায় লোকদের জন্য আলাদা দস্তরখানের ব্যবস্থা করা হয়। সেদিন ধনী-দরিদ্র সবার জন্যই সুলতান মেহমানদারির আয়োজন করেন।

পরবর্তী যাত্রাপথ বিপদসংকুল হওয়ার কারণে আমাদের এই শহরে অবস্থান কিছুটা দীর্ঘ হয়। অতঃপর একটি কাফেলা প্রস্তুত হয়ে গেলে আমরা তাদের সঙ্গে একদিন ও রাতের কিছু অংশ সফর করে তাওয়াস দুর্গে পৌছাই। দুর্গটি বেশ বড়। বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি সুহাইব রা. ছিলেন এই দুর্গের বাসিন্দা। দুর্গের বাইরেই আমরা রাত কাটাই। পরদিন সকালে দুর্গের দরজায় গিয়ে দাঁড়াই। প্রাচীরের উপর থেকে প্রহরীরা আমাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করে। আমরা তাদেরকে সে ব্যাপারে অবগত করি। সে সময়েই দুর্গের অধিপতি ইলিয়াস বেক তার বাহিনী নিয়ে বের হয়েছিলেন দুর্গপ্রাচীর ও পথের নিরাপত্তা যাচাই করে দেখার জন্য। যাতে করে চোরেরা কিছুতেই গৃহপালিত পশুর পাল থেকে চুরি করতে না পারে। তারা চারদিকে পর্যবেক্ষণ করে আসার পর তাদের পশুপাল বের করা হয়। এমনটিই তাদের রোজকার নিয়ম। দুর্গের অভ্যন্তরে দরিদ্র এক ব্যক্তির খানকায় আমরা অবস্থান করি। দুর্গের অধিপতি আমাদের জন্য আতিথেয়তাস্বরূপ খাবার এবং পাথেয় প্রেরণ করেন।

তাওয়াস দুর্গ থেকে যাত্রা করে আমরা চলে যাই মুগলা শহরে। সেখানে এক শায়খের খানকায় অবস্থান গ্রহণ করি। সেই শায়খ ছিল অনেক সম্মানিত ও মহৎ ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রায়ই আমাদের কাছে আসতেন এবং প্রতিবারই তার সঙ্গে খাবার, ফলমূল অথবা মিষ্টান্ন থাকত। এখানে আমাদের সাক্ষাৎ হয় ইবরাহিম বেকের সঙ্গে। তিনি মিলাস শহরের সুলতানের পুত্র। এই

সুলতানের কথা সামনে উল্লেখ করব। ইবরাহিম বেকের আমাদের সম্মান-সমাদর করে এবং সম্মানসূচক পোশাক উপহার দেন।

অতঃপর আমরা চলে আসি মিলাস শহরে। এটি বিলাদুর রোম অঞ্চলের অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন ও বিশাল একটি শহর। এখানে রয়েছে অনেক ফলমূল, বাগান এবং জলাধার। এখানকার একজন যুবক সর্দারের খানকায় আমরা অবস্থান গ্রহণ করি। তারা আমাদের সেবা ও আতিথেয়তায় পূর্বের সকল যুবক ভাইদের ছাড়িয়ে যান। এখানে আবুশ শুশতারি নামক অশীতিপর বৃদ্ধ বুযুর্গের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। কথিত আছে, তার বয়স দেড়শ বছরেরও বেশি। তখনও তিনি সুস্থভাবে নড়াচড়া করেন এবং সুস্থ মেধাসম্পন্ন। স্মৃতিশক্তিও ছিল বেশ ভালো। তিনি আমাদের জন্য দোয়া করেন। আমরা তার বরকত লুফে নিই।

মিলাসের সুলতানের বিবরণ

তিনি মহান সুলতান সুজাউদ্দিন উরখান বেক ইবনুল মুনতাশা। চারিত্রিক ও আকৃতিগত সৌন্দর্য উভয়দিক থেকেই তিনি ছিলেন প্রবাদতুল্য একজন সুলতান। তার সভাসদ ছিলেন ফকিহগণ। তাদেরকে তিনি অনেক সম্মান ও সমাদর করতেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফকিহ আল খাওয়ারিজমি। তিনি ছিলেন বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষ প্রতিভাবান একজন ব্যক্তি। আমরা যখন মিলাসের সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি ছিলেন এই ফকিহের উপর অসন্তুষ্ট। কারণ, এই ফকিহ আয়াসুলুক শহরে গিয়ে সেখানকার সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তার উপহার গ্রহণ করেছিলেন। তাই ফকিহ আল খাওয়ারিজমি আমাকে তার ব্যাপারে সুলতানের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। আমি সুলতানের কাছে ফকিহ আল খাওয়ারিজমির খুব প্রশংসা করি এবং তার জ্ঞান-গরিমার কথা আলোচনা করি। অনেকক্ষণ এ প্রসঙ্গে আলোচনা করার পর সুলতান তার অসন্তুষ্টি প্রত্যাহার করেন। এই সুলতান আমাদের অত্যন্ত সমাদর করেছিলেন এবং আমাদের সাওয়ারি ও পাথেয়ের ব্যবস্থাও করেছিলেন। মিলাস থেকে দুই মাইল দূরের বারজিন শহরে তার বাসভবন। সেখানকার একটি পাহাড়ের পাদদেশে নবনির্মিত এই শহরের অবস্থান। সেখানে বেশকিছু নান্দনিক বাড়িঘর ও মসজিদ রয়েছে। সুলতান সেখানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে সেটি আর সম্পন্ন করা হয়নি। আমর

এখানে এসেই সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং আলী নামক এক যুবক সর্দারের খানকায় অবস্থান গ্রহণ করি।

অতঃপর সুলতানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কোনিয়া শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। চমৎকার বাড়িঘর, প্রচুর নদীনালা, জলাধার, বাগান ও ফলমূলবিশিষ্ট বিশাল এক শহর কোনিয়া। এখানে কামারুদ্দিন নামে পরিচিত এপ্রিকট ফলও পাওয়া যায়। যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখান থেকেও এই ফল মিসর ও শামে রপ্তানি করা হয়। কোনিয়ার সড়কগুলো বেশ প্রশস্ত এবং বাজারগুলো অসাধারণভাবে বিন্যস্ত। প্রত্যেক শিল্পের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা দোকানের সারি। কথিত আছে, আলেকজান্ডার দি গ্রেট এই শহরের গোড়াপত্তন করেছিলেন। এটি এখন সুলতান বদরুদ্দিন বিন কারামানের শাসনাধীন। তার আলোচনা সামনেই আসবে। একবার ইরাকের সুলতানও এই শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন। তার শাসনাধীন অঞ্চল থেকে এই শহরের অবস্থান খুব বেশি দূরে নয়। আমরা এখানকার বিচারকের খানকায় অবস্থান গ্রহণ করি। তিনি ইবনে কলম শাহ নামে পরিচিতি। তিনিও যুবক সংঘ পরিচালনা করে। তার খানকাটি অন্যান্য খানকার তুলনায় বেশ বড়। তার ছাত্রের সংখ্যাও অনেক। তাদের সনদ আমিরুল মুমিনীন আলী রা.-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাদের স্বতন্ত্র পোশাক হচ্ছে পায়জামা। এই কাজি আমাদের সম্মান ও সমাদরের যে আয়োজন করেন, তা ছিল পূর্বের সকল আয়োজনের তুলনায় বিশাল। তিনি নিজ সন্তানকে তার পরিবর্তে আমাদের সেবা করার জন্য গোসলখানায় পাঠান। এই শহরেই রয়েছে প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও সুফি জালালুদ্দিন রুমির সমাধি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান একজন মনীষী। বিলাদুর রোম অঞ্চলে তার অনুসারী একদল লোক রয়েছে। যারা তার নামানুসারে জালালিয়্যাহ নামে পরিচিত। যেমনিভাবে ইরাকে আহমাদিয়্যাহ নামের একদল লোক রয়েছে। খোরাসানে রয়েছে হায়দারিয়্যাহ নামের একদল লোক। তার সমাধির পাশেই নির্মাণ করা হয়েছে বিরাট একটি খানকা। আগত মেহমানদের জন্য সেখানে আতিথেয়তা ও খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।

একটি ঘটনা

জানা যায়, জালালুদ্দিন প্রথমদিকে একজন ফকিহ ও শিক্ষক ছিলেন। কোনিয়ার এক মাদরাসায় ছাত্ররা তার কাছে এসে শিক্ষা লাভ করত।

একদিন এক মিষ্টান্ন বিক্রেতা মাথায় মিষ্টান্নের বোঝা নিয়ে তার মাদরাসায় আসে। টুকরো টুকরো করে কাটা মিষ্টান্নের একেকটির দাম ছিল এক পয়সা করে। সেই বিক্রেতা জালালুদ্দিনের শ্রেণীকক্ষের কাছাকাছি চলে আসলে তিনি তাকে কাছে ডাকেন। বিক্রেতা তাকে এক টুকরো মিষ্টান্ন প্রদান করে। জালালুদ্দিন সেটি নিজ হাতে গ্রহণ করে ভক্ষণ করেন। অতঃপর বিক্রেতা বেরিয়ে যায়। শুধুমাত্র শায়খ জালালুদ্দিনকেই সে এই মিষ্টান্ন দিয়েছিল। অন্য কোনো ছাত্রকে দেয়নি। সে বেরিয়ে গেলে শায়খ জালালুদ্দিনও ছাত্রদের দরস প্রদান ছেড়ে তার পিছু পিছু যেতে থাকেন। এদিকে ছাত্ররা তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর তারা শায়খের সন্ধানে বেরিয়ে দেখে তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকবছর পর শায়খ জালালুদ্দিন আবার তাদের কাছে ফিরে আসেন। কিন্তু এবার তিনি শুধু ফারসি কবিতা ব্যতীত আর কিছুই বলছিলেন না। ছাত্ররা এর কিছুই বুঝছিল না। তবুও তারা তার মুখনিঃসৃত কবিতাগুলো লিখে রাখছিল। এভাবেই রচিত হয় তার বিখ্যাত গ্রন্থ মসনবি শরিফ। এই অঞ্চলের লোকেরা এই গ্রন্থকে অত্যন্ত সম্মান করে এবং শায়খের রচনা হিসেবে গণ্য করে। জুমার দিনের রাতে খানকাগুলোতে এটি তারা নিজে পড়ে এবং অন্যদেরকেও পড়ায়। এই শহরে ফকিহ আহমাদ নামক আরেকজন মনীষীর কবর রয়েছে। তার ব্যাপারে বলা হয়, তিনি জালালুদ্দিন রুমীর শিক্ষক ছিলেন।

অতঃপর আমরা কোনিয়া থেকে প্রস্থান নিয়ে চলে আসি অনেক নদীনালা ও বাগানবেষ্টিত লারান্দা শহরে।

লারান্দার[১] সুলতানের বিবরণ

এই শহরের সুলতানের নাম বদরুদ্দিন বিন কারামান। প্রথমে এখানকার ক্ষমতায় ছিলেন তার সহোদর ভাই মুসা। তিনি সুলতান আল মালিকুন নাসিরের সঙ্গে বিনিময় চুক্তি করে তার হাতে এই শহরের ক্ষমতা ছেড়ে দেন। সুলতান আল মালিকুন নাসির এখানে গভর্নর ও সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এরপর সুলতান বদরুদ্দিন ক্ষমতা দখল করে এটিকে তার রাজধানী বানিয়ে এবং এখানেই তার ক্ষমতা সুসংহত হয়। শহরতলীতে এই সুলতানের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি তখন শিকার থেকে

[১] তুরস্কে অবস্থিত। বর্তমান নাম কারামান।–অনুবাদক

ফিরছিলেন। আমি তার সম্মানে বাহনজন্তুর পিঠ থেকে নেমে গেলে তিনিও বাহনজন্তুর পিঠে থেমে নেমে যান। আমি তাকে সালাম জানাই। তিনি জবাব দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসেন। এই অঞ্চলের সুলতানদের স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে, যদি কোনো অতিথি তাদের সম্মানে বাহনজন্তুর পিঠ থেকে নেমে যায়, তখন তারাও সেই অতিথিকে সম্মান জানিয়ে বাহন থেকে নেমে যান। তার এই কাজের প্রজারা খুব মুগ্ধ হয়। তাকে আগের চেয়েও বেশি সম্মান করে। বাহনে আরোহণরত অবস্থায় তাদেরকে সালাম দিলে তারা অসন্তুষ্ট হয়। এটি তারা মেনে নিতে পারে না। এমনটি করলে সেই অতিথিকে সুলতানের আতিথেয়তা ও উপহার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এক সুলতানের সঙ্গে আমারও এমন ঘটনা ঘটেছিল। অচিরেই তা উল্লেখ করব। লারান্দার সুলতানের সঙ্গে সালাম বিনিময়ের পর তিনি তার বাহনজন্তুর উপর উঠে বসেন। আমিও আমার বাহনজন্তুর উপর উঠে বসি। তিনি তখন আমার খোঁজখবর নেন এবং এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর আমি তার সঙ্গে শহরে প্রবেশ করি। তিনি আমার উত্তম আতিথেয়তার নির্দেশ দেন। রূপার পাত্রে করে অনেক খাবার, ফলমূল ও মিষ্টান্ন আমার কাছে পাঠাতেন তিনি। সঙ্গে থাকত মোমবাতি। এছাড়াও তিনি আমাকে সম্মানসূচক পোশাক পরিয়ে দেন। বাহনের ব্যবস্থা করেন এবং উপহার প্রদান করেন। তার এখানে আমাদের অবস্থান দীর্ঘ হয়নি। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাই আকসারা[১] শহরে।

আকসারা শহরটি বিলাদুর রোম অঞ্চলের অনিন্দ্য সুন্দর ও সুরক্ষিত শহরগুলোর মাঝে অন্যতম। চারদিক থেকেই শহরটিকে ঘিরে রেখেছে প্রবহমান জলধারা এবং অনেক উদ্যান ও বাগান। শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে তিনটি নদী। প্রবাহিত হয়েছে লোকদের বসতবাড়ির পাশ দিয়ে। এখানে আছে হরেক রকম গাছপালা ও আঙুরের ঝাঁকা। শহরের অভ্যন্তরেও রয়েছে অনেক বাগান। এখানে মেষের পশম দিয়ে একপ্রকার কার্পেট বানানো হয়। যা এই শহরের নামে পরিচিত। পৃথিবীতে যা অদ্বিতীয়। এখান থেকে শাম, মিসর, ইরাক, ভারতবর্ষ, চীন ও তুর্কি অঞ্চলে এই কার্পেট রপ্তানি করা হয়। অনিন্দ্য সুন্দর এই শহরটি ইরাকের সুলতানের শাসনাধীনে রয়েছে। আমরা এখানে শরিফ হুসাইনের সরাইখানায় গিয়ে উঠি। শরিক

---

[১] বর্তমান নাম আকসারায় (Aqsaray)।–অনুবাদক

হুসাইন ছিলেন ইরাকের সুলতানের পক্ষ থেকে বিলাদুর রোম অঞ্চলে নিযুক্ত গভর্নর আমির আরতানার ডেপুটি গভর্নর। এই শরিফ হুসাইন ছিলেন যুবক সংঘের একজন সর্দার। তার অনেক অনুসারী রয়েছে। তিনি আমাদেরকে আগের যুবক ভাইদের মতোই অনেক সম্মান-সমাদর এবং ভরপুর মেহমানদারি করেন।

অতঃপর আমরা যাত্রা করি নাকদা[১] শহরের উদ্দেশে। এটিও ইরাকের সুলতানের শাসনাধীন শহর। শহরটি বেশ বড় এবং অনেক লোকের বসবাস এখানে। শহরের কিছু অংশ এখন বিলুপ্ত। এর মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে প্রসিদ্ধ ব্ল্যাক রিভার বা কালো নদী। যা পৃথিবীর বড় নদীগুলোর একটি। নদীর উপর নির্মাণ করা হয়েছে তিনটি সেতু। একটি শহরের ভেতরে আর দুইটি শহরতলীতে। শহরের ভেতরে ও শহরতলীতে নদীর বুকে জলচাকাও বসানো হয়েছে। যার সাহায্যে বাগানগুলোতে পানি সেচ দেওয়া হয়। এখানে প্রচুর ফলমূল উৎপন্ন হয়। এখানে এসে আমরা জারুক নামক যুবকসর্দারের খানকায় অবস্থান গ্রহণ করি। এই শহরের গভর্নরও তিনি। যুবক সংঘের স্বাভাবিক নিয়মনীতি অনুযায়ী তিনি আমাদের যথাযথ সম্মান-সমাদর ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। আমরা তিনদিন তার এখানে অবস্থান করি।

এরপর যাত্রা করি কায়সারিয়্যা[২] শহরের উদ্দেশে। এটিও ইরাকের সুলতানের শাসনাধীনে রয়েছে। এই শহরটি বিলাদুর রোম অঞ্চলের বৃহদায়তনের শহরগুলোর মাঝে অন্যতম। এখানে ইরাকের সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পূর্ব আলোচিত গভর্নর আরতানার একজন স্ত্রী-ও এখানে বসবাস করেন। তিনি খুবই সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিতা একজন নারী। ইরাকের সুলতানের সঙ্গে তার বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে। তাকে বলা হয় আগা।[৩] আগা অর্থ শ্রেষ্ট। যাদের সঙ্গে সুলতানের সম্পর্ক রয়েছে তাদের প্রত্যেককেই এই নামে ডাকা হয়। তার নাম তুগা খাতুন। আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গেলে তিনি আমাদের সম্মানে উঠে দাঁড়ান এবং আমাদের সঙ্গে আন্তরিক আলাপ বিনিময় করেন। আমাদের জন্য খাবার পরিবেশন করার নির্দেশ দেন। আমরা

---

[১] বর্তমান নাম নিগদে (Nigde)।–অনুবাদক

[২] বর্তমান নাম কায়সেরি (Kayseri), তুরস্কের প্রসিদ্ধ একটি শহর।–অনুবাদক

[৩] মোঙ্গলদের আকা শব্দ থেকে আগা শব্দের উৎপত্তি। আকা শব্দের অর্থ হচ্ছে বড় ভাই, প্রধান। তুর্কিরা এটিকে সম্মানসূচক উপাধি হিসেবে ব্যবহার করে। পরবর্তীতে উসমানি শাসনামলে এটি সামরিক পরিভাষায় পরিণত হয়।–অনুবাদক

সেখানে আহার সেরে নিই। তার এখান থেকে ফিরে আসার পর তার এক গোলামকে দিয়ে তিনি আমাদের জন্য লাগাম পরিহিত ও হাওদাবিশিষ্ট ঘোড়া এবং দিরহামের থলে পাঠিয়ে দেন এবং এর বেশি দিতে না পারার জন্য দুঃখবোধ প্রকাশ করেন। এখানে আমরা আমির আলী নামক এক যুবক সর্দারের খানকায় অবস্থান করি। তিনি এই অঞ্চলের অন্যতম এবং বিশিষ্ট একজন যুবক সর্দার। শহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও তার অনুসারী। তার খানকাটি সবচেয়ে সুন্দর ও সুসজ্জিত। অনেক প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয় এখানে। পরিবেশ করা হয় অনেক খাবার। এমনিভাবে খানকার নির্মাণশৈলীও বেশ মজবুত। তার সকল অনুসারী প্রতিদিন রাতে এখানে এসে সমবেত হয়। অন্যান্য যুবক সংঘের সদস্যরা অতিথিদের যে সম্মান-সমাদর করে, তারা করে এর কয়েকগুণ বেশি। এই অঞ্চলের একটি রীতি হচ্ছে, যেসমস্ত শহরে কোনো সুলতান অথবা গভর্নর নেই, যুবক সংঘের সর্দারই হন সেখানকার শাসক। তিনিই নিজ সাধ্য অনুযায়ী আগত অতিথিদের বাহনের ব্যবস্থা করেন। সম্মানসূচক পোশাক পরিয়ে দেন এবং যথাসম্ভব উপহার প্রদান করেন। সুলতানের মতো করেই তিনি শাসন পরিচালনা ও আদেশ-নিষেধ করে থাকেন।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সিভাস শহর। এটিও ইরাকের সুলতানের শাসনাধীন এবং এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহর। এই অঞ্চলের বড় বড় আমির-উমারা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিবাস এখানে। সুবিন্যস্ত ভবন এবং প্রশস্ত সড়কবিশিষ্ট ছিমছাম সুন্দর একটি শহর। এখানকার বাজারগুলো জনকোলাহলে পরিপূর্ণ। এখানে মাদরাসার মতো একটি ভবন রয়েছে। যেটিকে বলা হয় দারুস সিয়াদাহ। এখানে কেবল সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তি এবং তাদের প্রতিনিধিরাই অবস্থান করতে পারে। অবস্থানের সময় তাদের জন্য বিছানা, খাবার এবং মোমবাতি প্রভৃতির বরাদ্দ রয়েছে। ফেরার সময় এখান থেকেই তাদের পাথেয়ও প্রস্তুত করে দেওয়া হয়।

এই শহরে আসার পর যুবক সর্দার বিজাকজির অনুসারীগণ আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা দলবদ্ধ হয়ে এসেছিলেন। কেউ এসেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে, কেউ পদব্রজে। অতঃপর আমাদের সাক্ষাৎ হয় অপর যুবক সর্দার জালবির অনুসারীদের সঙ্গে। তিনিও বিশিষ্ট একজন যুবক সর্দার এবং আগের সর্দার বিজাকজির চেয়ে উঁচু স্তরের। তারা আমাদেরকে তাদের মেহমানদারি গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু বিজাকজির অনুসারীদের সঙ্গে আগে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমাদের জন্য তা সম্ভব হয়নি। আমরা দুই

দলের সঙ্গেই শহরের ভেতরে প্রবেশ করি। তারা একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। আমাদের কাছে আগে পৌছানো দলটির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করায় তারা আনন্দে উল্লাস করছিল। অতঃপর তারা আমাদের খানকায় নিয়ে নাস্তা, গোসল, খাবার এবং রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করে। তাদের আন্তরিক আতিথেয়তায় আমরা তিনদিন অবস্থান করি। অতঃপর শহরের বিচারক তার একদল ছাত্রসমেত আমাদের কাছে আসেন। তাদের সঙ্গে ছিল বিলাদুর রোম অঞ্চলের গভর্নর আরতানার পক্ষ থেকে পাঠানো ঘোড়া। আমরা তাদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বসি। অতঃপর গভর্নরের বাসভবনের দেহলিজে তার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদেরকে সালাম দেন ও স্বাগত জানান। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ আরবিভাষী। আমার কাছে ইরাকে আজম, ইরাকে আরব, ইস্পাহান, সিরাজ ও কিরমান, সুলতান আতাবেক, শাম ও মিসর এবং তুর্কি সুলতানদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করেন। তিনি কামনা ছিল আমি যেন মহান ও উদার সুলতানদের প্রশংসা করি এবং কৃপণদের নিন্দা করি। কিন্তু আমি তা না করে সবারই প্রশংসা করি। এতে তিনি আনন্দিত হন এবং তাদের পক্ষ থেকে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অতঃপর খাবার পরিবেশন করা হলে আমরা আহার সেরে নিই। তিনি বলেন, আপনারা আমার মেহমানদারিতেই থাকবেন। তখন যুবক সর্দার আখি জালবি তাকে বলেন, তাহলে তো তারা আর খানকায় যাবেন না। তাই তারা আমার কাছেই থাকুক। আপনার মেহমানদারি তাদের কাছে পৌছে দেওয়া হবে। আমির আরতানা বললেন, তাহলে তাই করো। তখন আমরা যুবক সর্দার জালবির খানকায় চলে যাই। সেখানে তার ও গভর্নরের আতিথেয়তায় ছয়দিন অবস্থান করি। অতঃপর গভর্নর আমাদের জন্য ঘোড়া, পোশাক ও দিরহাম পাঠিয়ে দেন এবং বিভিন্ন শহরে নিযুক্ত তার প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে লিখে দেন, তারা যেন উত্তমরূপে আমাদের আতিথেয়তার ব্যবস্থা করে এবং আমাদের পাথেয় প্রস্তুত করে দেয়।

অতঃপর আমরা আমাসিয়া শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। নদীনালা, বাগান, গাছপালা ও ফলমূলবিশিষ্ট বিরাট আয়তনের চমৎকার এক শহর আমাসিয়া। বাগান ও ঘরবাড়িতে পানি সরবরাহের জন্য নদীতে জলচাকা স্থাপন করা হয়েছে। এখানে রয়েছে প্রশস্ত সড়ক আর সুবিন্যস্ত বাজার। ইরাকের সুলতানের শাসনে শহরটি পরিচালিত হয়। এর কাছেই সানুসি শহরের অবস্থান। সেটিও ইরাকের সুলতানের শাসনাধীন। আল্লাহর ওলি বুযুর্গ আবুল

আব্বাস আহমাদ আর রিফায়ির সন্তানগণ এই শহরে বসবাস করেন। শায়খ ইজ্জুদ্দিন এখানকার বর্তমান গদিনশীন। শায়খ আবুল আব্বাস আর রেফায়ির ভাই শায়খ আলী, শায়খ ইবরাহিম, শায়খ ইয়াহইয়া এবং শায়খ তাজুদ্দিন আর রিফায়ির সন্তান শায়খ আহমাদ কুজাকের (কুজাক মানে কনিষ্ঠ) সন্তানরাও এখানে বাস করেন। আমরা তাদের খানকায় অবস্থান গ্রহণ করি এবং তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষী হই।

অতঃপর আমরা চলে যাই কুমিস শহরে। এটিও ইরাকের সুলতানের অনুগত ব্যস্ততা ও কোলাহলময় বড় একটি শহর। ইরাক ও শামের ব্যবসায়ীরা এখানে আগমন করে। এখানে রয়েছে রূপার খনি। এখান থেকে দুই দিনের দূরত্বে দুর্গম জায়গায় উঁচু পর্বতশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সেখানে যাইনি। কুমিস শহরে আমরা যুবক সর্দার আখি মাজদুদ্দিনের খানকায় গিয়ে উঠি। তার আতিথেয়তায় তিনদিন অবস্থান। আগের যুবক ভাইদের মতোই তিনি আমাদের আতিথেয়তায় কোনো কার্পণ্য করেননি। এখানে গভর্নর আরতানার নিযুক্ত প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করেন এবং আমাদের জন্য খাবার ও পাথেয় প্রেরণ করেন।

কুমিস থেকে প্রস্থান নিয়ে আমরা চলে আসি আরজানজান শহরে। যা ইরাকের সুলতানের শাসনাধীন। এটিও জনবহুল বিশাল একটি শহর। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী আর্মেনীয়। এখানে বসবাসরত মুসলিমরা কথা বলে তুর্কি ভাষায়। শহরের বাজারগুলো বেশ বড় ও সুবিন্যস্ত। এখানে চমৎকার পোশাক তৈরি করা হয়। যা এই শহরের নামে বিখ্যাত। আরো আছে তামার খনি। এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন বাসন, পাত্র এবং প্রদীপদানি তৈরি করে, যা দেখতে অনেকটা মিনারের মতো। এখানে আখি নিযামুদ্দিনের খানকায় আমরা অবস্থান গ্রহণ করি। এই খানকাটিও খুব সুন্দর। আখি নিযামুদ্দিনও একজন বিশিষ্ট ও অগ্রগণ্য যুবক সর্দার। তিনি উত্তমরূপে আমাদের মেহমানদারি করেন।

তারপর আমরা চলে যাই এরজুরুম শহরে। এটিও ইরাকের সুলতানের অনুগত। আয়তনে বেশ প্রশস্ত হলেও তুর্কিদের দুই দলের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের ফলে এর অধিকাংশই এখন বিরান পড়ে আছে। এর মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে তিনটি নদী। অধিকাংশ বাড়িতেই রয়েছে বিভিন্ন ফলের ঝাঁকাবিশিষ্ট বাগান। এখানে আমরা যুবক সর্দার আখি তোমানের খানকায়

গিয়ে উঠি। তিনি অত্যন্ত বয়স্ক একজন ব্যক্তি। তার বয়স প্রায় একশ ত্রিশের কাছাকাছি বলে জানা যায়। আমি দেখেছি তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে দুই পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। তার স্মৃতিশক্তিও বেশ ভালো ছিল তখন। সময়ানুবর্তিতার সাথে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। তার কোনো কাজ নিয়েই আপত্তি তোলা যায় না। তবে তিনি রোযা রাখতে সক্ষম নন। তিনি নিজহাতে আমাদের খাবার পরিবেশন করেন আর তার সন্তানরা গোসলখানায় আমাদের সেবা করেন। একদিন অবস্থান করার পরই আমরা চলে আসতে চেয়েছিলাম। তিনি তাতে কষ্ট পেয়ে বলেন, 'এমনটি করলে আপনারা আমার সম্মানহানি করবেন। মেহমানদারির ন্যূনতম সময় হচ্ছে তিনদিন।' তাই আমরা তার কাছে তিনদিন অবস্থান করি।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য বিরগি শহর। আসরের পর আমরা এই শহরে পৌঁছাই। স্থানীয় একজন লোকের কাছে এখানকার যুবক সর্দারের খানকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন আমি আপনাদেরকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা তার পিছু পিছু যেতে থাকি। তিনি আমাদেরকে তার একটি বাগানে নিজের বাড়িতেই নিয়ে যান। আমরা তার বাসভবনের ছাদে অবস্থান করি। তখন ছিল প্রচণ্ড গরমের সময়। ঘন গাছপালার নিবিড় ছায়ায় আমাদের উপভোগ্য সময় কাটে। তিনি আমাদের জন্য হরেক রকম ফলমূল নিয়ে আসেন এবং আতিথেয়তায় এতটুকুও কার্পণ্য করেন না। আমাদের বাহনজন্তুগুলোর জন্যও তিনি ঘাসের ব্যবস্থা করেন। তার এখানেই আমরা সেই রাত কাটিয়ে দিই। আমরা জেনেছিলাম এই শহরে মুহিউদ্দিন নামক একজন সম্মানিত আলেম ও শিক্ষক রয়েছেন। মেজবান লোকটি আমাদেরকে এই আলেমের কাছে নিয়ে যান। তিনি এখানকারই ছাত্র ছিলেন। তখনই আমাদের কাঙ্ক্ষিত আলেম একটি তরতাজা গাধার পিঠে চড়ে মাদরাসায় এসে পৌঁছান। তার দুইপাশে ছিল তার দাস ও খাদিমরা। আর ছাত্ররা ছিল সামনে। তার পরনে ছিল স্বর্ণের সূচিকর্মযুক্ত চমৎকার পোশাক। আমরা তাকে সালাম জানাই। তিনি উত্তর দিয়ে আমাদের স্বাগত জানান এবং আন্তরিকভাবে কথাবার্তা বলেন। আমার হাতে ধরে তার পাশে নিয়ে বসান। অতঃপর সেখানে শহরের বিচারক কাজি ইজ্জুদ্দিন ফেরেশতার আগমন ঘটে। তার সততা, ধার্মিকতা এবং একনিষ্ঠতার জন্য তাকে ফেরেশতা উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তিনি এসে শায়খ মুহিউদ্দিনের ডানপাশে বসে দীনের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ে পড়াতে শুরু করেন।

দরস শেষ করে তিনি মাদরাসার ছোট্ট একটি কক্ষে চলে যান। সেখানে বিছানা বিছাতে বলে আমাকে সেখানে নিয়ে বসান। অতঃপর বেশ সুস্বাদু খাবারদাবারের আয়োজন করা হয়। মাগরিব নামাযের পর তিনি আবারও আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি তার কাছে গিয়ে দেখি তিনি তার এক বাগানে মজলিসে বসেছেন। সেখানে একটি পানির ফোয়ারা রয়েছে। যেখানে শুভ্র মার্বেল পাথরের তৈরি একটি হাউজ থেকে পানি প্রবাহিত হয়। তার সামনে বসে আছে একদল ছাত্র। আর তার সেবক ও পরিচারকরা বসে ছিল তার দুইপাশে। তিনি আসন গ্রহণ করেছিলেন কারুকার্যখচিত কাঠের তৈরি একটি মঞ্চের উপর। আমার তখন মনে হয়েছিল কোনো রাজা তার সিংহাসনে বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ান। এগিয়ে এসে স্বাগত জানান এবং হাতে ধরে তার আসনে তার পাশেই নিয়ে বসান। অতঃপর খাবার পরিবেশন করা হলে আহার সেরে আমরা মাদরাসায় ফিরে আসি। এখানকার এক ছাত্র আমাকে জানিয়েছে, সে রাতে শায়খ মুহিউদ্দিনের কাছে যত ছাত্র এসেছিল তাদের সবাই প্রতি রাতেই শায়খের সঙ্গে খাবারে শরিক হয়। শায়খ সুলতানের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে তার অনেক প্রশংসা করেছিলেন এবং আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। সুলতান তখন প্রচণ্ড গরমের কারণে সেখানকার একটি পাহাড়ে গ্রীস্মকাল কাটাতে গিয়েছিলেন। সেই পাহাড়ের আবহাওয়া বেশ শীতল। প্রতি গ্রীস্মেই তিনি সেখানে চলে যান।

বিরগির সুলতানের বিবরণ

তার নাম সুলতান মুহাম্মাদ বিন আইদিন। অত্যন্ত মহৎ ও উদার হৃদয়ের একজন সুলতান। শায়খ মুহিউদ্দিন তার কাছে আমার আগমনের সংবাদ জানালে তিনি আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। শায়খ মুহিউদ্দিন আমাদেরকে পরে সুলতানের সঙ্গে দেখা করানোর কথা বলে আমাদেরকে মাদরাসাতেই অবস্থান করতে বলেন। তার পায়ে তখন একটি ফোঁড়া হয়েছিল। এ কারণে তিনি বাহনে চড়তে পারছিলেন না। সুলতান আবারও আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠালে শায়খ মুহিউদ্দিন তখন দুঃখপ্রকাশ করেন। বলেন, আমি এখন বাহনে চড়তে সক্ষম নই। আমি চেয়েছিলাম আপনার সঙ্গে গিয়ে সুলতানের কাছে আপনার প্রয়োজনীয় পাথেয়ের কথা জানাতে। তবুও তিনি পায়ে পট্টি বেঁধে কষ্ট করে বাহনজন্তুর

উপর উঠে বসেন। হাওদার উপর পা রাখেননি। এদিকে আমরাও বাহনে উঠে বসি। অতঃপর কখনো সমতল আবার কখনো এবড়োখেবড়ো এমন পথ পেরিয়ে সেই পাহাড়ে গিয়ে উপনীত হই। দুপুরের সময় আমরা নদীর তীর আখরোট গাছের ছায়াঘেরা পরিবেশে অবস্থিত সুলতানের বাসভবনে যাই। সুলতান বেশ চিন্তিত চেহারা নিয়ে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার ছোট সুলাইমান তার কাছ থেকে পালিয়ে তার জামাতা উরখান বেকের কাছে চলে গেছে। আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তিনি আমাদের নেওয়ার তার অপর দুই সন্তান খিজির বেক ও উমর বেককে পাঠান। তারা শায়খ মুহিউদ্দিনকে সালাম জানান। শায়খ তাদেরকে আমাকেও সালাম জানাতে নির্দেশ দিলে তারা আমাকে সালাম জানান। আমার খোঁজখবর নেন। তারা দুজন চলে যাওয়ার পর সুলতান আমাদেরকে তাঁবুসদৃশ একটি গৃহে পাঠান। যেটি তাদের কাছে খারকা নামে পরিচিত। কাঠের বেশকিছু টুকরোকে একসঙ্গে মিলিয়ে গম্বুজসদৃশ আকৃতি করে এর উপর খড়কুটো দিয়ে ছাউনি বানানো হয়। আলো-বাতাসের প্রবেশের জন্য এর উপরিভাগ খোলা রাখা হয়। প্রয়োজন হলে সেটি বন্ধও করা যায়। বিছানা নিয়ে এসে এর ভেতরে বিছানো হয়। শায়খ মুহিউদ্দিন সেখানে বসেন। আমিও তার সঙ্গে বসি। শায়খের ছাত্র ও আমার সঙ্গীরা বসে ছাউনির বাইরে আখরোট গাছের ছায়ায়। জায়গাটি ছিল খুবই ঠান্ডা। এমনকি ঠান্ডার তীব্রতায় সে রাতে আমার একটি ঘোড়াও মারা যায়। পরদিন শায়খ মুহিউদ্দিন বাহনে চড়ে সুলতানের কাছে গিয়ে আমার ব্যাপারে আলাপ করেন। ফিরে এসে আমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন। কিছুসময় পর সুলতান আমাদের সবাইকে ডাকেন। আমরা তার বাসভবনে গিয়ে দেখি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে আমরা সালাম জানাই। শায়খ মুহিউদ্দিন তার ডানে গিয়ে বসেন। আমি বসি তার পাশে। সুলতানকে আমার খোঁজখবর নেন। হেজাজ, মিসর, শাম, ইয়েমেন, ইরাকে আরব, ইরাকে আজম, পারস্য ও অনারব অঞ্চলের খবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর খাবার পরিবেশন করা হয়। আমরা আহার সেরে ফিরে আসি। তিনি আমাদের জন্য মেষের চামড়া দিয়ে পাত্রে করে চাল, ময়দা ও ঘি পাঠান। তুর্কিদের মাঝে এটি খুবই স্বাভাবিক রীতি। আমরা এভাবে কয়েকদিন তার এখানে অবস্থান করি। প্রতিদিনই তিনি আমাদেরকে ডেকে পাঠাতেন। আমরা তার খাবারের আয়োজনে শরিক হতাম। একদিন যোহর নামাযের পর তিনি আমাদের কাছে আসেন। শায়খ

মুহিউদ্দিন বসেন মজলিসের ঠিক মধ্যখানে। আমি বসি শায়খের বামপাশে আর সুলতান বসেন ডানপাশে। তুর্কিরা আলেম-উলামাদেরকে এমনই সম্মান করে থাকে। সুলতান আমাকে তার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু হাদীস লিখে দিতে বলেন। আমি তখনই কিছু হাদীস লিখে দেই। শায়খ মুহিউদ্দিন তা সুলতানের কাছে পেশ করেন। সুলতান তখন শায়খকে বলেন তুর্কি ভাষায় হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা লিখে দিতে। অতঃপর তিনি এখান থেকে প্রস্থান নেন। যাওয়ার পথে দেখেন আমাদের খাদেমরা আখরোট গাছের ছায়ায় কোনো সবজি ও মশলাপাতি ছাড়াই আমাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করছে। এর জন্য তিনি খাদ্যভান্ডারের দায়িত্বশীলকে শাস্তি দেন এবং আমাদের জন্য ঘি ও মশলা পাঠিয়ে দেন।

পাহাড়ে আমাদের অবস্থান দীর্ঘ হতে থাকে। আমাকে বিরক্তি পেয়ে বসে। সেখান থেকে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করি। শায়খ মুহিউদ্দিনও আমার মতোই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সুলতানের কাছে আমাদের প্রস্থানের ব্যাপারে জানান। পরদিন সুলতান আমাদের কাছে তার প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তিনি শায়খ মুহিউদ্দিনের সঙ্গে তুর্কি ভাষায় কথা বলেন। আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। আলাপ শেষে প্রতিনিধি ফিরে যাওয়ার পর শায়খ আমাকে বলেন, লোকটি কী বলে গেলো জানেন? বললাম, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। শায়খ বললেন, সুলতান আপনাকে কী উপহার দিবেন এ ব্যাপারে আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছেন। আমি তাকে বলেছি, সুলতানের কাছে স্বর্ণ-রৌপ্য, ঘোড়া, গোলাম সবইতো রয়েছে। তার যা সবচেয়ে ভালো লাগে তা-ই দিবেন। প্রতিনিধি সুলতানের কাছ থেকে পুনরায় আমাদের কাছে এসে বলেন, সুলতান আপনাদেরকে আজকের দিনটি এখানে অবস্থান করে পরদিন সকালে মূল শহরে তার বাসভবনে যেতে বলেছেন। পরদিন সুলতান আমাদের জন্য তার আস্তাবল থেকে তরতাজা কিছু ঘোড়া প্রেরণ করেন। আমরা সেগুলোতে চড়ে শহরে গিয়ে পৌঁছাই। শহরের লোকেরা আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে আসে। কাজি ইজ্জুদ্দিন ফেরেশতাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা সুলতানের সঙ্গে তার বাসভবনে যাই। সেখানে যাওয়ার পর আমি শায়খ মুহিউদ্দীনের সঙ্গে মাদরাসার দিকে যাওয়ার ইচ্ছাপোষণ করি। তখন সুলতান আমাদের ডাকেন ও তার সঙ্গে প্রাসাদে প্রবেশ করতে বলেন। প্রাসাদের দরবার হলে যাওয়ার পর বিশজনের মতো খাদেম দেখতে পাই। তাদের সবার চেহারাই ছিল অত্যন্ত

সুন্দর। পরনে ছিল রেশমি পোশাক। তাদের চুলগুলো সিঁথি করা আর গায়ের রঙ ধবধবে সাদা ও লালচে আভাময়। আমি শায়খ মুহিউদ্দীনকে তাদের সৌন্দর্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এরা সবাই রোমীয় যুবক। অতঃপর সুলতানের সঙ্গে অনেকগুলো সিঁড়ি অতিক্রম করে চমৎকার এক সভাকক্ষে এসে উপনীত হই। যার মাঝবরাবর রয়েছে একটি পানির ফোয়ারা। যার প্রতিটি খুঁটির মাথায় রয়েছে তামা দিয়ে তৈরি পশুর আকৃতি। এর মুখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে। এই সভাকক্ষে রয়েছে অনেকগুলো তেপায়া। যেগুলোর উপর বিছানা পেতে রাখা আছে। এর একটির উপর রয়েছে সুলতানের বসার আসন। সেখানে যাওয়ার পর সুলতান নিজ হাতে তার আসন সরিয়ে আমাদের সঙ্গে নিচে এসে বসেন। শায়খ মুহিউদ্দিন বসেন তার বামপাশে। কাজি ইজ্জুদ্দিন বসেন তার সঙ্গে। আর আমি বসি কাজির পাশে। কারীগণ বসেন তেপায়ার পেছনে। সুলতান যেখানেই যেতেন, সবসময় একদল কারী তার সঙ্গেই থাকে।

অতঃপর স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে করে লেবুর রস মেশানো শরবত পরিবেশন করা হয়। এর ভেতরে দেওয়া হয়েছে বিস্কুটের ছোট ছোট টুকরো। সঙ্গে আছে স্বর্ণ ও রূপার চামচ। এর সঙ্গে তারা চীনা পাত্রে করেও শরবত নিয়ে আসে। যার ভেতরে ছিল কাঠের চামচ। যারা স্বর্ণ ও রূপার পাত্র ব্যবহারে অনীহাবোধ করেন, তারা এই চীনামাটির পাত্র ও কাঠের চামচ ব্যবহার করে থাকেন। আমি সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং শায়খ মুহিউদ্দীনের খুব প্রশংসা করি। এতে সুলতান খুব মুগ্ধ ও আনন্দিত হন।

একটি ঘটনা

সুলতানের সঙ্গে বসে থাকার সময়ে মাথায় পাগড়ি পরিহিত এক শায়খ এসে সুলতানকে সালাম জানান। শায়খ মুহিউদ্দিন ও কাজি ইজ্জুদ্দিন তাকে দেখে দাঁড়িয়ে যান। তিনি এসে সুলতানের সম্মুখে একটি তেপায়ার উপর বসেন। কারীগণ ছিলেন তার থেকে নিচে। আমি শায়খ মুহিউদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করি, এই শায়খ কে? প্রশ্ন শুনে তিনি হেসে চুপ করে থাকেন। আমি আবারও একই প্রশ্ন করি। শায়খ উত্তর দেন, ইনি একজন ইহুদি চিকিৎসক। আমরা সবাই তার সেবার মুখাপেক্ষী। এজন্যই আমাদেরকে তার প্রতি এমন শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখলেন। এই দেখে আমার মনে বেশ ক্ষোভ জন্ম হয়। আমি রাগত স্বরে ইহুদিকে বলে উঠি, 'ওহে অভিশপ্তের ছেলে অভিশপ্ত। তুমি

ইহুদি হয়েও কী করে পারলে কুরআন তেলাওয়াতকারীদের থেকে উপরে বসতে? এভাবে আমি জোর গলায় তাকে তিরস্কার করি। সুলতান বিস্মিত হয়ে আমার কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করলে শায়খ মুহিউদ্দীন তাকে অবহিত করেন। এতে সেই ইহুদি রেগেমেগে সভাকক্ষ থেকে বের হয়ে যায়। আমাদের ফিরে আসার পর শায়খ মুহিউদ্দীন আমাকে বলেন, আপনি বেশ ভালো কাজ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে বরকত দান করুন। আপনাকে ছাড়া আর কেউ তাকে এমন ধমক দিয়ে কথা বলতে পারত না। আপনি তাকে তার আসল অবস্থান চিনিয়ে দিয়েছেন।

আরেকটি ঘটনা

আলোচ্য এই মজলিসের সময়েই সুলতান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি কখনো আকাশ থেকে পাথর নেমে আসতে দেখেছেন? আমি বলি, এমনটি কখনো দেখিনি এবং এমন কথা শুনিওনি। তিনি বলেন, আমাদের শহরতলীতেই আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হয়েছে। অতঃপর তিনি কিছু লোককে বলেন সেই পাথর নিয়ে আসতে। তারা কুচকুচে কালো বর্ণের খুব শক্ত একটি পাথর নিয়ে আসে। পাথরটি বেশ চমকচ্ছিল তখন। মেপে দেখেছি তার ওজন একশ কেজির মতো হবে। অতঃপর সুলতান পাথর ভাঙার হাতুড়ি নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। চারজন মিলে একটি হাতুড়ি নিয়ে এলে সুলতান তাদেরকে পাথরটি ভাঙার নির্দেশ দেন। তারা একসঙ্গে মিলে চারবার পাথরের গায়ে আঘাত করার পরও পাথরটির গায়ে আঘাতের কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি। তা দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ি। অতঃপর সুলতান পাথরটিকে যথাস্থানে নিয়ে রেখে আসতে বলেন।

সুলতানের সঙ্গে শহরে প্রবেশের তৃতীয় দিন তিনি বিশাল এক আয়োজন করেন। শহরের দরিদ্র-অসহায়, উলামা-মাশায়েখ, নেতৃস্থানীয় সৈনিক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত দিয়ে তিনি খাবারের আয়োজন করেন। কারীগণ সুললিত কণ্ঠে করেন কুরআন তেলাওয়াত। অতঃপর আমরা ফিরে আসি আমাদের অবস্থানস্থল মাদরাসায়। তিনি প্রতিরাতেই আমাদের জন্য খাবার, ফলমূল, মিষ্টান্ন ও মোমবাতি পাঠাতেন। সবশেষে তিনি আমার জন্য একশ মিসকাল স্বর্ণ, এক হাজার দিরহাম, এক সেট পোশাক, একটি ঘোড়া এবং মিকাইল নামক রোমীয় দাস প্রেরণ করেন। আর আমার প্রত্যেক সাথীকেও দিরহাম ও পোশাক উপহার দেন। এসব কিছুতেই ছিল শায়খ

মুহিউদ্দীনের অংশগ্রহণ ও অবদান। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। অতঃপর আমরা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরবর্তী গন্তব্যের পথ ধরি। পাহাড় ও মূল শহর মিলিয়ে আমরা চৌদ্দদিন এখানে অবস্থান করি।

এরপর আমরা যাই তিরা শহরে। এটি বিরগির সুলতানেরই শাসনাধীন। এটি নদীনালা ও ফলমূলের বাগানবিশিষ্ট চমৎকার একটি শহর। এখানে আমরা যুবক সর্দার মুহাম্মাদের খানকায় অবস্থান গ্রহণ করি। তিনি একজন বুযুর্গ ব্যক্তি। অনেক রোযা রাখেন। তার অনেক অনুসারী রয়েছে। তারা যত্নসহকারে আমাদের মেহমানদারি করেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করেন।

এরপর যাই আয়াসুলুক[১] শহরে। এটি বেশ প্রাচীন ও বৃহদায়তনের একটি শহর। গ্রিকদের কাছে শহরটি খুবই সম্মানিত। এখানে বিরাট বিরাট পাথরের মাধ্যমে নির্মিত একটি গির্জা রয়েছে। একেকটি পাথরের দৈর্ঘ্য প্রায় দশহাতের মতো। এগুলোকে অত্যন্ত অভিনবভাবে খোদাই করা হয়েছে। এই শহরের জামে মসজিদটিও পৃথিবীর বুকে অনিন্দ্য সুন্দর একটি মসজিদ। সৌন্দর্যে তার জুড়ি মেলা ভার। পূর্বে এটি ছিল গ্রিকদের সম্মানিত গির্জা ও তীর্থস্থান। দূরদূরান্ত থেকে এটি দেখার জন্য লোকেরা ভিড় করত। মুসলিমদের হাতে এই অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর এটিকে জামে মসজিদে রূপান্তর করা হয়। এর দেয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে রঙিন মার্বেল পাথর। আর মেঝেতে বিছানো হয়েছে শুভ্র মার্বেল পাথর। আর ছাদে ব্যবহার করা হয়েছে সীসার পাত। এই মসজিদে বিভিন্ন আকৃতির এগারোটি গম্বুজ রয়েছে। প্রতিটি গম্বুজের মাঝবরাবর মেঝেতে রয়েছে একটি করে পানির ফোয়ারা। শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে মৃদু বেগে বয়ে চলা নদী। যার দুই তীরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, আঙুর ফলের ঝাঁকা এবং শিউলির বাগান। শহরে দরজা সংখ্যা পনেরোটি। সুলতান মুহাম্মাদ বিন আইদিনের পুত্র খিজির বেক এই শহরের গভর্নর। বিরগি শহরে অবস্থানের সময় তার পিতার কাছে তাকে দেখেছিলাম। অতঃপর আয়াসুলুকে এসে শহরতলীতে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাকে সালাম জানাই। তখন আমি আরোহী অবস্থায় থাকায় বিষয়টি তার কাছে ভালো লাগেনি। এর ফলে আমি

---

[১] বর্তমান নাম এফেসোস।—অনুবাদক

তার কাছে সম্মান-সমাদর ও উপহারপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হই। তাদের অভ্যাস হচ্ছে, অতিথি তাদের সম্মানে বাহন থেকে নেমে গেলে তারাও নেমে যায়। এতে তারা সন্তুষ্ট হয়। খিজির বেক আমার জন্য শুধুমাত্র একটি স্বর্ণের পাড়বিশিষ্ট রেশমি কাপড় প্রেরণ করেন। এই কাপড়কে তারা নাখ বলে থাকে। এই শহরে আমি চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে একটি কুমারী গ্রিক দাসী ক্রয় করি।

এরপর চলে যাই সমুদ্র উপকূলীয় বিশাল শহর ইজমিরে। এর অধিকাংশই এখন বিরান পড়ে আছে। শহরের উঁচুভূমিতে এখানকার দুর্গের অবস্থান। আমরা এখানে শায়খ ইয়াকুবের খানকায় গিয়ে উঠি। তিনি আহমাদিয়্যাহ দলের অনুসারী। নেককার ও সম্মানিত একজন ব্যক্তি। খানকার বাইরে শায়খ ইজ্জুদ্দিন বিন আহমাদ আর রিফায়ির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তার সঙ্গে ছিলেন আরেক বিশিষ্ট শায়খজাদাহ আল আখলাতি। তাদের সঙ্গে ছিল আরো শতজনের মতো অসহায় ব্যক্তি। শহরের গভর্নর তাদের জন্য তাঁবু তৈরি করে দিয়েছেন। শায়খ ইয়াকুব আমাদের জন্য মেহমানদারির আয়োজন করলে আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই। এই শহরের গভর্নর সুলতান মুহাম্মাদ বিন আইদিনের আরেক পুত্র উমর বেক। তিনি শহরের দুর্গে বসবাস করেন। আমরা যখন ইজমিরে এসেছি, তিনি তখন অবস্থান করছিলেন বিরগি শহরে তার পিতার কাছে। পাঁচদিন পর তিনি ইজমিরে আগমন করেন। এসেই তিনি মহত্ত্ব দেখিয়ে খানকায় এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সালাম জানিয়ে তার আগমনে বিলম্ব হওয়ায় দুঃখপ্রকাশ করেন। অতঃপর আমাদের জন্য অনেক খাবারও প্রেরণ করেন। তিনি আমাকে পাঁচ ফুট দৈর্ঘ্যের নাকুলা নামীয় একটি গ্রিক দাস উপহার দেন। আরো উপহার দেন দুইটি কামখা কাপড়। এটি রেশমের তৈরি বিশেষ একধরনের কাপড়। যা বাগদাদ, তাবরিজ, নিশাপুর এবং চীনদেশে তৈরি হয়। শহরের প্রধান ইমাম আমাকে জানান, উমর বেক এতই উদার যে, আমাকে উপহার দেওয়া দাসটিই ছিল তার কাছে অবশিষ্ট একমাত্র দাস। তিনি শায়খ ইজ্জুদ্দিনকেও তিনটি সুসজ্জিত ঘোড়া, দিরহাম ভর্তি বড় একটি রূপার পাত্র, কামখা, কুদসি ও আরো দুই ধরনের একটি করে পোশাক এবং দাস-দাসী উপহার দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সৎ ও মহৎ হৃদয়ের গভর্নর। অনেক জিহাদে অংশ নিয়েছেন তিনি। তার অধীন কয়েকটি উদ্যমী সেনা ইউনিট রয়েছে। যাদেরকে নিয়ে তিনি বৃহত্তর কনস্টান্টিনোপল অঞ্চলে

হামলা পরিচালনা করে অনেককে বন্দি করেন এবং অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করে আনেন। অতঃপর সেগুলো দান করে দিয়ে আবার জিহাদের ময়দানে নেমে পড়েন। এই কারণে রোমক ও গ্রিকরা তার প্রতি অনেক ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের পোপের কাছে তার নামে অভিযোগ করে। তখন পোল জেনোয়া ও ফ্রান্সের খ্রিস্টানদেরকে উমর বুকের সঙ্গে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। নিজেও রোমক ও গ্রিকদের সমন্বয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন। এভাবে অনেকগুলো সেনা ইউনিট মিলে রাতের বেলায় ইজমির শহরে এসে হামলা করে বন্দর দখল করে শহরে প্রবেশ করে ফেলে। তখন উমর বেক তার দুর্গ থেকে নেমে এসে বীরবিক্রমে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। কিন্তু সেই যুদ্ধে তিনি ও তার সঙ্গীরা নিহত হন। খ্রিষ্টানরা শহরটিকে পুরোপুরি দখল করে নেয়। তবে দুর্ভেদ্য অবস্থানে থাকার কারণে তারা শহরের দুর্গটি দখল করতে পারেনি।

ইজমির থেকে আমরা চলে আসি ম্যাগনেশিয়া[১] শহরে। আরাফার দিন সন্ধ্যায় এখানকার এক যুবক সর্দারের খানকায় আমরা অবস্থান গ্রহণ করি। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই শহরটি বেশ বড় ও দৃষ্টিনন্দন। শহরের বিশাল ভূখণ্ডজুড়ে রয়েছে অনেক নদী, ঝরনা, বাগান এবং ফলমূলের সমাহার।

ম্যাগনেশিয়ার সুলতানের বিবরণ

এখানকার সুলতানের নাম সারুখান। শহরে পৌঁছানোর পর তাকে নিজ সন্তানের সমাধি জিয়ারত করা অবস্থায় দেখতে পাই। কয়েকমাস আগে তার পিতার ইন্তেকাল হয়েছে। ঈদুল আযহার রাতে ও সকালে তিনি এবং তার মৃত সন্তানের মা এই সমাধিতে অবস্থান করেন। সন্তানের লাশকে মমি করে লোহার খাঁচা দিয়ে ঘেরা একটি কাঠের কফিনে রাখা হয়েছে। অতঃপর সেটিকে রাখা হয়েছে ছাদখোলা একটি ছাউনিতে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয়। যেন মৃত লাশের গন্ধ দূর হয়ে যায়। গন্ধ দূর হয়ে গেলে ছাউনির ছাদ লাগিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর কফিনকে মাটিতে নামিয়ে লাশের গায়ে কাফনের কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়। আরো কজন সুলতানকেও আমি এমন রীতি পালন করতে দেখেছি। আমরা সেখানেই এই সুলতানকে সালাম

---

[১] বর্তমান নাম মানিসা।—অনুবাদক

জানাই। তার সঙ্গে ঈদের নামায আদায় করে খানকায় ফিরে আসি। আমার সঙ্গে থাকা ক্রীতদাসটি অন্য এক সাথীর ক্রীতদাসের সঙ্গে মিলে আমাদের ঘোড়াগুলোকে পানি পান করাতে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের আসতে খুব বিলম্ব হচ্ছিল। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যায়, তবুও তাদের আসার কোনো নাম-গন্ধ নেই। এই শহরেই বাস করতেন বিশিষ্ট ফকিহ ও শিক্ষক মুসলেহুদ্দিন। তিনি আমার সঙ্গে বাহনে চড়ে সুলতানের কাছে গিয়ে তাকে বিষয়টি অবগত করেন। সুলতান তাদের দুজনের সন্ধানে কিছু সৈনিক পাঠিয়ে দেন। তবুও তাদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এদিকে শহরের লোকেরা ব্যস্ত ঈদের উদযাপনে। পলাতক দুই ক্রীতদাস সমুদ্র উপকূলের পথ ধরে ম্যাগনেশিয়া থেকে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত ফাওজা নামক বিধর্মী নিয়ন্ত্রিত রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। সেই বিধর্মীরা বেশ সুরক্ষিতভাবে বসবাস করে। প্রতিবছর তারা ম্যাগনেশিয়ার সুলতানকে আনুগত্যস্বরূপ উপঢৌকন প্রদান করে থাকে। পরদিন যোহর নামাযের পর একদল তুর্কি সৈনিক আমাদের ঘোড়াগুলোসহ তাদের দুজনকে ধরে নিয়ে আসে। তারা জানায়, এই দুজন সন্ধ্যার দিকে তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হলে তাদেরকে ধরে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তারা পলায়নের কথা স্বীকার করে নেয়।

অতঃপর আমরা ম্যাগনেশিয়া থেকে প্রস্থান নিয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করি। রাতে অবস্থান করি তুর্কি এক গোত্রের মহল্লায়। সেখানে আমাদের বাহনজন্তুগুলোকে খাওয়ানোর মতো কোনো ঘাস বা খাবার পাওয়া যায়নি। আমাদের কাফেলার সবাই চুরির ভয়ে পালাক্রমে একজন একজন করে পাহাড়া দিয়ে রাত কাটাই। একপর্যায়ে ফকিহ আফিফুদ্দিন আত তুজারির পালা এলে শুনতে পাই তিনি সূরা বাকারা তেলাওয়াত করেছেন। আমি তাকে বলি, আপনার ঘুমের সময় চলে এলে আমাকে জানাবেন। পরে কে পাহাড়া দিবে তা দেখার জন্য। অতঃপর আমি ঘুমিয়ে যাই। তিনি আমাকে জাগিয়ে তুলেন একদম ভোরে। এরই মধ্যে এক চোর এসে আমার একটি ঘোড়া নিয়ে উধাও। সেই ঘোড়ায় চড়তেন আফিফুদ্দিন নিজেই। তার লাগাম ও হাওদাসহ ঘোড়াটি নিয়ে চোর পালিয়ে গেছে। এটি ছিল খুবই উৎকৃষ্ট জাতের একটি ঘোড়া। আয়াসুলুক থেকে আমি এটি ক্রয় করেছিলাম। অতঃপর সকালবেলায় যাত্রা শুরু করে আমরা বারগামা শহরে এসে পৌছাই। এটি বিরানপ্রায় এক শহর। পাহাড়ের পৃষ্ঠে এখানকার দুর্ভেদ্য দুর্গের

অবস্থান। কথিত আছে, দার্শনিক আফলাতুন (প্লেটো) এই শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তার বাড়িটি এখনো তার নামে প্রসিদ্ধ। এখানে আমরা আহমাদিয়া সিলসিলার অনুসারী এক দরিদ্র ব্যক্তির খানকায় অবস্থান গ্রহণ করি। অতঃপর শহরের বিশিষ্ট একজন ব্যক্তি এসে আমাদেরকে তার বাড়িতে নিয়ে যান এবং অনেক খাতিরদারি করেন।

বারগামার সুলতানের বিবরণ

এখানকার সুলতানের নাম ইয়াখশি খান। তাদের ভাষায় খান মানে সুলতান। আর ইয়াখশি শব্দের অর্থ হচ্ছে ভালো। আমাদের শহরে পৌছানোর সময় তিনি গ্রীস্মকালীন অবকাশযাপনে ছিলেন। তাকে আমাদের আগমনের সংবাদ জানানো হলে তিনি আতিথেয়তাস্বরূপ খাবার এবং কুদসি কাপড় পাঠিয়ে দেন।

অতঃপর আমরা একজন পথনির্দেশক ভাড়া করে উঁচু পর্বতমালার দুর্গম পথ দিয়ে সামনে এগোতে থাকি। একপর্যায়ে উপনীত হই জনবহুল, অনেক বাড়িঘর ও চমৎকার বাজারবিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন বালিকেসির শহরে। এখানে কোনো জামে মসজিদ নেই। শহরতলীতে একটি জামে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানে শুধু দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। ছাদ দেওয়া হয়নি। এর মধ্যেই গাছের ছায়ায় তারা নামায আদায় করে। এখানে বিশিষ্ট যুবক সর্দার আখি সিনানের খানকায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। শহরের বিচারক ও খতিব ফকিহ ঈসা এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বালিকেসিরের সুলতানের বিবরণ

তার নাম দুমুর খান। তার পিতার হাতেই এই শহরের গোড়াপত্তন হয়েছে। দুমুর খানের সময়ে শহরের অনেক লোকের সমাগম ঘটে। এতে শহরের জন্য তেমন উপকার হয়নি। এখানকার অধিবাসীরা তাদের সুলতানের ধর্ম পালন করে। আমি এই সুলতানকে দেখেছিলাম। তিনি আমাকে একটি রেশমি কাপড় উপহার দেন। এখানে এসে আমি মারগারিটা নামীয় একটি গ্রিক দাসী ক্রয় করি।

অতঃপর আমরা চলে আসি বুরসা শহরে। শহরটি আয়তনে বিশাল, বাজারগুলো বেশ সুবিন্যস্ত ও চমৎকার এবং সড়কগুলো খুব প্রশস্ত। চারদিক

থেকে বাগান ও প্রবহমান জলধারা শহরটিকে বেষ্টিত করে রেখেছে। শহরের বাইরে রয়েছে প্রচণ্ড গরম পানির একটি নদী। যার পানি বিশাল একটি পুকুরে এসে নিবদ্ধ হয়। এই পুকুরের পাশে গোসলের জন্য দুইটি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য একটি, নারীদের জন্য একটি। অসুস্থ ব্যক্তিরা গরম পানির এই পুকুরে গোসল করে সুস্থতা কামনা করে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এই উদ্দেশ্যে এখানে এসে সমবেত হয়। এখানে আগত মেহমানদের জন্য একটি সরাইখানা রয়েছে। যেখানে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং একজন মেহমান তিনদিন পর্যন্ত অবস্থান করতে পারে। এক তুর্কি বাদশাহ এই সরাইখানাটি চালু করেছেন। বুরসা শহরে এসে আমরা বিশিষ্ট যুবক সর্দার আখি শামসুদ্দিনের খানকায় অবস্থান গ্রহণ করি। তার খানকাতেই আশুরার দিন চলে আসে। তিনি অনেক খাবার-দাবারের আয়োজন করেন। সন্ধ্যায় নেতৃস্থানীয় সৈনিক ও শহরের গণ্যমান্য লোকদেরকে দাওয়াত করেন। তারা এখানে এসে ইফতার করে। কারীগণ সুললিত কণ্ঠে করেন কুরআন তেলাওয়াত। অতঃপর প্রসিদ্ধ ফকিহ এবং ওয়ায়েজ মাজদুদ্দিন আল কুনুবি এসে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। এরপর তারা সঙ্গীত ও নৃত্যের আয়োজন করে। সবমিলিয়ে সেই রাতটি ছিল বেশ উপভোগ্যও মহিমান্বিত। শায়খ মাজদুদ্দিন আল কুনুবি একজন নেককার বুযুর্গ ব্যক্তি। বছরের প্রায়দিনই তিনি রোযা রাখেন এবং তিনদিন পরপর একবার ইফতার করেন। একমুঠো খাবারের বেশি আহার করেন না। কথিত আছে, তিনি কখনো কারো খাবার খাননি। তার কোনো ঘরবাড়ি নেই। সম্পদ বলতে শুধু গায়ের পোশাক। রাতের বেলায় গোরস্থানে গিয়ে তিনি ঘুমান। বিভিন্ন মজলিসে গিয়ে ওয়াজ করে লোকদেরকে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। প্রতি মজলিসেই অনেক লোক তার হাত ধরে তাওবা করে। আশুরার এই রাতের পর আমি তার সন্ধানে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাকে খুঁজে পাইনি। গোরস্থানে এসেও তাকে দেখিনি। জানা যায়, শহরের সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর তিনি গোরস্থানে আসেন।

একটি ঘটনা

আশুরার রাতের শেষভাগে শায়খ মাজদুদ্দিন আখি শামসুদ্দিনের খানকায় এসে ওয়াজ করেন। তখন খানকায় উপস্থিত এক ভাই চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। তার উপর গোলাপজল ছিটানোর পরও তার জ্ঞান ফিরেনি। তাই

পুনরায় গোলাপজল ছিটানো হয়। তবুও তার জ্ঞান ফিরে নাই। তাকে ঘিরে অনেক লোকের জটলা হয়ে যায় সেখানে। কেউ বলে সে মারা গেছে। কেউ বলে সে এখনো অজ্ঞান। অতঃপর শায়খ মাজদুদ্দিন তার ওয়াজ সমাপ্ত করেন। এরপর কারীগণের কুরআন তেলাওয়াত শেষে আমরা ফজরের নামায আদায় করি। উদিত হয় সূর্য। তখন লোকটির অবস্থা যাচাই করে দেখা যায়, তিনি ইতিমধ্যে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে দয়া করুন। তার গোসল ও কাফনের কাপড় পরিধানের তোরজোড় শুরু হয়ে যায়। আমি তার জানাযার নামায ও দাফনে শরিক হয়েছিলাম। এই ভাই আস সাইয়াহ অর্থাৎ চিৎকারকারী নামে পরিচিত হয়ে যা। জানা যায়, তিনি পাহাড়ের এক গুহায় নির্জনে ইবাদত করতেন। শায়খ মাজদুদ্দিনের ওয়াজের মজলিসের কথা শুনে তিনি এখানে এসে উপস্থিত হন। এসে কারো কোনো খাবার ভক্ষণ করেননি। শায়খ মাজদুদ্দিনের ওয়াজ শুরু হওয়ার পর থেকেই তিনি জ্ঞান হারাচ্ছিলেন আবার জেগে উঠছিলেন। তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায পড়েন। অতঃপর মাজদুদ্দিনের আলোচনা তিনি কয়েকবারই চিৎকার দিয়ে উঠেন। তাই তার নাম হয়ে আস সাইয়াহ অর্থাৎ চিৎকারকারী। তিনি ছিলেন খুবই দুর্বল ও শীর্ণকায়। কোনো কাজে সক্ষম ছিলেন না। তার মা তাঁত বুনতেন। সেই আয় থেকেই তার খাবারের ব্যবস্থা হতো। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি জমিনের উদ্ভিদ থেকে আহার গ্রহণ করেছেন।

বুরসা শহরে আরেক বুযুর্গ মনীষী শায়খ আবদুল্লাহ আল মিশরির সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি প্রায় পুরো বিশ্বই ভ্রমণ করেছেন। তবে চীন, সরনদীব (শ্রীলঙ্কা), মাগরিব, আন্দালুস এবং সুদানে যেতে পারেননি। কিন্তু আমি এই সকল দেশে সফর করে তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছি।

বুরসার সুলতানের বিবরণ

এখানকার সুলতানের নাম ইখতিয়ারুদ্দিন উরখান বেক। এই উরখান সুলতান উসমান[১] জুকের সন্তান। তুর্কি জুক শব্দের অর্থ হচ্ছে ছোট। তুর্কি অঞ্চলের সুলতানদের মধ্যে সুলতান উরখানই হচ্ছেন সবচেয়ে ক্ষমতাধর। সম্পদ, শাসনাধীন অঞ্চল ও সেনাবাহিনীর দিক দিয়ে তিনিই সবার চেয়ে

---

১ উসমানি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। উরখান ছিলেন সালতানাতের দ্বিতীয় সুলতান।

এগিয়ে। তার অধীনে প্রায় একশটি দুর্গ রয়েছে। অধিকাংশ সময়েই তিনি এই সকল দুর্গ ঘুরে ঘুরে দেখাশোনা করেন। প্রতি দুর্গে গিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করে সেখানকার সার্বিক খোঁজখবর নেন এবং উন্নয়নের দেখভাল করেন। কথিত আছে, তিনি কখনো কোনো এলাকায় পূর্ণ একমাস অবস্থান করেননি। কাফেরদের সঙ্গে তিনি অনেক লড়াই করেছেন। তাদের অবরোধ করেছেন। তার পিতা উসমান রোমকদের হাত থেকে বুরসা শহরটি বিজিত করেছেন। শহরের মসজিদে তার কবর রয়েছে। পূর্বে এই মসজিদটি ছিল খ্রিস্টানদের গির্জা। জানা যায়, তিনি ইজনিক শহরটি টানা বিশ বছর অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং তা বিজিত করার আগেই ইন্তেকাল করেন। অতঃপর তার এই সন্তান উরখান আরো বারো বছর অবরোধ করার পর শহরটি বিজিত করতে সক্ষম হন। সেখানেই এই মহান সুলতানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি আমার জন্য অনেকগুলো দিরহাম প্রেরণ করেছিলেন।

বুরসা থেকে আমরা ইজনিক শহরে চলে আসি। শহরে পৌঁছানোর আগে কারলাহ নামক পল্লীতে একজন যুবক সর্দারের খানকায় আমরা রাত্রিযাপন করি। এখান থেকে দুই পাড়ে টক-মিষ্টি আনার গাছের ছায়াঘেরা নদীপথে পূর্ণ একদিন সফর করে উপনীত হই ইজনিক থেকে আট মাইল দূরের নলখাগড়া দিয়ে ভর্তি একটি লেকে। ইজনিক শহরটি চারদিক দিয়ে এমন জলাভূমি দিয়ে ঘেরা। সেতুর পথে সরু একটি পথ দিয়েই কেবল শহরে প্রবেশ করা যায়। সরু সেই পথে কেবলমাত্র একজন করে অশ্বারোহী যেতে পারে। এ কারণেই শহরটি এতটা সুরক্ষিত। কিন্তু শহরটি এখন বিরান পড়ে আছে। সেবক শ্রেণীর অল্পকিছু লোককে সঙ্গী নিয়ে সুলতানের স্ত্রী বায়ালুন খাতুন এখানে বসবাস করেন। তিনি খুবই ধার্মিক ও গুণবতী একজন নারী। শহরে রয়েছে চারটি প্রাচীর। প্রতি দুই প্রাচীরের মাঝে রয়েছে একটি পানিভর্তি গর্ত। কাঠের পুলের সাহায্যে শহরে প্রবেশ করতে হয়। প্রয়োজন মনে হলে সেই কাঠের পুল উঠিয়ে রাখা হয়। শহরের অভ্যন্তরে বাগান, বাড়িঘর এবং অনাবাদি ও কৃষিজমি চোখে পড়ে। এখানকার প্রত্যেক বাসিন্দারই নিজস্ব বাড়ি, কৃষিজমি ও বাগানের একত্রে অবস্থান। নিকটবর্তী কূপ থেকে এই সকল জমি ও বাগানে পানি সেচের ব্যবস্থা করা হয়। সবধরনের ফলমূল ও আখরোট এখানে পাওয়া যায়। এখানে প্রচুর বাদামও পাওয়া যায়, যা দামে খুবই সস্তা। আরো পাওয়া যায় আঙুলের মতো লম্বা

প্রজাতির আঙুর ফল। যা আমি অন্য কোথাও দেখিনি। স্বাদে খুবই মিষ্টি এবং আকারে অনেক বড়। দেখতে খুবই স্বচ্ছ এবং পাতলা খোসাবিশিষ্ট। প্রতি আঙুরের মাঝে থাকে মাত্র একটি করে দানা।

বিশিষ্ট ফকিহ ও ইমাম হাজি আলাউদ্দিন আস সুলতানিয়্যুকি এখানে আমাদের আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। তিনি খুবই মহৎ হৃদয়ের মানুষ। যতবারই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছি, তিনি খাবার হাজির করেছেন। দেখতে যেমন সুন্দর, চারিত্রিক ভূষণে আরো সুন্দর। তিনি আমাকে সুলতান উরখানের পুণ্যবতী স্ত্রীর কাছে নিয়ে যান। মহীয়সী এই নারী আমাদের যথাযথ সমাদর ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। তার ব্যবহার খুবই চমৎকার। আমাদের ইজনিকে আগমনের কিছুদিন পর সুলতান উরখানও এই শহরে আগমন করেন। সবমিলিয়ে চল্লিশদিন আমরা এই শহরে অবস্থান করি। আমার একটি ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমাদের অবস্থান দীর্ঘ হয়ে যাওয়ায় সেটিকে রেখেই তিনজন সঙ্গী, একটি দাসী ও দুইটি দাসকে নিয়ে পরবর্তী গন্তব্যের পথ ধরি। আমাদের সঙ্গে তুর্কি ভাষায় কথা বলতে দক্ষ ও আমাদের কথা অনুবাদ করে দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। সঙ্গে থাকা দোভাষীটি ইজনিকে এসে পৃথক হয়ে গেছে।

ইজনিক থেকে বের হয় আমরা রাত্রিযাপন করি মাকাজা নামক পল্লীতে সেখানকার এক ফকিহের কাছে। তিনি আমাদের খুব সমাদর ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবারও সফর শুরু করি। পথিমধ্যে দেখা হয়, অশ্বারোহিনী তুর্কি এক নারীর সঙ্গে। তিনি তার খাদেমকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ানিজা শহরের উদ্দেশে। আমরাও তার অনুসরণ করে পিছু পিছু চলতে থাকি। অতঃপর আমরা সাকারি নামক বিশাল এক নদীর সম্মুখে এসে উপনীত হই। মনে হয় জাহান্নামের সাকার নাম থেকে এটির নামকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন। তুর্কি সেই নারী এই নদীর মাঝ দিয়েই চলতে শুরু করেন। মাঝামাঝি অবস্থানে গিয়ে তার ঘোড়াটি তাকে নিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। সঙ্গে থাকা খাদেমটি তাকে উদ্ধারের প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু নদীর তীব্র স্রোত তাদের দুজনকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নদীর অপর তীরে কিছু লোক অবস্থান করছিলেন। তারা এই দৃশ্য দেখে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাঁতার কেটে নারীকে উদ্ধার করেন। তখন তার জীবনপ্রদীপ নিভু নিভু জ্বলছিল। আর সঙ্গে থাকা খাদেমটিকে তারা উদ্ধার করে মৃত অবস্থায়।

আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়া করুন। ঐ লোকেরা আমাদেরকে জানায়, এখান থেকে আরো নিম্নভূমিতে গিয়ে হাঁটুজল পেরিয়ে নদী পার হওয়া যাবে। আমরা সেদিকে চলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি চারটি কাঠের টুকরোকে একসঙ্গে যুক্ত করে লম্বা রশি দিয়ে পাহাড়ের সঙ্গে বেঁধে নদীর বুকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর উপর বাহনজন্তুর পিঠের হাওদা ও আসবাবপত্র রাখা হয়। অপরপ্রান্তের লোকেরা তা টেনে নিয়ে যায়। মানুষরাও এর উপর চড়ে নদী পার হয় আর বাহনজন্তুগুলো পার হয় সাঁতার কেটে। আমরাও এমনটিই করি।

অতঃপর আমরা কাওইয়াহ শহরে পৌছাই। এখানকার এক যুবক সর্দারের খানকায় গিয়ে উঠি। তার সঙ্গে আমরা আরবিতে কথা বলি। তিনি আমাদের কথা কিছু বুঝেন না। এদিকে তিনি আমাদের সঙ্গে তুর্কি ভাষায় কথা বলেন। আমরা তার কিছুই বুঝতে পারি না। অতঃপর তিনি বলেন, কেউ ফকিহকে খবর পাঠাও। তিনি আরবিভাষা জানেন। ফকিহ এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন ফারসি ভাষায়। আমরা কথা বলি আরবি ভাষায়। তিনিও আমাদের কথা কিছুই বুঝতে পারেন না। তাই তিনি যুবক সর্দারকে ফারসি ভাষায় বলেন, 'এই লোকেরা পুরনো আরবিতে কথা বলে, আর আমি নতুন আরবি ভাষা জানি।' এই কথা বলে তিনি মূলত নিজেকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে চাইছিলেন। কারণ, এখানকার লোকেরা মনে করে তিনি আরবি জানেন। আসলে তিনি আরবি জানেনই না। তাই তাদেরকে বলেছেন, এই লোকেরা পুরনো আরবিতে কথা বলেন। আর আমি জানি নতুন আরবি। তখন যুবক সর্দার মনে করে, ফকিহ যেটা বলেছেন তাই ঠিক। কিন্তু এটি আমাদের জন্য শাপেবর হয়ে দাঁড়ায়। ফকিহ আমাদের খুবই খাতির-যত্ন করেন। অনুচরদের উদ্দেশে বলেন, তাদের যত্নে যেন কোনো কমতি না হয়। তারা পুরনো আরবি ভাষায় কথা বলেন। যে ভাষায় আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলতেন। আমরা তখন ফকিহের কথা না বুঝলেও তার উচ্চারিত শব্দগুলো মুখস্থ করে রাখি। ফারসি ভাষা আয়ত্ত করার পর আমি তার কথাগুলো বুঝতে পারি।

সেই রাতটি খানকায় যাপন করি। যুবক সর্দার আমাদেরকে ইয়ানিজা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য সঙ্গে করে একজন পথনির্দেশক প্রেরণ করেন। ইয়ানিজা শহরটি আয়তনে বড় এবং দেখতে খুবই সুন্দর। আমরা সেখানে যুবক সর্দারের খানকার খোঁজ করতে করতে এক জায়গায় এসে এক

লোককে দেখতে পাই। তাকে জিজ্ঞেস করি, এটিই কি এখানকার যুবক সর্দারের খানকা? লোকটি আরবিতে বলে, নাআম। মানে হ্যাঁ। তখন আরবিভাষা জানা লোক খুঁজে পেয়ে আমরা কী যে খুশি! কিন্তু লোকটিকে আরেকটু যাচাই করতেই আমাদের সেই আনন্দ উধাও হয়ে যায়। বুঝতে পারি সে 'নাআম' শব্দটি ছাড়া আরবি ভাষার আর কিছুই জানে না। অতঃপর আমরা সেই খানকায় গিয়ে উঠি। খানকার একজন সেবক আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসে। যুবক সর্দার তখন উপস্থিত ছিলেন না। এই সেবকের সঙ্গে আমাদের খুব খাতির জমে যায়। যদিও সে আরবিভাষা জানত না। কিন্তু সে গিয়ে শহরের নায়েব অর্থাৎ ডেপুটি গভর্নরকে নিয়ে আসে। তিনি তার এক অশ্বারোহী সৈনিককে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। আমরা সেই সৈনিকের সঙ্গে চলে যাই কাইনুক শহরে।

কাইনুক শহরটি আয়তনে ছোট। এখানে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে থাকা রোমীয় জিম্মিরা বসবাস করে। এখানে শুধুমাত্র একজন মুসলিম ব্যক্তির বাড়ি রয়েছে। তিনি এখানকার গভর্নর। এটি সুলতান উরখানের শাসনাধীন শহর। এখানকার এক বিধর্মী বৃদ্ধার বাড়িতে আমরা অবস্থান করি। তখন ছিল তীব্র শীতের সময়। তুষারপাতও হচ্ছিল। বৃদ্ধা মহিলাটি আমাদের যথেষ্ট সমাদর করেন। আমরা তার বাড়িতে রাতটুকু অবস্থান করি। কাইনুক শহরে কোনো গাছপালা নেই। নেই কোনো আঙুরের ঝাঁকা। এখানে শুধু জাফরানের চাষ হয়। বৃদ্ধা মহিলাটি আমাদের কাছে অনেক জাফরান নিয়ে আসেন। তিনি ভেবেছেন আমরা ব্যবসায়ী। তার কাছ থেকে জাফরান ক্রয় করব।

পরদিন ভোরের আলো ফুটতেই আমরা নিজ নিজ বাহনে উঠে বসি। কাওয়িয়াহ থেকে আমাদের সঙ্গে আসা অশ্বারোহী ব্যক্তিটি এবার অন্য একজন অশ্বারোহীকে সঙ্গে পাঠান আমাদেরকে মুতুরনি শহরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সেই রাতে অনেক তুষারপাত হয়েছিল। ফলে পথের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই আমরা অশ্বারোহী ব্যক্তিটি আগে যেতে বলে তার পিছু পিছু অনুসরণ করতে থাকি। দুপুরের সময় একটি গ্রামে এসে উপনীত হই। এখানে একটি তুর্কি গোত্রের বসবাস। তারা আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এলে আমরা আহার সেরে নিই। অশ্বারোহী ব্যক্তিটি তাদের সঙ্গে আলাপ করলে তাদের মধ্য হতেও একজন ব্যক্তি আমাদের সঙ্গী হয়। অতঃপর আমরা পাহাড়-পর্বতবেষ্টিত দুর্গম পথ ধরে এগোতে থাকি। পথিমধ্যে পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে একটি জলাধারকেই ত্রিশবারের বেশি অতিক্রম করি। সেটি পেরিয়ে যাওয়ার পর অশ্বারোহী ব্যক্তিটি আমাদের কিছু

দিরহাম দিতে বলে। আমরা তাকে বলি, শহরে পৌঁছে আমরা তোমাকে তোমার সন্তুষ্টি অনুযায়ী দিরহাম দিব। আমাদের এই উত্তর তার পছন্দ হলো না অথবা সে আমাদের কথাই বুঝতে পারেনি তখন। তখন সে আমাদের এক সঙ্গীর কাছ থেকে একটি ধনুক নিয়ে কিছুটা দূরে পুনরায় ফিরে এসে ধনুক ফিরিয়ে দেয়। তখন আমরা তাকে কিছু দিরহাম প্রদান করি। সেগুলো নিয়ে সে আমাদের ফেলে পালিয়ে যায়। আমরা পড়ে যাই দিশাহীন অবস্থায়। কোথায় যাব, কোনপথে যাব কিছুই জানি না। তখন আমরা তুষারের নিচে পথের চিহ্ন খুঁজে খুঁজে সামনে এগোতে থাকি। এভাবে চলতে চলতে সন্ধ্যায় আগমুহূর্তে একটি পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। সেখানে অনেক পাথর থাকায় পথের চিহ্ন দৃশ্যমান ছিল। আমাদের কাফেলার সদস্যদের মনে তখন মৃত্যুভয় জেগে উঠেছে। এমন জনমানবহীন বিরান জায়গায় যদি রাতে তুষারপাত হয়, তাহলে আমাদের বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না। বাহন থেকে নেমে যাওয়ার মানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেওয়া। আর রাতের বেলায় সফর করাও সম্ভব নয়। কারণ, আমরা জানি না ঠিক কোন দিকে যেতে হবে। আমার একটি উৎকৃষ্ট মানের ঘোড়া ছিল। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আমি একটি পরিকল্পনা করি। মনে মনে বলি, যদি আমি নিজে বাঁচতে পারি, তাহলে হয়তো আমার সঙ্গীদেরকেও বাঁচানোর পদক্ষেপ নিতে পারব। এই সংকল্প করে আমি তাদেরকে আল্লাহর নামে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এই অঞ্চলের লোকেরা কবরের উপর কাঠের ঘর তৈরি করে রাখে। দূর থেকে দেখে মনে হয় সেখানে হয়তো কোনো মানুষের বসবাস। কিন্তু কাছে গিয়ে কবর ছাড়া কোনো লোকালয়ের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন অনেক কবর আমার চোখে পড়ে। ইশার নামাযের পর আমি কিছু বাড়িঘর দেখতে পাই। মনে মনে আল্লাহর কাছে বলি, এটি যেন কোনো জনবসতি হয়। গিয়ে দেখি এটি সত্যিই জনবসতি। আল্লাহ তাআলার সাহায্যে একটি ঘরের দরজায় একজন বৃদ্ধকে দেখতে পাই। তার সঙ্গে আমি আরবি ভাষায় কথা বলি। তিনি কথা বলেন তুর্কি ভাষায়। ইশারায় আমাকে বলেন ভেতরে প্রবেশ করতে। তাকে আমি আমাদের কাফেলার দূরবস্থার কথা জানাই। কিন্তু তিনি আমার কথা কিছুই বুঝতে পারেননি। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে এই ঘরটিই ছিল এখানকার যুবক ভাইদের খানকা। দরজায় যিনি দাঁড়ানো ছিলেন তিনি এখানকার সর্দার। তার সঙ্গে আমার আলাপচারিতা শুনে ভেতর থেকে একজন ভাই বেরিয়ে আসেন। যার সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় ছিল। তাকে আমার সঙ্গীদের অবস্থা সম্পর্কে জানাই এবং তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য অন্য ভাইদের

নিয়ে যেতে বলি। তারা আমার অনুরোধ রেখে সঙ্গীদের উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। অবশেষে আমরা সবাই এই খানকায় মিলিত হই। নিরাপদে রাখার জন্য আল্লাহ তাআলার প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন করি। সেই রাতটি ছিল শুক্রবার রাত। গ্রামের প্রায় সকল অধিবাসী খানকায় সমবেত হয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও যিকিরে রত হয়ে রাতটি কাটায়। প্রত্যেকেই যার যার সাধ্য অনুযায়ী খাবার নিয়ে আসে। আমাদের কষ্ট লাঘব হয়ে যায়।

পরদিন ভোরে পুনরায় যাত্রা করে জুমার নামাযের কাছাকাছি সময়ে মুতুরনি এসে পৌঁছাই। এখানকার যুবক সর্দারের খানকায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। তখন একদল মুসাফিরও সেখানে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু আমাদের বাহনজন্তুগুলো বাঁধার মতো কোনো স্থান এখানে পাচ্ছিলাম না। জুমার নামায আদায় করে নিই। এদিকে আমাদের মনে তখন কনকনে ঠান্ডা, তুষারপাত আর বাহনজন্তু বাঁধার জায়গা না পাওয়া দুশ্চিন্তা ঘনায়মান। এমন সময়ে এখানকার এক হাজি সাহেবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি এসে আমাদের সালাম জানান। জানতে পারি তিনি আরবিভাষা জানেন। তাই তাকে পেয়ে আমরা যারপরনাই আনন্দিত হই। তাকে বলি ভাড়ায় হলেও আমাদের বাহনজন্তুগুলো বাঁধার মতো কোনো স্থান খুঁজে দিতে। তিনি বলেন, শহরের কোনো বাড়িতে বাহনজন্তু বাঁধা সম্ভব নয়। কারণ, এই শহরের বাড়িগুলোর দরজা খুবই ছোট। তা দিয়ে কোনো বাহনজন্তু প্রবেশ করতে পারবে না। তবে আমি আপনাদেরকে বাজারের পাশে একটি সামিয়ানাযুক্ত জায়গার সন্ধান দিতে পারি। মুসাফির এবং দূর থেকে আগত ব্যবসায়ীগণ সেখানে তাদের বাহনজন্তু বেঁধে রাখেন। তিনি আমাদেরকে সেই জায়গায় নিয়ে গেলে আমরা সেখানে আমাদের ঘোড়াগুলো বেঁধে আসি। আমাদের একজন সঙ্গী এগুলোকে পাহারা দেওয়ার জন্য পাশের এক হোটেলে অবস্থান করেন।

একটি ঘটনা

এখানে আমাদের সঙ্গে আশ্চর্য একটি ঘটনা ঘটে। আমাদ্র এক সেবককে প্রেরণ করি পশুদের জন্য ঘাস কিনে আনতে। আরেকজনকে প্রেরণ করি ঘি কিনে আনতে। প্রথমজন ঘাস নিয়ে আসে। কিন্তু পরেরজন আসে খালি হাতে এবং হাসতে হাসতে। তাকে জিজ্ঞাসা করি, এত হাসছ কেন? সে উত্তর দেয়, আমরা দুজন বাজারের এক দোকানে গিয়ে দোকানদারকে বলি

সামন (ঘি) দিতে। তিনি আমাদেরকে দাঁড়াতে বলেন। তার সঙ্গে থাকা ছেলের কাছে মূল্য পরিশোধ করতে বলে যান। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি ঘাস নিয়ে আসেন। সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে বলি আমরা তো সামন চেয়েছিলাম। তিনি বলেন, এগুলোই তো সামন। বুঝতে পারলাম তুর্কি ভাষায় এই ঘাসকেই সামন বলা হয়। আর সামন তথা ঘিকে তারা বলে রুগান।

হাজি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আমরা তাকে আমাদের সঙ্গে কাসতামুনিয়া পর্যন্ত যাওয়ার জন্য অনুরোধ করি। মুতুরনি থেকে কাসতামুনিয়ার দূরত্ব দশ মাইল। আমি সেই হাজি সাহেবকে আমার একটি মিসরীয় পোশাক উপহার দেই এবং এই কদিনের জন্য তার পরিবারের খরচও দিয়ে দেই। তার জন্য একটি বাহনজন্তু নির্ধারণ করা হয়। আমাদের পৌঁছে দেওয়ার পর তাকে উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করি। অতঃপর তিনি আমাদের সঙ্গে সফরে বের হন। পরে জানতে পারি তিনি অনেক সম্পদের অধিকারী। অনেকের কাছ থেকে তিনি ঋণ নিয়েছেন। আর লোকটা বেশ স্বার্থপর ও হীন স্বভাবের। আমাদের খাবার কেনার জন্য যে দিরহামগুলো দিতাম সেগুলো দিয়ে সে খাবার ক্রয় করে আনত। অতঃপর যে রুটিগুলো অতিরিক্ত হতো সেগুলোর বিনিময়ে মশলাপাতি, সবজি আর লবণ কিনে তা বিক্রি করে মূল্য নিজের কাছে রেখে দিত। এছাড়া সে আমাদের খরচের দিরহামগুলো থেকেও আত্মসাৎ করত বলেও প্রমাণ পাই। কিন্তু তুর্কি ভাষা জানা না থাকার কারণে আমরা যে বিড়ম্বনার মুখোমুখি হই, তা থেকে বাঁচতে এই লোকটাকে সহ্য করে যাচ্ছিলাম। অবশেষে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, আমরা তাকে অপমান করতে শুরু করি। দিনের শেষে আমরা তাকে বলতাম, ওহে হাজি সাহেব, আজকে আমাদের খরচের বাজেট থেকে কত দিরহাম চুরি করলেন? সে বলত, এত এত দিরহাম। আমরা তখন তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম। কিছু মনে করতাম না। তার আরো কিছু অপকর্মের কথা বলি। পথিমধ্যে একজায়গায় অবস্থানকালে আমাদের একটি ঘোড়া মারা যায়। তখন সে নিজ হাতে সেই মৃত ঘোড়ার চামড়া ছিলে তা বিক্রি করে। একরাতে কোনো একগ্রামে তার দূরসম্পর্কের এক বোনের বাসায় বিশ্রামের জন্য নেমেছিলাম। তিনি আমাদের জন্য খাবার এবং নাশপাতি, আপেল, এপ্রিকট ও পীচ প্রভৃত ফল পরিবেশন করেন। ফলগুলো ছিল শুকনো। পানিতে ভেজানোর পর কিছুটা তাজা হলে এগুলো ভক্ষণ করা

হয়। আর ফলভেজানো পানিটুকু পান করা হয়। আমরা এই আতিথেয়তার বিনিময়ে মহিলাকে কিছু বিনিময় দিতে চেয়েছিলাম। লোকটা সেই কথা টের পেয়ে আমাদের বলে, তাকে কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যা দেওয়ার আমাকে দিন। আমরা তখন তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু দিরহাম দেই। এদিকে গোপনে সেই মহিলাকেও তার পুরস্কার দিয়ে আসি।

অতঃপর আমরা বুলি শহরে এসে পৌছাই। শহরের কাছাকাছি আসার পর একটি নদী দেখতে পাই। যা দেখতে বেশ ছোট মনে হয়। আমাদের এক সঙ্গী তাতে নামার পর দেখতে পায় এটি অত্যন্ত খরস্রোতা একটি নদী। তবুও সবাই মিলে কষ্ট করে নদী পার হয়ে যাই। বাকি থাকে একটি ছোট্ট দাসী। সে পার হতে ভয় পাচ্ছিল। আমার ঘোড়াটি সবার চেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়ায় আমি তাকে আমার পেছনে বসিয়ে নিই। মাঝনদীতে আসার পর ঘোড়াটি আমাদেরকে নিয়ে পড়ে যায়। আমাদের এক সঙ্গী তাকে জীবিত উদ্ধার করে আনে। আমি আগেই পাড়ে পৌছতে পেরেছিলাম। শহরের ভেতরে প্রবেশ করে এখানকার যুবক সর্দারের খানকার সন্ধান করতে থাকি। শীতের দিনগুলোতে তাদের খানকায় সবসময় আগুন প্রজ্বলিত থাকে। খানকার প্রতিটি খুঁটির প্রান্তে ফায়ারপ্লেস রাখা হয়। চিমনির সাহায্যে ধোঁয়াগুলো উপরে উঠে যায়। খানকার ভেতরের মানুষদের কোনো কষ্ট হয় না। এই চিমনিগুলোকে তারা বাখারি বলে থাকে।

খানকায় প্রবেশ করে আমরা আগুন প্রজ্বলিত অবস্থায় দেখতে পাই। আমি আমার পোশাক খুলে নতুন পোশাক পরিধান করি এবং আগুনের তাপে নিজেকে গরম করে নিই। যুবক সর্দার খাবার এবং অনেক খাবার নিয়ে আসেন। এই লোকগুলোর উদারতা দেখে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আগত মেহমানদের প্রতি তাদের যত্ন, খাতিরদারি আর সম্মিলনের কোনো তুলনা হয় না। যেকোনো অপরিচিত লোক এলেই তারা এমন খাতিরদারি করেন, যেন লোকটি তাদের অনেক আপনজন। বেশ আরামদায়কভাবে আমরা সেই রাতটি কাটিয়ে দিই। পরদিন সকালে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কারদিবুলি শহরে পৌছাই। শহরটি বিশাল ভূখণ্ডজুড়ে বিস্তৃত এবং বেশ চমৎকার। প্রশস্ত সড়ক আর সুবিন্যস্ত বাজারবিশিষ্ট। তবে এটি শীতলতম একটি শহর। এখানে বেশ কয়েকটি মহল্লা রয়েছে। প্রতিটি মহল্লায় পৃথক পৃথক দলের লোক বসবাস করে। একদল আরেকদলের সঙ্গে মেলামেশা করে না।

কারদিবুলির সুলতানের বিবরণ

তার নাম সুলতান শাহ বেক। এই অঞ্চলের মধ্যম পর্যায়ের একজন সুলতান। দৈহিক সৌন্দর্য এবং চারিত্রিক ভূষণের অধিকারী। উপহার-উপঢৌকন প্রদানের ক্ষেত্রে হিসেবী। আমরা এই শহরে এসে প্রথমে জুমার নামায আদায় করি। অতঃপর খানকায় গিয়ে উঠি। এখানকার খতিব ফকিহ শামসুদ্দিন আদ দিমাশকি আল হাম্বলির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে এখানেই বসবাস করছেন। তার সন্তানরাও এখানে থাকে। সুলতান তাকে রাজ্যের ফকিহ ও খতিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। তাকে তিনি খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ফকিহ শামসুদ্দিন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য খানকায় চলে আসেন। জানান, সুলতানও আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছেন। আমরা এই মহানুভবতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। সুলতান এলে আমরা তাকে সালাম জানাই। তিনি আমাদের সঙ্গে বসেন। আমার খোঁজখবর নেন এবং কোন কোন সুলতানের সঙ্গে এ পর্যন্ত দেখা হয়েছে, তা জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাকে সব বিস্তারিত বলি। কিছুক্ষণ থেকে তিনি ফিরে যান। অতঃপর লাগাম পরিহিত ও হাওদাসজ্জিত একটি ঘোড়া এবং রাজকীয় পোশাক পাঠিয়ে দেন।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য বুরলু শহর। এটি পাহাড়ি টিলার পাদদেশে অবস্থিত ছোট একটি শহর। এর নিম্নভূমিতে রয়েছে একটি উপত্যকা আর উচ্চপ্রান্তে রয়েছে একটি সুরক্ষিত দুর্গ। এখানকার একটি মাদরাসায় আমরা অবস্থান করি। আমাদের সঙ্গে আসা হাজি সাহেব এই মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের পরিচিত। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি দরসে বসে যেতেন। হানাফি মাযহাবের অনুসরণ করেন তিনি। শহরের গভর্নর আলী বেক আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি কাসতামুনিয়ার সুলতান সুলাইমান বাদশাহর সুযোগ্য পুত্র। এই সুলতানের কথা সামনে উল্লেখ করব। আমরা আলী বেকের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দুর্গে আরোহণ করি। তাকে সালাম জানালে তিনি আমাদের স্বাগত জানান এবং খুব সমাদর করেন। আমার সার্বিক অবস্থা ও বিভিন্ন অঞ্চলের সফরের বিবরণ জানতে চান। আমি তাকে বিস্তারিত খুলে বলি। তিনি আমাকে তার পাশে নিয়ে বসান। অতঃপর শহরের বিচারক ও সুলতানের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ এসে উপস্থিত হন। তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট একজন উপদেষ্টা। এরপর খাবার পরিবেশন করা আমরা আহার সেরে নিই। খাবারপর্ব শেষে শুরু হয় কুরআন

তেলাওয়াতের আসর। কারীগণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী স্বরে এমন মনোমুগ্ধকর তেলাওয়াত করেন যে, সবার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করে।

পরদিন আমরা কাসতামুনিয়ার উদ্দেশে সফর করি। এটি পৃথিবীর বুকে বিশাল ও চমৎকার একটি শহর। প্রাচুর্যে ভরপুর। অত্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে এখানকার সকল পণ্য সংগ্রহ করা যায়। আল উতরুশ নামক এক যুবক সর্দারের খানকায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। তিনি কানে শুনতেন না। তার আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করি আমি। তার ছাত্ররা কখনো শূন্যে, আবার কখনো জমিনে আঙুল দিয়ে লিখে দেখাতো, তিনি তা দেখেই বুঝে নিতেন আর উত্তর দিতেন। এভাবেই তারা তাকে বিভিন্ন ঘটনা জানাতো। তিনি সেগুলো খুব ভালোভাবেই বুঝে নিতেন।

এই শহরে আমরা চল্লিশ দিনের মতো অবস্থান করি। এইসময়ে মাত্র দুই দিরহামের বিনিময়ে এক পোঁটলা মোটাতাজা মেষের মাংস ক্রয় করেছি। দুই দিরহামের বিনিময়ে যে রুটি ক্রয় করতাম, তা আমাদের দশজনের কাফেলার সারাদিনের খাবারের জন্য যথেষ্ট হতো। দুই দিরহামে মধুর মাধ্যমে তৈরি মিষ্টান্ন ক্রয় করে সবাই মিলে তৃপ্তিভরে খেতাম। এক দিরহামের বিনিময়ে যে পরিমাণ আখরোট বা বাদাম পাওয়া যেত, তা আমরা সবাই মিলে খেয়েও শেষ করতে পারতাম না। তখন ছিল তীব্র শীতকাল। পৃথিবীর আর কোথাও আমি এত সস্তা মূল্যে পণ্য বেচাকেনা হতে দেখিনি।

এখানকার শীর্ষস্থানীয় আলেম, মুফতি ও শিক্ষক তাজুদ্দিন আস সুলতানিয়ুকির সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়। তিনি ইরাকে আরব, ইরাকে আজম এবং তাবরিজে পড়াশোনা করেছেন। দীর্ঘসময় সেখানে অবস্থান করেছিলেন। দামেস্কেও পড়াশোনা করেছেন এবং বেশ আগে মক্কা-মদিনায় গিয়ে অবস্থান করেছেন। আরেক বরেণ্য আলেম সদরুদ্দিন সুলাইমান আল ফানিকির সঙ্গেও আমার দেখা হয়। তিনি বিলাদুর রোম ফানিকা শহরের অধিবাসী। ঘোড়ার বাজার সংলগ্ন তার মাদরাসায় নিয়ে গিয়ে তিনি আমার মেহমানদারি করেন। বৃদ্ধ শায়খ দাদা আমির আলের সাক্ষাৎ লাভেরও সুযোগ হয় আমার। ঘোড়ার বাজারের নিকটেই তার খানকা। সেখানে গিয়ে আমি তার সঙ্গে দেখা করি। গিয়ে দেখি তিনি পিঠে ভর করে শুয়ে আছেন। এক খাদেম এসে তাকে উঠিয়ে দিয়ে যায়। একজন এসে চোখের পাপড়ি উঠিয়ে দিয়ে গেলে তিনি চোখ মেলেন এবং বিশুদ্ধ

আরবিভাষায় আমার সঙ্গে আলাপ করেন। বলেন, আপনার আগমন শুভ হোক। তার বয়সের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি খলিফা আল মুসতানসির বিল্লাহর[১] সময়ের লোক। তিনি যখন মারা যান, তখন আমি ত্রিশ বছর বয়সী টগবগে যুবক। এখন আমার বয়স একশ ত্রিশ বছর প্রায়। আমি তার কাছে দোয়া কামনা করি। তিনি আমার জন্য দোয়া করার পর আমি ফিরে আসি।

কাসতামুনিয়ার সুলতানের বিবরণ

তিনি সম্মানিত সুলতান সুলাইমান বাদশাহ। তার বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। সুন্দর চেহারা ও লম্বা দাঁড়িবিশিষ্ট গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং প্রভাবময় একজন ব্যক্তি। আলেম-উলামা, ফকিহ ও নেককার ব্যক্তিগণ তার সাহচর্য গ্রহণ করে থাকেন। তার দরবার হলে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে তার পাশে নিয়ে বসান। আমার সার্বিক খোঁজখবর নেন এবং মক্কা-মদিনা, মিসর ও শামের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাকে বিস্তারিত জবাব দেই। তিনি নির্দেশ দেন, যেন তার কাছেই আমার আতিথেয়তার ব্যবস্থা করা হয়। সেদিন তিনি আমাকে উৎকৃষ্ট জাতের ধূসর বর্ণের একটি ঘোড়া ও রাজকীয় পোশাক উপহার দেন। পাশাপাশি আমার খরচ ও বাহনজন্তুর জন্য ঘাস বরাদ্দ করার নির্দেশও প্রদান করেন। অতঃপর তিনি আমার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ গম ও যব বরাদ্দ করেন। যা শহরের অন্তর্গত অর্ধদিনের সফরের দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রাম থেকে আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু এই শহরে পণ্যের মূল্য অনেক সস্তা হওয়ার ফলে আমি এগুলো বিক্রি করার মতো ক্রেতা খুঁজে পাইনি। তাই আমাদের সঙ্গে আসা হাজি সাহেবকে দিয়ে দেই।

কাসতামুনিয়ার সুলতান সুলাইমান প্রতিদিন আসর নামাযের পর তার দরবার হলে বসেন। তখন শাহী খাবারের আয়োজন করে রাজপ্রাসাদের দরজা খুলে দেওয়া হয়। শহুরে-গ্রাম্য, পরিচিত এবং অজানা অচেনা মুসাফির সবাই নির্দ্বিধায় এই খাবারে শরিক হতে পারে। দিবসের শুরু দিকে তিনি বিশেষ

---

[১] এই খলিফা আল মুসতানসির ছিলেন আব্বাসি খিলাফতের ছত্রিশতম অর্থাৎ সর্বশেষ খলিফার আগের খলিফা। ৬২৩ হিজরিতে শাসন গ্রহণ করে ৬৪০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। এই হিসেবে দাদা আমির আলির জন্ম হবে ৬১০ হিজরিতে। আর ৭৩৪ হিজরিতে ইবনে বতুতার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তার বয়স হবে ১২৪ বছর। ১৩০ বছর নয়।



সভায় বসেন। তার পুত্র এসে তার দুই হাতে চুম্বন করে নিজের নির্ধারিত আসনে বসেন। অতঃপর রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ একে একে হাজির হন। খাবার পরিবেশন করার পর আহার সেরে তারা নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যান। শহরের জামে মসজিদের অবস্থান তার বাসভবন থেকে দূরে হওয়ায় তিনি জুমার দিন বাহনে চড়ে জুমার নামায আদায় করতে যান। মসজিদটি কাঠের তৈরি তিনতলা বিশিষ্ট। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিচারক, ফকিহ এবং নেতৃস্থানীয় সৈনিকদেরকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান নিচতলায় নামায আদায় করেন। সুলতানের ভাই আফেন্দি, তার সঙ্গী ও সেবকদল এবং শহরের কিছু নাগরিক নামায পড়েন দ্বিতীয় তলায়। আর সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র ও যুবরাজ জাওয়াদ, তার দাস ও সেবকদল এবং অন্যান্য সাধারণ জনগণ তৃতীয় তলায় নামায আদায় করেন। শহরের কারীগণ সমবেত হয় মিহরাবের সম্মুখে গোল হয়ে বসেন। তাদের সঙ্গে বসেন খতিব ও বিচারক। সুলতান বসেন মিহরাবের পাশে। কারীগণ সম্মিলিতভাবে সুললিত স্বরে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করেন। আশ্চর্য এক বিন্যাসে তারা সূরার আয়াতগুলো পুনরাবৃত্তি করেন। তেলাওয়াত শেষ হওয়ার পর খতিব সাহেব মিম্বারে আরোহণ করে খুতবা দিয়ে নামায পড়ান। ফরয নামায শেষ হলে সবাই দাঁড়িয়ে নফল নামায আদায় করে। অতঃপর কারীগণ পুনরায় সুলতানের সম্মুখে বসে দশটি আয়াত তেলাওয়াত করেন। এরপর সুলতান তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে ফিরে যান। কারীগণ এবার সুলতানের ভাইয়ের সম্মুখে বসে তেলাওয়াত করেন। শেষ হওয়ার পর তিনি নিজ সঙ্গীদেরকে নিয়ে ফেরার পথ ধরেন। সবশেষে কারীগণ বসেন সুলতানের ছেলের সম্মুখে। তেলাওয়াত শেষ হওয়ার পর তাদের মধ্য হতে একজন উঠে দাঁড়িয়ে তুর্কি ভাষায় রচিত কবিতার মাধ্যমে সুলতান ও তার ছেলের প্রশংসা করেন ও তাদের জন্য দোয়া করেন। অতঃপর সুলতান পুত্রও ফেরার পথ। পথে তিনি চাচার জন্য অপেক্ষা করে তার হাতে চুমো খান। অতঃপর দুজন মিলে প্রবেশ করেন সুলতানের প্রাসাদে। প্রথমে সুলতানের ভাই সুলতানের হাতে চুমো খেয়ে তার সম্মুখে নির্ধারিত আসনে বসেন। অতঃপর সুলতানের পুত্র এসে চুমো খেয়ে নিজের আসন গ্রহণ করেন। আসরের নামাযের সময় হয়ে গেলে তারা সম্মিলিতভাবে নামায আদায় করে নেন। অতঃপর সুলতানের ভাই সুলতানের হাতে চুম্বন করে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে যান। পরবর্তী জুমার দিনের আগে তাদের মাঝে আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই। আর সুলতানের পুত্র প্রতিদিন সকালেই সুলতানের কাছে আসেন।

কাসতামুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আমরা পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। সেই রাতে কোনো এক পল্লীতে অবস্থিত খানকায় এসে আমরা অবস্থান গ্রহণ করি। এই অঞ্চলের খানকাগুলোর মধ্যে এই খানকাটিকেই আমার কাছে সবচেয়ে নান্দনিক মনে হয়েছে। ফখরুদ্দিন নামক বিশিষ্ট এক আমির এই খানকাটি নির্মাণ করেছেন। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করে পাপের কাজ ফিরে এসে এটি নির্মাণ করেন। নিজ সন্তানকে তিনি এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং খানকায় আগত মুসাফির ও অসহায় ব্যক্তিদের দেখভালে নিয়োজিত করেছেন। পল্লী থেকে অর্জিত সমস্ত আয় এই খানকার জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে। খানকার পাশেই একটি গোসলখানা নির্মাণ করা হয়েছে। আগত ব্যক্তিগণ এখানে বিনামূল্যে গোসল করতে পারেন। এই পল্লীতে একটি বাজারও রয়েছে। যার আয় ওয়াকফ করা হয়েছে শহরের জামে মসজিদের জন্য। পবিত্র মক্কা-মদিনা অথবা শাম, মিসর, ইরাকে আরব, ইরাকে আজম এবং খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত মুসাফিরদের জন্য খানকার ওয়াকফ থেকে একটি পোশাক ও একশ দিরহাম করে বরাদ্দ করা হয়েছে। যা মুসাফিরের আগমনের দিনই তাকে প্রদান করা হয়। খানকা থেকে প্রস্থানের দিন দেওয়া হয় আরো তিনশ দিরহাম। আর খানকায় অবস্থানের সময়ে রুটি, গোশত, ঘি দিয়ে রান্না করা ভাত আর মিষ্টান্ন তো রয়েছেই। আর বিলাদুর রোম অঞ্চলের মুসাফিরদের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে দশ দিরহাম এবং তিন দিনের আতিথেয়তা। এখান থেকে বিদায় নিয়ে আবারও শুরু হয় আমাদের যাত্রা। এই রাতে আমরা অবস্থান করি উঁচু এক পাহাড়ে নির্মিত খানকায়। এখানে তেমন জনবসতি নেই। কাসতামুনিয়ার অধিবাসী নিজামুদ্দিন নামক এক যুবক সর্দার এই খানকাটি নির্মাণ করেছেন এবং এর খরচের জন্য একটি গ্রাম ওয়াকফ করেছেন। সেই গ্রাম থেকে অর্জিত আয় এই খানকায় আগত অতিথি ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করা হয়।

এই খানকা থেকে প্রস্থান নিয়ে আমরা সানুব[১] শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। সৌন্দর্যে ভরপুর এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত সমৃদ্ধ একটি শহর এই সানুব। তিনদিক থেকেই একে সমুদ্র ঘিরে রেখেছে। শুধু পূর্বদিকে রয়েছে স্থলপথ। সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে ফটক। গভর্নরের অনুমতি ব্যতীত কেউ সেই ফটক দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না। এখানকার গভর্নরের নাম ইবরাহিম বেক। তিনি কাসতামুনিয়ার সুলতান সুলাইমান বাদশাহর পুত্র। তার কাছ

[১] আধুনিক নাম সিনোপ।–অনুবাদক

থেকে অনুমতি নিয়ে আমরা শহরের ভেতরে প্রবেশ করি এবং যুবক সর্দার হুজ্জুদ্দিন আখি জালবির খানকায় অবস্থান গ্রহণ করি। সমুদ্রের প্রান্তে নির্মিত ফটকের বাইরে এই খানকার অবস্থান। এখান থেকে সমুদ্রের বুকে অবস্থিত একটি পাহাড়ে আরোহণ করা যায়। সাবতা (সিউটা) শহরের মিনা পাহাড়ের মতো এই পাহাড়েও বাগান, ফসলি জমি এবং জলাধার রয়েছে। এখানে অধিকহারে ডুমুর ও আঙুরফল উৎপন্ন হয়। তবে পাহাড়টি খুবই দুর্গম। এতে আরোহণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই পাহাড়ে এগারোটি পল্লী রয়েছে। গ্রিক জিম্মি খ্রিস্টানরা এখানে বসবাস করে। পাহাড়ের একেবারে উঁচুতে রয়েছে একটি আশ্রম। খিজির ও ইলিয়াস আ. এখানে ইবাদত করতেন বলে ধারণা করা হয়। এই আশ্রমে সবসময় ইবাদতকারী মুসলিমদের পদচারণা থাকে। এর কাছেই রয়েছে একটি ঝরনা। এই আশ্রমে দোয়া করলে তা কবুল করা হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এই পাহাড়েরই একপ্রান্তে প্রসিদ্ধ সাহাবি বিলাল হাবশি রা.-এর কবর অবস্থিত।[১] কবরের পাশেই নির্মাণ করা হয়েছে একটি খানকা। যেখানে আগত অতিথি ও দর্শনার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

সানুব শহরের জামে মসজিদটি পৃথিবীর দর্শনীয় ও নান্দনিক মসজিদগুলোর একটি। মসজিদের ঠিক মাঝবরাবর রয়েছে একটি পানির হাউজ। এর উপরে রয়েছে চারটি আয়তাকার স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছাউনি। প্রতি স্তম্ভের সঙ্গে রয়েছে মার্বেল পাথরের দুটি খুঁটি। ছাউনির উপরে রয়েছে একটি আসন। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সেখানে আরোহণ করা যায়। সুলতান আলাউদ্দিন আর রুমির পুত্র সুলতান বারওয়ানা এটি নির্মাণ করেছেন। তিনি ছাউনির উপরে স্থিত এই আসনে দাঁড়িয়ে জুমার নামায আদায় করেন। তার মৃত্যুর ক্ষমতাসীন হন তার পুত্র গাজি চেলেবি। তার মৃত্যুর পর কাসতামুনিয়ার সুলতান সুলাইমান এই শহর দখল করে নেন। গাজি চেলেবি ছিলেন একজন অকুতোভয় বীর। আল্লাহ তাআলা তাকে পানির নিচে দমবন্ধ করে থাকার এবং দ্রুত সাঁতার কাটার বিশেষ প্রতিভা দান করেছিলেন। রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি নৌবাহিনী নিয়ে বের হতেন। অতঃপর দুইদল মুখোমুখি হওয়ার পর সবাই যখন যুদ্ধের ময়দানে তুমুল লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকত, তিনি তখন হাতে একটি লৌহ বর্শা নিয়ে পানির নিচে

---

[১] তবে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী বিলাল রা.-এর কবরের অবস্থান দামেস্কের বাবুস সগির গোরস্থানে।–অনুবাদক

ডুব দিয়ে শত্রুবাহিনীর নৌযানগুলো ফুটো করে দিতেন। শত্রুবাহিনী এর কিছুই টের পেত না। হঠাৎ আবিষ্কার করত তাদের নৌযানগুলো তাদেরকে নিয়ে ডুবে যাচ্ছে। একবার শত্রুবাহিনীর নৌবহর এসে সানুবের উপকূলে আকস্মিক হামলা করে বসে। তিনি তখন সেই নৌবহরে ফাটল সৃষ্টি করে শত্রুবাহিনীর সবাইকে বন্দি করেন। মোটকথা, তিনি এমনই এক প্রতিভা পেয়েছিলেন যে, তার অনুরূপ কেউ ছিল না। তবে কথিত আছে, তিনি অত্যধিক পরিমাণ হাশিশ পান করতেন। এর প্রতিক্রিয়াতেই তার মৃত্যু হয়েছে। একদিন তিনি এমন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় শিকারে বের হয়েছিলেন। একটি হরিণীকে অনুসরণ করে তিনি বনের ভেতরে প্রবেশ করে ঘোড়াকে দ্রুত চালাতে শুরু করেন। হঠাৎ একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তার মাথা ফেটে যায়। সেই আঘাতেই তার মৃত্যু হয়। অতঃপর সুলতান সুলাইমান এসে শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং নিজ সন্তান ইবরাহিমকে এখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তার ব্যাপারেও শোনা যায়, আগের শাসকের মতো তিনিও হাশিশ পান করে। সমগ্র বিলাদুর রোম অঞ্চলে এ ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। একদিন আমি সানুবের জামে মসজিদের ফটক দিয়ে বের হচ্ছিলাম। ফটকের বাইরেই ছিল বেশ কিছু দোকান। লোকেরা সেখানে বসে কথাবার্তা বলত। আমি সেখানে শহরের বিশিষ্ট কজন সৈনিককে দেখতে পাই। তাদের সঙ্গে থাকা সেবকদের হাতে ছিল একটি পদার্থভর্তি ব্যাগ। যা দেখতে মেহেদির মতো। তারা চামচ দিয়ে সেই ব্যাগ থেকে সেগুলো নিয়ে খাচ্ছিল। আমি দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছিলাম। ব্যাগের ভেতরে ঠিক কি আছে, তা আমার জানা ছিল না। আমার সঙ্গের লোককে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, এগুলো হচ্ছে হাশিশ। এই শহরের বিচারক, ডেপুটি গভর্নর এবং স্থানীয় মাদরাসার শিক্ষক আমাদের মেহমানদারির দায়িত্ব নেন। তিনি বিন আবদির রাজ্জাক নামে পরিচিত।

একটি ঘটনা

সানুব শহরে প্রবেশের পর এখানকার অধিবাসীরা দেখতে পায় আমরা হাত ঝুলিয়ে রেখে নামায আদায় করি। এখানকার সকল অধিবাসী হানাফি মাযহাবের অনুসারী। তারা মালিক মাযহাব এবং এই মাযহাবের নামাযের পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত নন। এই মাযহাব অনুযায়ী হাত না বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে নামায আদায় করতে হয়। এখানকার কিছু অধিবাসী হেজাজ ও ইরাক অঞ্চলের রাফেযিদেরকেও হাত ঝুলিয়ে রেখে নামায আদায় করতে দেখেছে।

ফলে তারা আমাদেরকে রাফেযি হিসেবে অভিহিত করে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলে আমরা জানাই, আমরা মালিকি মাযহাবের অনুসারী। কিন্তু আমাদের কথা বিশ্বাস না করে তারা আমাদেরকে নিশ্চিত রাফেযি বলে বিশ্বাস করে নেয়। এমনকি সুলতানের নায়েব আমাদের কাছে একটি খরগোশ প্রেরণ করেন এবং তার এক খাদেমকে নির্দেশ দেন সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে থেকে আমরা এই খরগোশটি কী করি, তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য। তখন আমরা সেই খরগোশটি জবাই ও রান্না করে ভক্ষণ করি। খাদেম গিয়ে সুলতানের নায়েবকে এই সংবাদ জানালে আমাদের উপর থেকে সন্দেহ দূর হয়। অতঃপর আমাদের জন্য মেহমানদারিস্বরূপ খাবারও প্রেরণ করা হয়। রাফেযিরা খরগোশের গোশত ভক্ষণ করে না।

সানুবে পৌঁছানোর চারদিন পর গভর্নর ইবরাহিমের মা এখানে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তার জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করি। তার ছেলে ইবরাহিম সেদিন খালি পায়ে এবং খালি মাথায় বের হয়েছিলেন। এমনিভাবে অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও গোলামরাও এসেছিল একই অবস্থায়। তাদের পরনের পোশাক ছিল উলটানো। তবে শহরের বিচারক, খতিব এবং ফকিহগণ তাদের পোশাক উল্টিয়ে পরিধান করেননি এবং তাদের মাথাও উন্মুক্ত করেননি। তবে তারা সেদিন পাগড়ির পরিবর্তে কালো রঙের পশমি রুমাল বেঁধে এসেছিলেন। টানা চল্লিশদিন তারা খাবারের আয়োজন করেন। তাদের রীতি অনুযায়ী মৃত্যুর পর চল্লিশদিন শোকপালনের সময়।

আমরা এই শহরে চল্লিশ দিনের মতো অবস্থান করি। এখান থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ক্রিমিয়া যাওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছিলাম আমরা। এইলক্ষ্যে আমরা রোমকদের একটি নৌযান ভাড়া করি। অনুকূল বাতাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে এগারোদিন কেটে যায়। অতঃপর আমরা সমুদ্রযাত্রা শুরু করি। তিনদিন পর সমুদ্রের মাঝামাঝি এসে বাতাসের মোড় ঘুরে যায়। সমুদ্র হয়ে উঠে বিধ্বংসী। আমরা যেন তখন স্বচক্ষে আমাদের মৃত্যু দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি অবস্থান করছিলাম একটি কক্ষে। আমার সঙ্গে ছিল আবু বকর নামক মাগরিবের একজন লোক। আমি তাকে বলি নৌযানের উপরে উঠে সমুদ্রের অবস্থা দেখতে। সে তা দেখে কক্ষে এসে আমাকে বলে, আল্লাহর নামে আমি তোমাদেরকে বিদায় জানাচ্ছি। এমনই এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলাম আমরা। ইতিপূর্বে কখনো এত ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়নি আমাদের। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে

একপর্যায়ে ঝড়ো হাওয়া থেমে গেলে দেখতে পাই, আমরা আবার সানুবের কাছাকাছি চলে এসেছি। যেখান থেকে রওনা করেছিলাম। কিছু ব্যবসায়ী বন্দরে নেমে যেতে চাইলে নৌকার নাবিক নিষেধ করেন। অতঃপর সমুদ্রের বাতাস শান্ত হয়ে গেলে আমরা আবার যাত্রা শুরু করি। এবারও মাঝসমুদ্রে এসে আমরা প্রথমবারের মতোই ভয়াবহ ঝড়ের কবলে পড়ি। অতঃপর বাতাস আমাদের কিছুটা অনুকূলে আসে। আমাদের চোখে পড়ে একটি পাহাড়ের উপকূল।

কারশ নামক বন্দরের উদ্দেশে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। পাহাড়ি উপকূল দেখতে পেয়ে আমরা এখানে অবতরণের ইচ্ছা করি। কিন্তু পাহাড়ে অবস্থানকারী কিছু লোক আমাদেরকে এখানে অবতরণ করতে নিষেধ করে। আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। ধারণা হয়, এখানে হয়তো কোনো শত্রুবাহিনী অবস্থান করছে। অতঃপর আমরা উপকূলের কাছাকাছি দিয়ে পুনরায় চলতে থাকি। তীরের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর আমি নাবিককে বলি, আমি এখানে নামতে চাই। আমাকে তীরে নামিয়ে দিন। সেখানে নামার পর আমি একটি গির্জা দেখতে পাই। গির্জায় গিয়ে দেখি সেখানে একজন পাদরি আছেন। গির্জার একটি দেওয়ালে দেখতে পাই পাগড়ি পরিহিত, কাঁধে তরবারি ঝুলানো এবং হাতে বর্শা ধরে রাখা একজন আরব পুরুষের প্রতিকৃতি। এর সামনেই একটি প্রদীপ জ্বলছে। আমি পাদরিকে এই প্রতিকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, এটি নবী আলীর চিত্র। আমি তার এই উত্তর শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। সেই রাতটি আমরা এই গির্জাতেই কাটিয়ে দেই। আমরা কিছু মুরগী রান্না করেছিলাম। কিন্তু সেগুলোর উপর সামুদ্রিক দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার কারণে আমরা তা ভক্ষণ করতে পারিনি।

আমরা যেখানে অবতরণ করেছ এটি দাশতই কিফজাক নামে পরিচিত মরুভূমির অংশ। এই মরুভূমি বেশ সবুজ ও ঘাসময়। কিন্তু এখানে কোনো গাছপালা, পাহাড়, টিলা ও বাড়িঘর নেই। নেই জ্বালানির কাঠ। এখানকার অধিবাসীরা পশুর বিষ্ঠা দিয়ে আগুন প্রজ্বলিত করে। এই বিষ্ঠাকে তারা বলে নাজাক। তাদের মধ্যকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকেও দেখা যায়, তারা এই বিষ্ঠা কুড়িয়ে পরিহিত কাপড়ের এককোণে রেখে দিচ্ছে। এখানকার চলাচলের একমাত্র যান হচ্ছে মালগাড়ি। সবমিলিয়ে এই মরুভূমির আয়তন ছয় মাসের পথ সমান। এর অর্ধেক পড়েছে সুলতান মুহাম্মাদ উজবেকের শাসনাধীন অঞ্চলে। আর বাকি অর্ধেক পড়েছে অন্য অঞ্চলে।

এখানে অবতরণের দ্বিতীয়দিন আমাদের সঙ্গেকার কিছু ব্যবসায়ী এখানে বসবাসকারী কিপচাক নামক উপজাতির লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। তাদের কাছে আমাদের সঙ্গীরা ঘোড়ার মাধ্যমে টেনে নেওয়া একটি মালগাড়ি ভাড়া করে। আমরা সেই গাড়িতে চড়ে কাফফা শহরে গিয়ে পৌছাই। সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত এই শহরটি বিশাল আয়তনবিশিষ্ট। এখানকার প্রায় সকল অধিবাসী খ্রিস্টান। তাদের বেশিরভাগই এসেছে জেনোয়া শহর থেকে। তাদের গভর্নরের নাম দানদির। আমরা এখানকার মুসলিম অধিবাসীদের মসজিদে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করি।

একটি ঘটনা

মসজিদে এসে কিছুক্ষণ অবস্থানের পরই আমরা শুনতে পাই চারদিক থেকে ঘন্টার আওয়াজ আসছে। ইতিপূর্বে কখনো এমন আওয়াজ না শুনায় আমি খুব ভয় পেয়ে যা। আমার সঙ্গীদেরকে বলি মিনারের উপরে উঠে কুরআন তেলাওয়াত করতে, আল্লাহ তাআলার যিকির করতে এবং আযান দিতে। তারা তাই করে। অতঃপর অস্ত্রসজ্জিত ও বর্মপরিহিত একজন ব্যক্তি আমাদের কাছে এসে সালাম প্রদান করেন। আমরা তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে জানান, তিনি এখানকার মুসলিমদের বিচারক। তিনি বলেন, 'আমি আপনাদের কুরআন তেলাওয়াত ও আযানের শব্দ শুনতে পেয়ে আপনাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে হতদন্ত অবস্থায় ছুটে এসেছি। অতঃপর তিনি চলে যান। এরপর আমরা আর কোনো অনভিপ্রেত পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি। পরদিন এখানকার গভর্নর আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার এখানে খাবারের আয়োজন করা হয়। আমার আহার সেরে নিই। অতঃপর কাফফা শহরটি ঘুরে দেখি। শহরটিতে চমৎকার সুবিন্যস্ত কিছু বাজার রয়েছে। সবকটিতেই খ্রিস্টানদের আধিপত্য। শহরের বন্দরে গিয়ে অবলোকন করি মনমাতানো দৃশ্য। প্রায় দুইশটির মতো ছোট-বড় নৌযান সেখানে ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে। যুদ্ধের জাহাজ এবং সাধারণ সফরের জাহাজ, সবই আছে এখানে। এটি পৃথিবীর প্রসিদ্ধ বন্দরগুলোর একটি।

অতঃপর একটি মালগাড়ি ভাড়া করে আমরা আল কিরাম (ক্রিমিয়া) শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। এটি প্রতাপশালী সুলতান মুহাম্মাদ উজবেক খানের[১]

---

[১] পুরো নাম গিয়াসুদ্দিন মুহাম্মাদ উজবেক খান। তিনি ছিলেন মোঙ্গলদের গোল্ডেন হোর্ড সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বেশি সময় ধরে শাসনকারী সুলতান।–অনুবাদক

অনুগত সুবিশাল ও চমৎকার একটি শহর। সুলতান উজবেক খান এখানে একজন গভর্নর নিয়োগ করেছেন। তার নাম তুলুকতুমুর। তার একজন খাদেম পথে আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি গভর্নরকে আমাদের আগমনের সংবাদ জানান। তখন তিনি তার ইমাম সাদুদ্দিনের সঙ্গে আমাদের জন্য ঘোড়া প্রেরণ করে। আমরা এখানকার শায়খজাদা আল খোরাসানির খানকায় অবস্থান গ্রহণ করি। তিনি আমাদেরকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং অত্যন্ত সম্মান-সমাদর করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে তিনি খুবই সম্মানিত একজন ব্যক্তি। বিচারক, খতিব এবং ফকিহগণ ছাড়াও আরো অনেক লোক প্রতিদিন তাকে এসে সালাম জানায়। এই শায়খ আমাকে জানান, শহরের বাইরে খ্রিস্টান একজন পাদরি রয়েছে। তিনি ছোট্ট একটি ঘরে অবস্থান করে ইবাদত করেন। অনেক রোযা রাখেন তিনি। একবার টানা চল্লিশদিন রোযা রেখে মাত্র একটি দানা ভক্ষণ করে তিনি ইফতার করেছেন। তিনি মানুষের গোপন কথা বলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। শায়খ আমাকে তার সঙ্গে গিয়ে এই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও বলেন। কিন্তু আমি না করে দেই। পরে আফসোস হয়। গেলে এই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করে তার প্রকৃত অবস্থা জানা যেত।

শহরের প্রধান বিচারক শামসুদ্দিন আস সায়িলির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি হানাফি মাযহাবের অনুসারী। শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী বিচারকের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়। তার নাম খিজির। আরো সাক্ষাৎ হয় ফকিহ ও স্থানীয় মাদরাসার শিক্ষক আলাউদ্দিন আল আসি এবং শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের খতিব আবু বকরের সঙ্গে। এই খতিব এই শহরের সুলতান আল মালিকুন নাসিরের নির্মিত মসজিদের জুমার নামায পড়ান। আরো সাক্ষাৎ হয় শায়খ মুজাফফরুদ্দিনের সঙ্গে। তিনি মূলত ছিলেন গ্রিক খ্রিস্টান। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে পরিপূর্ণ দীনদার হয়ে যান। এখানকার বিশিষ্ট একজন ফকিহ ও নেককার ব্যক্তি শায়খ মুজহিরুদ্দিনের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়। গভর্নর তুলুকতুমুর তখন অসুস্থ ছিলেন। তা সত্ত্বেও আমরা তার সঙ্গে দেখা করার জন্য যাই। তিনি আমাদের খুব খাতির-যত্ন করেন এবং উপহার প্রদান করেন। তিনি তখন সুলতান মুহাম্মাদ উজবেক খানের রাজধানী আস সারা শহরের উদ্দেশে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমিও তার সঙ্গে সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করে নিই এবং এই লক্ষ্যে কিছু মালগাড়ি ভাড়া করি।

এই অঞ্চলের প্রধান যানবাহন মালগাড়ির বিবরণ

এই মালগাড়িকে তারা আরাবা (عربة) বলে থাকে। এই গাড়িগুলোর প্রতিটিতে থাকে চারটি বড় বড় চাকা। কোনো গাড়িকে টেনে নিয়ে যায় দুইটি ঘোড়া। আবার কোনোটিকে টেনে নিতে এর বেশি ঘোড়ার প্রয়োজন হয়। তবে গাড়ির আকার ও ওজনভেদে ভেড়া ও উটচালিত মালগাড়িও রয়েছে। মালগাড়ির চালক বসেন গাড়ি টেনে নেওয়া দুই বা তার অধিক ঘোড়ার যেকোনো একটি ঘোড়ার পিঠে। এর পিঠে লাগাম পরিহিত থাকে। আর চালকের হাতে থাকে একটি চাবুক। এটি নাড়িয়ে চালক ঘোড়াকে চলতে উৎসাহিত করে। আরো থাকে একটি বড় লাঠি। ঘোড়া কখনো ভুল পথে চলতে শুরু করলে সেই লাঠির মাধ্যমে আঘাত করে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনা হয়। গাড়ির উপরে থাকে কাঠ ও নলখাগড়ার মাধ্যমে তৈরি ছাউনি। যা ওজনে খুবই হালকা। পশমি কাপড় অথবা মোটা কাপড় দিয়ে এটিকে ঢেকে দেওয়া হয়। এর ভেতরে থাকে দুইটি জানালা। এই জানালা দিয়ে ছাউনির ভেতরে থাকা লোকেরা বাইরের লোকদের দেখতে পারে। কিন্তু বাইরে থেকে তাদেরকে দেখা যায় না। যাত্রীরা ছাউনির ভেতরে যেমন খুশি থাকতে পারে। সফর অবস্থাতেই সে চাইলে ঘুমাতে পারে, খেতে পারে, পড়তে পারে এবং লিখতে পারে। আর যেসকল মালগাড়ি বিভিন্ন পণ্য ও খাদ্যের বোঝা বহন করে, সেগুলোর উপরের ছাউনিটি দেখতে ঘরের মতো। এর দরজা তালা লাগানো থাকে। সফরের পরিকল্পনা করার পর আমি ভেড়ার পশম দিয়ে ঢাকা ছাউনিযুক্ত একটি মালগাড়ি প্রস্তুত করি। এর ভেতরে আমার সঙ্গে ছিল আমার এক দাসী। আমার সঙ্গী আফিফুদ্দিন আত তুজারির জন্য প্রস্তুত করা হয় অপেক্ষাকৃত ছোট একটি গাড়ি। আর অন্য সকল সঙ্গীদের জন্য নেওয়া হয় বড় একটি গাড়ি। যা তিনটি উট মিলে টেনে নিয়ে যায়। চালক আরোহণ করে তন্মধ্য হতে একটি উটের পিঠে।

গভর্নর তুলুকতুমুর, তার ভাই ইসা এবং তার দুই পুত্র কাতলুদমুর ও সারুর বেকের সঙ্গে আমরা সফর করতে থাকি। গভর্নরের ইমাম সাদুদ্দিন, তার খতিব আবু বকর, বিচারক শামসুদ্দিন, ফকিহ শারফুদ্দিন মুসা এবং ঘোষক আলাউদ্দিনও এই যাত্রায় সঙ্গী হয়েছিলেন। ঘোষক আলাউদ্দিনের কাজ হচ্ছে তিনি গভর্নরের প্রতিটি সভার সময়ে তার সম্মুখে আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর যখন বিচারক, ফকিহ অথবা কোনো উপদেষ্টা আগমন করেন, তখন এই ঘোষক দাঁড়িয়ে উঁচু আওয়াজে তাদের নাম নিয়ে আগমনের ঘোষণা দেন। এর ফলে ভেতরে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা সচেতন হয়ে বসে এবং আগত ব্যক্তির জন্য জায়গা করে দেয়।

হেজাজের মরুময় পথে হাজিদের কাফেলা যে নিয়মে সফর করে থাকে, তুর্কিরাও এই মরুভূমিতে ঠিক সেই নিয়মেই সফর করে। ফজরের নামাযের পর তারা যাত্রা শুরু করে পূর্বাহ্নের সময় বিশ্রাম নেয়। অতঃপর দুপুরের পর পুনরায় যাত্রা শুরু করে রাত্রিকালে যাত্রাবিরতি গ্রহণ করে। মালগাড়ি থেকে কোনো ঘোড়া, উট অথবা ভেড়া ছুটে গেলে তারা রাত হোক বা দিন, সেগুলোকে উন্মুক্তভাবে বিচরণের সুযোগ দেয়। সুলতান অথবা অন্য কেউই সেগুলোকে ঘাস খেতে দেয় না। কারণ, এই মরুভূমির বিশেষত্ব হচ্ছে এখানকার উদ্ভিদগুলো বাহনজন্তুর জন্য যবের মতো খাদ্যের কাজ করে। অন্য কোনো অঞ্চলে এমনটি দেখা যায় না। এজন্যই এখানে অনেক পশু চোখে পড়ে। কোনো রাখাল অথবা প্রহরী ছাড়াই পশুপাল অবাধে বিচরণ করে বেড়ায়। এই অঞ্চলের লোকেরা চুরির ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর হওয়ায় পশু চুরি যাওয়ার ব্যাপারে কোনো ভয় নেই। এখানকার নিয়ম হচ্ছে, কারো কাছে যদি একটি চুরির ঘোড়া পাওয়া যায়, তাহলে সেই চোরকে অনুরূপ আরো নয়টি ঘোড়া দিতে বাধ্য করা হয়। সে যদি তা দিতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার সন্তানদেরকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। আর যদি সেই চোরের কোনো সন্তানও না থাকে, তাহলে তাকে ভেড়ার মতো করে জবাই করে ফেলা হয়।

এই তুর্কিরা রুটি এবং ভারি কোনো খাবার ভক্ষণ করেন না। বাজরার মতো দেখতে দুগি নামক এক প্রকার শস্যের মাধ্যমে তারা একধরনের খাবার তৈরি করে। চুলোয় উপর একটি পাত্রে পানি রেখে জ্বাল দেওয়া হয়। সেই পানি উত্তপ্ত হয়ে গেলে এর ভেতরে কিছু দুগি ঢেলে দিয়ে সেই খাবার প্রস্তুত করা হয়। আর যদি তাদের কাছে গোশত থাকে, তারা সেই গোশতকে ছোট ছোট টুকরো করে রান্না করে। অতঃপর প্রত্যেককে একটি পাত্রে করে তাদের অংশ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এর উপর দোহনকৃত দুধ ঢেলে তারা পান করে নেয়। কখনো কখনো তারা এটিকে সিরকার মাধ্যমে ভিজিয়েও পান করে। এই খাবার তাদের কাছে কিমিজ নামে পরিচিত। তারা বেশ শক্তিশালী, সুঠাম-সবল এবং খোশমেজাজের অধিকারী। মাঝে মাঝে তারা বুরখানি নামক একধরনের খাবার তৈরি করে। আটার খামিরাকে ছোট ছোট টুকরো করে এর মাঝে ছিদ্র করে একটি পাতিলায় রেখে রান্না করা হয়। রান্না শেষ হয়ে গেলে এর ভেতরে দোহনকৃত দুধ ঢেলে পান করা হয়। দুগির দানার মাধ্যমে তারা একধরনের পানীয়ও প্রস্তুত করে থাকে। কিন্তু মিষ্টান্ন ভক্ষণ করাকে তারা দূষণীয় মনে করে।

রমাযান মাসে আমি একবার সুলতান উজবেক খানের কাছে হাজির হই। সেখানে ঘোড়ার গোশত পরিবেশন করা হয়। তারা সবচেয়ে বেশি ঘোড়ার গোশতই ভক্ষণ করে। আরো পরিবেশন করা হয় ভেড়ার গোশত। যা ম্যাকারনির সঙ্গে রান্না করে দুধ সহযোগে পান করা হয়। সেই রাতে আমি সুলতান উজবেক খানের কাছে মিষ্টান্নের একটি পাত্র এনে রাখি। আমার এক সঙ্গী এগুলো প্রস্তুত করেছে। সুলতান তখন শুধুমাত্র তার একটি আঙুল মিষ্টান্নের মাঝে ডুবিয়ে তার মুখে নেন। এর বেশি কিছু করেননি। গভর্নর তুলুকতুমুর আমাকে বলেন, সুলতানের এক বৃদ্ধ দাস ছিল। তার সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনি মিলিয়ে প্রায় চল্লিশজনের মতো বংশধর। একবার সুলতান তাকে বলেন, তুমি মিষ্টান্ন ভক্ষণ করো। তাহলে আমি তোমার পুরো পরিবারকে মুক্ত করে দেব। কিন্তু সেই বৃদ্ধ দাস অপারগতা প্রদর্শন করে বলে, আপনি যদি আমাকে হত্যাও করে ফেলেন, তবুও আমি তা খেতে পারব না।

ক্রিমিয়া শহর থেকে বেরিয়ে আমরা সাজাফ নামক স্থানে গভর্নর তুলুকতুমুরের নির্মিত খানকায় অবস্থান করেছিলাম। তখন গভর্নর আমাকে তার কাছে যাওয়ার জন্য সংবাদ পাঠান। আমি ঘোড়ায় চড়ে তার কাছে চলে যাই। আমার আরোহণের জন্য পৃথক একটি ঘোড়াও রাখা ছিল। মালগাড়ির চালক সেটি ব্যবহার করত। প্রয়োজনের সময়ে আমি সেটি ব্যবহার করতাম। গভর্নরের কাছে এসে দেখি অনেক খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। তার মধ্যে রুটিও আছে। অতঃপর ছোট ছোট পাত্র করে একধরনের সাদা পানীয় হাজির করা হয়। সবাই তা পান করে। তখন গভর্নরের পাশে বসেছিলেন শায়খ মুজাফফরুদ্দিন। আর আমি বসেছিলাম তারই পাশে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, এটি কী জিনিস? তিনি বলেন, এটি দুহুনের পানীয়। আমি তার কথা বুঝতে পারিনি। অতঃপর এটি পান করতে গিয়ে টক স্বাদ অনুভূত হলে আমি পান না করেই রেখে দেই। সেখান থেকে বের হওয়ার পর শায়খকে পুনরায় এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এটি দুগির দানার মাধ্যমে তৈরিকৃত পানীয়। তারা হানাফি মাযহাবের অনুসরণ করেন। এই পানীয় তাদের কাছে হালাল। দুগির মাধ্যমে তৈরিকৃত এই পানীয় তাদের কাছে বুজা নামে পরিচিত। শায়খ আমাকে তখন বলেছিলেন, এটি দুখুনের পানীয়। কিন্তু তার ভুল উচ্চারণের কাছে আমি ভেবেছি, তিনি দুহুনের পানীয় বলেছেন।

ক্রিমিয়া শহর থেকে বেরিয়ে আঠারো মনজিল অতিক্রম করার পর আমরা বিপুল জলাবদ্ধ একটি জায়গায় এসে উপনীত হই। পুরো একদিন লেগে যায় সেই জলাভূমি অতিক্রম করতে। অনেক ঘোড়া অথবা গাড়ি একত্র হয়ে পানির নিচের মাটি পিচ্ছিল হয়ে সামনে চলা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন গভর্নর তার এক খাদেমকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে অগ্রে পাঠিয়ে দেন। তিনি আমার জন্য আজাক শহরের গভর্নরের কাছে একটি চিঠিও লিখে দেন। চিঠিতে তাকে সুলতান উজবেক খানের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের আগ্রহের কথা জানান এবং তাকে আমার সম্মান-খাতিরের জন্য উৎসাহিত করেন। অতঃপর আমরা তাদেরকে রেখে এগিয়ে যেতে থাকি। পথিমধ্যে আরেকটি জলাভূমিতে উপনীত হই। সেটি অতিক্রম করতে অর্ধদিন লেগে যায়।

আরো তিনদিন সফর করার পর আমরা আজাক[১] শহরে এসে পৌঁছাই। এটি সমুদ্র উপকূলবর্তী বেশ দৃষ্টিনন্দন শহর। জেনোয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের বণিকরা এখানে বাণিজ্যের জন্য আসে। প্রসিদ্ধ যুবক সর্দার বিচাকচি এখানেই থাকেন। আগত অতিথিদের জন্য তিনি উদারহস্তে মেহমানদারির আয়োজন করেন। এই শহরের গভর্নরের নাম মুহাম্মাদ খাজা আল খাওয়ারিজমি। ক্রিমিয়ার গভর্নর তুলুকতুমুরের চিঠি তার কাছে পৌঁছানোর পর তিনি শহরের বিচারক ও অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য বের হন। সঙ্গে করে খাবারও নিয়ে আসেন। আমরা তাকে সালাম জানাই। অতঃপর একটি স্থানে নেমে খাবার সেরে নিই। এরপর আমরা শহরের দিকে এগিয়ে যাই। শহরের উপকণ্ঠে একটি গোরস্থানের পাশে অবস্থিত আশ্রমে আমরা অবস্থান নিই। এটিকেই খিজির ও ইলিয়াস আলাইহিমাস সালামের ইবাদতের স্থান হিসেবে ধারণা করা হয়। অতঃপর এখানকার অধিবাসী শায়খ রজব আন নাহার আল মালাকি আমাদেরকে তার খানকায় নিয়ে গিয়ে আমাদের জন্য চমৎকার আতিথেয়তার আয়োজন করেন। আমাদের আগমনের আরো দুদিন পর গভর্নর তুলুকতুমুর আজাকে আগমন করেন। এখানকার গভর্নর মুহাম্মাদ বিচারক ও অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে তাকে স্বাগত জানান এবং তার জন্য আতিথেয়তার আয়োজন করেন। তার জন্য পরস্পর সংযুক্ত তিনটি তাঁবু খাটানো হয়। একটি ছিল চমৎকার বাহারি রেশমি কাপড়ের তাঁবু। অন্য দুটি ছিল কাতান কাপড়ের। তাঁবুগুলোর বাইরে প্রশস্ত চত্বর রেখে চারদিক থেকে কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। তা দেখতে অনেকটা দুর্গের মতো ছিল। গভর্নর তুলুকতুমুর অবতরণ করার পর

---

[১] বর্তমান নাম আজুভ।–অনুবাদক

তার সম্মুখে রেশমি কাপড়ের গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হয়। এর উপর দিয়ে হাঁটার জন্য। তখন এই মহান ব্যক্তি উদারতা দেখিয়ে আমাকে তার আগে বাড়িয়ে দেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি আজাকের গভর্নরকে বুঝিয়ে দেন যে, তিনি আমাকে কতটা সম্মান করেন।

অতঃপর আমরা প্রথম তাঁবুতে চলে যাই। এটি প্রস্তুত করা হয়েছে তুলুকতুমুরের বসার জায়গা হিসেবে। তাঁবুর মাঝবরাবর তার বসার জন্য রাখা হয়েছে কাঠের তৈরি বড় একটি সোফা চেয়ার রাখা হয়েছে। চেয়ারের উপর রাখা হয়েছে সুন্দর একটি কুশন। গভর্নর তুলুকতুমুর আমাকে ও শায়খ মুজাফফরুদ্দিনকে আগে আগে হাঁটতে বলেন। অতঃপর তিনি এলে আমরা একসঙ্গে সেই চেয়ারে উপবেশন করি। তার বিচারক ও খতিব এবং আজাকের বিচারক ও তার অনুচরগণ বসেন চেয়ারের ডানপাশে বিছানো আরামদায়ক বিছানার উপর। আর তুলুকতুমুরের দুই সন্তান, তার ভাই এবং আমির মুহাম্মাদ ও তার সন্তানরা আমাদের সেবায় নিয়োজিত হন। অতঃপর খাবার পরিবেশন করা হয়। সেখানে ছিল ঘোড়ার গোশত ও আরো অনেক পদের খাবার। ঘোড়ার দুধ ও বুজা নামক পানীয়ও পরিবেশন করা হয়েছিল। আহারপর্ব শেষে কারীগণ অত্যন্ত সুললিত স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করেন। অতঃপর একটি মিম্বার বসানো হয়। একজন আলোচক তাতে আরোহণ করেন এবং চমৎকার বক্তব্য প্রদান করে সুলতান ও উপস্থিত দুই গভর্নরের জন্য দোয়া করেন। কারীগণ তখন তার সামনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আরবি ভাষায় মূল বক্তব্য পেশ করে তুর্কি ভাষায় এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এর মাঝেমাঝে কারীগণ বেশ চমৎকার ছন্দে কুরআনের কিছু পুনরাবৃত্তি করে তেলাওয়াত করেছেন। অতঃপর আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষায় সঙ্গীতের আয়োজন হয়। এই আয়োজনের পর পুনরায় খাবার পরিবেশন করা হয়। এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে সময় কেটে যায়। আমি যতবারই বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, গভর্নর তুলুকতুমুর আমাকে নিষেধ করেছেন। এরপর সুলতান, তার দুই পুত্র, তার ভাই এবং শায়খ মুজাফফরুদ্দিন ও আমার জন্য পোশাক নিয়ে আসা হয়। গভর্নরকে উপহারস্বরূপ দেওয়া হয় দশটি ঘোড়া, তার ভাই ও দুই পুত্রকে দেওয়া হয় ছয়টি ঘোড়া এবং তার বিশিষ্ট অনুচরদেরকে দেওয়া হয় একটি করে ঘোড়া। আমাকেও একটি ঘোড়া দেওয়া হয়। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ ঘোড়া পাওয়া যায়। দামেও খুব অল্প। তাদের মুদ্রা অনুযায়ী

সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের ঘোড়ার দাম বেশির থেকে বেশি পঞ্চাশ অথবা ষাট দিরহাম হবে। যা আমাদের মুদ্রা অনুযায়ী হবে এক দিনার সমান হতে পারে। এখানকার ঘোড়াগুলো মিসরে আকাদিশ নামে পরিচিত। এই ঘোড়ার মাধ্যমেই এখানকার লোকেরা জীবিকা নির্বাহ করে। আমাদের অঞ্চলে যেমন প্রচুর ভেড়া পাওয়া যায়। এখানে তার চেয়েও অধিক পরিমাণে ঘোড়া পাওয়া যায়। একেকজন তুর্কির মালিকানায় হাজারেরও বেশি ঘোড়া থাকে।

এখানকার অধিবাসী ঘোড়া পালনকারী তুর্কিদের নিয়ম হচ্ছে, তাদের নারীদের যাতায়াতের জন্য নির্ধারিত মালগাড়ির এককোণে তারা একহাত পরিমাপের চিকন একটি লাঠির মাঝে একবিঘৎ পরিমাণ পশমি কাপড়ের টুকরো বেঁধে রাখে। প্রতি একহাজার ঘোড়ার জন্য তারা এমন এক টুকরো কাপড় বেঁধে দেয়। আমি তাদের কারো কারো কাছে এমন দশ টুকরো কাপড়ও দেখেছি। কারো কাছে দেখেছি এর কম। এই ঘোড়াগুলোকে ভারতবর্ষে বিক্রি করার জন্য নেওয়া হয়। তখন তাদের সঙ্গে প্রায় ছয় হাজারের মতো ঘোড়া থাকে। প্রত্যেক ব্যবসায়ী একশ-দুইশ, অথবা তার কমবেশি পরিমাণ ঘোড়া সঙ্গে করে নিয়ে যায়। প্রতি পঞ্চাশটি উটের জন্য একটি করে রাখাল নিয়োগ দেওয়া হয়। তারা সেগুলোকে ভেড়াল পালের মতো চরিয়ে বেড়ায়। এই অঞ্চলে এদেরকে বলা হয় আল কাশি। তারা রশিবাঁধা লম্বা লাঠি হাতে নিয়ে একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে এই ঘোড়ার পাল নিয়ে চলতে থাকে। কখনো কোনো ঘোড়াকে ধরতে আরোহণকৃত ঘোড়াকে বরাবর নিয়ে গিয়ে সেই ঘোড়ার গলায় রশি নিক্ষেপ করে টেনে আনা হয়। তখন ধরে আনা সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে আগের ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এমন করে সিন্ধু অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছানোর পর তারা এগুলোকে ঘাস খেতে দেয়। কারণ, সিন্ধু অঞ্চলের উদ্ভিদ পশুদের জন্য যবের মতো কাজ করে না। এই যাত্রার সময় অনেক ঘোড়া মারা যায়। চুরিও হয় অনেক। সিন্ধু অঞ্চলের শশংকর নামক স্থানে এসে তাদেরকে প্রতি ঘোড়ার জন্য সাত দিরহাম করে কর দিতে হয়। সিন্ধুর রাজধানী মুলতানে এসেও দিতে হয় একই পরিমাণ কর। ইতিপূর্বে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আসা ঘোড়ার এক চতুর্থাংশ কর হিসেবে দিতে হতো। কিন্তু ভারতবর্ষের সুলতান মুহাম্মাদ এই প্রথা রহিত করেন। তিনি মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের সম্পদের যে যাকাত আর খ্রিস্টান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের মূলধনের এক দশমাংশ গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। এই অংক দেওয়ার পরও ব্যবসায়ীদের

কাছে অনেক লাভ থাকত। কারণ, তারা ভারতবর্ষে এসে সবচেয়ে সস্তা ঘোড়াটি বিক্রি করত এখানকার একশত দিরহামের বিনিময়ে। মাগরিব অঞ্চলের মুদ্রা অনুযায়ী যা পঁচিশ দিনারের সমান। কিছু ঘোড়া বিক্রি করত এর দুইগুণ, তিনগুণ মূল্যে। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ঘোড়ার দাম হতো পাঁচশ দিনার বা তার বেশি। ভারতবর্ষের লোকেরা এই ঘোড়া ক্রয় করত সাধারণ ব্যবহারের জন্য। কোনো যুদ্ধ অথবা ঘোড়দৌড়ের জন্য নয়। যুদ্ধের সময়ে তারা নিজেরা যেমন লৌহবর্ম পরিধান করেন, তেমনি ঘোড়াকেও বর্ম পরানো হয়। তারা ঘোড়ার শক্তিমত্তা এবং দ্রুতগতির প্রতি খুব লক্ষ্য করেন। যুদ্ধ অথবা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় তারা যে ঘোড়া ব্যবহার করেন, সেগুলো ইয়েমেন, ওমান ও পারস্য অঞ্চল থেকে আনা হয়। সেই ঘোড়াগুলোর একেকটি এক হাজার দিনার থেকে শুরু করে চার হাজার দিনার পর্যন্ত মূল্যে বিক্রি হয়।

গভর্নর তুলুকতুমুর আজাক থেকে চলে যাওয়ার পর আমি আরো তিনদিন এখানে অবস্থান করি। এই সময়ের মধ্যে আজাকের গভর্নর মুহাম্মাদ খাজা আমার সফরের পাথেয় প্রস্তুত করে দেন। অতঃপর আমি মাজার শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। এটি তুর্কি অঞ্চলের সুবিশাল ও অনিন্দ্য একটি শহর। বড় একটি নদীর তীরে এই শহরের অবস্থান। অনেক বাগান ও প্রচুর ফলমূলের সমাহার লক্ষ্য করা যায় এখানে। এখানে আমরা বৃদ্ধ বুযুর্গ শায়খ মুহাম্মাদ আল বাতায়িহির খানকায় অবস্থান গ্রহণ করি। তিনি ছিলেন ইরাকের বাতায়িহ তথা প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসী। শায়খ আহমাদ আর রেফায়ি তাকে নিজের খলিফা হিসেবে মনোনীত করেছেন। তার খানকায় আরব, পারস্য, তুর্কি ও রোম অঞ্চলের সত্তরজনের মতো বিবাহিত ও অবিবাহিত অসহায় ব্যক্তি অবস্থান করেন। লোকদের সাহায্য-অনুদানের মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করেন। এখানকার অধিবাসীরা এই অসহায় ব্যক্তিদের প্রতি খুবই ভালো ধারণা রাখেন। প্রতি রাতে তারা খানকায় ঘোড়া, ভেড়া ও দুম্বা নিয়ে আসেন। এমনিভাবে এখানকার সুলতান ও তার স্ত্রীও শায়খের সঙ্গে দেখা করে তার বরকত নেওয়ার জন্য আসেন এবং তাকে অনেক উপহার-উপঢৌকন দিয়ে যান। বিশেষ করে এখানকার নারীগণ দান-সদকা ও কল্যাণকর কাজে পুরুষদের চেয়েও এগিয়ে। মাজার শহরে এসে আমরা জুমার নামায আদায় করি। নামায শেষে বুখারা অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ফকিহ ও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব শায়খ ইজ্জুদ্দিন মিম্বারে আরোহণ করেন।

এখানে তার অনেক শিষ্য উপস্থিত ছিলেন। একদল কারী তার সম্মুখে বসে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি ওয়াজ ও নসিহত করেন। শহরের গভর্নর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন। একপর্যায়ে শায়খ মুহাম্মাদ আল বাতায়িহি দাঁড়িয়ে বলেন, শায়খ ইজ্জুদ্দিন নিজ মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে সফর করতে চাইছেন। আমরা তার পাথেয় প্রস্তুত করে দিতে চাই। এই বলে তিনি তার পরনে থাকা পশমি পোশাক খুলে বলেন, এটি আমার পক্ষ থেকে দিলাম। অতঃপর উপস্থিত ব্যক্তিরাও নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পোশাক, ঘোড়া এবং দিরহাম প্রদান করেন। এভাবে অনেক সম্পদ জমা হয় এবং সেগুলো একত্র করা হয়।

এই শহরের বাজারে এক ইহুদির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সে আমাকে সালাম জানায় এবং আরবি ভাষায় কথা বলে। আমি তাকে তার মাতৃভূমি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। সে জানায়, সে আন্দালুসের অধিবাসী। সেখান থেকে সে সমুদ্রপথে সফর না করে স্থলপথে কনস্টান্টিনোপল, রোম ও জারকাস অঞ্চল অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছেছে। চারমাস আগে সে আন্দালুস থেকে বিদায় নিয়েছে। এই পথে গমনকারী অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরাও তার এই কথা সত্য বলে জানায়। এই অঞ্চলে আমি নারীদের বিস্ময়কর সম্মান প্রত্যক্ষ করেছি। পুরুষদের তুলনায় তারাই এখানে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

ক্রিমিয়া থেকে চলে আসার সময় আমি সালতিয়ার গভর্নরের স্ত্রীকে তার মালগাড়িতে আরোহণরত অবস্থায় দেখতে পাই। তার গাড়ির পুরো ছাউনি ছিল উৎকৃষ্ট রঙিন কাপড়ে ঢাকা। ছাউনির দরজা ও জানালা দুটি খোলা ছিল। তার সঙ্গে ছিল চারজন সুন্দরী ও চমৎকার পোশাক পরিহিতা দাসী। তার এই মালগাড়ির পেছনে ছিল আরো বেশ কয়েকটি মালগাড়ি। যার সবকটিতেই ছিল তার অনুগত দাসীরা। গভর্নরের বাসভবনের কাছাকাছি এসে তিনি মালগাড়ি থেকে জমিনে অবতরণ করে। তার সঙ্গে প্রায় ত্রিশজন দাসী তার কাপড়ের পাড় উঁচু করে হেঁটে যায়। তার পোশাকে অনেকগুলো লেস যুক্ত ছিল। একজন দাসী একটি করে লেস ধরে কাপড়ের পাড়কে মাটি থেকে উঁচুতে তুলে ধরত। এমন আড়ম্বরপূর্ণভাবেই তিনি হেঁটে যান। গভর্নরের কাছে পৌঁছানোর পর তাকে দেখে গভর্নর দাঁড়িয়ে যান। সালাম প্রদান করে তাকে নিজের পাশে নিয়ে বসান। দাসীরা তাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রাখে। অতঃপর মশকে করে কুমিজ নামক পানীয় নিয়ে আসা হয়।

গভর্নরের স্ত্রী তা একটি পাত্রে ঢেলে গভর্নরের সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে তাকে পাত্রটি দেন। গভর্নর তা পান করার পর তার ভাইকেও পান করানো হয়। এরপর গভর্নর তার স্ত্রীকে পান করান। অতঃপর খাবার পরিবেশন করা হয়। গভর্নর ও তার স্ত্রী একসঙ্গে আহার করেন। আহার শেষে গভর্নর তার স্ত্রীকে রাজকীয় পোশাক উপহার দেন। অতঃপর তার স্ত্রী ফিরে যান। গভর্নরের স্ত্রীদের জন্যই ছিল এতসব আয়োজন। সুলতান ও রাজা-বাদশাহদের স্ত্রীদের বিবরণ সামনে উল্লেখ করব।

ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকদের স্ত্রীরাও কম ছিল না। তারা ঘোড়াচালিত মালগাড়িতে করে সফর করত। প্রত্যেকের সঙ্গে থাকত তিন থেকে চারজন দাসী। যারা তাদের কাপড় মাটি থেকে উঁচু করে রাখত। তাদের মাথায় থাকত বুগতাক নামক মুক্তোখচিত টুপি। যেটির উপরে ময়ূরের পালক দিয়ে সজ্জিত করা হতো। তাদের ছাউনির জানালা দুটি থাকত খোলা। এর ভেতরে চেহারা খুলে রেখেই তারা বসে থাকত। কারণ, তুর্কি অঞ্চলের নারীরা পর্দা করে না। তাদের ক্রীতদাসরা ভেড়া-বকরি এবং দুধ নিয়ে তাদের পেছনে পেছনে আসত। এগুলো তারা সুগন্ধি ও প্রসাধনীর বিনিময়ে বিক্রি করবে। মাঝে মাঝে কোনো নারীর সঙ্গে তার স্বামীও থাকেন। তাকে দেখে মনে হয় সেই নারীর কোনো খাদেম। তার গায়ে থাকে ভেড়ার পশম দিয়ে তৈরি সাধারণ পোশাক। আর মাথায় থাকে সাধারণ একটি টুপি। যা স্থানীয় ভাষায় আল কালা নামে পরিচিত।

মাজার শহর থেকে প্রয়োজনীয় পাথেয় প্রস্তুত করে আমরা সুলতানের ঘাঁটির উদ্দেশে যাত্রা করি। মাজার থেকে চার দিনের দূরত্বে বিশদাগ নামক স্থানে সুলতান এই ঘাঁটি বসিয়েছেন। তাদের ভাষায় বিশ (بش) শব্দের অর্থ হচ্ছে পাঁচ আর দাগ (داغ) শব্দের অর্থ হচ্ছে পাহাড়। এখানে পরস্পর সংলগ্ন পাঁচটি পাহাড় থাকার কারণে এই নাম দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচ পাহাড়ে গরম পানির ঝরনা রয়েছে। এখানে এসে তুর্কিরা গোসল করে। তাদের বিশ্বাস, যারা এই পানিতে গোসল করবে তারা কোনো রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে না। আমরা এই ঘাঁটির উদ্দেশে যাত্রা করে পয়লা রমযানে সেখানে পৌঁছাই। গিয়ে দেখি এখান থেকে ঘাঁটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই আমরা যেখানে থেকে রওনা করেছিলাম, পুনরায় সেখানে ফিরে আসি। কারণ, এর কাছাকাছিই সুলতান নতুন করে ঘাঁটি বসাবেন বলে জানতে পেরেছি। আমি সেখানে একটি পাহাড়ি টিলায় তাঁবু স্থাপন করি। তাঁবুর সম্মুখে গেড়ে দিই পতাকাবাহী একটি লাঠি। আর আমার ঘোড়া ও মালগাড়ি

রাখি এর পেছনে। অতঃপর সুলতানের ঘাঁটির আগমন ঘটে। আমি বিশাল একটি ভ্রাম্যমাণ শহরের সাক্ষী হই। যেখানে মসজিদ থেকে শুরু করে বাজার-ঘাট সবই আছে। চলমান অবস্থাতেই তাদের রান্না-বান্নার আয়োজন চলছে। রান্নাঘরগুলো থেকে ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে আকাশে। মালগাড়িগুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার পাল। নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছানোর পর মালগাড়ির উপর থাকা ছাউনিগুলোকে নামিয়ে তারা মাটির বুকে স্থাপন করে। সেগুলো ওজনে খুবই হালকা। এমনিভাবে তারা মসজিদ এবং দোকানপাটও স্থাপন করে। সুলতানের স্ত্রীগণ আমাদের অতিক্রম করে যান। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ছিল আলাদা আলাদা অনুসারী দল। তার চতুর্থ স্ত্রী যাওয়ার সময় টিলার উঁচুতে আমার তাঁবু ও সামনে গেড়ে রাখা পতাকা লক্ষ্য করেন। তিনি আমির ইসা বেকের কন্যা। তার বিবরণ সামনে উল্লেখ করব। আমাদের তাঁবু ও পতাকা দেখতে পেয়ে তিনি কিছু দাস ও দাসী প্রেরণ করেন। তারা এসে আমাকে সালাম জানায় এবং সুলতানার সালাম পৌছে দেয়। সুলতানা তখন অদূরে অপেক্ষা করছিলেন। আমি আমার সঙ্গী ও গভর্নর তুলুকতুমুরের ঘোষককে সঙ্গে দিয়ে তার জন্য কিছু উপহার প্রেরণ করি। তিনি বরকতস্বরূপ তা গ্রহণ করেন। অতঃপর বলেন আমি যেন তার মহল্লা বা অবস্থানস্থলের পাশে অবস্থান করি। এই বলে তিনি ফিরে যান। অতঃপর আসেন সুলতান। তিনি এসে তার জন্য স্থাপিত পৃথক মহল্লায় অবস্থান গ্রহণ করেন।

মহান সুলতান মুহাম্মাদ উজবেক খানের বিবরণ

মূলত তার নাম মুহাম্মাদ উজবেক। তাদের ভাষায় খান অর্থ হচ্ছে সুলতান। এই সুলতান বিশাল রাজত্বের অধিকারী, অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং প্রবল ক্ষমতাধর। সুবিশাল কনস্টান্টিনোপল সাম্রাজ্যের কাফের শত্রুরা তার ভয়ে থরথর করে কাঁপে। তাদের সঙ্গে তিনি অনেক জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার রাজত্ব সুবিশাল। শহরগুলোও বেশ বড় বড়। কাফফা, ক্রিমিয়া, মাজার, আজাক, সুরদাক, খাওয়ারিজম প্রভৃতি শহর তন্মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য। তার রাজধানীর নাম সারায়। তিনি মুসলিম বিশ্বের প্রবল প্রতাপশালী সাতজন সুলতানের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মাগরিব অঞ্চলের মহামান্য আমিরুল মুমিনীন, জমিনের বুকে আল্লাহ তাআলার ছায়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী দলের নেতা আবু আন্নান ফারিস আল মুররিনি থাকবেন তাদের সবার আগে। আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করুন। এই তালিকায় আরো আছেন

মিসর ও শামের সুলতান, ইরাকের সুলতান, এই সুলতান মুহাম্মাদ উজবেক, তুর্কিস্তান ও মাওরাউন্নাহার অঞ্চলের সুলতান, ভারতবর্ষের সুলতান এবং চীনের সুলতান। সফরকালে সুলতান মুহাম্মাদ উজবেকের জন্য পৃথক একটি মহল্লা নির্ধারিত থাকে। সঙ্গে থাকে তার সেবক, দাস-দাসী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এমনিভাবে তার প্রতিজন স্ত্রীর জন্যও পৃথক পৃথক মহল্লা থাকে। কোনো স্ত্রীর কাছে অবস্থান করতে চাইলে আগে তার কাছে সংবাদ পাঠিয়ে এ ব্যাপারে অবগত করেন। তখন সেই স্ত্রী যথাযথ সাজগোজ করে প্রস্তুতি নেন। অবস্থান, সফর এবং শাসনকার্যের যাবতীয় বিষয়ে তিনি চমৎকার গোছালো ও সুবিন্যস্ত নিয়ম মেনে চলেন। প্রতি শুক্রবার জুমার নামাযের পর তিনি অত্যন্ত মনোরমও সুসজ্জিত একটি ছাউনিতে বসেন। এটিকে তারা বলে থাকে স্বর্ণের ছাউনি। এর মাঝবরারবর রাখা হয়েছে স্বর্ণ ও রূপার কারুকার্যযুক্ত কাঠের তৈরি একটি আসন। যার পায়াগুলো তৈরি নিরেট রূপা দিয়ে। সুলতান এসে এই আসনে উপবেশন করেন। তার ডানপাশে বসেন তার স্ত্রী খাতুন তাইতুগলি। তার পাশে বসেন দ্বিতীয় স্ত্রী খাতুন কাবাক। বামপাশে বসেন তৃতীয় স্ত্রী খাতুন বাইলুন এবং তার পাশে বসেন চতুর্থ স্ত্রী খাতুন উরদুজা। আসনের নিম্নদেশে ডানপাশে দাঁড়ান সুলতানপুত্র তিনি বেক আর বামপাশে দাঁড়ান অপর পুত্র জানি বেক। তার সম্মুখে বসেন কন্যা ইত কুজুক। তার স্ত্রীগণ একেক করে আসার সময় তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাদের হাতে ধরে আসনে এসে বসান। খাতুন তাইতুগলি সুলতানের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী। তাকেই সুলতানা হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি যখন আগমন করেন সুলতান উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সালাম জানান। অতঃপর তাকে হাতে ধরে আসনের কাছে নিয়ে আসেন। তিনি বসার পর সুলতান বসেন। এর সব কিছুই ঘটে প্রকাশ্যে, মানুষের সম্মুখে।

অতঃপর সেখানে বিশিষ্ট মন্ত্রী-আমলাদের আগমন ঘটে। তাদের জন্য ডানে-বামে চেয়ার বিছানো হয়। সুলতানের কাছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই একজন করে গোলাম থাকে। যে চেয়ার বহন করে নিয়ে আসে। সুলতানের সহোদর ভাই, চাচাতো ভাই ও নিকটাত্মীয়দের সন্তানরা সুলতানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের মুখোমুখি অবস্থানে ছাউনির দরজা বরাবর দাঁড়ায় বিশিষ্ট মন্ত্রী-আমলাদের সন্তানরা। তাদের পেছনে ডানে-বামে দাঁড়ায় নেতৃস্থানীয় সৈনিকরা। অতঃপর সাধারণ মানুষদের মধ্য হতে যারা মান্যগণ্য আছেন, তারা তিনজন তিনজন করে প্রবেশ করে সুলতানকে সালাম জানান।

অতঃপর ফিরে এসে ছাউনি থেকে কিছুটা দূরে বসেন। আসর নামাযের পর প্রথমে সুলতানা প্রস্থান গ্রহণ করেন। সুলতানও পেছনে পেছনে তার মহল্লায় যান। অতঃপর অন্য স্ত্রীগণও একেক করে তাদের মালগাড়িতে চড়ে নিজ নিজ মহল্লায় ফিরে যান। এ সময় তাদের সবার সঙ্গেই থাকে অশ্বারোহিনী পঞ্চাশজন করে দাসী। তাদের সম্মুখে থাকে অশ্বারোহিনী আরো বিশজন বৃদ্ধা নারী। এমনিভাবে তাদের যাত্রার সামনে ও পেছনে আরো প্রায় দুইশ অশ্বারোহী ও পদাতিক বালক ও যুবক বয়সের ক্রীতদাসের বহর থাকে। তাদের হাতে থাকে লাঠি আর কোমরে ঝুলানো থাকে তরবারি। সুলতানের প্রত্যেক স্ত্রীর আগমন ও প্রস্থানের সময় এমনই মহা আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। আমি সুলতানের পুত্র জানি বেকের মহল্লায় তার পাশেই অবস্থান গ্রহণ করি। সামনে তার কথা আলোচিত হবে। এখানে পৌঁছানোর দ্বিতীয় দিন আসর নামাযের পর আমি সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। বিশিষ্ট আলেম, বুযুর্গ শায়খ, বিচারক, ফকিহ ও সাধারণ লোক মিলিয়ে অনেক লোকের জমায়েত হয়েছিল তখন। তিনি বিশাল খাবারের আয়োজনও করেছিলেন। আমরা তার সম্মুখে ইফতার করি। সেখানে সম্মানিত শায়খ ইবনে আবদুল হামিদ এবং বিচারক শায়খ হামযা আমার বেশ প্রশংসা করেন। সুলতানকে উৎসাহিত করেন আমার যত্ন ও খাতিরদারির জন্য। এই অঞ্চলের তুর্কিরা আগত মুসাফিরদের আতিথেয়তা ও তাদের খরচের ব্যবস্থা করার রীতির সঙ্গে পরিচিত নয়। আগত অতিথির খাবারের জন্য বকরি-ঘোড়া এবং কিমিজ পানীয় প্রেরণ করাকেই তার আতিথেয়তা মনে করে। এটিই তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এর কিছুদিন পর আমি সুলতানের সঙ্গে আসরের নামায আদায় করি। ফিরে আসার সময় তিনি আমাকে বসতে বলেন। আমার জন্য নিয়ে আসা ভেড়া ও ঘোড়ার গোশতের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত খাবার এবং দুগির দানার পানীয়। সেই রাতেই আমি সুলতানের কাছে মিষ্টান্ন নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি সেই মিষ্টান্নের পাত্রে সামান্য একটু আঙুল ডুবিয়ে তার মুখে দিয়েছিলেন শুধু। এরপর আর আগ্রহ দেখাননি।

সুলতানের স্ত্রীগণ ও তাদের আয়োজন

তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভবন অথবা তাঁবু থেকে নিজস্ব মালগাড়িতে চড়ে যাতায়াত করেন। তাদের বাসভবনে থাকে স্বর্ণ ও রূপার কারুকার্যখচিত কাঠের তৈরি ছাউনি। তাদের মালগাড়ি টেনে নেওয়া ঘোড়াগুলোকে

স্বর্ণখচিত রেশমি কাপড় পরানো হয়। একটি ঘোড়ার উপরে বসে যে যুবক গাড়ি পরিচালনা করে, তাকে বলা হয় আল কাশি। সুলতানের স্ত্রী তার গাড়িতে বসার পর তার ডানপাশে থাকেন একজন বৃদ্ধা মহিলা। তাকে বলা হয় উলু খাতুন। উলু শব্দের অর্থ হচ্ছে পরামর্শক বা উপদেষ্টা। বামপাশে থাকেন আরেকজন বৃদ্ধা মহিলা। তাকে বলা হয় কুজুক খাতুন। কুজুক শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রহরী বা দেহরক্ষী। তার সম্মুখে থাকে অতি রূপবতী ও গুণবতী ছয়জন অল্পবয়স্কা দাসী। তাদেরকে বলা হয় আল বানাত। তার পেছনে থাকে এমন আরো দুইটি দাসী। সুলতানের স্ত্রী তাদের উপর হেলান দিয়ে থাকেন। তার মাথায় থাকে বুগতাক নামক মণি-মুক্তা খচিত ছোট্ট মুকুট। এর উপরিভাগ ময়ূরের পালক দিয়ে সজ্জিত করা হয়। তাদের পরনে থাকে মণি-মুক্তো খচিত বহুমূল্যের রেশমি পোশাক। উপদেষ্টা ও প্রহরী নারীদ্বয়ের মাথায় থাকে স্বর্ণ ও মণি-মুক্তার পাড়যুক্ত রেশমি কাপড়ের ওড়না। আর প্রত্যেক দাসীর মাথায় থাকে আল কুলা নামক বিশেষ একধরনের টুপি। এই টুপির উপরিভাগে থাকে একটি মুক্তোসজ্জিত স্বর্ণের গোলাকার বৃত্ত। এর উপরে ছিল ময়ূরের পালক। প্রত্যেকের পরনেই ছিল নাখ নামক স্বর্ণখচিত রেশমি কাপড়। সুলতানের স্ত্রীদের গাড়ির সম্মুখে থাকত দশ অথবা পনেরোজন গ্রিক অথবা ভারতবর্ষের দাস। তাদের পরনেও থাকত স্বর্ণখচিত ও মুক্তোসজ্জিত রেশমি পোশাক। প্রত্যেকের হাতেই থাকত একটি স্বর্ণ, রূপা অথবা উভয়টির মিশ্রণে তৈরিকৃত লাঠি। তাদের মালগাড়ির পেছনে থাকত আরো একশটির মতো মালগাড়ি। প্রতিটি গাড়িতেই থাকতো তিন থেকে চারজন করে বৃদ্ধা অথবা যুবতী দাসী। তাদের পরনে থাকত রেশমি পোশাক। মাথায় থাকত আল কুলা টুপি। প্রায় একশ গাড়ির এই বহরের পেছনে থাকতো আরো তিনশটির মতো উট ও ভেড়ার মাধ্যমে টানা মালগাড়ি। সেগুলোতে করে স্ত্রীদের সম্পদ, কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র এবং খাদ্যসামগ্রী বহন করা হতো। প্রতিটি গাড়ির সঙ্গে একজন করে দায়িত্বশীল বিবাহিত গোলাম। যাদের বিবাহ হয়েছে পূর্বোল্লিখিত দাসীদের সঙ্গে। তাদের নিয়ম হচ্ছে, দাসীদের মাঝে কেবল ঐ দাস বা গোলামই প্রবেশ করতে পারবে, যার সঙ্গে এখানকার কোনো দাসীর বিবাহ হয়েছে। সুলতানের প্রত্যেক স্ত্রীর ক্ষেত্রেই দেখা যেত এই বিপুল আয়োজন। পৃথক পৃথকভাবেও তাদের কথা আলোচনা করব।

প্রধান স্ত্রী বা সুলতানার বিবরণ

তার নাম খাতুন তাইতুগলি। তিনিই সুলতানের সুলতানা বা রানি হিসেবে বিবেচিত। সুলতানের দুই পুত্র জানি বেক ও তিনি বেক তারই গর্ভে জন্ম লাভ করেছে। তাদের আলোচনা সামনে আসবে। তবে সুলতানের মেয়ে ইত কুজুকের জন্ম হয়েছে পূর্বের সুলতানার গর্ভ থেকে। খাতুন তাইতুগলি সুলতান মুহাম্মাদ উজবেকের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী। অধিকাংশ রাতে তিনি তার কাছেই অবস্থান করেন। সুলতান তাকে সম্মান করার কারণে সাম্রাজ্যের জনগণও তাকে অনেক সম্মান করে থাকে। নয়তো তিনি এত সম্মানে যোগ্য হতেন না। সুলতানের স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে কৃপণ। এই সুলতানা সম্পর্কে অবগত নির্ভরযোগ্য এক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন, 'এই স্ত্রীর বিশেষ এক বৈশিষ্ট্যের কারণে সুলতান তাকে এত পছন্দ করেন। তার সঙ্গে সহবাস করার প্রতি রাতেই সুলতানের মনে হয় তিনি কোনো কুমারী মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম করছেন।' অন্য এক ব্যক্তি থেকে শুনেছি, 'তিনি সেই নারীর বংশধর; যার কারণে সুলাইমান আ. তার রাজত্ব হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি পুনরায় রাজত্ব ফিরে পাওয়ার পর এই নারীকে কোনো জনমানবহীন মরুভূমিতে রেখে আসেন। তখন তাকে এই কিফজাক বা ককেশাস মরুভূমিতে এনে রাখা হয়। সে আরো বলেছে, সুলতানের এই স্ত্রীর যোনিপথ একটি আংটির মতো। সুলাইমান আ.-এর ঘটনার সেই নারীর যত বংশধর রয়েছে, তাদের সবার যোনিপথই এমন।' কিফজাক মরুভূমি অথবা অন্য কোনো অঞ্চলে আমি এমন কোনো ব্যক্তি পাইনি, যিনি এই সুলতানাকে ছাড়া এমন গঠনাকৃতির অন্য কোনো নারীর কথা শুনেছেন বা দেখেছেন। তবে চীনের কিছু লোক থেকে শুনেছিলাম, চীনের এক উপজাতির নারীদের গঠনাকৃতি এমন। তবে এমন কোনো নারী আমার মালিকানায় আসেনি। তাই এর সত্যতা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই।

সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরদিন আমি এই সুলতানার কাছে যাই। তিনি তখন দশজন বয়স্কা সেবক মহিলা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তার সম্মুখে ছিল আরো পঞ্চাশজন যুবতী দাসী। যাদেরকে বলা হয় আল বানাত। তাদের সম্মুখে ছিল অনেকগুলো স্বর্ণ ও রূপার পাত্র। যেগুলোতে ছিল চেরীফল। দাসীরা সেই চেরীফল পরিষ্কার করছিল। সুলতানার সম্মুখেও ছিল চেরীফলভর্তি একটি স্বর্ণের খাঞ্চা। তিনি সেগুলো পরিষ্কার করছিলেন। আমরা তাকে সালাম জানাই। আমার সঙ্গীদের মধ্যে কুরআনের কারীও ছিলেন। তারা মিসরীয় ধাঁচে অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিমায় ও

সুললিত স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তারা তখন কুরআন তেলাওয়াত করেন। অতঃপর সুলতানা কুমিজ নামক পানীয় হাজির করার নির্দেশ দেন। কাঠের তৈরি হালকা পাত্রে করে সেই পানীয় নিয়ে আসা হয়। তিনি নিজ হাতে সেখান থেকে একটি পাত্র নিয়ে আমার হাতে উঠিয়ে দেন। এটিকে তাদের নিকট সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর আগে আমি কখনো কুমিজ পান করিনি। কিন্তু এখানে তা গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। দু-এক চুমুক দিয়ে আমার কাছে তা খুব বিস্বাদ মনে হয়। তখন অন্য এক সঙ্গীকে সেটি দিয়ে দিই। সুলতানা আমাকে আমাদের বিভিন্ন সফর সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেন। আমি বিস্তারিত উত্তর জানাই। অতঃপর ফিরে আসি। সুলতান তাকে অনেক পছন্দ করেন বিধায় আমরা প্রথমে তার কাছেই গিয়েছিলাম।

দ্বিতীয় স্ত্রীর বিবরণ

তার নাম কাবাক খাতুন। তুর্কি ভাষার এই শব্দের অর্থ হচ্ছে তুষ বা ভুসি। তিনি আমির নাগাতাইয়ের কন্যা। তার পিতা এখনো জীবিত। তবে গেঁটেবাত রোগে আক্রান্ত। সুলতানার সঙ্গে সাক্ষাতের পরদিন আমরা তাকে দেখেছিলাম। কাবাক খাতুনের গৃহে প্রবেশ করে আমরা দেখতে পাই তিনি একটি আসনে বসে কুরআন শরিফ দেখে দেখে তেলাওয়াত করেছেন। তার সম্মুখে ছিল তখন দশজনের মতো বয়স্কা সেবিকা এবং বিশজনের মতো যুবতী দাসী। তারা বসে বসে কাপড়ে সুচিকর্ম করছিল। আমরা তাকে সালাম জানাই। তিনি আমাদের সালামের জবাব দেন এবং আন্তরিকভাবে আলাপ করেন। আমাদের কারীগণের তেলাওয়াত শুনে তিনি খুবই মুগ্ধ হন। অতঃপর তিনি কুমিজ পানীয় হাজির করার নির্দেশ দেন। সুলতানের আগের স্ত্রীর মতো তিনিও নিজে এগিয়ে এসে আমার হাতে কুমিজের পাত্র তুলে দেন। অতঃপর আমরা তার এখান থেকে ফিরে আসি।

তৃতীয় স্ত্রীর বিবরণ

তার নাম বাইলুন খাতুন। তিনি বৃহত্তর কনস্টান্টিনোপল তথা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাটের কন্যা। তার কাছে গিয়ে দেখি তিনি একটি রূপায় পায়াবিশিষ্ট সুসজ্জিত আসনের উপর বসে আছেন। তার সম্মুখে ছিল তখন রোম, তুর্কি ও নুবিয়া অঞ্চলের প্রায় একশত দাসী। কে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ

বসে আছে। খোঁজা দাসরা ছিল তার পেছনে আর রোমীয় দেহরক্ষী পুরুষরা ছিল তার সম্মুখে। তিনি আমাদের খোঁজখবর নেন। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য এবং মাতৃভূমির দূরত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আমাদের উত্তর শুনে তিনি কান্না চলে আসে। সম্মুখে থাকা রুমাল দিয়ে তিনি তার চেহারা মুছে নেন। নিশ্চয়ই এটি তার কোমল ও দয়ালু মনের পরিচয় বহন করে। অতঃপর তিনি খাবার পরিবেশনের নির্দেশ দিলে আমরা তার সম্মুখেই আহার সেরে নিই। তিনি তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ফেরার সময় তিনি আমাদেরকে বলেন, আপনারা আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন না। পুনরায় এসে আপনাদের প্রয়োজনীয় পাথেয়ের কথা জানাবেন। তিনি আমাদের সঙ্গে এমনই বদান্য আচরণ করেন। ফেরার সময় আমাদের সঙ্গে খাবার, অনেক রুটি, ঘি, ভেড়া, দিরহাম, উৎকৃষ্ট কাপড় এবং উন্নত জাতের তিনটি ও সাধারণ মানের দশটি ঘোড়া পাঠিয়ে দেন। এই মহীয়সী নারীর সঙ্গে আমি কনস্টান্টিনোপল শহরে সফর করেছিলাম। সেই আলোচনা অচিরেই আসবে।

চতুর্থ স্ত্রীর বিবরণ

তার নাম উরদুজা। তাদের ভাষায় উরদু বলা হয় মহল্লা বা ঘাঁটিকে। এমনই এক মহল্লায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার ফলে তার এই নাম রাখা হয়েছে। তিনি আমিরুল উমারা তথা সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় মন্ত্রী ইসা বেকের কন্যা। আমরা তাকে জীবিত অবস্থায় দেখেছিলাম। সুলতানের কন্যা ইত কুজুক ছিলেন তার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। সুলতানের স্ত্রীদের মধ্যে খাতুন উরদুজা ছিলেন সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার এবং কোমল ও দয়ালু মনের অধিকারিণী। তিনিই টিলার উপরে আমার তাঁবু দেখতে পেয়ে আমার নিকট লোক পাঠিয়েছিলেন। যা পূর্বে আলোচনা করেছি। তার কাছে গিয়ে আমরা তার অনুপম সৌন্দর্য এবং উদার চরিত্রের সাক্ষী হই। তিনি আমাদের জন্য খাবার পরিবেশনের নির্দেশ দিলে আমরা তার সম্মুখেই আহার করি। এরপর তিনি কুমিজ পরিবেশন করতে বলেন। আমার সঙ্গীরা তা পান করে। সবশেষে তিনি আমাদের সার্বিক খোঁজখবর নেন। আমরাও তাকে তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করি। এরপর আমরা তার বোন মন্ত্রী আলী বিন আরজাকের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি।

সুলতান উজবেকের কন্যার বিবরণ

তার নাম ইত কুজুক। তার নামের অর্থ হয় ছোট কুকুর। ইত শব্দের অর্থ হচ্ছে কুকুর। আর কুজুক শব্দের অর্থ হচ্ছে ছোট। আগেই বলেছি, আরবদের মতো তুর্কিরাও শুভলক্ষণ গ্রহণের জন্য সন্তানের নামকরণ করে থাকে। আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাই। তিনি পিতার মহল্লা থেকে ছয় মাইল দূরবর্তী পৃথক একটি মহল্লায় অবস্থান করেন। তার এখানে যাওয়ার পর তিনি সেখানকার ফকিহ, বিচারক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ বিন আবদুল হামিদকে উপস্থিত হতে বলেন। এমনিভাবে আরো একদল শায়খ, ফকিহ এবং ছাত্রও সেখানে ছিলেন। তার স্বামী ইসা বেকও এসে উপস্থিত হন। যার কন্যাকে সুলতান বিয়ে করেছেন। তিনি এসে স্ত্রীর সঙ্গে একই বিছানায় বসেন। তিনি তখন গেঁটেবাতের রোগে ভুগছিলেন। তাই তিনি পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারতেন না। ঘোড়ার পিঠেও আরোহণ করতে পারতেন না। মালগাড়ির মাধ্যমে এদিক সেদিক যাতায়াত করতেন। সুলতানের কাছে যেতে চাইলে সেবকরা তাকে বহন করে নিয়ে গাড়িতে উঠাত। সুলতানের দ্বিতীয় স্ত্রী কাবাক খাতুনের পিতা আমির নাগাতাইয়ের ক্ষেত্রেও আমরা একই অবস্থা দেখেছি। এই অঞ্চলের তুর্কিদের মাঝে এই রোগ ব্যাপকহারে ছড়িয়ে ছিল। সুলতান কন্যা ইত কুজুকও ছিলেন উদারমনা ও উত্তম চরিত্রশোভার অধিকারী নারী। তিনি আমাদেরকে অনেক উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

সুলতানের দুই পুত্রের বিবরণ

তারা দুজন সহোদর ভাই। তাদের মা তাইতুগলি খাতুন। দুজনের মধ্যে তিনি বেক জ্যেষ্ঠ। বেক শব্দের অর্থ হচ্ছে আমির বা মন্ত্রী। আর তিন শব্দের অর্থ হচ্ছে দেহ বা শরীর। যেন তার নাম হয়ে গেল দেহের মন্ত্রী। তার ছোট ভাইয়ের নাম জানি বেক। জানি শব্দের অর্থ হচ্ছে রূহ তথা প্রাণ। তাই তার নাম হয়ে গেল প্রাণের মন্ত্রী। তাদের দুজনেরই রয়েছে পৃথক পৃথক মহল্লা। তিনি বেক ছিলেন খুবই সুদর্শন। পৃথিবীতে এমন সুদর্শন ব্যক্তি খুব কমই আছেন। পিতা তাকে পরবর্তী সুলতান হিসেবে মনোনীত করেছেন। সুলতান তাকে খুবই স্নেহ ও সমীহ করতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি অল্পসময় শাসন করতে পেরেছিলেন। অতঃপর তার

সঙ্গে ঘটে যাওয়া কিছু অনৈতিক ঘটনার কারণে তাকে হত্যা করা হয়। পরবর্তী সুলতান হন অপর সন্তান জানি বেক। তিনি ছিলেন তিন বেকের চেয়ে উত্তম। তিনি বেড়ে উঠেছিলেন সাম্রাজ্যের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ শরিফ ইবনে আবদুল হামিদের পরিচর্যায়। আমি যখন এখানে আসি তখন সাইয়েদ বিন আবদুল হামিদ, কাজি হামযা, ইমাম বদরুদ্দিন আল কিওয়ানি এবং ইমাম হুসামুদ্দিন আল বুখারি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আমি যেন জানি বেকের মহল্লায় অবস্থান গ্রহণ করি।

বুলগার শহরের উদ্দেশে আমার সফর

ইতিপূর্বে আমি বুলগার[১] শহরের কথা অনেক শুনেছি। শুনেছিলাম এই শহরে রাত অনেক ছোট হয়। আবার বিপরীত ঋতুর সময়ে দিন অনেক ছোট হয়। এমন তথ্যের বাস্তবতা জানার জন্য আমার এই শহর ঘুরে দেখার ইচ্ছে জাগে। সুলতান মুহাম্মাদ উজবেকের মহল্লা থেকে এই শহরের দূরত্ব দশ দিনের সফর সমান। সুলতানের কাছে আমি আমার সঙ্গে একজন পথপ্রদর্শক প্রেরণের অনুরোধ করলে তিনি একজন ব্যক্তি সঙ্গে দিয়ে দেন। যিনি আমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। বুলগার শহরে যখন পৌঁছাই, তখন রমযান মাস চলে এসেছে। মাগরিব নামায শেষে আমার ইফতার করতে বসি। ইফতারের মাঝেই শুরু হয়ে যায় ইশার আযান। তখন আমরা ইশা, তারাবিহ ও বিতর নামায আদায় করি। এর পরপরই রাতের আঁধার কেটে ভোরের সূর্য উদিত হয়ে যায়। এমনিভাবে পরবর্তী মৌসুমে দিনও এমন ছোট হয় এখানে। এই শহরে আমি তিনদিন অবস্থান করেছিলাম।

অন্ধকারের ভূখণ্ডের বিবরণ

অন্ধকারের ভূখণ্ডে[২] যেতেও ইচ্ছে হয়েছিল আমার। বুলগার শহর থেকে চল্লিশ দিনের পথ পাড়ি দিয়ে এই ভূখণ্ডে পৌঁছানো যায়। কিন্তু এই পথে

---

[১] সোভিয়েত ইউনিয়নের সময়ে এই শহরের নাম ছিল স্ট্যালিনগ্রাদ। বর্তমান নাম ভোলগাগ্রাদ।

[২] এটি পরিচিত Land of darkness নামে। এই অঞ্চলের অবস্থান ঠিক কোথায় এ নিয়ে বিভিন্ন ধারণা রয়েছে। ধারণা করা হয় এটির অবস্থান ককেশাসের দক্ষিণাঞ্চলের আবখাজিয়া রাজ্যে। যেটিকে অনেকেই জর্জিয়া রাষ্ট্রের অংশ মনে করে। এদিকে রাশিয়ার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত উরাল পর্বতমালার উত্তরাঞ্চলের আশপাশের এলাকাকেও Land of darkness হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অঞ্চল নিয়ে প্রাচীন ইংরেজি ও আরবি সাহিত্যে সম্রাট আলেকজেন্ডার দি গ্রেট বা জুলকারনাইনের ঘটনা রয়েছে।–অনুবাদক

যেতে অনেক বেশি পাথেয় ও খরচের প্রয়োজন হয়। বিপরীতে তেমন আয়-উপার্জন হয় না। তাই আমি পরিকল্পনা বাদ দিই। এই পথে সফরের একমাত্র যান হচ্ছে বড় বড় কুকুরের মাধ্যমে টানা মালগাড়ি। এই পথে অনেক তুষারপাত হয়। তাই কোনো মানুষের পা অথবা বাহনজন্তুর খুর এখানে স্থির থাকতে পারে না। কিন্তু কুকুরের পায়ে তীক্ষ্ণ নখ থাকার বরফে তাদের পা স্থির থাকে। যে সকল বড় ব্যবসায়ীদের একশ বা তার বেশি মালগাড়ির বহর থাকে, তারাই কেবল এই পথে সফরের সাহস করে। এই সফরে তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার, পানীয় এবং জ্বালানি মজুদ করে রাখতে হয়। কারণ, তুষারাবৃত এই মরুপথে কোনো উদ্ভিদ, পাথুরে ভূমি অথবা জনপদের দেখা পাওয়া যায় না। এই পথের একমাত্র পথপ্রদর্শক হচ্ছে এই পথে একাধিকবার যাতায়াত করা কুকুরগুলো। এগুলোর একেকটির মূল্য এক হাজার দিনার বা তার অধিক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পথপ্রদর্শক কুকুরের সঙ্গে আরো তিনটি কুকুরের গলায় মালগাড়ি টানার রশি যুক্ত করে দেওয়া হয়। পথপ্রদর্শক কুকুরটি থাকে সবার আগে। অন্য কুকুরগুলো নিজ নিজ মালগাড়িসমেত সেটিকে অনুসরণ করে। প্রথম কুকুরটি কোথাও থেমে গেলে সবকটি কুকুর একযোগে থেমে যায়। পথপ্রদর্শক কুকুরটিকে এর মালিক কখনো প্রহার করে না। এমনকি ধমকিও দেয় না। খাবারের সময় হয়ে গেলে মানুষের আগে কুকুরগুলোকে খাবার দেওয়া হয়। নয়তো কুকুরগুলো রেগেমেগে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে বসে। যার ফলে মালিককে ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়। জনমানবহীন দুর্গম এই পথে চল্লিশদিন অতিবাহিত করার পর অবশেষে সবাই অন্ধকারের ভূখণ্ডে পৌঁছায়। সেখানে নামার পর সবাই নিজ নিজ পণ্য উন্মুক্তভাবে রেখেই একটি স্থান নির্দিষ্ট করে সেখানে তাঁবু খাঁটিয়ে অবস্থান করে। পরদিন তারা বের হয় নিজেদের পণ্যের খোঁজ নিতে। এসে দেখে তাদের রেখে যাওয়া পণ্যের পাশে সাম্মুর, সিনজাব (কাঠবিড়ালী) ও কাকুম[১] প্রভৃতি প্রাণীর চামড়া রেখে দেওয়া হয়েছে। পণ্যের

---

[১] সাম্মুর (Sable) নেউলজাতীয় একপ্রকার প্রাণী। এর পর ইবনে বতুতা সিনজাব শব্দ উল্লেখ করেছেন। সিনজাব শব্দের অর্থ হয় কাঠবিড়ালী। কিন্তু তুষারাবৃত সেই অঞ্চলে কাঠবিড়ালী থাকার কথা না। ইংরেজি অনুবাদে এটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে Minever। এটিও দেখতে নেউলজাতীয় একপ্রকার প্রাণী। আর কাকুম (Ermine) ইঁদুর জাতীয় একপ্রকার প্রাণী। ব্যবসায়ীরা মূলত নিজেদের বহন করা পণ্যের বিনিময়ে এই প্রাণীগুলোর চামড়া সংগ্রহ করতেন। এই প্রাণীর পশমি চামড়া খুবই মোলায়েম। এগুলো দিয়ে শীতের পোশাক ও মাফলার প্রভৃতি তৈরি করা হতো। কাকুম বা এরমাইন দেখতে খুবই সাদা। যেমনটি ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন। সাম্মুর বা স্যাবল দেখতে ধূসর বর্ণের।

মালিক যদি তার পণ্যের পাশে রাখা এই বিনিময়ে সন্তুষ্ট হয়, তবে সেটি গ্রহণ করে। অন্যথায় সেভাবেই রেখে দেয়। তখন স্থানীয় অধিবাসীরা সেই পণ্যের বিনিময়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। আবার কখনো ব্যবসায়ীদের পণ্য রেখে দিয়ে নিজেদের পণ্য নিয়ে চলে যায়। এভাবেই এই অঞ্চলের বেচাকেনা হয়ে থাকে। এখানে গমনকারী বিক্রেতারা জানতেও পারে না, কাদের সঙ্গে তারা এই বেচাকেনা করছে। তারা কি মানুষ নাকি জিন-পরী? কাউকেই তারা দেখতে পায় না। কাকুম হচ্ছে ইঁদুর প্রজাতির সবচেয়ে উন্নত প্রাণী। ভারতবর্ষে এর একটির মূল্য এক হাজার দিনার। আমাদের মাগরিব অঞ্চলের স্বর্ণমুদ্রা অনুযায়ী যা দুইশ পঞ্চাশ দিনারের সমান। এই প্রাণীর গায়ের রঙ খুবই সাদা। দেখতে খুবই ছোট। একবিঘত পরিমাণ হবে। তবে এর লেজ খুব লম্বা। এর চামড়া দিয়ে সরাসরি রুমাল ও তোয়ালে ইত্যাদি তৈরি করা হয়। সাম্মুরের চামড়ার তৈরি রুমাল বা তোয়ালে এর তুলনায় নিম্নমানের। সাম্মুরের চামড়া দিয়ে তৈরি একেকটি রুমালের মূল্য চারশ দিনার পর্যন্ত হতে পারে। এই চামড়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ভেতরে উকুন প্রবেশ করতে পারে না। চীনের আমলা-মন্ত্রী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাদের রুমালের সঙ্গে মিলিয়ে এই চামড়া গলায় পেঁচিয়ে রাখে। এমনিভাবে ইরাক ও পারস্যের ব্যবসায়ীদেরকে এমনভাবে এই চামড়া পরিধান করতে দেখা যায়।

সুলতান মুহাম্মাদ উজবেক আমার সঙ্গে যে ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলেন, আমি তার সঙ্গে বুলগার শহর থেকে ফিরে আসি। এসে দেখি সুলতান পূর্বোল্লিখিত বিশদাগ[১] নামক স্থানে তার মহল্লা স্থাপন করেছেন। সেদিন ছিল রমযানের আটাশ তারিখ। এ বছর আমি এই সুলতানের সঙ্গেই ঈদুল ফিতর উদযাপন করি। ঈদের দিনটি ছিল শুক্রবার।

তাদের ঈদ আয়োজনের বিবরণ

ঈদের দিন সকালে তার বিশাল সেনাবহর নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বের হন। তার প্রত্যেক স্ত্রী নিজ নিজ গাড়িতে করে নিজেদের বহরকে সঙ্গে নিয়ে বের হন।

আর সিনজাব বা মিনিভারের গায়ে সাদা-কালো মিশ্রণ রয়েছে। তবে চেহারা ও আকৃতিগত দিক থেকে তিনটির মাঝেই সাদৃশ্য রয়েছে। পাঠক চাইলে উল্লিখিত ইংরেজি শব্দগুলো গুগলে সার্চ করে প্রাণীগুলোর ছবি দেখে নিতে পারেন।–অনুবাদক

[১] এটির বর্তমান নাম Pyatigorsk। যা রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি শহর। প্রতীয়মান হয়, সুলতান মুহাম্মাদ উজবেকের রাজত্বের অবস্থান ছিল বর্তমান রাশিয়া ও পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলে।–অনুবাদক

সুলতান কন্যা চড়েন ঘোড়ার পিঠে। তার মাথায় ছিল রাজমুকুট। কারণ, প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন রাজ্যের রানি। নিজ মাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি এই মুকুট লাভ করেছেন। সুলতানের দুই পুত্রও বের হয় ঘোড়ার পিঠে চড়ে। প্রত্যেকের সঙ্গেই ছিল নিজস্ব বহর। সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারক কাজি শিহাবুদ্দিন আস সায়িলি একদল ফকিহ ও আলেমকে সঙ্গে নিয়ে ঈদের জামাতে শরিক হওয়ার জন্য। আরো হাজির হয়েছেন কাজি হামযা, ইমাম বদরুদ্দিন আল কিওয়ামি এবং সাইয়েদ শরিফ ইবনে আবদুল হামিদ। ফকিহগণ এসেছেন যুবরাজ তিনি বেকের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে ছিল ঢোল-তবলা ও পতাকা। প্রধান বিচারক শিহাবুদ্দিন ঈদের নামাযে ইমামতি করেন এবং চমৎকার খুতবা প্রদান করেন।

অতঃপর সুলতান তার ঘোড়ায় চড়ে কাঠের তৈরি একটি টাওয়ারের কাছে পৌছান। এগুলোকে তাদের ভাষায় কুশক বলা হয়। সুলতান তার স্ত্রীদেরকে নিয়ে সেখানে গিয়ে বসেন। এর নিচে স্থাপিত করা হয় আরেকটি টাওয়ার। সেটিতে বসেন যুবরাজ তিনি বেক ও সুলতান কন্যা মুকুটের অধিকারিণী ইত কুজুক। এছাড়াও ডানে-বামে আরো দুটি টাওয়ার স্থাপন করা হয়। সেখানে বসে সুলতানের অন্য সন্তান ও তার আপনজনেরা। আমির-উমারা ও রাজপরিবারের সদস্যদের বসার জন্য টাওয়ারের ডানে-বামে বসানো হয় অনেকগুলো চেয়ার। এগুলোকে তাদের ভাষায় বলা হয় সানদালিয়া। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চেয়ার বসে পড়েন। অতঃপর করা হয় তির নিক্ষেপের প্রতিযোগিতার আয়োজন। প্রত্যেক আমির তুমানের হাতে থাকে একটি করে ধনুক। আমির তুমান বলা হয় ঐ সেনাপতিকে, যার অধীনে দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রয়েছে। সেখানে এমন সতেরোজন আমির তুমান উপস্থিত ছিলেন। তাদের অধীনে পরিচালিত হয় এক লক্ষ সত্তর হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী। তবে সুলতানের বাহিনীতে এছাড়াও আরো অনেক সৈন্য রয়েছে। প্রত্যেক আমিরের জন্য স্থাপন করা হয় মিম্বারের মতো একটি আসন। তারা সেটির উপর বসেন। আর তাদের অনুচর সৈনিকরা তাদের সম্মুখে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। বেশ কিছুক্ষণ এই প্রতিযোগিতা চলার পর রাজকীয় পোশাক নিয়ে এসে প্রত্যেক আমিরকে পরিয়ে দেওয়া হয়। এই পোশাক পরিধান করার সময় তাদের প্রত্যেকেই সুলতানের জন্য স্থাপিত টাওয়ারের কাছে একহাঁটু মাটিতে গেড়ে বসে। অপর পা থাকে দণ্ডায়মান। অতঃপর নিয়ে আসা হয় হাওদাসজ্জিত ও লাগাম পরিহিত একটি ঘোড়া।

সেটি তার পা উঁচিয়ে ধরলে আমির এর পায়ে চুমো খান। অতঃপর এই ঘোড়াকে নিয়ে নিজ নিজ চেয়ারের কাছে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে তার অনুগত সৈন্যদের সঙ্গে অবস্থান করেন। এমনি করে প্রত্যেক আমির এই নিয়ম পালন করেন।

অতঃপর সুলতান টাওয়ার থেকে নেমে তার ঘোড়ায় চড়েন। তখন তার ডানদিকে ছিলেন যুবরাজ তিনি বেক। তার সঙ্গে ছিলেন রাজকুমারী ইতকুজুক। বামদিকে ছিলেন অপর পুত্র জানি বেক। সুলতানের চার স্ত্রী ছিলেন তার সম্মুখে। প্রত্যেকেই আরোহণ করেছিলেন নিজ নিজ গাড়িতে। সেগুলোর ছাউনিকে সজ্জিত করা হয়েছে স্বর্ণের কারুকার্যখচিত রেশমি কাপড় দিয়ে। গাড়িকে টেনে নেওয়া ঘোড়াগুলোর গায়েও ছিল এমনই স্বর্ণখচিত রেশমি কাপড়। অতঃপর সকল ছোট-বড় মন্ত্রী-আমলা, রাজপরিবারের সদস্য, উজির, প্রহরী, দেহরক্ষী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নিজ নিজ আসন থেকে নেমে এসে সুলতানের সম্মুখে পায়ে হেঁটে চলতে থাকে। অতঃপর সবাই মিলে উপস্থিত হন বিশাল একটি তাঁবুর কাছে। যেটিকে স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদির কারুকার্যে সজ্জিত করা হয়েছে। দূর থেকে এই তাঁবুকে দেখে পাহাড়ি টিলার মতো মনে হয়। এর ডানে-বামে স্থাপন করা হয়েছে সুতি ও লিলেন কাপড়ের শামিয়ানা। সেগুলোর নিচে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে রেশমি কাপড়ের বিছানা। তাঁবুর মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছে একটি বিশাল সিংহাসন। এটিকে তারা বলে তাখত। স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্যযুক্ত কাঠের এটি তৈরি করা হয়েছে। এর পায়াগুলো নিরেট রূপার। এর উপর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বড় একটি বিছানা। বিশাল এই আসনের উপর স্থাপিত মঞ্চে উপবেশন গ্রহণ করেন সুলতান ও তার প্রধান স্ত্রী। এর ডানদিকে স্থাপন করা হয়েছে আরেকটি মঞ্চ। তার উপর বসেছেন ইত কুজুক ও উরদুজা খাতুন। বামদিকে স্থাপিত মঞ্চে বসেছেন বাইলুন খাতুন ও কাবাক খাতুন। সুলতানের দুই পুত্র বসেছেন মঞ্চের ডানে-বামে স্থাপিত দুটি চেয়ারে। ডানদিকের চেয়ারে বসেছেন তিনি বেক। আর বামদিকের চেয়ারে বসেছেন জানি বেক। এছাড়াও আরো বেশ কিছু চেয়ার স্থাপন করা হয়েছে। সেগুলোতে বসেছেন রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্য ও বিশিষ্ট আমির ও মন্ত্রী-আমলাগণ। সেখানে এক হাজার সৈন্যের দায়িত্বে থাকা আমির হাজারাদের মতো ছোট পর্যায়ের আমিররাও আছেন। অতঃপর স্বর্ণ ও রূপার দস্তরখানে করে খাবার পরিবেশন করা হয়। চার-পাঁচজন পুরুষ মিলে একেকটি দস্তরখান বহন করে

আনে। তাদের খাবারের তালিকায় ছিল ঘোড়া ও ভেড়ার কসানো গোশত। প্রত্যেক আমিরের সম্মুখে একেকটি করে দস্তরখান দেওয়া হয়। অতঃপর বারুজি বা বাবুর্চিদের আগমন ঘটে। তার দায়িত্ব হচ্ছে গোশত টুকরো টুকরো দেওয়া। তার পরনে ছিল রেশমি কাপড়ের ইউনিফর্ম। আর সঙ্গে ছিল অনেকগুলো ছুরি। প্রত্যেক আমিরের জন্য একজন করে বাবুর্চি নির্ধারিত থাকে। দস্তরখান হাজির করার পর বাবুর্চিরা আমিরদের সম্মুখে বসে। অতঃপর স্বর্ণ ও রূপার ছোট পাত্রে করে নিয়ে আসা হয় লবণে ভেজানো পানি। অতঃপর বাবুর্চিরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে হাড্ডিসহকারে গোশতের ছোট ছোট টুকরো করে দেয়। এই অঞ্চলের লোকেরা হাড্ডিবিহীন গোশত খায় না। গোশত খাওয়া শেষ হলে স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে করে নিয়ে আসা হয় মধু দিয়ে তৈরি পানীয়। এখানকার লোকেরা হানাফি মাযহাবের অনুসরণ করে এবং এই পানীয় পানকে বৈধ মনে করে। সুলতান এই পানীয় পান করতে চাইলে তার কন্যা নিজে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে সুলতানের সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে তার হাতে পাত্র তুলে দেন। অতঃপর আরেকটি পাত্র হাতে নিয়ে তুলে দেন সুলতানের প্রধান স্ত্রীর হাতে। এভাবে চার স্ত্রীর হাতেই পানীয়ের পাত্র তুলে দেওয়া হয়। অতঃপর যুবরাজ এগিয়ে এসে আগের মতো করে সুলতান, তার চার স্ত্রী ও বোনের হাতে পানীয়ের পাত্র তুলে দেয়। তারপর ছোট পুত্র জানি বেক এগিয়ে এসে তার ভাইয়ের হাতে পাত্র তুলে দেয়। এরপর বিশিষ্ট আমিরবর্গ ও রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এসে যুবরাজকে সম্মান প্রদর্শন করে।

সাম্রাজ্যের বিচারক, খতিব, শরিফ, ফকিহ ও বিশিষ্ট আলেমদের জন্য মসজিদের পাশে স্থাপন করা হয়েছিল আরেকটি বিরাট তাঁবু। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের সম্মুখেও চার-পাঁচজন বলিষ্ঠ তুর্কি ব্যক্তি মিলে স্বর্ণ ও রূপার একেকটি দস্তরখান নিয়ে আসে। এই দিন সুলতানের সম্মুখে কেবল সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই অবস্থান করতে পারেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন, যেন তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো যাদেরকে খাবার খাওয়াতে চায়, তাদের কাছে খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করে। আমাদের সম্মুখে খাবার আনার পর অনেকে সেখান থেকে আহার করেন। আবার অনেকেই স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে করে খাবার আনায় তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। সেদিন আমি ডানে-বামে তাকিয়ে অনেকগুলো মালগাড়ি দেখতে পাই। যেগুলো ছিল কুমিজ পানীয় দিয়ে ভর্তি। সুলতান সেগুলো লোকদের মাঝে বণ্টন করার

নির্দেশ দেন। আমাকেও সেখান থেকে এক গাড়িভর্তি কুমিজ দেওয়া হলে আমি সেগুলো আমার প্রতিবেশী তুর্কিদের দিয়ে দেই।

অতঃপর আমরা জুমার নামায আদায়ের জন্য মসজিদে চলে আসি। সুলতানের আসতে খুব বিলম্ব হচ্ছিল বিধায় একজন বলে, তিনি আজকে আর আসবেন না। তিনি নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছেন। আরেকজন বলে, তিনি অবশ্যই আসবেন। তিনি কখনোই জুমার নামায ছাড়েননি। অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সুলতান নেশায় ঢুলতে ঢুলতে এসে হাজির হন। এসে মুচকি হেসে সাইয়েদ শরিফ ইবনু আবদুল হামিদকে সালাম দেন। সুলতান তাকে আতা বলে সম্বোধন করেন। তুর্কি ভাষার এই শব্দের অর্থ হচ্ছে পিতা। এরপর আমরা জুমার নামায আদায় করি। নামায শেষে সবাই যার যার অবস্থানে ফিরে যায়। সুলতান ফিরে যান তাঁবুতে। আসর নামায পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর সকল মানুষ সেখান থেকে নিজ নিজ অবস্থানস্থলে ফিরে যায়। তবে সুলতান, তার কন্যা ও স্ত্রীগণ সেখানেই থেকে যান।

ঈদের উৎসব সমাপ্তির পর আমরা সুলতান ও তার মহল্লার সঙ্গে এখান থেকে প্রস্থান করে আলহাজ তারখান[১] শহরে চলে যাই। তাদের ভাষায় তারখান শব্দের অর্থ হচ্ছে শুল্ক ও করমুক্ত স্থান। যে ব্যক্তির নামে এই স্থানের নামকরণ করা হয়েছে তিনি ছিলেন একজন নেককার তুর্কি ব্যক্তি। তিনি হজ করে এসেছিলেন। তিনি এই স্থানে এসে অবস্থান করার পর সুলতান তার জন্য এই স্থানকে করমুক্ত ঘোষণা করে দেন। অতঃপর ধীরে ধীরে এটি গ্রামের রূপ ধারণ করেছে, এরপর গ্রাম থেকে আজকের শহরে পরিণত হয়েছে। ইতিল নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটি খুবই সুন্দর। এখানকার বাজারগুলোও বিশাল। ইতিল নদী বিশ্বের বড় নদীগুলোর একটি।[২] তীব্র শীতের সময় পর্যন্ত সুলতান এখানে অবস্থান করেন। প্রচণ্ড শীতের সময়ে

---

[১] এটির বর্তমান নাম আসতারাখান। যা রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ভলগা নদীর তীরে অবস্থিত ঐতিহ্যসমৃদ্ধ প্রাচীন একটি শহর।–অনুবাদক

[২] প্রসিদ্ধ ভলগা নদীকে আরবিতে আতিল বা ইতিল বলা হয়। এটি ইউরোপের দীর্ঘতম নদী। রাশিয়ার মধ্যাঞ্চল থেকে শুরু করে দক্ষিণাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এটি কাস্পিয়ান সাগরের সঙ্গে গিয়ে মিলেছে। এর মোট দৈর্ঘ্য ৩৫৩১ কিলোমিটার। ৩৬৫০ কিলোমিটারের কথাও উল্লেখ আছে। সাম্প্রতিক প্রকাশিত একটি জরিপে দেখা গেছে, বিশ্বের দীর্ঘতম নদীর তালিকায় এটির অবস্থান আঠারোতম। –অনুবাদক

এই নদীর পানি বরফে পরিণত হয়। তখন সুলতানের নির্দেশে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা হাজারো ঘাসের বোঝা নিয়ে এসে নদীর বুকে জমে থাকা বরফের উপর রেখে আগুন প্রজ্বলিত করে। এখানকার পশুরা এই ঘাস খায় না। এগুলো তাদের জন্য ক্ষতিকর। যেমনটি ভারতবর্ষেও লক্ষ্য করেছি। এই অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর হওয়ায় এখান বিপুল পরিমাণে একপ্রকার সবুজ শস্য উৎপন্ন হয়। পশু ও জীবজন্তুরা সেই শস্য ভক্ষণ করে। নদীর বুকে জমে থাকা বরফের উপর দিয়ে মালগাড়িতে করে তিনদিনের দূরত্ব পর্যন্ত সফর করা যায়। শীতের শেষপ্রান্তে গিয়ে মাঝে মাঝে নদীর বরফ গলে গিয়ে সফররত কাফেলার নদীর বুকে সলিল সমাধি রচিত হয়।

আলহাজ তারাখান শহরে পৌঁছানোর পর সুলতানের স্ত্রী ও বাইজেন্টাইন সম্রাটের কন্যা বাইলুন খাতুন পিতার কাছে যাওয়ার জন্য সুলতানের কাছে অনুমতি চান। তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন। চেয়েছিলেন পিতৃগৃহেই তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হোক। সুলতান তাকে অনুমতি দেন। আমার মনে সুবিশাল কনস্টান্টিনোপল শহর ঘুরে দেখার সুপ্ত ইচ্ছা ছিল। তাই আমিও সুলতানকে বলি তিনি যেন আমাকেও বাইলুন খাতুনের সঙ্গে সফর করার অনুমতি দেন। কিন্তু তিনি আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে ভয় করে নিষেধ করে দেন। আমি তখন তাকে কোমল স্বরে বলি, আমি আপনার নিরাপত্তা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়েই সেখানে সফর করব। তাই আমার কোনো কিছুর ভয় নেই। তখন তিনি আমাকেও অনুমতি দেন। অতঃপর আমরা তাকে বিদায় জানাই। তিনি আমাকে এক হাজার পাঁচশ দিনার, রাজকীয় পোশাক এবং অনেকগুলো ঘোড়া প্রদান করেন। সুলতানের প্রত্যেক স্ত্রী আমাকে উপহার দেন অনেকগুলো রূপার টুকরো এবং তার কন্যা উপহার দেন আরো বেশি। তিনি আমাকে পোশাক উপহার দেন। সাওয়ারির জন্য উন্নতমানের ঘোড়ার ব্যবস্থা করেন। এমনিভাবে আরো বেশকিছু ঘোড়া, মূল্যবান কাপড় এবং সাম্মুর ও সিনজাবের চামড়াও উপহার দেন।

কুসতুনতিনিয়ার (কনস্ট্যান্টিনোপল) উদ্দেশে সফর

শাওয়ালের দশ তারিখে বাইলুন খাতুনের সঙ্গে তার পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের সফর শুরু হয়। সুলতান তাকে বিদায় জানাতে এক মারহালা পর্যন্ত এগিয়ে আসেন। সুলতানের অন্য স্ত্রীগণ ছিলেন দুই মারহালা পর্যন্ত। অতঃপর সবাই বিদায় জানিয়ে ফিরে যান। এই সফরে বাইলুন খাতুনের

সঙ্গে ছিলেন পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক আমির বাইদারা। এছাড়াও বাইলুন খাতুনের ব্যক্তিগত বাহিনীতে ছিল পাঁচশ অশ্বারোহী। তাদের মধ্য হতে দুইশজন ছিলেন ক্রীতদাস ও রোমীয় সেবক। বাকি তিনশজন ছিলেন তুর্কি সৈনিক। আরো ছিল প্রায় দুইশ দাসী। যাদের অধিকাংশই ছিল রোমীয়। তার মালিকানায় ছিল চারশ মালগাড়ি। সেগুলো টানার জন্য এবং পৃথকভাবে আরোহণের জন্য ছিল দুই হাজার ঘোড়া, তিনশ বকরি এবং দুইশ উট। তার সঙ্গে আরো ছিল দশজন রোমীয় এবং ভারতবর্ষের দশজন খোঁজা ক্রীতদাস। ভারতবর্ষের ক্রীতদাসদের প্রধানের নাম ছিল সুম্বুল আল হিন্দী। আর রোমীয় ক্রীতদাসদের প্রধানের নাম ছিল মিখাইল। তুর্কিরা তাকে লুলু নামে ডাকে। সে খুবই সাহসী ও শক্তিশালী একজন ব্যক্তি। যেহেতু বাইলুন খাতুন শুধুমাত্র তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সন্তান প্রস্রব করার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন, এজন্য তার অধিকাংশ দাসী ও আসবাবপত্র তিনি সুলতানের মহল্লাতেই রেখে এসেছেন।

এই যাত্রায় প্রথমে আমরা উকাক শহরে পৌঁছাই। চমৎকার বাড়িঘর ও বিভিন্ন সুযোগসুবিধাবিশিষ্ট তীব্র ঠান্ডার মাঝারি আয়তনের একটি শহর। সুলতান মুহাম্মাদ উজবেকের রাজধানী আস সারায়া ও এই শহরের মাঝে দশদিনের সফরের ব্যবধান। এই শহর থেকে একদিনের দূরত্বে রুশ পর্বতমালার অবস্থান। এখানকার অধিবাসীরা খ্রিস্টান। তাদের চুলের রঙ লাল, চোখের রঙ নীল আর চেহারা অদ্ভূদ আকৃতির। চারিত্রিক দিক থেকে তারা বিশ্বাসঘাতক প্রকৃতির। তাদের কাছে রূপার খনি রয়েছে। তাদের দেশ থেকেই রূপার টুকরো বা বার রপ্তানি করা হয়। এখানে এমন রূপার বার বেচাকেনা করা হয়। একটি বারের ওজন পাঁচ আউন্স পর্যন্ত হয়ে থাকে।

এই শহর থেকে যাত্রা করে দশদিন পর পৌঁছাই সুরদাক[১] শহরে। এটি কিফজাক বা ককেশাস মরুভূমির সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি শহর। এখানকার বন্দরটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ও চমৎকার বন্দর। এর শহরতলীতে রয়েছে অনেক বাগান, ঝরনা ও জলাশয়। তুর্কি জাতির লোকেরা এখানে বসবাস করে। তাদের অধীনে এখানে একদল রোমীয় নাগরিকও বসবাস করে। যারা মূলত বিভিন্ন শিল্পের কারিগর। এখানকার অধিকাংশ স্থাপনা কাঠের তৈরি। আগে শহরটির আয়তন ছিল অনেক বড়। তুর্কি ও রোমীয়দের মধ্যকার

[১] বর্তমান নাম সুদাক। ক্রিমিয়ায় অবস্থিত। –অনুবাদক

সংঘাতে শহরটির অধিকাংশই বিরান হয়ে যায়। সেই সংঘাতে রোমীয়রা বিজয়ী হয়েছিল। নিজেদের সঙ্গীদের পক্ষে প্রতিশোধ নিতে তুর্কিরা পুনরায় এসে আক্রমণ করে। এবারে তারা রোমীয়দেরকে কচুকাটা করে। অতঃপর তাদের অধিকাংশকেই এখান থেকে বিতাড়িত করে দেয়। অল্পকিছু রোমীয় নাগরিক অবশিষ্ট ছিলেন। তারাই এখন তুর্কিদের নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করছেন। এই অঞ্চলে সফরকালে প্রত্যেক বিশ্রামস্থলেই বাইলুন খাতুনের কাছে ঘোড়া, ভেড়া ও বকরি, দুগি ও কুমিজ পানীয় এবং ভেড়া ও বকরির দোহনকৃত দুধ উপহার হিসেবে প্রদান করা হতো। এই অঞ্চলের প্রতিটি শহরের গভর্নর নিজ নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে এই রানিকে শহরের শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন। এটি নিছকই সম্মান প্রদর্শনের জন্য। কোনো নিরাপত্তাজনিত কারণে নয়। কারণ, এই অঞ্চলে নিরাপত্তা নিয়ে কোনো ভয় নেই।

অতঃপর আমরা পৌঁছাই বাবা সালতুক শহরে। বারবার ও তুর্কিদের ভাষায় বাবা শব্দের একই অর্থ। মানে পিতা। তবে তুর্কিরা বাবা শব্দকে অধিক গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করে। কথিত আছে, এই সালতুক ছিলেন একজন সাধক পুরুষ। তবে তার ব্যাপারে শরীয়তে নিষেধকৃত কিছু কাজে লিপ্ত হওয়ার কথাও শুনা যায়। এটিই তুর্কি অঞ্চলের সর্বশেষ শহর। এর মাঝে ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রথম শহরের মধ্যকার দূরত্ব আঠারো দিনের সফর পরিমাণ। জনমানবহীন মরুপথে এই আঠারো দিন সফর করতে হয়। তন্মধ্য হতে আট দিনের পথে কোনো পানি নেই। সেজন্য আগে থেকেই বিভিন্ন পাত্র ও মশকে করে পানি সংগ্রহ করে রাখতে হয়। সেগুলো মালগাড়িতে বহন করা হয়। আমরা যেহেতু শীতকালে এই অঞ্চলে এসেছিলাম, তাই আমাদের তেমন পানির প্রয়োজন হয়নি। তুর্কিরা মশকের মধ্যে দুধ নিয়ে সেগুলোকে চুলায় জ্বাল দিয়ে তৈরিকৃত দুগির পানির সঙ্গে মিশিয়ে পাত্র করে। এর ফলে দীর্ঘসময় পর্যন্ত তাদের পিপাসা লাগে না। বাবা সালতুক শহর থেকে আমরা এই বিরান মরুপথে সফর করার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। এ পর্যায়ে এসে আমাদের আরো ঘোড়ার প্রয়োজন হয়। আমি খাতুনকে এ ব্যাপারে অবগত করি। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আমি তার কাছে গিয়ে তাকে সালাম জানাতাম। যতবারই মেহমানদারি হিসেবে উপহার আসত, তিনি সেখান থেকে আমার জন্য দুই-তিনটি ঘোড়া ও বকরি পাঠিয়ে দিতেন। আমি ঘোড়াগুলোকে রেখে দিতাম। পরে জবাই করার জন্য।

আমার সঙ্গে আসা গোলাম ও সেবকরা আমার তুর্কি সঙ্গীদের সাথেই আহার করত। এভাবে আমার কাছে পঞ্চাশটি ঘোড়া জমে যায়। বাইলুন খাতুন আমাকে আরো পনেরোটি ঘোড়া দেওয়ার নির্দেশ দেন। দায়িত্বশীল সারুজা আর রুমিকে বলেন, রান্নার জন্য বাছাইকৃত ঘোড়ার পাল থেকে যেন বেছে বেছে মোটা তাজা ঘোড়াগুলো আমাকে দেওয়া হয়। তিনি আমাকে আরো বলেন, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আপনার যদি আরো কিছুর প্রয়োজন হয় নির্দ্বিধায় জানাবেন। আমরা আরো বাড়িয়ে দেব। যিলকদ মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমরা এই মরুপথে প্রবেশ করি। সুলতানের কাছ থেকে প্রস্থান নিয়ে এই মরুভূমির শুরুভাগে পৌঁছানো পর্যন্ত ইতিমধ্যে উনিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। মাঝে পাঁচদিন বিশ্রামের জন্য অবস্থান করেছিলাম।[১] অতঃপর এই মরুপথ দিয়ে টানা আঠারো দিন আমরা সকাল-সন্ধ্যা সফর করি। পথে আমাদেরকে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।

এরপর আমরা পৌঁছাই বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রথম ঘাঁটি মাহতুলি দুর্গে। রোমীয়রা আগে থেকেই বাইলুন খাতুনের আগমনের ব্যাপারে জানতে পেরেছিল। তাই এই দুর্গে পৌঁছানোর পর এখানকার প্রধান নিকোলাস বিশাল সেনাবাহিনী ও অনেক উপহার-উপঢৌকন নিয়ে তাকে স্বাগত জানান। এমনিভাবে তার পিতার প্রাসাদ থেকে সম্ভ্রান্ত নারী ও সেবিকারাও এসে উপস্থিত হয়। মাহতুলি দুর্গ থেকে কনস্টান্টিনোপলের দূরত্ব বাইশ দিনের। ষোলো দিনের সফর শেষে উপনীত হয় একটি প্রণালির প্রান্তে। অতঃপর প্রণালি থেকে ছয়দিন সফর করে কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছানো যায়। এই দুর্গ থেকে কেবল ঘোড়া ও গাধার মাধ্যমেই সফর করা যায়। এখানে সব মালগাড়ি রেখে যেতে হয়। কারণ, এই অঞ্চলে পাহাড়ি দুর্গম পথে সফর করতে হয়। দুর্গপ্রধান নিকোলাস অনেকগুলো গাধা নিয়ে আসা। খাতুন আমার জন্য সেখান থেকে ছয়টি গাধা প্রেরণ করেন। এই দুর্গেই আমার সঙ্গে আসা সাথী, সেবক, মালগাড়ি ও আসবাবপত্র রেখে যেতে হয়। খাতুন দুর্গপ্রধানকে এগুলো দেখাশোনা করার নির্দেশ দেন। এগুলো রাখার জন্য একটি ভবন খালি করতে বলেন। আমির বাইদারা তার সৈন্যদেরকে নিয়ে এখান থেকে ফিরে যান। শুধু খাতুনের ব্যক্তিগত লোকরাই এখান থেকে তার

---

[১] ভিন্ন ছাপায় উনত্রিশ দিনের কথা উল্লেখ রয়েছে।

সঙ্গে সফর করেন। খাতুনের সঙ্গে করে বহন করে আনা মসজিদকে এই দুর্গেই রেখে যাওয়া হয়। এরপর আযানের হুকুমও উঠিয়ে দেওয়া হয়। উপহার হিসেবে এই খাতুনের কাছে মদও পেশ করা হতো। তিনি সেই মদ পান করতেন। শূকরও উপহার দেওয়া হতো তাকে। শুনেছি তিনি সেই শূকরের গোশতও ভক্ষণ করেছেন। তার সঙ্গে নামায পড়ার মতো অল্পকজন তুর্কি লোক অবশিষ্ট থাকে। তারা আমাদের সঙ্গে মিলে নামায আদায় করত। কাফেরদের রাষ্ট্রে প্রবেশ করার কারণে ইবাদতের পরিবেশও পালটে যায়। তবে খাতুন দুর্গপ্রধানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমার সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করার জন্য। আমাদের নামায পড়া দেখে হাসার কারণে এক গোলামকে তিনি শাস্তিও প্রদান করেছিলেন।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য মাসলামা ইবনে আবদুল মালিক[১] দুর্গ। ইস্তাকিলি নামক এক খরস্রোতা নদীর তীরে অবস্থিত পাহাড়ের পাদদেশে এই দুর্গের অবস্থান। এখন শুধু এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অক্ষত রয়েছে। দুর্গের বাইরে রয়েছে একটি বিরাট পল্লী। এখান থেকে দুইদিন সফর করার পর আমরা প্রণালির প্রান্তে উপনীত হই। এর তীরে গড়ে উঠেছে বিশাল একটি গ্রাম। প্রণালিতে তখন জোয়ার চলছিল। তাই আমরা ভাটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। ভাটা চলে আসার পর আমরা দুই মাইল প্রস্থের এই প্রণালি পাড়ি দেই। অতঃপর চার মাইলের বালুময় পথ পাড়ি দিয়ে উপনীত হই আরেকটি প্রণালির প্রান্তে। এটির প্রস্থ তিন মাইল। এটি পাড়ি দিয়ে দুই মাইলের মতো বালু ও কঙ্করময় পথে সফর করে উপনীত হই তৃতীয় প্রণালির কাছে। এখানে তখন জোয়ার শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই এটি পাড়ি দিতে গিয়ে আমাদের বেশ কসরত করতে হয়েছিল। এটির প্রস্থ ছিল এক মাইল। পানি ও শুকনো পথ মিলিয়ে পুরো প্রণালিটির আয়তন ছিল বারো মাইল। বর্ষার সময় পুরোটাই পানিতে ভরে যায়। তখন নৌকা ব্যতীত পার হওয়া যায় না।

তৃতীয় প্রণালির তীরে ফানিকা শহরের অবস্থান। এটি আয়তনে ছোট হলেও বেশ সুন্দর ও দুর্ভেদ্য। এখানকার গির্জা ও ঘরবাড়িগুলো দেখতে বেশ চমৎকার। শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে স্রোতস্বিনী নদী আর চারদিক থেকে

---

[১] উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সন্তান ছিলেন মাসলামা ইবনে আবদুল মালিক। আবদুল মালিকের খিলাফতকালে তিনি আরবদের কনস্টান্টিনোপল অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই দুর্গটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছে অথবা তার নামে এই দুর্গের নামকরণ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। -অনুবাদক

বেষ্টিত করে রেখেছে অসংখ্য বাগান। এখানে আঙুর, নাসপাতি, আপেল ও কুইন্স ফল পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হয়। এই শহরে আমরা তিনদিন অবস্থান করি। বাইলুন খাতুন অবস্থান করেছিলেন এই শহরে তার পিতার এক প্রাসাদে। অতঃপর তার সহোদর ভাই কিফালি কারাস পাঁচ হাজার অস্ত্রসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আগমন করেন। খাতুনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তার এই ভাই ধূসর রঙের ঘোড়ায় চড়ে, গায়ে শ্বেতশুভ্র কাপড় এবং মাথায় মণি-মুক্তাসজ্জিত মুকুট পরে আসেন। এ সময় তার ডান-বামে ছিলেন পাঁচজন করে রাজপরিবারের সদস্য। তাদের পরনেও ছিল শুভ্র রঙের পোশাক আর মাথায় ছিল স্বর্ণের কারুকার্যখচিত টুপি। তার সম্মুখে ছিল একশত পদাতিক সৈন্য এবং একশত অশ্বারোহী সৈন্য। তাদের শরীরে এবং তাদের ঘোড়ার শরীরে ছিল লৌহবর্ম। বর্ম ও লাগামযুক্ত অশ্বে আরোহণকারী প্রত্যেকে সৈন্যের কাছে ছিল অলংকারসজ্জিত শিরস্ত্রাণ, বর্ম এবং তির-তূণীর ও তলোয়ার। তাদের হাতে ছিল একটি বর্শা এবং মাথার একপাশে ছিল পতাকা। তাদের হাতের এই বর্শাগুলোর অধিকাংশই ছিল স্বর্ণ ও রূপার লেইস দিয়ে মোড়ানো। সম্রাটপুত্র এই অশ্বগুলোতে আরোহণ করতে থাকেন। তার সেনাবাহিনীকে তিনি কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। প্রতি ইউনিটে ছিল দুইশজন করে অশ্বারোহী। প্রতিটি ইউনিটের অধিনায়ক ছিলেন তাদের অগ্রে। এমন দশজন অধিনায়ক ছিল তার বাহিনীতে। তাদের প্রত্যেকেই ছিল অস্ত্রসজ্জিত তেজী ঘোড়ার পিঠে আরোহণরত। তার পেছনে দশজন অশ্বারোহী সৈনিকের হাতে ছিল দশটি রঙিন পতাকা। অপর দশ সৈনিকের সঙ্গে ছিল দশটি তবলা। আর ছয়জন সৈনিকের কাছে ছিল আরো কিছু বাদ্যযন্ত্র।

এদিকে বাইলুন খাতুন তার দাস-দাসী ও সেবকদের পাঁচশজনের বহরকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়েন। দাস-দাসী ও সেবক সবার পরনেই ছিল স্বর্ণের কারুকার্যখচিত রেশমি কাপড়। বাইলুন খাতুন পরেছিলেন মণি-মুক্তোসজ্জিত নাসিজ নামক একধরনের মূল্যবান পোশাক। তার মাথায় ছিল অলংকারসজ্জিত মুকুট। তার ঘোড়ার গায়েও ছিল বাহারি রঙের স্বর্ণখচিত রেশমি কাপড়। এর চার পায়েই ছিল স্বর্ণের রিঙ আর গলায় ছিল মূল্যবান পাথরের নেকলেস। এর হাওদাটি ছিল বেশবড়। স্বর্ণ ও বিভিন্ন অলংকার দিয়ে সজ্জিত। শহর থেকে এক মাইল দূরের বিস্তীর্ণ এক প্রান্তরে ভাই-বোনের সাক্ষাৎ হয়। বাইলুন খাতুনের ভাই বয়সে ছোট হওয়ায় তাকে দেখে

খালি পায়ে হেঁটে এসে তার ঘোড়ার লাগামে চুম্বন করে। তিনি ভাইয়ের মাথায় চুম্বন করেন। এমনিভাবে অন্যান্য মন্ত্রী-আমলা এবং রাজপরিবারের উপস্থিত অন্যান্য সদস্যরাও নিজ নিজ বাহন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এসে সম্মিলিতভাবে বাইলুন খাতুনের ঘোড়ার লাগাম ধরে চুম্বন করে। অতঃপর বাইলুন খাতুন তার ভাইয়ের সঙ্গে সম্মুখপানে যাত্রা করেন।

পরদিনই আমরা সমুদ্র উপকূলবর্তী বিশাল একটি শহরে এসে উপনীত হই। এর নামটি এখন মনে পড়ছে না।[১] অনেক গাছপালা ও নদীনালা রয়েছে এখানে। আমরা শহরের উপকণ্ঠে অবতরণ করি। খাতুনের যুবরাজ ভাইও তার বিশাল ও সুবিন্যস্ত বাহিনী নিয়ে আমাদের পরপরই উপস্থিত হন। অতঃপর রেশমি কাপড়ের একটি তাঁবু প্রস্তুত করা হলে তারা সেটির ভেতরে প্রবেশ করেন। তাদের পরস্পর অভিবাদন জানানোর পদ্ধতি আমি জানতে পারিনি। আমরা যেখানে অবস্থান নিয়েছি, এটি ছিল কনস্টান্টিনোপল থেকে দশ মাইল দূরে। পরদিন দেখতে পাই কনস্টান্টিনোপলের নারী-পুরুষ ও শিশু সবাই মিলে খাতুনকে স্বাগত জানানোর জন্য বেরিয়ে এসেছেন। কেউ এসেছেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে, কেউ পদব্রজে। তাদের সবার পরনেই ছিল নিজেদের পরিধানের সবচেয়ে উত্তম পোশাক। সকাল সকালই তারা ঢোল-তবলা ও বাদ্য বাজাতে শুরু করে। সৈনিকরা তাদের নিজ নিজ অশ্বে আরোহণ করে। বাইজেন্টাইন সম্রাট, তার স্ত্রী ও বাইলুন খাতুনের মা, সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও বেরিয়ে আসেন স্বাগত জানাতে। সম্রাটের মাথার উপরে ছিল বিশাল একটি ছাউনি। বেশ কজন অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য তা বহন করে চলছিল। পদাতিক সৈন্যদের হাতে ছিল একটি করে লম্বা লাঠি। লাঠির মাথায় ছিল গোল বলের মতো একটি বস্তু। এই লাঠির সাহায্যে তারা ছাউনিটি উঁচু করে ধরে। ছাউনির মাঝামাঝি অবস্থানে গম্বুজের মতো একটি বস্তু। যা অশ্বারোহী সৈন্যরা লাঠির সাহায্যে উঁচু করে ধরে রেখেছিল।

সম্রাটের আগমনের পর সৈনিকরা একসঙ্গে মিলে যায় এবং বেশ হট্টগোল সৃষ্টি হয়। আমি তাদের মধ্য দিয়ে কীভাবে যাব তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমি বাইলুন খাতুনের আসবাবপত্র ও তার অনুচরদের

---

[১] খুব সম্ভবত এটি সেলিস্ত্রিয়া (বর্তমান সিলিব্রি, তুরস্ক) অথবা রেগিয়াম (বর্তমান Reggio Calabria, ইতালির দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় শহর) শহর হবে। সূত্র, এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০৩।–অনুবাদক

সঙ্গেই থাকি। পরে শুনতে পাই, পিতামাতার কাছে যাওয়ার পর বাইলুন খাতুন বাহন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে তাদের সম্মুখে গিয়ে জমিনে চুম্বন করেন। অতঃপর চুম্বন করে তাদের দুজনের ঘোড়ার খুরে। তার বহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তার অনুরূপ জমিনে ও ঘোড়ার খুরে চুম্বন করে।

দুপুরের দিকে অথবা তার সামান্য পরে আমরা সুবিশাল কনস্টান্টিনোপল শহরের বুকে পা রাখি। তারা তখন এমনভাবে বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল যে, আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠছিল। সম্রাটের প্রাসাদের প্রথম ফটকে উপনীত হওয়ার পর দেখতে পাই সেখানে একশ প্রহরী নিয়োজিত রয়েছে। তাদের সঙ্গে আছে একজন অধিনায়ক। যে বসে ফটকের এখানে নির্মিত একটি কক্ষে। আমি তখন তাদেরকে 'সারাকিনু সারাকিনু' শব্দ বলতে শুনি। এর অর্থ হচ্ছে মুসলিম। তারা আমাদেরকে ভেতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করে তখন বাইলুন খাতুনের সঙ্গীরা বলে, তারা আমাদের দলেরই লোক। কিন্তু প্রহরীরা বলে, অনুমতি ব্যতীত তাদেরকে ভেতরে যেতে দেওয়া যাবে না। অগত্যা আমরা ফটকে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করতে থাকি। খাতুনের সঙ্গীদের মধ্য হতে একজন তাকে গিয়ে এই সংবাদ জানায়। তিনি তখন তার পিতার কাছেই ছিলেন। সম্রাটকে তিনি আমাদের ব্যাপারে জানালে তিনি আমাদের প্রবেশের অনুমতি দেন এবং খাতুনের আবাসস্থলের কাছেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করতে বলেন। আমাদের জন্য তিনি নির্দেশনা জারি করেন, যেন শহরের কোথাও আমাদেরকে কোনোরূপ বাঁধা না দেওয়া হয় এবং শহরের বাজারগুলোতেও এই ঘোষণা দেওয়া হয়। আমরা সেখানে তিনদিন অবস্থান করি। সম্রাট আমাদের জন্য ময়দা, রুটি, বকরি, মুরগী, ঘি, ফলমূল, মাছ, দিরহাম এবং বিছানা উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। চতুর্থদিন আমরা সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের বিবরণ

তার নাম তাকফুর।[১] তার পিতা সম্রাট জিরজিস এখনো জীবিত। তবে তিনি পার্থিব জীবনের ব্যস্ততা ছেড়ে গির্জায় স্রষ্টার ইবাদতে মনোনিবেশ করেছেন। সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ছেড়ে গেছেন নিজ পুত্রের হাতে। তার আলোচনা সামনে

---

[১] তাকফুর মূলত আরবি ভাষায় রোমান সম্রাটদের উপাধি। এটি কোনো নাম নয়। ইবনে বতুতার সফরকালীন সময়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন এন্ড্রনিকোস তৃতীয়। যিনি তার পিতামহ এন্ড্রনিকোস দ্বিতীয়ের কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। –অনুবাদক

আসবে। কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছানোর পর চতুর্থদিন বাইলুন খাতুন তার খোঁজা দাস সুম্বুল আল হিন্দীকে আমার কাছে পাঠান। সে আমাকে হাতে ধরে সম্রাটের প্রাসাদে নিয়ে যায়। এ সময় আমরা চারটি ফটক অতিক্রম করি। প্রতিটি ফটকের ব্যালকনিতেই অস্ত্রসজ্জিত একদল প্রহরী নিয়োজিত ছিল। তাদের নেতা বসেছিলেন বিছানা বিছিয়ে রাখা একটি কক্ষে। পঞ্চম ফটকে পৌঁছানোর পর সুম্বুল আমাকে রেখে ভেতরে চলে যান। অতঃপর তার সঙ্গে চারজন রোমীয় দাস এসে হাজির হয়। তারা এসে আমাকে তল্লাশি করে দেখে আমার সঙ্গে কোনো চাকু-ছুরি আছে কি না। প্রহরীদের অধিনায়ক আমাকে বলে, এটিই তাদের রীতি। সাধারণ অথবা বিশেষ, দূরের অথবা স্বদেশের যে লোকই সম্রাটের কাছে যেতে ইচ্ছুক হবে, তাকে তল্লাশি করা বাধ্যতামূলক। ভারতবর্ষেও এমনটি করা হয়।

তল্লাশির পর আমার জন্য ফটকের দরজা খুলে দেওয়া হয়। চারজন ব্যক্তি আমাকে বেষ্টন করে সম্মুখে নিয়ে যায়। দুইজন ধরে রাখেন আমার আস্তিনে। আর দুইজন ছিলেন পেছনে। তারা আমাকে নিয়ে বড় একটি দরবারহলে এসে উপনীত হন। এর দেয়াল মোজাইক করা। তাতে রয়েছে নানা জীবজন্তু ও জড়বস্তুর চিত্রকর্মের সমাহার। কক্ষের মাঝখানে রয়েছে একটি পানির ফোয়ারা। এর চারদিকে রয়েছে গাছপালা। ডানে-বামে দাঁড়িয়ে আছে বেশকিছু মানুষ। তাদের কেউই কোনো কথা বলছে না। দরবারকক্ষের মাঝখানে বসে আছে তিনজন ব্যক্তি। আমার নিয়ে আসা চারজন ব্যক্তি আমাকে এই তিন ব্যক্তির কাছে দিয়ে যায়। তখন তারাও আগের লোকদের মতো আমার কাপড় ধরে রাখে। তাদেরকে ইঙ্গিত দেওয়া হলে তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে যায়। তাদের একজন ছিল ইহুদি। সে আরবি ভাষায় আমাকে বলে, আপনার কোনো ভয় নেই। এখানে কোনো মেহমান এলে তাকে এভাবেই নিয়ে যাওয়া হয়। আমি এখানকার দোভাষী। আমার পূর্বপুরুষরা শামের অধিবাসী। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, এখানে কীভাবে অভিবাদন জানাতে হয়? সে বলে, আপনি 'আসসালামু আলাইকুম' বললেই হবে। অতঃপর আমাকে নিয়ে আসা হয় বিরাট একটি ছাউনির কাছে। ছাউনির নিচে সম্রাট তার সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট হয়ে আছেন। বাইলুন খাতুনের মা সম্রাজ্ঞী বসে আছেন আছেন তার সম্মুখে। আর সিংহাসনের নিচে বসেছেন বাইলুন খাতুন ও তার অন্য ভাই-বোনেরা। সম্রাটের ডানে ছিল ছয়জন লোক আর বামে ছিল চারজন লোক। তাদের

প্রত্যেকেই ছিল অস্ত্রসজ্জিত। সম্রাটের কাছে যাওয়ার ও তাকে সালাম দেওয়ার পূর্বে আমাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বলা হয়। যেন আমার হৃদয় স্থির হয়। আমি তা-ই করি। এরপর সম্রাটের কাছে গিয়ে তাকে সালাম জানাই। তিনি আমাকে বসতে বললেও আমি দাঁড়িয়েই থাকি। তিনি আমাকে বাইতুল মাকদিস, সেখানকার পবিত্র পাথর, হলি সেপালকার গির্জা, ঈসা আ.-এর দোলনা, বেথেলহেম এবং হেবরন শহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন শাম, মিসর, ইরাক ও বিলাদুর রোম অঞ্চল সম্পর্কে। আমি একাধারে তার সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করি। ইহুদি ব্যক্তিটি আমাদের কথা অনুবাদ করে দিচ্ছিল। সম্রাট তখন আমার কথাবার্তা শুনে বেশ মুগ্ধ হন এবং তার সন্তানদেরকে বলেন, তোমরা এই ব্যক্তিকে যথাযথ সম্মান করবে এবং তার নিষ্কণ্টক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। অতঃপর তিনি আমাকে রাজকীয় সম্মানসূচক পোশাক পরিয়ে দেন, আমার জন্য হাওদা ও লাগামবিশিষ্ট একটি ঘোড়া এবং একটি ছোট ছাউনির ব্যবস্থাও করতে বলেন। যেমনটি সফর করার সময় সুলতানের মাথার উপরে থাকে। এটি হচ্ছে নিরাপত্তার নিদর্শন। আমি সম্রাটের কাছে আবেদন করি, যেন আমার সঙ্গে প্রতিদিন একজন করে লোক থাকে। যিনি আমাকে শহর ঘুরিয়ে দেখাবেন। এভাবে আমি এই শহরের আশ্চর্য ও দুর্লভ সব স্থান ও স্থাপনার সাক্ষী হবো এবং নিজ অঞ্চলে গিয়ে এখানকার সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আমার জন্য একজন লোক নির্ধারণ করে দেন। তাদের প্রথা হচ্ছে, সম্রাট যাকে রাজকীয় সম্মানসূচক পোশাক পরিয়ে দেন এবং তার ঘোড়া উপহার দেন; তাকে নিয়ে ঢোল-তবলা বাজিয়ে শহরের বাজারগুলোতে প্রদক্ষিণ করা হয়। যাতে করে মানুষ তাকে দেখতে পারে। সুলতান মুহাম্মাদ উজবেকের সাম্রাজ্য থেকে আগত তুর্কিদের ক্ষেত্রেই অধিকাংশ সময় এমনটি করা হয়। যেন তাদেরকে কেউ পথে-ঘাটে কষ্ট না দেয়। এই অনুযায়ী তারা আমাকে নিয়েও শহরের বাজারগুলোতে প্রদক্ষিণ করে।

কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) শহরের বিবরণ

সুবিশাল আয়তনের এই শহরটি বিভক্ত দুইভাগে। মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে বিরাট একটি জোয়ার-ভাটাবিশিষ্ট খরস্রোতা নদী। দেখতে অনেকটা আমাদের মাগরিব অঞ্চলের সালা নদীর মতো। এই নদীর উপর একটি সেতু

নির্মাণ করা হয়েছিল। সেটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু নৌকাযোগেই এই নদী পার হওয়া যায়। এই নদীর নাম আবসুমি।[১] শহরের একাংশ নাম ইস্তাম্বুল।[২] এটির অবস্থান নদীর পূর্বতীরে এবং এখানেই সম্রাটের প্রাসাদ ও তার প্রশাসনিক সকল কার্যালয়ের অবস্থান। এখানকার প্রশস্ত বাজার ও সড়কগুলোতে টালিপাথর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাজারগুলোতে প্রতিটি শিল্পের জন্য পৃথক পৃথক দোকানসারি নির্ধারিত রয়েছে। প্রতিটি বাজারেই রয়েছে ফটক। যা রাতের বেলায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, এখানকার অধিকাংশ কারিগর ও বিক্রেতা হচ্ছেন নারী। শহরটির অবস্থান পাহাড়ের পাদদেশে। এই পাহাড়ের নয় মাইলের মতো জায়গা রয়েছে সাগরের বুকে। পাহাড়ের উঁচুপ্রান্তে রয়েছে ছোট্ট একটি দুর্গ এবং সেখানেই সম্রাটের প্রাসাদের অবস্থান। পাহাড়ের চারদিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে সমুদ্র পথে এই পাহাড়ে পৌঁছানোর কোনো উপায় নেই। এখানে রয়েছে তেরোটি জনবহুল গ্রাম। শহরের এই অংশের ঠিক মাঝখানে এখানকার কেন্দ্রীয় বিরাট গির্জার অবস্থান।

শহরের দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় গালাতা। যেটির অবস্থা নদীর পশ্চিমতীরে। নদীর কাছাকাছি অবস্থানের দিক দিয়ে রাবাত শহরের সঙ্গে এটির খুব সাদৃশ্য রয়েছে। এই অংশে শুধু খ্রিস্টানরা বসবাস করে। তারা জেনোয়া, ভেনিস, রোম ও ফ্রান্স প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এসে এখানে আবাস গেড়েছে। তারা সবাই কনস্টান্টিনোপলের শাসনাধীন। সম্রাট তাদেরই মধ্য হতে একজনকে এখানে তার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেন। স্থানীয় ভাষায় তাকে কুমুস বলা হয়। সম্রাটের পক্ষ থেকে তাদের জন্য বাৎসরিক কর নির্ধারিত রয়েছে। কখনো কখনো তারা এই কর প্রদানে অস্বীকার করে। তখন সম্রাট তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। অতঃপর পোপ এসে উভয় পক্ষের মাঝে সমঝোতা করে দেয়। তারা সকলেই ব্যবসায়ী। তাদের বন্দরটি পৃথিবীর বৃহত্তম বন্দরগুলোর একটি। সেখানে আমি একশটির মতো বড় জাহাজ

---

[১] এখানে গোল্ডেন হর্ন প্রণালির কথা বলা হচ্ছে। ইবনে বতুতা যেটিকে মরক্কোর আটলান্টিক মহাসাগর উপকূলীয় অঞ্চলে সালা ও রাবাত শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া বো রেগরেগ মোহনার সঙ্গে তুলনা করেছেন।–অনুবাদক

[২] ইবনে বতুতা এটির নাম উল্লেখ করেছেন আস্তাম্বুল। ইস্তাম্বুল নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করায় এখানে তা-ই রাখা হলো।–অনুবাদক

দেখেছি। আর ছোট ছোট নৌযান ছিল অগণিত। এই অংশের বাজারগুলো বেশ সুন্দর। তবে এখানে ময়লা-আবর্জনার পরিমাণ বেশি। এর মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়ার ছোট্ট নদীটিও বেশ নোংরা। আর তাদের গির্জাটিও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

কেন্দ্রীয় বিশাল গির্জার বিবরণ

আমি শুধু গির্জার বাইরের অংশেরই বিবরণ প্রদান করব। এর ভেতরের অংশ আমি দেখিনি। এটি তাদের কাছে আয়াসুফিয়া নামে পরিচিত। কথিত আছে, এটি নির্মাণ করেছেন নবী সুলাইমান আ.-এর খালাতো ভাই আসিফ ইবনে বারখিয়া। এটি রোমীয়দের সবচেয়ে বড় গির্জা। বিশাল একটি প্রাচীর এটিকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে। যেন বা এটি কোনো সুরক্ষিত শহর। প্রাচীরে মোট তেরোটি ফটক রয়েছে। এর হেরেম বা চত্বর এক মাইলের মতো বিস্তৃত। হেরেমের সম্মুখে রয়েছে বিশাল একটি দরজা। যে কেউ এই হেরেমে প্রবেশ করতে পারে। আমি সম্রাটের পিতার সঙ্গে এখানে গিয়েছিলাম। তার আলোচনা সামনেই আসবে। এই হেরেমটি দেখতে অনেকটা দরবার হলের মতো। মেঝেতে বিছানো মার্বেল পাথর। আর মাঝে রয়েছে গির্জা থেকে বয়ে আসা একটি পানির ফোয়ারা। যা একহাত সমান উঁচু মার্বেল পাথরের বিচিত্র কারুকার্যখচিত দুটি দেয়ালের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে। ফোয়ারার দুইপাশে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন গাছপালা। গির্জার দরজা থেকে এই চত্বরের দরজা পর্যন্ত স্থাপন করা হয়েছে কাঠের তৈরি উঁচু ঝাঁকাবিশেষ। যেটির উপর দিয়ে বয়ে গেছে আঙুর গাছের লতা। আর নিচে রয়েছে জেসমিন ও বিভিন্ন সুগন্ধি ফুলের চারা। চত্বরের ফটকের বাইরে রয়েছে কাঠের তৈরি একটি ছাউনি। এর ভেতরে রয়েছে কাঠের কিছু আসন। ফটকের প্রহরীর সেখানে বসে থাকে। ছাউনির ডানদিক রয়েছে কিছু বেঞ্চ ও ছোট ছোট কুটির। যার অধিকাংশই কাঠের তৈরি। বিচারক ও কেরানিরা এগুলোতে বসেন। কুটিরগুলোর মাঝে রয়েছে আরেকটি কাঠের তৈরি ছাউনি। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সেটিতে উঠতে হয়। সেখানে স্থাপন করা হয়েছে বড় একটি চেয়ার। এখানকার প্রধান বিচারক সেখানে বসেন। তার আলোচনাও সামনে আসবে। চত্বরের ফটকসংলগ্ন ছাউনির বামদিকে রয়েছে সুগন্ধি বিক্রেতাদের বাজার। তাদের বাজার পার হতেই বিচারক ও কেরানিদের অবস্থানস্থলে উপনীত হতে হয়। গির্জার ফটকগুলোতে রয়েছে ব্যালকনি। সেখানে গির্জার সেবকরা অবস্থান করে। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে

গির্জার যাতায়াতপথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, রাত্রিকালে বাতি প্রজ্বলিত করা এবং যথাসময়ে ফটকগুলো বন্ধ করা। গির্জার ভেতরে প্রবেশকারী প্রত্যেককেই তারা ক্রুশের সম্মুখে সেজদা দিতে বাধ্য করে। ঈসা আ.-এর অনুরূপ ব্যক্তি যে শূলীতে চড়ানো হয়েছিল, তাদের ধারণা এই ক্রুশ সেই শূলীরই অবশিষ্ট অংশ। তাদের বিশ্বাস স্বয়ং ঈসা আলাইহিস সালামকেই শূলীতে চড়ানো হয়েছিল। এই ক্রুশকে স্থাপন করা হয়েছে গির্জার প্রবেশমুখের কাছেই। দশহাত উঁচু স্বর্ণের একটি পাতকে লম্বালম্বিভাবে রেখে তার উপর অনুরূপ আরেকটি স্বর্ণের পাত আড়াআড়িভাবে রাখা হয়েছে। ফলে সেটি ক্রুশের রূপধারণ করেছে। গির্জার এই প্রবেশমুখে স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রলেপ যুক্ত করা হয়েছে। আর এর আংটা দুটি তৈরি নিরেট স্বর্ণ দিয়ে।

আমি শুনেছি, এই গির্জায় অবস্থানকারী সাধক ও যাজকদের সংখ্যা হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তাদের কেউ কেউ ঈসা আ.-এর হাওয়ারীদের বংশধর। এর ভেতরে পৃথক আরেকটি গির্জা রয়েছে। যা শুধু নারীদের জন্যই নির্ধারিত। সেখানেও হাজারের বেশি যুবতী মেয়ে অবস্থান করে। যারা স্রষ্টার ইবাদতে নিরত থাকার জন্য চিরকুমারিত্ব বরণ করেছে। এছাড়াও বৃদ্ধা মহিলার সংখ্যা আরো বেশি। সম্রাট ও সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট সকল ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে গির্জায় উপস্থিত হন। আর বছরে একবার এখানে খ্রিস্টানদের প্রধান পোপের আগমন ঘটে। তিনি যখন শহর থেকে চার দিনের দূরত্বে এসে পৌঁছান, সম্রাট তখন তাকে স্বাগত জানানোর জন্য বের হন এবং তার সম্মুখে পায়ে হেঁটে যান। এমনিভাবে পোপ যখন শহরে প্রবেশ করে তখনও সম্রাট তার সম্মুখে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেন। যতদিন পোপ কনস্টান্টিনোপলে অবস্থান করেন, ততদিনই সম্রাট সকাল-সন্ধ্যায় গিয়ে তাকে অভিবাদন জানান।

কনস্টান্টিনোপলের মনাস্টারিগুলোর বিবরণ

মুসলিমদের যেমন খানকা রয়েছে, তেমনি খ্রিস্টানদের রয়েছে মনাস্টারি বা আশ্রম। এই শহরে এমন অনেক আশ্রম রয়েছে। একটি নির্মাণ করেছেন বর্তমান সম্রাটের পিতা জিরজিস। এটির অবস্থান ইস্তাম্বুলের বাইরে গালাতার মুখোমুখি অবস্থানে। শহরের প্রধান গির্জার ফটকের ডানদিকে রয়েছে পাশাপাশি দুটি আশ্রম। একটি বাগানের মাঝে এই দুটির অবস্থান। মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট একটি নদী। একটি আশ্রম পুরুষদের জন্য, আরেকটি

নারীদের জন্য। প্রতিটি আশ্রমেই রয়েছে পৃথক গির্জা। গির্জার চতুর্দিকে রয়েছে ইবাদতকারী নারী-পুরুষদের কক্ষ। প্রতিটি আশ্রমের খরচের জন্যই বরাদ্দ রয়েছে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ। পূর্বেকার একজন সম্রাট এই দুটি আশ্রম নির্মাণ করেছেন। প্রধান গির্জার প্রবেশপথের বামদিকেও রয়েছে অনুরূপ দুটি আশ্রম। এই দুটি আশ্রমকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ঘরবাড়িও গড়ে তোলা হয়েছে সেখানে। একটিতে বসবাস করে অন্ধ ব্যক্তিরা। আরেকটিতে বসবাস করে ষাট বা তদূর্ধ্ব বয়সী বৃদ্ধ ব্যক্তিরা। এই দুটির জন্যও নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দ রয়েছে। প্রতিটি আশ্রমেই রয়েছে নির্মাণকারী সম্রাটের প্রার্থনার জন্য ছোট কক্ষ। তাদের অধিকাংশ সম্রাটই ষাট বা সত্তর বছর অতিক্রম করার পর সন্তানের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে আশ্রম নির্মাণ করে অথবা পশমি কাপড় পরিধান করে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসতেন। অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিপালকের প্রার্থনায় নিরত হতেন। এই সকল আশ্রম নির্মাণে তারা অত্যন্ত জাঁকজমক প্রদর্শন করতেন। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হতো মূল্যবান মার্বেল পাথর। মেঝেতে ও দেয়ালে করা হতো মোজাইকের কাজ। এই শহরে এমন অনেক আশ্রমের দেখা মিলে।

সম্রাটের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া রোমীয় ব্যক্তির সঙ্গে আমি নদীর তীরে অবস্থিত একটি আশ্রমে প্রবেশ করেছিলাম। সেটিতে অবস্থিত গির্জায় আমি প্রায় পাঁচশত কুমারী মেয়েকে দেখতে পাই। তাদের সম্মুখে একটি মিম্বারে বসে বাইবেল পাঠ করছিল অল্পবয়সী একটি বালক। তার মতো মিষ্টি কণ্ঠ আমি খুব কমই শুনেছি। তার পাশেই নিজ নিজ মিম্বারে বসেছিল আরো আটজন বালক। তাদের সঙ্গে ছিল আশ্রমের যাজক। এক বালকের বাইবেল পাঠ শেষ হলে আরেক বালক পাঠ করা শুরু করত। রোমীয় ব্যক্তিটি আমাকে জানায়, এরা সবাই রাজবংশের কন্যা। গির্জার সেবার জন্য তারা নিজেদের নিবেদিত করেছে। এমনিভাবে বালকগুলোও রাজবংশের। এই গির্জার বাইরে তাদের জন্য আরেকটি গির্জা রয়েছে। কোনো এক বাগানে অবস্থিত আরেকটি গির্জাতেও আমরা গিয়েছিলাম। সেখানেও এমন প্রায় পাঁচশ কুমারী মেয়ে ও মিম্বারে উপবিষ্ট একদল অল্পবয়সী বালক দেখতে পাই। রোমীয় ব্যক্তিটি আমায় বলে, এরা সবাই উজির ও রাজন্যবর্গের কন্যা। এই গির্জায় তারা প্রার্থনা করে। অতঃপর আমি এমন বেশকয়েকট গির্জায় প্রবেশ করেছি। যেখানে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কুমারী কন্যারা অবস্থান করে। আরো কিছু গির্জায় গিয়ে দেখেছি অশীতিপর বৃদ্ধা নারীদেরকে। কিছু গির্জায় দেখেছি সন্ন্যাসীদেরকে।

একেকটি গির্জাতে একশ বা তার কিছু কম-বেশি পুরুষ অবস্থান করে। এই শহরের অধিকাংশ অধিবাসীই এমন সন্ন্যাসী, যাজক অথবা প্রার্থনার জন্য নিরত। সবমিলিয়ে এই শহরে অসংখ্য গির্জা রয়েছে। শহরের নাগরিকরা শীত-গ্রীষ্ম সবসময়েই মাথায় হ্যাট পরিধান করে আর মহিলারা পরিধান করে বড় পাগড়ির মতো স্কার্ফ।

সন্ন্যাসী বনে যাওয়া সম্রাট জিরজিসের বিবরণ

তিনি নিজের সন্তানের কাছে ক্ষমতা তুলে দিয়ে প্রার্থনার জন্য নিজেকে নিরত করার লক্ষ্যে শহরের বাইরে উপকূলের কাছে আশ্রম নির্মাণ করেছেন। রোমীয় ব্যক্তির সঙ্গে শহর ঘুরতে বের হয়ে একদিন দেখি তিনি পশমি কাপড় ও জীর্ণ টুপি পরিধান করে পায়চারি করছেন। তার সুশ্রী ও লম্বা শুভ্র দাড়িবিশিষ্ট চেহারায় ইবাদতের ছাপ স্পষ্ট। তার সামনে পেছনে ছিল একদল সন্ন্যাসী। তার হাতে ছিল একটি যাজকের লাঠি আর গলায় ছিল একটি পুঁতির মালা। রোমীয় ব্যক্তিটি তাকে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে গিয়ে আমাকে বলে, আপনিও নামুন। ইনি আমাদের মহামান্য সম্রাটের পিতা। অতঃপর রোমীয় ব্যক্তিটি তাকে গিয়ে সালাম জানালে তিনি আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। তারপর আমাকে তার কাছে যেতে বলেন। আমি তার কাছে যাওয়ার পর তিনি আমার হাতে ধরেন এবং সেই রোমীয় ব্যক্তিটিকে বলে (সে আরবি ভাষাও জানত), এই সারাকিন অর্থাৎ মুসলিমকে বলো, যে হাত বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছে আমি সেই হাতের সঙ্গে মুসাফাহা করি। আর যে পা পবিত্র পাথর, হলি সেপালকার গির্জা ও বেথেলহামে প্রবেশ করেছে আমি তা স্পর্শ করি। এই হলে তিনি তার হাত দিয়ে আমার পা স্পর্শ করে হাত দিয়ে তার চেহারা মুছে নেন। আমি তাদের এই বিশ্বাস দেখে হতবাক হই। তাদের ধর্মের বাইরেও যে কেউ এই স্থানগুলোতে গেলে তারা এমন ভক্তি দেখায়। অতঃপর তিনি আবারও আমার হাত ধরেন। আমি তার সঙ্গে হাঁটতে থাকি। তিনি আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাস ও সেখানকার খ্রিস্টানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এভাবে আরো অনেক প্রশ্ন করে তিনি কথোপকথন প্রলম্বিত করেন। আমি তার সঙ্গে শহরের প্রধান গির্জার চত্বরে প্রবেশ করি। যে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। গির্জার প্রধান ফটকে এসে উপস্থিত হওয়ার পর তাকে দেখে ভেতর থেকে একদল ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসী বেরিয়ে এসে তাকে সালাম জানায়। তিনি তাদের প্রধান হিসেবে বিবেচিত।

তাদেরকে দেখে তিনি আমার হাত ছেড়ে দেন। আমি তাকে বলি, আমি আপনার সঙ্গে গির্জার ভেতরে যেতে চাই। তিনি দোভাষীকে বলেন, তাকে বলো, এর ভেতরে যেতে হলে আমাদের ক্রুশের সম্মুখে সেজদা করা বাধ্যতামূলক। এটি আমাদের পূর্বপুরুষের সময় থেকে চলে আসা নিয়ম। কোনোভাবেই এটির বিপরীত করা যাবে না। তখন আমিও তাকে ছেড়ে চলে আসি। তিনি একাই গির্জায় প্রবেশ করেন। এরপর তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

কনস্টান্টিনোপলের বিচারকের বিবরণ

সম্রাটের সাধক পিতার সঙ্গে ছেড়ে আমি বিচারক ও কেরানিদের বাজারে প্রবেশ করি। সেখানে শহরের বিচারক আমাকে দেখে তার এক সহচরকে আমার নিকট প্রেরণ করেন। সে এসে আমার সঙ্গে থাকা রোমীয় ব্যক্তির কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। রোমীয় ব্যক্তি জবাবে বলে, তিনি একজন মুসলিম ধর্মীয় পণ্ডিত। এই শুনে সেই ব্যক্তি বিচারকের কাছে ফিরে গিয়ে এই খবর জানায়। এই সংবাদ পেয়ে তিনি আরেকজন সহচরকে আমার কাছে পাঠান। এই বিচারককে তারা বলে নাজাশি কিফালি। সেই সহচর এসে আমাকে বলেন, নাজাশি কিফালি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তখন সিঁড়ি বেয়ে তার ছাউনিতে প্রবেশ করি। যেটির কথা পূর্বেই বলেছি। গিয়ে দেখি বিচারক সুশ্রী চেহারা ও সুঠাম দেহের অধিকারী একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। তার পরনে যাজকদের কালো পোশাক। তার সম্মুখে বসে দশজনের মতো কেরানি লিখছে। তিনি আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালে তার সহচররাও উঠে দাঁড়ায়। তিনি আমাকে বলেন, আপনি আমাদের মহামান্য সম্রাটের অতিথি। তাই আপনার সম্মান করা আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়। অতঃপর তিনি আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাস, শাম ও মিসর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে দীর্ঘ আলাপ করেন। এ সময় অনেক লোকের ভিড় জমে যায় সেখানে। তিনি আমাকে বলেন, আপনাকে অবশ্যই একবার আমার গৃহে মেহমানদারির দাওয়াত রাখতে হবে। তারপর আমি তার এখান থেকে ফিরে আসি। পরে আর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি।

কনস্টান্টিনোপল থেকে ফিরতি যাত্রা

খাতুনের সঙ্গে আসা তুর্কিরা যখন বুঝতে পারলে যে, এই খাতুন এখনো তার পিতার ধর্মেই আছেন এবং তার সঙ্গেই থাকতে ইচ্ছুক, তখন তারা খাতুনের কাছে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চায়। তিনিও তাদের অনুমতি দেন

এবং অনেক উপহার দেন। এমনিভাবে তাদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে সারুজা নামক এক সেনাপতিকেও পাঁচশ সৈন্যের বাহিনীসমেত প্রেরণ করেন। তিনি আমাকেও খোঁজ করেন। অতঃপর আমাকে তাদের সাম্রাজ্যের তিনশ স্বর্ণমুদ্রা (এটি বারবারা নামে পরিচিত এবং এর মূল্যমান খুব বেশি নয়), দুই হাজার ভেনিসীয় দিরহাম, তার দাসীদের হাতে তৈরি করা একটি উৎকৃষ্ট সুতি পোশাক এবং রেশম, লিনেন ও পশমের তৈরি দশটি পোশাক উপহার দেন। তার পিতার পক্ষ থেকে উপহার দেন দুইটি ঘোড়া। সেনাপতি সারুজাকেও আমার ব্যাপারে বিশেষ দেখভালের নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর আমি তাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসি। মোট একমাস ছয়দিন আমি তাদের কাছে অবস্থান করেছিলাম।

অতঃপর সেনাপতি সারুজার সঙ্গে আমাদের সফর শুরু হয়। তিনি আমাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। অতঃপর আমরা তাদের অঞ্চলের সর্বশেষ প্রান্তে এসে উপনীত হই। যেখানে আমাদের আসবাবপত্র ও মালগাড়িগুলো রেখে গিয়েছিলাম। আমরা সেই মালগাড়িতে চড়ে মরুপথে যাত্রা শুরু করি। সেনাপতি সারুজা আমাদেরকে বাবা সালতুক শহর পর্যন্ত পৌঁছে দেন। সেখানে তিনদিন আতিথেয়তা উপভোগ করে পুনরায় তার অঞ্চলে ফিরে যান। তখন শীত তীব্র আকার ধারণ করেছে। আমি তখন একসঙ্গে তিনটি পশমি সোয়েটার ও দুইটি পায়জামা পরিধান করতাম। একটি পায়জামা ছিল বেশ মোটা কাপড়ের। আর পায়ে পরিধান ছিল পশমের তৈরি মোজা। এর উপরে ছিল লিনেন কাপড়ের আরেকজোড়া মোজা। এর উপরে পরেছিলাম বুরগালি নামক বিশেষ একপ্রকার মোজা। যা ঘোড়া ও নেকড়ের চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয়। আগুন প্রজ্বলিত করে এর কাছাকাছি গরম পানি দিয়ে অযু করতাম। সেই পানির একটি ফোঁটা নিচে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে বরফ হয়ে যেত। পানির মাধ্যমে মুখ ও দাড়ি ধৌত করার পর তা জমে যেত। দাড়ি নাড়া দিলে সেখান থেকে বরফ টুকরো ঝরে পড়ত। নাক থেকে বেয়ে আসা পানি জমে যেত গোঁফের কাছে এসে। অধিক পোশাক পরিধানের কারণে আমি একা ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতে পারতাম না। সঙ্গীদের সাহায্যের প্রয়োজন হতো।

অতঃপর আমরা আলহাজ তারাখান শহরে এসে উপনীত হই। এই শহর থেকেই সুলতান আমাদের বিদায় জানিয়েছিলেন। এসে দেখি তিনি এখান থেকে সবকিছু গুটিয়ে তার রাজধানীতে চলে গেছেন। তখন আমরা ভলগা

নদীর উপর জমে থাকা বরফের উপর দিয়ে সফর করি। পানির প্রয়োজন হলে বরফ কেটে একটি পাত্রে রাখলেই তা পানি হয়ে যেত। আমরা সেই পানি পান করতাম ও তা দিয়ে রান্না করতাম। তিনদিন পর আমরা সারায় শহরে এসে পৌছাই। এটি সারা বারাকা নামেও পরিচিত। সুলতান মুহাম্মাদ উজবেকের সাম্রাজ্যের রাজধানী। সুলতানের কাছে যাওয়ার পর তিনি আমাদেরকে সফর কেমন হয়েছিল, কনস্টান্টিনোপল শহর কেমন, সেখানকার সম্রাট ও নাগরিকদের আচার-ব্যবহার কেমন ছিল? ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। আমরা তাকে বিস্তারিত উত্তর প্রদান করি। অতঃপর তিনি আমাদের জন্য খরচের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলে আমরা সেখানে অবস্থান করি।

সারা শহরটি অত্যন্ত সুন্দর ও চমৎকার। আয়তনেও বিশাল। বিস্তৃত এক ভূখণ্ডের মাঝে এই শহরের অবস্থান। এখানে অনেক লোকের বসবাস। শহরের বাজারগুলো বেশ সুবিন্যস্ত, গোছালো এবং সড়কগুলোও অত্যন্ত প্রশস্ত।

একদিন শহরের বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঘুরতে বের হই। উদ্দেশ্য ছিল শহরের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে দেখে এর বিশালতা ও আয়তন সম্পর্কে ধারণা নেওয়া। আমরা অবস্থান করেছিলাম শহরের একপ্রান্তে। সেখান থেকে ভোরবেলায় আমরা যাত্রা শুরু করি। অপরপ্রান্তে পৌছুতে দুপুর গড়িয়ে যায়। আমরা নামায পড়ে দুপুরের খাবার খেয়ে নিই। অতঃপর পুনরায় আমাদের অবস্থানে এসে পৌছুতে পৌছুতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আরেকদিন আমরা শহরের প্রস্থ ধরে হেঁটে হেঁটে গিয়েছিলাম। ফিরে আসতে অর্ধেক দিন লেগে গিয়েছিল। আমরা হেঁটে গিয়েছিলাম একেরপর এক নিরবচ্ছিন্ন ঘরবাড়ির পাশ দিয়ে। ছিল না কোনো বিরান মরু অঞ্চল, এমনকি কোনো বাগানও। শহরে মোট তেরোটি জামে মসজিদ রয়েছে। একটি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য। এছাড়াও আরো অনেক পাঞ্জেগানা মসজিদ রয়েছে। এখানে বেশকিছু শ্রেণীর লোক বাস করে। মোঙ্গলরাই এখানকার স্থানীয় ও ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী। তাদের একাংশ মুসলিম। তাদের বাইরে আস জাতির লোকেরাও মুসলিম। আর কিফজাক (ককেশাস), জারকাস, রুস ও রোম জাতীয়তার লোকেরা খ্রিস্টান। প্রতিটি জাতিই বসবাস করে পৃথক পৃথক মহল্লায়। তাদের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক বাজার। ইরাক, মিসর, শাম এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত ব্যবসায়ী ও

মুসাফিররা বাস করেন প্রাচীরঘেরা একটি মহল্লায়। ব্যবসায়ীদের সম্পদের নিরাপত্তার জন্য তাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এখানে সুলতানের প্রাসাদকে বলা হয় আলতুন তাশ। আলতুন শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বর্ণ আর তাশ শব্দের অর্থ হচ্ছে পাহাড়। এই শহরের বিচারক কাজি বদরুদ্দিন আল আ'রাজ বেশ সুদক্ষ, বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

এখানে শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সদরুদ্দিন সুলাইমান আল লাকাজি। তিনি অত্যন্ত বরেণ্য একজন ব্যক্তি। মালিকি মাযহাবের উল্লেখযোগ্য আলেম হচ্ছেন শামসুদ্দিন আল মিশরি। তবে তার দীনদারিতা নিয়ে অনেকের আপত্তি রয়েছে। এখানে আলহাজ নিজামুদ্দিন নামক একজন বুযুর্গের খানকা রয়েছে। তিনি এই খানকায় আমাদের সম্মান-সমাদর ও মেহমানদারি করেছেন। ফকিহ ও আলেম নুমানুদ্দিন আল খাওয়ারিজমির খানকাও রয়েছে এখানে। এই খানকায় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি বরেণ্য ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন আলেম ও বুযুর্গ। উত্তম চরিত্রবান, অত্যন্ত বিনয়ী এবং দুনিয়াবিমুখ। তার কাছ থেকে অনেক উপকার লাভের সুযোগ রয়েছে। সুলতান মুহাম্মাদ উজবেক প্রতি সপ্তাহে একবার তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসেন। তিনি তখন তাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে যান না এবং উঠেও দাঁড়ান না। সুলতান তার সম্মুখে এসে নতজানু হয়ে বসেন এবং অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র স্বরে তার সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু শায়খ তার সঙ্গে কথা বলেন উচ্চস্বরে। তবে অন্য অসহায়-দরিদ্র ব্যক্তি ও অতিথিদের সঙ্গে তার ব্যবহার এর বিপরীত। তাদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও কোমল স্বরে কথাবার্তা বলেন এবং খুব সম্মান করেন। তিনি আমাকেও অনেক সম্মান দেখিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি আমাকে একটি তুর্কি ক্রীতদাসও উপহার দেন। আমি তার বরকত ও কারামতের সাক্ষী হয়েছিলাম।

তার একটি কারামত

আমি সারায় থেকে খাওয়ারিজম শহরের উদ্দেশে সফর করতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে নিষেধ করে বলেন, কিছুদিন এখানে থাকুন। তারপর না হয় সফর করবেন। আমি তবুও যাওয়ার পক্ষেই থাকি। আমি সেখানে খাওয়ারিজমের উদ্দেশে সফরে ইচ্ছুক বিরাট একটি কাফেলা পেয়েছিলাম। তাদের মধ্যে আমার পরিচিত কিছু ব্যবসায়ীও ছিল। তাই আমি তাদের সঙ্গে

খাওয়ারিজমে যাওয়ার সুযোগটুকু হারাতে চাইছিলাম না। শায়খ নুমানুদ্দিন আল খাওয়ারিজমিকে এ ব্যাপারে জানালে তিনি আমাকে বলেন, আপনাকে থাকতেই হবে। কিন্তু আমি যাওয়ার ব্যাপারেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকি। ইত্যবসরে আমার একটি গোলাম পালিয়ে যায়। তার কারণে আমার এখানেই থাকতে হয়। এই ঘটনা থেকেই তার কারামত প্রকাশিত হয়।

তিনদিন পর আমার এক সঙ্গী সেই পলাতক গোলামকে আলহাজ তারাখান শহরে খুঁজে পেয়ে তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসে। এরপরই আমি খাওয়ারিজমের উদ্দেশে সফর শুরু করি। সারা ও খাওয়ারিজম শহরের মাঝে মরুপথে চল্লিশদিনের দূরত্ব। ঘাসের স্বল্পতার কারণে এই পথে ঘোড়ার মাধ্যমে সফর করা যায় না। উটচালিত মালগাড়িই এই পথের একমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম।

তুর্কিস্তান ও খোরাসান

সারায় থেকে যাত্রা করে দশ দিনের মাথায় আমরা সারাজুক শহরে পৌঁছাই। জুক অর্থ ছোট। সারাজুক শব্দের অর্থ দাঁড়ায় ছোট সারা শহর। খরস্রোতা বিশাল এক নদীর তীরে এই শহরের অবস্থান। নদীটি উলুসু নামে পরিচিত। এর অর্থ হয় বিশাল জলরাশি। এর উপর নৌকার মাধ্যমে বাগদাদের সেতুর মতো করে একটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এই শহরে এসেই ঘোড়ায় টানা মালগাড়ির মাধ্যমে সফর শেষ হয়। এরপর আমরা চার দিনার ও তার কম মূল্যে একেকটি ঘোড়া বিক্রি করে দেই। একে তো ঘোড়াগুলো ছিল দুর্বল। উপরন্তু এই শহরে ঘোড়ার মূল্য খুবই সস্তা। অতঃপর আমরা মালগাড়ি টানার জন্য উট ভাড়া করি। এই শহরে আতা নামক এক বৃদ্ধি তুর্কি বুযুর্গের খানকা রয়েছে। আতা শব্দের অর্থ পিতা। তিনি নিজ খানকায় আমাদের জন্য মেহমানদারির ব্যবস্থা করেন এবং দোয়া করেন। এখানকার বিচারকও আমাদের আতিথেয়তার আয়োজন করেন। তার নাম জানতে পারিনি।

অতঃপর টানা ত্রিশদিন আমরা অনবরত দ্রুতগতিতে সফর করি। দৈনিক মাত্র দুই ঘণ্টার জন্য বিরতি নিতাম। একবার বিরতি নিতাম পূর্বাহ্নের সময়। আরেকবার সূর্যাস্তের সময়। দুগির পানীয় রান্না করে তা পান করা পর্যন্ত যতটুকু সময় লাগত, ততটুকু সময়ই অবস্থান করতাম। তা এক জ্বালেই রান্না করতে হয়। কাফেলার যাত্রীদের সঙ্গে শুকনো গোশতও থাকত। সেই শুকনো গোশতকে তারা দুগির পানীয়তে ঢেলে দুধ সহযোগে পান করত। আর আমরা ঘুমাতাম সফর অবস্থায় গাড়ির মধ্যেই। আমার সঙ্গে মালগাড়িতে ছিল তিনজন দাসী। এই মরুভূমিতে ঘাস ও উদ্ভিদ অনেক কম থাকায় এই পথে সবাই যথাসম্ভব দ্রুত সফর করে। এই মরুভূমি অতিক্রম করা উটগুলোর অধিকাংশই ঢলে পড়ে মৃত্যুর মুখে। যেগুলো অক্ষত থাকে এতটাই কাহিল হয়ে পড়ে যে, সেগুলোকে নিয়ে পরবর্তী বছরের আগে এই মরুভূমি পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয় না। হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার পরেই সেগুলো সফরের উপযুক্ত হয়। দুইদিন অথবা তিনদিন পরপর নির্দিষ্ট কিছু স্থানে পানি পাওয়া যায়। এগুলো বৃষ্টির জমে থাকা পানি অথবা বালির নিচে ঢেকে যাওয়া পুরোনো কোনো কূপের পানি।

অবশেষে এমন ক্লান্তি ও কষ্ট-ক্লেশের সফর শেষে মরুভূমি অতিক্রম করে আমরা খাওয়ারিজম শহরে এসে উপনীত হই।[১] এটি তুর্কিস্তানের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সুন্দর সুবিশাল শহর। এখানকার বাজারগুলো জমজমাট আর সড়কগুলো বেশ প্রশস্ত। বাড়িঘরগুলোও বেশ নান্দনিক। এখানে অনেক লোকের বসবাস হওয়ায় প্রচুর বসতবাড়ি চোখে পড়ে। একদিন আমি বাহনে চড়ে শাহওয়ার নামক স্থানে বাজারে যাই। বাজারের মাঝামাঝি গিয়ে পড়ে যাই বিশাল এক ভিড়ের মাঝে। আমি সেই ভিড় অতিক্রম করে কিছুতেই যেতে পারছিলাম না। তাই ফেরার চিন্তা করতেই দেখি ফেরারও কোনো পথ খোলা নেই। আমি সেই ভিড়ের মাঝে হতদন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। অবশেষে অনেক চেষ্টা-সাধনা করে কোনোমতে সেখান থেকে বেরোতে সক্ষম হই। একজনের কাছ থেকে শুনতে পাই, শুধুমাত্র জুমার দিনেই এখানকার বাজারগুলোতে ভিড় থাকে না। জুমার দিন আমি শহরের জামে মসজিদ ও মাদরাসায় গমন করি।

এই শহরটি সুলতান মুহাম্মাদ উজবেকেরই শাসনাধীনে রয়েছে। এখানে তিনি কুতলুদুমুর নামক বিশিষ্ট এক গভর্নরকে নিয়োজিত করেছেন। তিনিই শহরের মাদরাসাটি নির্মাণ করে পার্শ্ববর্তী স্থানগুলো আবাদ করেছেন। আর জামে মসজিদটি নির্মাণ করেছেন তার সতী সাধ্বী স্ত্রী খাতুন তুরাবাক। খাওয়ারিজমে একটি হাসপাতালও রয়েছে। সেখানে শামের একজন চিকিৎসক রয়েছেন। শামের সাহইয়ুন অঞ্চলের নামানুসারে তিনি আস সাহইয়ুনি নামে পরিচিত।

খাওয়ারিজমের অধিবাসীদের চেয়ে সভ্য, ভদ্র, উত্তম শিষ্টাচারবিশিষ্ট, উদার ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী এবং অতিথিপরায়ণ মানুষ আমি পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখিনি। নামাযের সময়গুলোতে তারা খুবই সুন্দর একটি নিয়ম অনুসরণ করেন। যা আমি অন্য কোথাও দেখিনি। নামাযের সময় হয়ে এলে মসজিদের মুয়াযযিনগণ মহল্লার প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে নামাযে শরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসেন। কেউ জামাতে উপস্থিত না হলে ইমাম তাকে উপস্থিত সবার সম্মুখে প্রহার করেন। এই কাজের জন্য প্রতিটি

---

[১] খাওয়ারিজম ছিল আমু দরিয়ার অববাহিকায় অবস্থিত মধ্য এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল এক মরুময় ভূখণ্ডের নাম। এর উত্তরসীমান্তে ছিল আরাল সাগর, পূর্বে কিজিলকুম মরুভূমি, দক্ষিণে কারাকুম মরুভূমি আর পশ্চিমে ছিল উসটিয়ুর্ট মালভূমি। বর্তমানে এই অঞ্চলটি উজবেকিস্তান, কাজাখাস্তান ও তুর্কমেনিস্তান এই তিন দেশে বিভক্ত।–অনুবাদক

মসজিদেই একটি করে বেত থাকে। এছাড়াও তাকে পাঁচ দিনার জরিমানা করা হয়। যা মসজিদের উন্নয়ন ও অসহায়-দরিদ্রদের খাবারের আয়োজনের জন্য ব্যয় করা হয়। তারা জানান, অনেক আগে থেকেই তারা এই নিয়ম অনুসরণ করে আসছেন।

খাওয়ারিজমের বাইরে তাকালেই দেখা যায়, কলকল রবে যাচ্ছে আমুদরিয়া নদী। জান্নাত থেকে প্রবাহিত হওয়া চারটি নদীর একটি।[১] ইতিল (ভলগা) নদীর মতো এই নদীর পানিও শীতের সময় বরফ হয়ে যায়। তখন মানুষ এর উপর দিয়ে চলাচল করে। মোট পাঁচ মাস এই নদীর পানিতে বরফ জমে থাকে। মাঝে মাঝে এর উপর দিয়ে চলার সময় বরফ গলতে শুরু করে। তখন সফররত ব্যক্তিরা পড়ে যার মৃত্যুমুখে। গ্রীস্মকালে এখানকার লোকেরা নৌযানের মাধ্যমে নদীপথে তিরমিয শহরে গিয়ে সেখান থেকে গম ও যব আমদানি করে। নদীপথে এখান থেকে তিরমিযের দূরত্ব দশদিনের সফর সমান। খাওয়ারিজমে শহরতলীতে শায়খ নাজমুদ্দিন আল কুবরার সমাধিকে কেন্দ্র করে একটু খানকা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই শায়খ ছিলেন প্রসিদ্ধ একজন বুযুর্গ। খানকায় আগত দর্শনার্থীদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আলেম সাইফুদ্দিন বিন গাজবা এই খানকার তত্ত্বাবধায়ক শায়খ হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি খাওয়ারিজমে বিশিষ্ট একজন ব্যক্তিত্ব। এখানে আরো রয়েছে পার্শ্ববর্তী সমরকন্দ শহর থেকে আগত বুযুর্গ শায়খ জালালুদ্দিন আস সমরকন্দির খানকা। তিনি এই খানকায় আমাদের আতিথেয়তার আয়োজন করেছেন। শহরের উপকণ্ঠে আরো রয়েছে প্রসিদ্ধ মনীষী আল্লামা আবুল কাসিম মাহমুদ বিন উমর আয যামাখশারি রহ.-এর কবর।[২] কবরের উপর একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। খাওয়ারিজম থেকে চার মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম জামাখশার।

---

[১] সেই চারটি নদী হচ্ছে সাইহান (সিরদরিয়া), জাইহান (আমুদরিয়া), নীলনদ এবং ফোরাত। আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সাইহান, জাইহান, নীল ও ফোরাত প্রতিটি নদীই জান্নাত থেকে প্রবাহিত।' [সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৮৩৯] তবে নীল ও ফোরাত নদীর উৎস হচ্ছে সিদরাতুল মুনতাহা। আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি সিদরাতুল মুনতাহায় উপনীত হওয়ার পর দেখি চারটি নদী। দুইটি নদী প্রকাশ্য ও দুইটি নদী গোপন। প্রকাশ্য দুটি নদী হচ্ছে নীল আর ফোরাত। আর গোপন নদী দুটি জান্নাতের দুটি নদী।' [সহিহুল বুখারি, হাদিস: ৫৬১০]–অনুবাদক

[২] তিনিই প্রসিদ্ধ তাফসিরগ্রন্থ আল কাশশাফের রচয়িতা আল্লামা জারুল্লাহ আয যামাখশারি (৪৬৭-৫৩৮ হিজরি)।–অনুবাদক

t.me/BoierSomahar

খাওয়ারাজিম শহরে উপনীত হয়ে আমি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান করি। আমার এক সঙ্গী শহরের প্রধান বিচারক আবু হাফস উমর আল বাকরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি তার নায়েব নুরুল ইসলামকে আমার কাছে প্রেরণ করেন। নুরুল ইসলাম এসে আমাকে সালাম জানিয়ে বিচারকের কাছে ফিরে যান। অতঃপর প্রধান বিচারক নিজেই তার কিছু সঙ্গীকে নিয়ে এসে আমাকে সালাম জানান। বয়সে তিনি যুবক হলেও কাজে অনেক বড়। তার দুইজন নায়েব বা সহকারী রয়েছেন। একজন নুরুল ইসলাম। অপরজন নুরুদ্দিন আল কিরমানি। যিনি বিশিষ্ট একজন ফকিহ। ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ তাআলার অবমাননার প্রতিবাদে তিনি খুবই কঠোর ও সতর্ক।

প্রধান বিচারকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, এই শহর অনেক জনাকীর্ণ। তাই দিনের বেলায় আপনাদের ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। রাতের শেষভাগে নুরুল ইসলাম এসে আপনাদেরকে শহরের ভেতরে নিয়ে যাবেন। আমরা তা-ই করি। শহরের ভেতরে একটি নবনির্মিত মাদরাসায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে অন্য কেউই ছিলেন না। ফজর নামাযের পর বিচারক শহরের একদল গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমাদের কাছে উপস্থিত হন। তাদের মধ্যে আছেন, মাওলানা হুমামুদ্দিন, মাওলানা জাইনুদ্দিন আল মাকদিসি, মাওলানা রাজিউদ্দিন ইয়াহইয়া, মাওলানা ফজলুল্লাহ আর রিজভি, মাওলানা জালালুদ্দিন আল ইমাদি এবং মাওলানা শামসুদ্দিন আস সিনজারি। শেষোক্ত ব্যক্তি এখানকার গভর্নরের ইমাম। তারা সকলেই জ্ঞানী-গুণী লোক। তাদের অধিকাংশই মুতাযিলা মতাদর্শের অনুসারী হলেও তা প্রকাশ করেন না। কারণ, সুলতান মুহাম্মাদ উজবেক ও এখানকার গভর্নর কুতলুদুমুর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী। খাওয়ারিজমে অবস্থানের সময় আমি বিচারক আবু হাফস উমরের সঙ্গেই তার মসজিদে নামায আদায় করেছি। নামায শেষে তার সঙ্গে তার বাড়িতে চলে যেতাম। মসজিদের নিকটেই ছিল তার বাড়ি। তিনি আমাকে তার সভাকক্ষে নিয়ে যেতেন। তার সভাকক্ষটি ছিল অত্যন্ত চমৎকার। তাতে বিছানো ছিল মূল্যবান সুসজ্জিত গালিচা। দেয়ালে সজ্জিত করা হয়েছিল মূল্যবান কাপড় দিয়ে। দেয়ালে ছিল অনেকগুলো তাক। প্রতিটি তাকেই ছিল অনেকগুলো স্বর্ণখচিত রৌপ্যের পাত্র এবং ইরাক থেকে আমদানিকৃত পাত্র। এই অঞ্চলের প্রত্যেক বাড়িতেই এই পাত্রগুলো দেখা যায়। অতঃপর

প্রতিদিনই খাবার-দাবারের বিশাল আয়োজন করা হয়। বিচারক আবু হাফস একজন সচ্ছল ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। অনেক সম্পদ ও জমি-জমার মালিক। শহরের গভর্নর কুতলুদমুরের সঙ্গে তার আত্মীয়তা রয়েছে। কুতলুদুমরের স্ত্রীর বোন জিজা আগাকে আবু হাফস বিয়ে করেছেন।

এই শহরে বেশকজন প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ ও নসিহতকারী বসবাস করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, মাওলানা জাইনুদ্দিন আল মাকদিসি এবং খতিব মাওলানা হুসামুদ্দিন আল মিশাতী। এই খতিব পৃথিবীর চারজন হৃদয়গ্রাহী আলোচকের একজন। যাদের নসিহত আমার কাছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাব সৃষ্টিকারী ও হৃদয় বিগলিতকারী মনে হয়েছে।

খাওয়ারিজমের গভর্নর

আগেই বলেছি তিনি বিশিষ্ট একজন গভর্নর। তার নাম কুতলুদুমুর। তার নামের অর্থ হয় বরকতময় লোহা। কুতলু শব্দের অর্থ বরকতময়। আর দুমুর শব্দের অর্থ লোহা। তিনি সুলতান মুহাম্মাদ উজবেকের খালাতো ভাই এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত গভর্নর। সুলতানের পক্ষ থেকে তাকে খোরাসানের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। তার পিতা হারুন বেক আবার ছিলেন সুলতানের কন্যার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। এই কন্যার মা খাতুন তাইতুগলি। কুতলুদুমুরের স্ত্রী খাতুন তুরাবাক একজন জ্ঞানে-গুণে এবং উদারতা ও মহত্ত্বে সুখ্যাতি লাভ করেছেন।

বিচারক আবু হাফস প্রথম সাক্ষাতের সময়েই আমার নিকটে এসে সালাম জানিয়ে বলেছিলেন, আমাদের গভর্নর আপনার আগমনের ব্যাপারে জানতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি অসুস্থতা থেকে পুরোপুরি সেরে না উঠায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। অতঃপর আমি বিচারক আবু হাফসের সঙ্গে বাহনে চড়ে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে তার বাসভবনে যাই। অতঃপর প্রবেশ করি বিশাল একটি দরবার হলে। যার ভেতরে রয়েছে কাঠের তৈরি অনেকগুলো ছোট ছোট কক্ষ। এরপর যাই ছোট একটি দরবার হলে। যার ভেতরে কারুকার্যখচিত কাঠের মাধ্যমে তৈরি একটি ছাউনি রয়েছে। এর দেয়াল আবৃত করা হয়েছে তুলো দিয়ে তৈরি বাহারি রঙের কাপড় দিয়ে আর ছাদে ব্যবহার করা হয়েছে স্বর্ণখচিত রেশমি কাপড়। গভর্নর বসে ছিলেন তার জন্য নির্দিষ্ট রেশমি কাপড়ের বিছানায়।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার ফলে তার দুই পা ঢেকে রাখা হয়েছে। তুর্কি অঞ্চলে এই রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়।

আমি গভর্নর কুতলুদুমুরকে সালাম জানাই। তিনি আমাকে তার পাশে নিয়ে বসান। বিচারক আবু হাফস এবং উপস্থিত অন্য ফকিহগণও বসে পড়েন। তিনি আমাকে সুলতান মুহাম্মাদ উজবেক, বাইলুন খাতুন ও তার পিতা এবং কনস্টান্টিনোপল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাকে সবকিছু বিস্তারিত খুলে বলি। অতঃপর নিয়ে আসা হয় বেশকিছু দস্তরখান। সেগুলোতে ছিল ভুনাকৃত মুরগী, বক, কবুতরের বাচ্চা, ঘিয়ে ভাজা রুটি (যেগুলোকে তারা কুলিজা বলে থাকে), বিস্কুট এবং মিষ্টান্ন। এরপর আনা হয় ফলমূলে পরিপূর্ণ আরেকটি দস্তরখান। সেখানে স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে ছিল খোসা ছাড়ানো আনার। এর সঙ্গে ছিল স্বর্ণের চামচ। ইরাকে কাঁচের তৈরি কিছু পাত্রও ছিল। সেগুলোর সঙ্গে ছিল কাঠের চামচ। আরো ছিল আঙুর এবং অবাক করা স্বাদের তরমুজ। এই গভর্নরের রুটিন হচ্ছে, প্রতিদিন বিচারক আবু হাফস তার দরবার হলে এসে নিজের নির্ধারিত আসনে বসবেন। তার সঙ্গে থাকবেন ফকিহ ও কেরানিগণ। তার বিপরীতে বসবেন একজন বিশিষ্ট আমির বা মন্ত্রী। তার সঙ্গে থাকবেন আরো আটজন আমির এবং বয়স্ক কজন তুর্কি ব্যক্তি। যাদেরকে বারগুজি বলা হয়। অতঃপর লোকেরা এসে তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে বিচার কামনা করে। শরয়ী কোনো বিষয়ে এলে রায় প্রদান করেন বিচারক। আর অন্যান্য বিষয়ে রায় প্রদান করেন আমিরগণ। তাদের খুব বিচক্ষণতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে রায় প্রদান করে থাকেন। তাদের মধ্যে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। কারো কাছ থেকে তারা ঘুষও গ্রহণ করেন না। গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে মাদরাসায় ফেরার পর তিনি আমাদের জন্য চাল, ময়দা, ঘি, বাজরা এবং কিছু লাকড়ির বোঝা প্রেরণ করেন। এই অঞ্চলের লোকেরা কয়লা ও অঙ্গারের ব্যবহার সম্পর্কে অবগত নয়। এমনিভাবে ভারতবর্ষ, খোরাসান ও পারস্যের লোকদেরকেও এগুলো ব্যবহার করতে দেখা যায় না। তবে চীনের অধিবাসীরা একধরনের পাথর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। সেগুলোর মাধ্যমে কয়লার মতোই আগুন প্রজ্বলিত হয়। সেই পাথর ছাই হয়ে গেলে তারা এগুলোর সঙ্গে পানি মিশিয়ে খামিরা তৈরি করে রোদে শুকাতে দেয়। শুকিয়ে যাওয়ার পর আবার সেগুলো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। একপর্যায়ে এগুলো পুরোপুরি ক্ষয় হয়ে যায়।

বিচারক আবু হাফস ও গভর্নর কাতলুদুমুরের বদান্যতা

কোনো এক জুমার দিনের কথা। বিচারক আবু হাফসের মসজিদে নামায আদায় করার পর তিনি আমাকে বলেন, গভর্নর আপনাকে পাঁচশ দিরহাম দিতে বলেছেন। আর আপনার সম্মানে একটি দাওয়াতের আয়োজন করে সেখানে আরো পাঁচশ দিরহাম ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেখানে শহরের সকল শায়খ, ফকিহ ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু এই নির্দেশ দেওয়ার পর আমি তাকে বলি, সম্মানিত গভর্নর, আপনি এমন দাওয়াতের আয়োজন করতে বলছেন, যেখানে সবাই এসে এক লোকমা, দুই লোকমা করে খেয়ে চলে যায়। যদি আপনি এই পুরো অংকটাই তাকে দিয়ে দিতেন, তবে তিনি বেশি উপকৃত হতেন। তখন তিনি বলেন, তাহলে তা-ই করুন। এই বলে তিনি আপনাকে পুরো এক হাজার দিরহাম প্রদান করার নির্দেশ দেন।

কিছুক্ষণ পরেই গভর্নর তার ইমাম শামসুদ্দিন আস সিনজারিকে দিয়ে তিনি আমার কাছে সেগুলো প্রেরণ করেন। তার সঙ্গে একজন গোলাম একটি থলেতে করে সেগুলো নিয়ে এসেছিল। মাগরিবের স্বর্ণমুদ্রার হিসেবে এর মূল্যমান হবে তিনশ দিনার। সেদিনই আমি পঁয়ত্রিশ দিনারের বিনিময়ে একটি কালো রঙের ঘোড়া ক্রয় করে এর পিঠে চড়ে মসজিদে যাই। গভর্নরের উপহার পাঠানো এক হাজার দিরহাম থেকেই আমি এর মূল্য পরিশোধ করি। এরপর আমার কাছে অনেক ঘোড়া জমে যায়। এমনকি এতই বেশি হয়ে যায় যে, প্রকৃত সংখ্যাটি উল্লেখ করলে অনেকেই আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে। তাই আমি সেটি উল্লেখ করব না। এমনকি ভারতবর্ষে প্রবেশ করার সময়েও আমার সঙ্গে এমন অসংখ্য ঘোড়া ছিল। কিন্তু এতসব ঘোড়ার মধ্যে আমি এই কালো ঘোড়াটিকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতাম। একে বাঁধতাম আমার অন্য সব ঘোড়ার আগে। তিন বছর ঘোড়াটি আমার কাছে ছিল। এটির মৃত্যুর পর আমার অবস্থা পালটে যায়।

বিচারক আবু হাফসের স্ত্রী জিজা আগাও আমার কাছে একশ দিনার উপহার প্রেরণ করেন। তার বোন ও গভর্নরের স্ত্রী তুরাবাক আমার সম্মানে তার নির্মিত খানকায় একটি দাওয়াতের আয়োজন করেন। যেখানে শহরের সকল ফকিহ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমাগম ঘটেছিল। আগত সকল অতিথির জন্য সেখানে ছিল উৎকৃষ্ট খাবারের ব্যবস্থা। এছাড়াও তিনি আমাকে

সাম্মুরের চামড়ার একটি রুমাল এবং উৎকৃষ্ট মানের একটি ঘোড়া উপহার দেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত উত্তম শিষ্টাচার ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারিণী, সতীসাধ্বী মহীয়সী একজন নারী।

একটি ঘটনা

খাতুন তুরাবাকের দাওয়াতের আয়োজন শেষে ফেরার সময় ময়লা কাপড় ও মাথায় নিকাব পরিহিতা একজন নারী খানকার দরজায় এসে দাঁড়ায়। তার সঙ্গে আরো কজন মহিলাও ছিল। সঠিক সংখ্যাটি আমার মনে পড়ছে না। সেই নারী আমাকে সালাম জানালে আমি তার উত্তর প্রদান করি। অতঃপর আমি মহিলার দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে তখনই সেখান থেকে চলে আসি। পরে এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলেন, যে মহিলা আপনাকে সালাম দিয়েছেন, তিনিই খাতুন তুরাবাক। এই কথা শুনে আমি যারপরনাই লজ্জিত হই। পুনরায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে দেখি তিনি ফিরে গেছেন। অতঃপর আমি তার খাদেমের মাধ্যমে সালাম পৌঁছাই এবং তাকে না চেনার ফলে আমার অনভিপ্রেত আচরণের কারণে দুঃখ প্রকাশ করি।

খাওয়ারিজমের সুস্বাদু তরমুজ

সারা দুনিয়া চষে বেড়ালেও খাওয়ারিজমের অতুলনীয় স্বাদের তরমুজের সমকক্ষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে বুখারা ও ইস্পাহানের তরমুজকেও এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এর উপরের আবরণ সবুজ আর ভেতরে টকটকে লাল। খুবই মিষ্টি ও আঠালো স্বাদের। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এই তরমুজকে টুকরো টুকরো করে রোদে শুকিয়ে প্যাকেটজাত করে রাখা হয়। যেমনটি আমাদের অঞ্চলের তিনফল বা ডুমুরের ক্ষেত্রে দেখা যায়। অতঃপর প্যাকেটজাত এই তরমুজকে সুদূর চীন ও ভারতবর্ষে রপ্তানি করা হয়। শুকনো ফলমূলের মধ্যে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু হতে পারে না। ভারতবর্ষে দিল্লীতে অবস্থান করার সময় যতবারই কোনো মুসাফিরের আগমনের সংবাদ পেয়েছি, আমি তার কাছ থেকে প্যাকেটজাত সেই তরমুজের টুকরো ক্রয় করার লোক পাঠিয়েছি। এমনিভাবে দিল্লীর সুলতানের কাছেও এই তরমুজ উপহার এলে তিনি আমার কাছেও কিছু অংশ পাঠিয়ে দিতেন। তিনি জানতেন আমি এই তরমুজ কতটা পছন্দ করি। দূর থেকে আগত অতিথিদেরকে নিজ অঞ্চলের ফল দিয়ে আপ্যায়ন করানো ছিল তার

t.me/BoierSomahar

চমৎকার একটি অভ্যাস। অতিথিদের পছন্দনীয় খাবার ও ফলমূলের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে তিনি তাদেরকে সেগুলো দিয়ে আপ্যায়ন করাতে পছন্দ করতেন।

একটি ঘটনা

সারা থেকে খাওয়ারিজমের উদ্দেশে যাত্রা করার সময় কারবালার অধিবাসী আলী ইবনে মানসুর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার সঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। আমি তাকে আমার জন্য কাপড় ও অন্যান্য পণ্য কিনতে বলতাম। তিনি আমার জন্য দশ দিনার দিয়ে কাপড় কিনে বলতেন, আমি এটি আট দিনার দিয়ে কিনেছি। এই বলে আমাকে আট দিনারের হিসাব বুঝিয়ে দিতেন। বাকি দুই দিনার পরিশোধ করতেন তার নিজের পক্ষ থেকে। আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। পরে অন্যদের কাছ থেকে আমি এই কথা জানতে পারি। এছাড়াও তিনি আমাকে কিছু দিনার ঋণও দিয়েছিলেন। তাই আমি তার এই উত্তম কাজের যথাযথ বিনিময় প্রদানের ইচ্ছা করি। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে আমাকে শপথ করিয়ে বলেন, আমি যেন কখনোই এমনটি না করি। তখন আমি তার কাফুর নামক গোলামকে পুরস্কার দিতে চাইলে এখানেও তিনি নিষেধ করেন। আমার দেখা ইরাকের মানুষদের মধ্যে তার মতো উদার ব্যক্তি খুব কমই দেখেছি। তিনি আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে সফর করার দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন। অতঃপর তার এলাকার কিছু লোক চীনে সফর করার উদ্দেশে খাওয়ারিজমে এসে পৌঁছালে তিনি তাদের সঙ্গে সফর করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এরা আমার নিজ এলাকার লোক ও আত্মীয়স্বজন। এরা যদি দেশে ফিরে গিয়ে এ কথা ছড়ায় যে, আমি উপহার-উপঢৌকন চাওয়ার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশে ভারতবর্ষে গিয়েছি, এটি আমার জন্য খুবই অপমানজনক হবে। তাই আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারছি না। অতঃপর তিনি তাদের সঙ্গে চীনের উদ্দেশে সফর করেন। ভারতবর্ষে থাকা অবস্থায় আমি জানতে পারি, মাওয়ারাউন্নাহার ও চীনের সীমান্তবর্তী আল মালিক শহরে পৌঁছে তারা সেখানে অবস্থান করে। আলী ইবনে মানসুর তার সকল সম্পদ ও আসবাবপত্র প্রেরণ করেছিলেন তার এক গোলামকে দিয়ে। কিন্তু তার আসতে বিলম্ব হচ্ছিল। এ সময় তার এলাকার এক ব্যবসায়ী সেখানে এসে পৌঁছালে তিনি তার কাছে কিছু ঋণ চান। গোলাম চলে এলে তা পরিশোধ করে দিবেন। কিন্তু সেই ব্যবসায়ী ঋণ দিতে

রাজি তো হয়নি, উলটো সে আলী ইবনে মানসুরকে অপমান করে। আলী ইবনে মানসুর হোটেলের যে কক্ষে অবস্থান করছিলেন, অসভ্য ব্যবসায়ী লোকটি বেশি মূল্য দিয়ে সেই কক্ষ ভাড়া করে নেয়। এতে করে আলী ইবনে মানসুর খুবই ব্যথিত হন। নিজ কামরায় তিনি নিজ হাতে গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। সবাই যখন তাকে দেখতে পায় তখনো তিনি জীবিত। সবাই তার এক গোলামকে এই হত্যার জন্য অভিযুক্ত করে। তখন তিনি বলেন, তোমরা তাকে অত্যাচার করো না। আমি নিজেই এই কাজ করেছি। সেদিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করুন।

তিনি নিজেই আমাকে তার একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন, একবার তিনি দামেস্কের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ছয় হাজার দিরহাম মুদারাবা হিসেবে নিয়েছিলেন। অতঃপর শামের হামা শহরে তার সঙ্গে সেই ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি আলী ইবনে মানসুরকে তার দিরহাম ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু তিনি সেই দিরহামের বিনিময়ে কেনা পণ্য ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তাই তিনি ব্যবসায়ীর কাছে খুবই লজ্জায় পড়ে যান। এরপর তিনি নিজের কামরায় গিয়ে তার পাগড়িকে ঘরের ছাদের সঙ্গে বেঁধে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার মৃত্যু আরো বিলম্বে লেখা ছিল বলে সে যাত্রায় তিনি বেঁচে যান। তার এক মুদ্রাব্যবসায়ী বন্ধুকে এই ঘটনা জানালে সেই বন্ধুটি ব্যবসায়ীর পাওনা পরিশোধ করে দেন।

এবার খাওয়ারিজম থেকে বিদায় নেওয়ার পালা। পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে সফর করার জন্য আমি একটি উট ভাড়া করি ও দুই অংশবিশিষ্ট হাওদা ক্রয় করি। হাওদার একাংশে ছিলাম আমি, আর অপর অংশে ছিলেন আফিফুদ্দিন তুজারি। খাদেমরা আরোহণ করে কিছু ঘোড়ার উপর। ঠান্ডার কারণে বাকি ঘোড়াগুলোকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। আমাদেরকে যেতে হবে খাওয়ারিজম ও বুখারার মধ্যবর্তী মরুপথে। খাওয়ারিজম থেকে এই পথ ধরে আঠারো দিনের সফর শেষে বুখারায় পৌঁছানো যায়। পথের পুরোটাই প্রায় জনমানবহীন। মাঝে শুধু ছোট একটি শহর রয়েছে। গভর্নর কুতলুদুমুরের কাছ থেকে বিদায় নেই। তিনি আমাকে তখন রাজকীয় সম্মানসূচক পোশাক উপহার দেন। আরেকটি পোশাক উপহার দেন বিচারক আবু হাফস। অন্য ফকিহগণকে সঙ্গী নিয়ে তিনি আমাদের বিদায় জানানোর উদ্দেশে বের হন।

চারদিন সফর করে আমরা আল কাত (কাথ) শহরে এসে পৌঁছাই। এই পথে এই শহরটি ছাড়া আর কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। শহরটি ছোট হলেও বেশ সুন্দর। শহরের উপকণ্ঠে বরফ জমে যাওয়া একটি পুকুরের কাছে আমরা অবস্থান গ্রহণ করি। সেই পুকুরের উপর শিশুরা খেলাধুলা করছিল আর পিছলে পড়ে যাচ্ছিল। শহরের বিচারক আমাদের আগমনের কথা জানতে পারেন। তাকে সদরুশ শরিয়াহ নামে উপাধিতে ডাকা হয়। খাওয়ারিজমের বিচারক আবু হাফসের গৃহে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। এই বিচারক তার অনুচর ও শহরের বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তি শায়খ মাহমুদ আল খুয়ুফিকে নিয়ে আমার কাছে এসে আমাকে সালাম জানান এবং এখানকার গভর্নরের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব জানান। তখন শায়খ মাহমুদ তাকে বলেন, আগত অতিথির প্রাপ্য হচ্ছে গভর্নর নিজে এসে তার সঙ্গে দেখা করবেন। যদি বিষয়টি নিয়ে আমাদের সত্যিই গুরুত্ব থাকে, তাহলে আমাদের উচিত গভর্নরের কাছে গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসা। তারা এই কথার বাস্তবায়ন করেন। কিছু সময় পর শহরের গভর্নর তার সহচর ও সেবকদের নিয়ে আমার কাছে আসেন। আমরা তাকে সালাম জানাই। আমরা চেয়েছিলাম যথাসম্ভব দ্রুত পুনরায় সফর শুরু করতে। কিন্তু গভর্নর আমাদেরকে এখানে অবস্থান করে তার দাওয়াতের আয়োজনে শরিক হতে বলেন। সেখানে শহরের বিশিষ্ট ফকিহ, নেতৃস্থানীয় সৈনিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। একদল কবি আবৃত্তি করে গভর্নরের প্রতি প্রশংসামূলক কবিতা। তিনি আমাকে একটি সম্মানসূচক পোশাক ও উন্নতমানের একটি ঘোড়া উপহার দেন।

অতঃপর আমরা এখান থেকে বিদায় নিয়ে সিয়াবা নামক মরুপথ ধরে যাত্রা শুরু করি। পানিহীন এই পথে আমাদেরকে ছয়দিন সফর করতে হবে। এই পথ শেষে আমরা ওয়াবকানা শহরে এসে উপনীত হই। বুখারা থেকে মাত্র এক দিনের দূরত্বে অবস্থিত ছোট এই শহরটি দেখতে বেশ সুন্দর এবং অনেক নদীনালা ও বাগানের ভরপুর। তারা আঙুরফলের চাষ করে পরবর্তী বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখে। এখানে আলু[১] নামক এক ধরনের ফল পাওয়া যায়। এই ফলকে শুকিয়ে তারা ভারতবর্ষ ও চীনে রপ্তানি করে। পরিপক্ব ও সবুজ থাকা অবস্থায় এই ফল অনেক মিষ্টি হয়। তখন এই ফলকে পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি পান করা হয়। শুকানোর পর এর স্বাদ

---

[১] এটি মূলত বরই বা কুল ফল। পারস্য অঞ্চলে এই ফলকে বলা হয় আলু।

কিছুটা টক হয়ে যায়। এই ফলের উপরের অংশ বেশ মোটা হয়ে থাকে। আন্দালুস ও মাগরিব অঞ্চলে এই ফল আমার চোখে পড়েনি।

অতঃপর পরস্পর সংলগ্ন নিরবচ্ছিন্ন বাগান, নদীনালা, ঘন গাছপালা ও বাড়িঘরের মাঝ দিয়ে পূর্ণ একদিন সফর করে আমরা উপনীত হই হাদীসের প্রখ্যাত ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারির স্মৃতিধন্য শহর বুখারায়। এককালে এই শহরটি ছিল মাওরাউন্নাহার তথা আমুদরিয়া সংলগ্ন অঞ্চলের রাজধানী।[১] ইরাকের বর্তমান সুলতানদের পূর্বপুরুষ পাপিষ্ঠ চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বাধীন তাতার বাহিনী শহরটিকে ধ্বংস করে দেয়। শহরের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদ, মাদরাসা ও বাজারগুলোর সামান্যই এখন অক্ষত আছে। এখানকার বর্তমান অধিবাসীরা লাঞ্ছনার শিকার। তাদের গোঁড়ামি, অবান্তর ও বাতিল যত দাবি এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতির কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার কারণে খাওয়ারিজম ও অন্যান্য শহরে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। বর্তমানে এখানে বসবাসকারী লোকদের কারো মাথায় না আছে কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি, না আছে জ্ঞান শিখার প্রতি কোনো গুরুত্ব বা আগ্রহ।

তাতারদের পূর্বপুরুষ এবং তাদের হাতে বুখারাসহ অন্যান্য অঞ্চলের ধ্বংসযজ্ঞ

চেঙ্গিজ খান ছিল খাতা অঞ্চলের[২] একজন কামার। সে ছিল বেশ উদার মনের, শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের অধিকারী একজন ব্যক্তি। অনেক লোককে একত্র করে সে খাবারের আয়োজন করত। এভাবে তার নেতৃত্বে বিশাল একটি দল তৈরি হয়ে যায়। একপর্যায়ে সে নিজ অঞ্চলের ক্ষমতা দখল করে নেয়। এরপর সে ক্রমেই আরো শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ হতে থাকে। এরপর সে প্রথমে পরাজিত করে খাতা অঞ্চলের রাজাকে, তারপর চীনের রাজাকেও নাস্তানাবুদ করে দেয়। ধীরে ধীরে তার হাতে গড়ে উঠে বিশাল এক বাহিনী। এই বাহিনীর সাহায্যে সে খুতান, কাশগড় ও আলমালিগ অঞ্চলগুলোও দখল করে ফেলে। তখন সুলতান জালালুদ্দিন সানজার ইবনু খাওয়ারিজম শাম

---

[১] আমুদরিয়া নদী সংলগ্ন অঞ্চলই মাওরায়ান্নাহার নামে পরিচিত। ইংরেজিতে এই অঞ্চল ট্রান্সঅক্সিয়ানা নামে পরিচিত।

[২] খাতা, খিতা অথবা কাথায় বলা হতো বর্তমান মঙ্গোলিয়া তথা চীনের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোকে। সেখানে একসময় পৃথক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল।–অনুবাদক

ছিলেন খাওয়ারাজিম, খোরাসান ও মাওরাউন্নাহার অঞ্চলের সুলতান। তিনিও ছিলে অনেক ক্ষমতা ও বিপুল সামরিক শক্তির অধিকারী। তাই চেঙ্গিজ খান তার সাম্রাজ্যের সীমান্ত থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতেন। তার সঙ্গে কোনো সংঘর্ষে জড়াতে চাইতেন না।

ঘটনাক্রমে একবার চেঙ্গিজ খান কতক ব্যবসায়ী চীন ও খাতা অঞ্চলে তৈরিকৃত রেশমি পোশাক ও অন্যান্য পণ্য নিয়ে সুলতান জালালুদ্দিনের সাম্রাজ্যের সর্বশেষ প্রান্তের উতরার শহরে প্রেরণ করে। শহরের গভর্নর চিঠির মাধ্যমে জালালুদ্দিনকে এ ব্যাপারে অবগত করে করণীয় সম্পর্কে জানতে চান। ফিরতি চিঠিতে জালালুদ্দিন নির্দেশ দেন, তাদের সকল সম্পদ জব্দ করে তাদেরকে হত্যা করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করে তাদের দেশে পাঠিয়ে দিতে। আল্লাহ তাআলা প্রাচ্যের এই অঞ্চলের লোকদের ভাগ্যে দুর্ভোগ, কষ্ট, লাঞ্ছনা লিখে রেখেছিলেন বলেই তারা এমন পদক্ষেপের দিকে এগিয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় চেঙ্গিজ খান চরম ক্ষিপ্ত হয়ে অগণিত সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মুসলিম ভূখণ্ডে তাণ্ডব চালানোর লক্ষ্যে। উতরারের গভর্নর বিষয়টি টের পেয়ে কিছু গোয়েন্দা প্রেরণ করে চেঙ্গিজ খানের বাহিনীর সংবাদ জানার জন্য। তাদের একজন চেঙ্গিজ খানের এক সেনাপতির মহল্লায় ভিক্ষুকের বেশ ধরে গমন করে। কিন্তু কারো কাছেই সে খাবার খুঁজে পায়নি। এক ব্যক্তির কাছাকাছি গিয়ে দেখে তার কাছে কোনো পাথেয়ই নেই। সেও তাকে কোনো খাবার দেয়নি। সন্ধ্যার পর সেই ব্যক্তি তার কাছে থাকা একটি শুকনো ভুঁড়ি বের করে সেগুলো পানি দিয়ে ভিজিয়ে নেয়। তারপর তার ঘোড়ার একটি রগ কেটে সেই ভুঁড়িতে রক্ত ভরে তা বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে ভক্ষণ করে। এটিই ছিল তার খাবার। সেই গোয়েন্দা উতরারে ফিরে গিয়ে তাতারদের এই অবস্থা জানিয়ে বলে, এদেরকে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি কারো কাছে নেই। উতরারের গভর্নর তখন সুলতান জালালুদ্দিনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি ষাট হাজারের অধিক সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার পর চেঙ্গিজ খান তাদেরকে পরাজিত করে। এরপর সে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে উতরারে প্রবেশ করে নির্বিচারে শহরের সকল পুরুষকে হত্যা করে। আর শিশুদেরকে করে বন্দী। অতঃপর তাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন সুলতান জালালুদ্দিন নিজেই। তাদের মাঝে সংঘটিত হয় মুসলিম ইতিহাসের প্রলয়ংকরী এক যুদ্ধ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এর সমাপ্তি ঘটে চেঙ্গিজ খানের

মাওরায়ান্নাহারের পতনের মধ্য দিয়ে।[১] উন্মত্ত চেঙ্গিজ খান তখন বুখারা, সমরকন্দ ও তিরমিযের মতো ঐতিহ্যসমৃদ্ধ শহরগুলোতে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায়। এরপর সে আমুদরিয়া পাড়ি দিয়ে দখল করে বলখ শহর। তারপর দখল করে বামিয়ান অঞ্চল।[২] তারপর হাত বাড়ায় খোরাসান এবং ইরাক অঞ্চলের দিকে। এদিকে বলখ ও মাওরায়ান্নাহারের মুসলিমরা সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করেনি। চেঙ্গিজ খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তারা। তখন পাপিষ্ঠ চেঙ্গিজ খান আবার তাদের উপর হামলা। উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে বলখে প্রবেশ করে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে সে শহরটিকে তছনছ করে দেয়।

তিরমিযেও চালায় একই ধ্বংসযজ্ঞ। ফলে শহরটি এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যায় যে, পরে আর কখনো সেখানে বসতি গড়ে উঠেনি। তবে পরবর্তী সময়ে মূল শহর থেকে দুই মাইল দূরে নতুন করে শহর গড়ে তোলা হয়। সেটিই বর্তমানে তিরমিয নামে পরিচিত। এদিকে বামিয়ান অঞ্চলের মুসলিমদেরকেও নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়, শুধুমাত্র শহরের জামে মসজিদের মিনারটিই অক্ষত ছিল। এদিকে বুখারা ও সমরকন্দের অধিবাসীরা হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে বেঁচে গেলেও তাদের শহর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচতে পারেনি। অতঃপর চেঙ্গিজ খানের বাহিনী ইরাকে ফিরে যায়। সবশেষে তারা ইসলামি খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদে প্রবেশ করে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। সর্বশেষ আব্বাসি খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ আল আব্বাসিকে জবাই করে তারা সুদীর্ঘকাল ধরে মুসলিম বিশ্ব শাসন করে আসা আব্বাসি খেলাফতের পতন ঘটায়।[৩]

ইবনে জুজাই বলেন : আমাদের শায়খ বিচারক আবুল বারাকাত ইবনুল হাজ বলেছেন, আমি খতিব আবু আবদুল্লাহ বিন রশিদকে বলতে শুনেছি, 'মক্কায়

---

[১] সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ পারওয়ানের যুদ্ধে মোঙ্গল বা তাতার বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু চেঙ্গিজ খান তার পিছু অনুসরণ করে ইন্দুস নদীর প্রান্তে এসে তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলে। সুলতান জালালুদ্দিন তখন সিন্ধু নদে সাঁতার কেটে কোনোমতে তার জান নিয়ে পালাতে সক্ষম হন। –অনুবাদক

[২] বলখ ও বামিয়ানের বর্তমান অবস্থান আফগানিস্তানে। –অনুবাদক

[৩] খোরাসানে তারা হামলা করেছিল ১২২১ খ্রিস্টাব্দে। চেঙ্গিজ খানের কনিষ্ট সন্তান তুলুই-এর নেতৃত্বে। নিশাপুর ও মারভ শহর দুটিকে তখন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। বামিয়ানে অবরোধকালীন সময়ে চেঙ্গিজ খানের এক দৌহিত্র নিহত হয়। এর জের ধরে শহরটিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। সবশেষে চেঙ্গিজ খান মঙ্গোলিয়ায় ফিরে যান। আর বাগদাদে হামলা ও নিধনযজ্ঞ চালানো হয় তার দৌহিত্র হালাকু বা হুলাগু খানের নেতৃত্বে। ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম ইতিহাসের এই নিদারুণ ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়। –অনুবাদক

নুরুদ্দিন ইবনুয যুজাজ নামক ইরাকের একজন আলেমের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সঙ্গে তার চাচাতো ভাইও ছিলেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ইরাকে তাতারদের নিধনযজ্ঞের সময়ে প্রায় চব্বিশ হাজার আলেম-উলামা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। শুধু আমি ও আমার এই ভাই পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম।

(ইবনে বতুতার ভাষ্যে ফিরে আসি) আমরা বুখারার শহরতলী ফাতহাবাদে এসে প্রসিদ্ধ আলেম ও দুনিয়াবিমুখ বুযুর্গ সাইফুদ্দিন আল বাখরাজির কবরকে কেন্দ্র করে নির্মিত খানকায় অবতরণ করি। এই খানকাটি খুবই জমজমাট। এরজন্য ওয়াকফ করা হয়েছে বিশাল পরিমাণ সম্পদ। যা থেকে আগত দর্শনার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। খানকার বর্তমান শায়খ আলহাজ ইয়াহইয়া আল বাখরাজি সাইফুদ্দিন বাখরাজি রহ.-এরই বংশধর। এই শায়খ আমাকে নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে আতিথেয়তার আয়োজন করেন। সেখানে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত হন। কারীগণ অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করেন। এরপর ওয়ায়েজগণ ওয়াজ করেন। তুর্কি ও ফারসি ভাষার সঙ্গীতেরও আয়োজন করা হয়। সেখানে আমার জীবনের অন্যতম রোমাঞ্চকর একটি রাত অতিবাহিত হয়। এখানকার বরেণ্য ফকিহ ও আলেম সদরুশ শরিয়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি হেরাত থেকে এখানে এসেছেন। তিনি একজন নেককার ও মহৎ ব্যক্তি। সহিহ বুখারির সংকলক আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি রহ.-এর কবর জিয়ারত করতে ভুলে যাইনি। তার কবরের এপিটাফে লেখা ছিল, এটি মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল বুখারির কবর। তিনি এই এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। বুখারার অন্যান্য আলেমদের কবরের ফলকেও তাদের নাম ও তাদের রচিত গ্রন্থের নাম লেখা রয়েছে। সেখান থেকে অনেকগুলো গ্রন্থের নাম আমি লিখে রেখেছিলাম। কিন্তু সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের জলদস্যুদের হাতে ছিনতাইয়ের শিকার হয়ে সব হারিয়ে ফেলি।

বুখারা থেকে প্রস্থান নিয়ে এবার যাত্রা করি মহান সুলতান আলাউদ্দিন তারমাশিরিনের সামরিক ঘাঁটির উদ্দেশে। সামনে এই সুলতানের আলোচনা করা হবে। পথিমধ্যে আমরা নাখশাব শহর অতিক্রম করি। শায়খ আবু তুরাব আন নাখশাবি[১] ছিলেন এখানকারই বাসিন্দা। নাখশাব শহরটি ছোট।

---

[১] পুরো নাম আবু তুরাব আসকার বিন হুসাইন আন-নাখশাবি। নাখশাব শহরটি নাসাফ নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন স্বীয় যুগের প্রসিদ্ধ একজন সূফী আলেম। অনেকবার হজ করেছেন। ২৪৫

ঘন বাগান ও নদীনালা বেষ্টিত। আমরা শহরের উপকণ্ঠে এখানকার গভর্নরের একটি বাড়িতে বিশ্রাম নিয়েছিলাম। তখন আমার এক দাসীর সন্তান প্রসবের সময় ঘনিয়ে এসেছিল। আমি চেয়েছিলাম তাকে সমরকন্দে পাঠিয়ে দিতে। যেন সেখানে তার বাচ্চা প্রস্রব হয়। সে একটি উটের উপর হাওদার মধ্যে ছিল। এদিকে আমাদের সঙ্গীরা রাতের বেলায়ই সফরে বেরিয়ে পড়ে। আমার সেই দাসী ও সকল সামানপত্র ছিল তাদের সঙ্গে। এদিকে আমি ও অল্প কজন সঙ্গী পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম দিনের বেলা সফর করতে। কিন্ত প্রথম দল চলে যায় আর আমরা ভিন্নপথ অবলম্বন করে সন্ধ্যাবেলায় সুলতান আলাউদ্দিনের ঘাঁটিতে এসে পৌছাই। তখন আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই বাজার থেকে সামান্য দূরে আমরা অবতরণ করি। আমাদের এক সঙ্গী গিয়ে ক্ষুধা মেটানোর জন্য খাবার নিয়ে আসে। একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তাঁবু ভাড়া নিয়ে আমরা এখানেই রাত্রিযাপন করি। পরদিন আমার সঙ্গীরা দাসীর উট ও বাকি সঙ্গীদের খোঁজ করতে বের হয়। সন্ধ্যার দিকে তাদের খুঁজে পেয়ে এখানে নিয়ে আসে। সুলতান তখন তার মহল্লায় উপস্থিত ছিলেন না। শিকারের জন্য বেরিয়েছিলেন। তাই আমরা তার নায়েব আমির তাকবুগার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি তার মসজিদের নিকটে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেন। আমার জন্য তিনি একটি খারকার ব্যবস্থা করেন। যা বিশেষ একধরনের তাঁবু। পূর্বে এর বিবরণ অতিবাহিত হয়েছে। আমি দাসীকে সেই খারকায় নিয়ে রাখি। সেই রাতেই তার গর্ভ থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। আমাকে জানানো হয় পুত্রসন্তান জন্ম হয়েছে। কিন্তু আকিকার পর একজন সঙ্গী বলে সে কন্যাসন্তান। আমি তখন বাঁদিদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলে তারাও বলে কন্যাসন্তানই জন্ম হয়েছে। এই কন্যাসন্তান আমার জন্য সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছিল। তার জন্মের পর থেকে আনন্দমুখর ও সুখকর যত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। কিন্তু ভারতবর্ষে পৌছানোর দুই মাস পর তার মৃত্যু হয়। সামনে এ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সুলতানের এই মহল্লাতেই ফকিহ ও বুযুর্গ মাওলানা হুসামুদ্দিন আল ইয়াগির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ইয়াগি শব্দের অর্থ হচ্ছে বিদ্রোহকারী। তিনি মূলত উতরার শহরের বাসিন্দা। আরো সাক্ষাৎ হয় সুলতানের জামাতা শায়খ হাসানের সঙ্গে।

হিজরিতে এমনই এক হজের সফরে যাওয়ার সময় যাত্রাপথে তিনি ইন্তেকাল করেন। হিংস্র প্রাণী তার লাশ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। [সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৫৪৬] –অনুবাদক

মাওরায়ান্নাহার অঞ্চলের সুলতানের বিবরণ

তিনি মহান সুলতান আলাউদ্দিন তারমাশিরিন। বিশাল সাম্রাজ্য ও অগণিত সৈন্যের মাধ্যমে গঠিত বিরাট বাহিনীর অধিকারী শক্তিধর, প্রতাপশালী ও ন্যায়পরায়ণ একজন সুলতান। চীনের সুলতান, ভারতবর্ষের সুলতান, ইরাকের সুলতান এবং সুলতান মুহাম্মাদ উজবেক এই চার ক্ষমতাধর সুলতানের সাম্রাজ্যের মাঝে তার সাম্রাজ্যের অবস্থান। প্রত্যেকেই তাকে যথেষ্ট সমীহ ও সম্মান করে চলে। সহোদর ভাই জাকতির মৃত্যুর পর তিনি ক্ষমতা লাভ করেন। এই জাকতি ছিল কাফের। সে ক্ষমতা লাভ করেছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাবাকের মৃত্যুর পর। কাবাক যদিও কাফের ছিলেন, কিন্তু তিনি ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী শাসক ছিলেন। মুসলিমদেরকে তিনি অনেক সম্মান ও সমাদর করতেন।

একটি ঘটনা

কথিত আছে, এই সুলতান কাবাক একদিন ওয়ায়েজ ও ফকিহ বদরুদ্দিন আল মাইদানির সঙ্গে আলাপকালে তাকে বলেন, আপনি তো বলেন যে, আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র গ্রন্থে সবকিছুর নাম উল্লেখ করেছেন। বদরুদ্দিন বলেন, অবশ্যই। সুলতান বলেন, তাহলে এর মধ্যে আমার নাম কোথায়? ফকিহ বদরুদ্দিন জবাবে বলেন, এই আয়াতে, فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ (তিনি তোমাকে যেভাবে চান সেভাবে সৃষ্টি করেন)।[১] তার এই জবাব শুনে সুলতান কাবাক মুগ্ধ হয়ে বলেন, ইয়াখশি। এর অর্থ হচ্ছে খুব ভালো। অতঃপর তিনি ফকিহ বদরুদ্দিনের অনেক খাতির যত্ন করেন এবং মুসলিমদেরকে আগের চেয়েও বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন।

একটি ঘটনা

সুলতান কাবাকের বিচারের একটি ঘটনা জানা যায়। একবার এক মহিলা এসে সুলতানের কোনো এক মন্ত্রীর নামে অভিযোগ করেন। মহিলাটি জানান, তিনি খুবই দরিদ্র এবং কয়েক সন্তানের মা। তার কাছে কিছু দুধ ছিল। পরিবারের খাবার জোগাড় করার জন্য তিনি তা বিক্রি করতে এনেছিলেন। কিন্তু সেই আমির জোর করে দুধ ছিনিয়ে নিয়ে সাবাড় করে

---

[১] আয়াতটির বাংলা উচ্চারণ হচ্ছে, 'ফি আইয়ি সুরাতিম মা শাআ রাক-কাবাক।' লক্ষ্য করে দেখুন, আয়াতের শেষে কিন্তু কাবাক শব্দটি আছে। [সূরা ইনফিতার : ৮]

দেয়। সুলতান কাবাক তখন মহিলাকে বলেন, আমি সেই আমিরকে দুই টুকরো করব। যদি তার পেট থেকে দুধ বের হয় তবে তো তার উচিত বিচারই হলো। আর যদি দুধ বের না হয় তাহলে আপনাকে দুই টুকরো করে ফেলব। মহিলাটি তখন বলে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। তার উপর আমার আর কোনো দাবি নেই। কিন্তু সুলতান ঠিকই সেই মন্ত্রীকে দুই টুকরো করার নির্দেশ দেন। তার পেট থেকে তখন দুধ বের হয়ে আসে।

সুলতান তারমাশিরিনের আলোচনায় ফেরা যাক। আমি তার মহল্লায় কিছুদিন অবস্থান করি। তাদের ভাষায় এই মহল্লাকে উরদু বলা হয়। একদিন মসজিদে ফজর নামায আদায় করার পর একজন লোক আমাকে বলে, সুলতান মসজিদে আছেন। তিনি নামায শেষ করে দাঁড়ানোর পর আমি তাকে সালাম জানাতে এগিয়ে যাই। শায়খ হাসান এবং ফকিহ হুসামুদ্দিন আল ইয়াগিও সেখানে ছিলেন। তারা দুজন সুলতানকে আমার ব্যাপারে অবগত করেন। আমি যে কয়েকদিন ধরে তার জন্য অপেক্ষা করছি সে কথাও জানান। তিনি তুর্কি ভাষায় আমাকে বলেন, খুশ মিসিন, ইয়াখশি মিসিন, কুতলু ইয়ুসিন। খুশ মিসিন শব্দের অর্থ হচ্ছে আপনি সদা নিরাপদে থাকুন। ইয়াখশি মিসিন অর্থ হচ্ছে আপনি সর্বদা ভালো থাকুন। আর কুতলু ইয়ুসিন অর্থ হচ্ছে আপনার আগমন শুভ হোক। সে সময় তার পরনে ছিল সবুজ রঙের একটি কুদসি জুব্বা।[১] মাথায় ছিল একই রঙের একটি টুপি।

অতঃপর তিনি পায়ে হেঁটে তার সভাকক্ষে ফিরে যান। লোকেরা তখন তাকে ঘিরে একেরপর এক অভিযোগ জানাচ্ছিল। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের অভিযোগই শুনছিলেন। অতঃপর তিনি আমার খোঁজ করেন। আমি তার কাছে গিয়ে দেখতে পাই তিনি একটি খারকায় অবস্থান করছেন। খারকার বাইরে ডানে-বামে লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। মন্ত্রী-আমলারা বসেছেন চেয়ারে। তাদের অনুচররা দাঁড়িয়ে আছে তাদের ঠিক পাশেই। সেনাবাহিনীর সদস্যরাও অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সেখানে কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তারা পালা করে এখানে অবস্থান নেয়। আসর পর্যন্ত একদল পাহারা দেয়। অতঃপর আরেকদল এসে রাতের শেষভাগ পর্যন্ত পাহারা দেয়। সেখানে লিলেন কাপড়ের মাধ্যমে তৈরি বেশকিছু সামিয়ানার নিচে তারা অবস্থান নেয়। খারকার ভেতরে প্রবেশ করে দেখি

---

[১] কুদসি অর্থাৎ আল-কুদুস তথা জেরুজালেমে তৈরিকৃত।–অনুবাদক

সুলতান মিম্বারসদৃশ একটি চেয়ারে বসে আছেন। স্বর্ণের কারুকার্যখচিত রেশমি কাপড়ের মাধ্যমে চেয়ারটিকে আবৃত করে দেওয়া হয়েছে। খারকার অভ্যন্তরে স্বর্ণের কারুকার্যখচিত রেশমি কাপড় দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। সুলতানের মাথায় ছিল স্বর্ণ ও মণি-মুক্তাখচিত একহাত উচ্চতার মূল্যবান মুকুট। তার ডানে-বামে চেয়ারে বসেছিলেন বিশিষ্ট রাজন্যবর্গ। আর তার সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল রাজপরিবারের সন্তানরা। খারকার দরজায় ছিলেন সুলতানের নায়েব, উজির, প্রহরী এবং পতাকাবাহী রক্ষীদের দল। তাদেরকে বলা হয় আ-লু তামগি। আ-ল শব্দের অর্থ হচ্ছে লাল আর তামগি শব্দের অর্থ হচ্ছে পতাকা। খারকায় প্রবেশ করার সময় তাদের চারজন আমার দিকে এগিয়ে আসে এবং আমার সঙ্গে খারকার ভেতরে প্রবেশ করে। অতঃপর আমি সুলতানকে সালাম জানাই। তিনি আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। পতাকাবাহী একজন রক্ষী তখন আমাদের কথা অনুবাদ করে দিচ্ছিল। সুলতান আমাকে মক্কা, মদিনা, বাইতুল মুকাদ্দাস, হেবরন, দামেস্ক, মিসর ও সেখানকার সুলতান আল মালিকুন নাসির, দুই ইরাক ও সেখানকার সুলতান এবং পারস্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর মুয়াযযিন যোহরের আযান দিলে আমি ফিরে আসি। প্রতি ওয়াক্তেই আমি তার সঙ্গে জামাতে নামায আদায় করতাম। তখন ছিল ভয়ানক শীতের সময়। এই তীব্র শীতের মাঝেও তিনি কখনো ফজর ও ইশার নামাযের জামাত ত্যাগ করতেন না। ফজর নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি বসে বসে তুর্কি ভাষায় যিকির করতেন। তখন মসজিদে উপস্থিত প্রত্যেকে এসে তার সঙ্গে মুসাফাহা করত। আসরের নামাযের সময়েও তারা তার সঙ্গে মুসাফাহা করত। কেউ কিসমিস অথবা খেজুর হাদিয়া নিয়ে আসলে তিনি নিজ হাতে মসজিদে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বণ্টন করে দিতেন। খেজুর তাদের নিকট খুবই প্রিয়। এটিকে তারা খুবই বরকতময় হিসেবে বিবেচনা করে।

একটি ঘটনা

এই সুলতানের আরেকটি চমৎকার ঘটনা বলি। একদিন আমি আসর নামাযের জন্য মসজিদে যাই। তখনও সুলতান এসে উপস্থিত হননি। তার এক ভৃত্য তখন একটি জায়নামাজ নিয়ে এসে মিহরাবের সামনে বিছিয়ে দেয়। সুলতান সাধারণত এখানেই নামায আদায় করেন। জায়নামাজ বিছানোর পর ভৃত্যটি ইমাম হুসামুদ্দিন আল ইয়াগিকে বলেন, সুলতান

বলেছেন তার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে। তিনি অযু করে আসছেন। তখন ইমাম হুসামুদ্দিন দাঁড়িয়ে দৃঢ়চিত্তে বলেন, আপনারা কি নামাযের জন্য এসেছেন নাকি সুলতান তারমাশিনের জন্য এসেছেন? অতঃপর তিনি মুয়াযযিনকে ইকামত দিতে বলেন। সুলতান উপস্থিত হন দুই রাকাত শেষ হওয়ার পর। মসজিদের শেষপ্রান্তে মুসল্লিদের জুতো রাখার স্থানে দাঁড়িয়ে বাকি দুই রাকাত ও ছুটে যাওয়া দুই রাকাত পড়ে নেন। নামায শেষে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ইমামের সঙ্গে হাসিমুখে মুসাফাহা করে মিহরাবের সম্মুখে বসেন। শায়খ হাসান ও ইমাম বসেন তার পাশে। আমি ছিলাম ইমামের পাশে। ইমাম তখন আমাকে বলেন, নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার পর সবাইকে বলবেন, আমার মতো একজন অনারব ছাপোষা দরিদ্র ব্যক্তিও প্রতাপশালী তুর্কি সুলতানের সঙ্গে এমন দুঃসাহসিক আচরণ করতে পারে।

ইমাম হুসামুদ্দিন প্রতি শুক্রবার লোকদের নসিহত করতেন। এ সময় তিনি কঠোর ভাষায় সুলতানকে সৎকাজের প্রতি আদেশ দিতেন এবং অসৎ কাজ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করতেন। সুলতান নীরবে তার কথা শ্রবণ করে কান্না করতেন। ইমাম হুসামুদ্দিন কখনো সুলতানের উপহার গ্রহণ করেননি। একবেলাও তার দেওয়া কোনো খাবার গ্রহণ করেননি। তার দেওয়া কোনো পোশাকও পরিধান করেননি। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত নেককার বান্দাদের একজন। আমি তাকে অধিকাংশ সময় জীর্ণ ও ছেঁড়া একটি সুতি জুব্বা পরে থাকতে দেখতাম। তার মাথায় থাকত অনুরূপ পুরনো একটি টুপি। যার মূল্য বড়জোর এক কিরাত হতে পারে। টুপির সঙ্গে তিনি কোনো পাগড়ি পরিধান করতেন না। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, মুহতারাম, আপনি কেন এই জুব্বাটিই বেশিরভাগ সময় পরিধান করেন? এটি তো দেখছি বেশ পুরনো হয়ে গেছে? তিনি তখন আমাকে বলেন, হে বৎস, এই জুব্বাটি মূলত আমার নয়, আমার মেয়ের। আমি তখন তাকে আমার একটি পোশাক নিতে অনুরোধ করি। তিনি বলেন, আমি পঞ্চাশ বছর ধরে আল্লাহর কাছে শপথ করেছি, কারো কাছ থেকে কোনো উপহার নেব না। যদি কারো উপহার নিতাম, অবশ্যই সেটি হতেন আপনি।

সুলতান আলাউদ্দিন তারমাশিরিনের কাছে চুয়ান্ন দিন অবস্থান করার পর আমি পরবর্তী সফরে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে করি। সুলতান তখন আমাকে সাতশ দিনার এবং একশ দিনার মূল্যের একটি সামুরের[১] চামড়া উপহার

---

[১] খেকশেয়াল জাতীয় বরফ অঞ্চলের প্রাণী।–অনুবাদক

দেন। তীব্র শীতের কারণে আমি তার কাছে এই চামড়াটি চেয়েছিলাম। তখন তিনি নিজ হাতে আমার জামার আস্তিন ধরে তাতে চুম্বন করেন। নিশ্চয়ই এটি তার চমৎকার বিনয়, উদারতা ও উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। তিনি আমাকে দুটি ঘোড়া এবং দুটি উটও প্রদান করেন। বিদায় জানানোর সময় তার সঙ্গে দেখা মাঝপথে। তিনি তখন শিকারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তখন এত প্রচণ্ড শীত ছিল যে, আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছিল না। এটি বুঝতে পেরে তিনি হেসে দিয়ে তার হাত বাড়িয়ে দেন। আমি তার সঙ্গে মুসাফাহা করে সফর শুরু করি।

ভারতবর্ষে যাওয়ার দুই বছর পর সংবাদ পাই, তার সাম্রাজ্যের কিছু আমলা-মন্ত্রী এবং নেতৃস্থানীয় লোক সাম্রাজ্যের শেষপ্রান্তে চীন সীমান্তের কাছে একত্র হয়েছে। সুলতানের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈনিকই সেখানে মোতায়েন করা ছিল। তারা সেখানে সুলতানের এক চাচাতো ভাইয়ের হাতে বাইআত গ্রহণ করে। তার নাম বুজুন উগলি। রাজপরিবারের প্রত্যেক পুরুষকেই উগলি বলা হতো। বুজুন উগলি মুসলিম হলেও ধর্মে-কর্মে আগ্রহী ছিল না। চারিত্রিক দিক থেকেও সে ছিল মন্দ। সুলতান আলাউদ্দিন তারমাশিরিন তাদের পূর্বপুরুষ মুসলিম নিধনকারী অভিশপ্ত চেঙ্গিজ খানের কিছু নির্দেশের বিরোধিতা করেছিলেন। এই কারণে তার বিরুদ্ধে গিয়ে বুজুন উগলির হাতে বাইআত গ্রহণ করেছে। চেঙ্গিজ খান একটি গ্রন্থে তার প্রণীত নিয়ম-নীতি লিখে গিয়েছিল। এই গ্রন্থ তাদের কাছে ইয়াসাক নামে পরিচিত ছিল। তাদের বিশ্বাস হচ্ছে, যে সুলতান এই গ্রন্থের বিরোধিতা করবে, তাকে অপসারণ করা অত্যাবশ্যক। সেই গ্রন্থের একটি নিয়ম হচ্ছে এমন, বছরের নির্দিষ্ট একটি দিনে তারা একত্র হবে। সেই দিনকে বলা হয় আত তুওয়া। এর অর্থ হচ্ছে আতিথেয়তার দিন। এদিন সাম্রাজ্যের সকল প্রান্ত থেকে চেঙ্গিজ খানের বংশধর, আমলা-মন্ত্রী ও রাজন্যবর্গ এসে একত্র হন। এমনিভাবে সম্ভ্রান্ত নারী ও নেতৃস্থানীয় সৈনিকরাও এসে উপস্থিত হন। কোনো সুলতান সেই নিয়মে পরিবর্তন ঘটালে তাদের গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বলত, তুমি তো এমন এমন পরিবর্তন করেছ। তাই তোমাকে বরখাস্ত করা আবশ্যক হয়ে গেছে। তখন তারা সেই সুলতানকে হাত ধরে সিংহাসন থেকে টেনে নামাত। তার স্থানে বসাত চেঙ্গিজ খানের অন্য কোনো বংশধরকে। এমনিভাবে বড় কোনো গভর্নর তার শাসনাধীন এলাকায় কোনো অপরাধে লিপ্ত হলে, তারা তাকে উপযুক্ত শাস্তিও প্রদান করত।

সুলতান আলাউদ্দিন তারমাশিরিন উল্লিখিত দিবস উদযাপনের প্রথাটি রহিত করেন। ফলে তার গোত্রের লোকেরা বিষয়টি খুবই অপছন্দ করে। এমনিভাবে সাম্রাজ্যের চীন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থান না করে টানা চার বছর খোরাসান সংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থানের বিষয়টিও তাদের পছন্দ ছিল না। সাধারণত সুলতান প্রতি বছরে একবার চীন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সফর করে সেখানকার সার্বিক অবস্থা ও সৈনিকদের খোঁজখবর নেন। কারণ, তাদের সাম্রাজ্যের মূল শিকড়ই হচ্ছে এই অঞ্চলে। আর তাদের রাজধানী হচ্ছে আল মালিগ শহর।

বুজুনের হাতে বাইয়াত গ্রহণের পর সে বিশাল এক বাহিনী নিয়ে তারমাশিরিনের দিকে এগিয়ে আসে। এদিকে সুলতান আলাউদ্দিন তারমাশিরিন তার নিজের মন্ত্রী-আমিরদেরকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাই প্রাণভয়ে তিনি পনেরোজন অশ্বারোহীর একটি দল নিয়ে তার অধীনস্ত গজনী শহরের উদ্দেশে চলে যান। সেখানকার গভর্নর সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ এবং সুলতানের খুবই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। এই গভর্নর ইসলাম ও মুসলিমদেরকে খুবই ভালোবাসেন। নিজ অঞ্চলে তিনি চল্লিশটির মতো খানকা বা সরাইখানা নির্মাণ করেছেন। সেখানে মুসাফিরদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তার অধীনেও রয়েছে বিশাল একটি সেনাবাহিনী। পুরো পৃথিবীতে আমি তার মতো বিশাল দেহের অধিকারী ব্যক্তি দেখিনি। আমুদরিয়া পাড়ি দিয়ে বলখ শহরের উদ্দেশে যাওয়ার সময় সুলতানের ভাই কাবাকের ছেলে ইয়ানকির সহচররা সুলতানকে দেখে ফেলে। সুলতান তার ভাই কাবাককে হত্যা করেছিলেন। তার ছেলে ইয়ানকি ছিল জীবিত। সে বলখে বাস করত। ইয়ানকিকে তার ব্যাপারে জানানো হলে সে বলে, নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যে কিছু একটা ঘটেছে। তাই তিনি পালিয়ে এসেছেন। অতঃপর সে তার বাহিনী নিয়ে গিয়ে সুলতানকে বন্দী করে ফেলে। এদিকে বুজুন, সমরকন্দ ও বুখারা শহরে গিয়ে সেখানকার লোকদের কাছ থেকেও বাইয়াত গ্রহণ করে। সেখানেই ইয়ানকি তার কাছে সুলতান তারমাশিরিনকে নিয়ে যায়। কথিত আছে, সমরকন্দের উপকণ্ঠে নাসাফে পৌঁছানোর পর সুলতান আলাউদ্দিন তারমাশিরিনকে হত্যা করে। সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়। শায়খ শামসুদ্দিন গুরদান বুরিদাকে সুলতানের সমাধির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছিল। তাকে হত্যা করা হয়নি বলেও একটি মত প্রচলিত আছে। এই আলোচনা সামনে করা হবে। গুরদান শব্দের অর্থ হচ্ছে গলা। আর বুরিদা শব্দের অর্থ কর্তিত। শায়খ শামসুদ্দিনের

গলায় একটি কাঁটা দাগ থাকার কারণে তাকে এই নামে ডাকা হয়।[১] ভারতবর্ষে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সামনে তাকে নিয়েও আলোচনা হবে।

বুজুনের ক্ষমতা লাভের পর সুলতান আলাউদ্দিন তারমাশিরিনের সন্তান বাশাই উগলি, তার বোন ও ভগ্নিপতি পালিয়ে হিন্দুস্তান তথা ভারতবর্ষের সুলতানের কাছে চলে যান। ভারতবর্ষের সুলতান তাদের খুবই সম্মান-সমাদর করেন ও উত্তম আবাসনের ব্যবস্থা করেন। কারণ, সুলতান আলাউদ্দিনের সঙ্গে ছিল তার খুবই হৃদ্যতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক। তাকে তিনি ভাই বলে সম্বোধন করতেন। এর কিছুদিন পর সিন্ধু অঞ্চলে এক লোক এসে নিজেকে সুলতান তারমাশিরিন বলে দাবি করে। লোকেরা তাকে নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যায়। হিন্দুস্তানের সুলতানের গোলাম ও সিন্ধু অঞ্চলের গভর্নর ইমাদুল মুলক সারতিজ এই সংবাদ শুনতে পান। তিনি মালিক আরিজ নামেও পরিচিত। হিন্দুস্তানের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি তিনিই। অবস্থান করেন সিন্ধু অঞ্চলের রাজধানী মুলতানে। তিনি এই সংবাদ শুনতে পেয়ে তারমাশিরিনের চেনা-পরিচিত কিছু তুর্কি লোককে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য পাঠান। তারা ফিরে এসে জানায় সেই লোকটি সত্যিই সুলতান তারমাশিরিন। ইমাদুল মুলক তখন তার জন্য শহরের বাইরে সারাচা বা শাহী তাঁবু নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং তার যথাযথ খাতিরদারির ব্যবস্থা করতে বলেন। অতঃপর বেরিয়ে পড়েন তাকে স্বাগত জানানোর জন্য। তিনি পায়ে হেঁটে এসে সুলতান তারমাশিরিনকে সালাম জানান এবং শাহী তাঁবুতে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর সুলতান তারমাশিরিন রাজকীয়ভাবে ঘোড়ায় চড়ে সেই তাঁবুতে প্রবেশ করেন। তখন আর তাকে নিয়ে কারো মনে সন্দেহ ছিল না। এদিকে হিন্দুস্তানের সুলতানের কাছে তার আগমনের সংবাদ জানানো হয়। তিনি উপহার-উপঢৌকনসমেত কিছু মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন তাকে স্বাগত জানাতে। সেসময় হিন্দুস্তানের সুলতানের কাছে একজন হেকিম বা চিকিৎসক অবস্থান করছিলেন। এর আগে তিনি সুলতান তারমাশিরিনের সেবা করে এসেছেন। ভারতবর্ষে তার অনেক সুনাম। তিনি সুলতানকে বলেন, আমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাহলে জানতে পারব প্রকৃত সত্যিটা কী। আমি তার হাঁটুর নিচে একটি ফোঁড়ার চিকিৎসা করেছিলাম। সেটির চিহ্ন রয়ে গিয়েছিল। এই চিহ্নের

[১] বাংলা ভাষায় হলে তাকে বলা হতো গলাকাটা শামসু। –অনুবাদক

মাধ্যমেই আমি তাকে চিনতে পারব। এই হেকিমও অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে তারমাশিরিনের কাছে এসে তাকে স্বাগত জানান। অতঃপর পূর্বপরিচয়ের সূত্র ধরে তিনি সুলতানের কাছে অবস্থান করে তা পা টিপে দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি পা উন্মুক্ত করে সেই চিহ্নটি দেখার চেষ্টা করেন। সুলতান তারমাশিরিন তখন তাকে ধমক দিয়ে বলেন, আপনি যে ফোঁড়ার চিকিৎসা করেছিলেন সেটি দেখতে চাইছেন তো, এই দেখুন। এই বলে তিনি ফোঁড়ার চিহ্নটি দেখিয়ে দেন। হেকিম তখন তার ব্যাপারে নিশ্চিত হন। হিন্দুস্তানের সুলতানের কাছে ফিরে গিয়ে তিনি এই সংবাদ জানান। অতঃপর হিন্দুস্তানের উজির খাজা জিহান আহমাদ বিন আইয়াস এবং বিশিষ্ট মন্ত্রী ও সুলতানের শৈশবকালের শিক্ষক কুতলুখান তার কাছে এসে বলেন, জাহাঁপনা, এখন তো নিশ্চিত হওয়া গেল যে, সুলতান তারমাশিরিন আমাদের সাম্রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন। এখানে তার বংশের লোক ও আত্মীয় মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক অবস্থান করে। এখন যদি তারা একত্র হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কী করণীয়? সুলতানের কাছে বিষয়টি খুবই গুরুতর মনে হয়। তিনি যথাসম্ভব দ্রুত সুলতান তারমাশিরিনকে রাজধানীতে নিয়ে আসতে বলেন। তিনি এসে উপস্থিত হলে অন্য সকল অতিথিদের তার সেবা ও সম্মান-খাতিরের নির্দেশ দেন। কিন্তু তাকে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন না করে হিন্দুস্তানের সুলতান তাকে 'মাদারকানি' বলে সম্বোধন করেন। এটি খুবই নোংরা একটি গালি। অতঃপর তাকে বলেন, 'তোমার এত সাহস হলো কী করে? তুমি মিথ্যা কথা বলে নিজেকে তারমাশিরিন বলে দাবি করছ? তারমাশিরিনকে তো আগেই হত্যা করা হয়েছে। তার সমাধির খাদেমও আমাদের কাছে উপস্থিত আছেন। নিরাপত্তা প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে হত্যা করা অভদ্র আচরণ না হলে আমি তোমাকে হত্যার নির্দেশ দিতাম।' অতঃপর উপস্থিত লোকদেরকে বলেন, তাকে পাঁচ হাজার দিনার প্রদান করে তারমাশিরিনের সন্তান বাশাই উগলি ও তার মেয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বলুন, এই মিথ্যাবাদী লোকটি দাবি করছে, সে আপনাদের পিতা। তাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর তারা নিজেদের পিতাকে ঠিকই চিনতে পারে। তারমাশিরিন প্রহরাধীন অবস্থায় তাদের কাছেই রাত্রিযাপন করেন। কিন্তু পরদিন তাকে বের করে দেওয়া হয়। নিজেদের নিরাপত্তার ভয়ে নিজ সন্তানরাই তাকে অস্বীকার করে।

এরপর হিন্দুস্তান ও সিন্ধু অঞ্চল থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি চলে যান কিজ ও মাকরান অঞ্চলে। সেখানকার লোকেরা তার খুব সম্মান-সমাদর করে। তার

আতিথেয়তার ব্যবস্থা করে এবং মূল্যবান উপহারও প্রদান করে। একপর্যায়ে তিনি পৌঁছে যান সিরাজ শহরে। সেখানকার সুলতান আবু ইসহাক তাকে অত্যন্ত সম্মান-সমাদর করেন এবং তার থাকা-খাওয়া ও প্রয়োজনীয় খরচের ব্যবস্থাও করেন। ভারতবর্ষ থেকে পুনরায় সিরাজে পৌঁছানোর পর আমি জানতে পারি, তিনি এখানেই আছেন। তখন তার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছে জাগলেও তা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। কারণ, তিনি অবস্থান করতেন এমন একটি বাড়িতে, যেখানে সুলতান আবু ইসহাকের অনুমতি ব্যতীত কেউ যেতে পারত না। তাই আমি অনুমতি চাইতে গেলে তিনি কী না কি সন্দেহ করে বসেন, এই ভয়ে বিরত থাকি। অবশ্য পরে এই কারণে আমি খুবই আফসোস করেছিলাম।

বুজুনের আলোচনায় ফিরে আসি : ক্ষমতা লাভ করার পর বুজুন তার সাম্রাজ্যের মুসলিমদেরকে চাপের উপর রাখে। সাধারণ প্রজাদের উপর চালায় নিপীড়ন। খ্রিস্টান ও ইহুদিদেরকে সে তাদের গির্জা নির্মাণের অনুমতি দেয়। এতে মুসলিমরা খুবই ব্যথিত হয়। তারা বুজুনকে শায়েস্তা করার সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। সুলতান আল ইয়াসাউরের পুত্র খলিলের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে। তার পিতা ইয়াসাউর খোরাসানে অবরোধ করে পরাজিত হয়েছিলেন। খলিল তখন হেরাতের সুলতান হুসাইন বিন গিয়াসুদ্দিন আল ঘুরীর কাছে গিয়ে এই সংবাদ জানান এবং নিজের পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করে তার কাছে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য কামনা করেন। তবে শর্ত ছিল যদি খলিল বিজয়ী হন, তাহলে হুসাইনকেও সাম্রাজ্যের অর্ধেক প্রদান করতে হবে। অতঃপর সুলতান হুসাইন খলিলের সঙ্গে বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করেন। হেরাত থেকে তিরমিযের দূরত্ব ছিল নয়দিনের। তিরমিযের মুসলিম আমিরগণ খলিলের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাকে সাদরে বরণ করেন এবং তার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। সবার আগে তার সঙ্গে যোগ দেন তিরমিযের গভর্নর আলাউল মুলক খোদাওয়ান্দজাদা। তিনি হুসাইন রা.-এর বংশধর। তিনি ছিলেন প্রতাপশালী একজন গভর্নর। চার হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে তিনি সুলতান খলিলের বাহিনীতে যোগ দেন। এতে করে সুলতান খলিল খুবই আনন্দিত হন এবং তাকে নিজের উজির হিসেবে মনোনীত করে তার কাঁধে দায়িত্ব সপে দেন। নিজের সাহসিকতা ও নির্ভীকতা দিয়ে আলাউল মুলক অল্পসময়ের মধ্যেই এই আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। অতঃপর অন্যান্য অঞ্চল থেকেও

একেরপর এক আমির এসে খলিলের বাহিনীতে যোগ দেয়। রণাঙ্গনে বুজুনের মুখোমুখি হওয়ার পর তার বাহিনীও খলিলের সঙ্গে মিত্রতা ঘোষণা করে। তারা বুজুনকে বন্দী করে খলিলের কাছে নিয়ে আসে। তাকে তখন ধনুকের মাধ্যমে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। রাজপরিবারের সদস্যকে এভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করাই তাদের নিয়ম।

এভাবেই সুলতান খলিল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে যান। সমরকন্দে নিজের সঙ্গে থাকা বাহিনীকে গণনা করে দেখেন মোট আশি হাজার সৈন্য রয়েছে। তারা সবাই ছিল বর্মপরিহিত। এমনিভাবে তাদের ঘোড়াগুলোর পরনেও ছিল বর্ম। এরপর তিনি হেরাত থেকে আসা বাহিনীকে তাদের সাম্রাজ্যে ফিরিয়ে দিয়ে নিজ বাহিনী নিয়ে আলমালিগ শহরের উদ্দেশে রওনা দেন। তাতাররা তখন নিজেদের মধ্য হতে একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করে আলমালিগ শহর থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত তারাজ শহরের নিকটে এসে সুলতান খলিলের বাহিনীর মুখোমুখি হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে সমানভাবে তুমুল লড়াই চলতে থাকে। একপর্যায়ে আমির খোদাওয়ান্দজাদা তার অধীনস্ত বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ঝড়ের বেগে হামলা চালিয়ে তাতারদের হটিয়ে দেন। তারা আর রণাঙ্গনে টিকে থাকতে পারেনি। তাদের শোচনীয় পরাজয় ও বিপুল পরিমাণ তাতার সৈন্য নিহত হওয়ার মধ্যে দিয়ে এই যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। সুলতান খলিল তিনদিন আলমালিগে অবস্থান করে অবশিষ্ট তাতারদের নির্মূল করার লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়েন। অবশিষ্ট তাতাররা তখন তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। এরপর তিনি খাতা ও চীন অঞ্চলের সম্মুখভাগ অতিক্রম করে কারাকুরাম ও বিশবালিগ শহর দুটি বিজয় করেন। খাতা অঞ্চলের সুলতান তাকে প্রতিরোধ করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল। পরে তাদের মধ্যে সন্ধি হয়। দেখতে দেখতে সুলতান খলিল বিশাল রাজত্ব ও দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী হয়ে যান। অন্য অঞ্চলের রাজা-বাদশাহরা তাকে সমীহ করতে শুরু করে। প্রজাদের প্রতি তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। তিনি আলমালিগে একদল সৈনিক মোতায়েন করে তার উজির খোদাওয়ান্দজাদাকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করে সমরকন্দ ও বুখারায় ফিরে যান। এরপর তার সাম্রাজ্যের তুর্কিরা উজির খোদাওয়ান্দজাদার নামে কুৎসা রটিয়ে ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা করে। তারা দাবি করে, এই উজির বিদ্রোহ করতে চান। তিনি বলেছেন, বংশপরম্পরার দিক দিয়ে নবীজির নিকটাত্মীয় এবং সুলতান খলিলের চেয়ে অধিক যোগ্য ও সাহসী। সুলতান খলিল তখন

খোদাওয়ান্দজাদার পরিবর্তে আরেকজনকে আলমালিগের গভর্নর হিসেবে প্রেরণ করেন। আর খোদাওয়ান্দজাদাকে নির্দেশ দেন তার অল্প কজন সঙ্গীকে নিয়ে তার কাছে এসে উপস্থিত হতে। তিনি উপস্থিত হতেই সুলতান কোনো যাচাই-বাছাই ব্যতিরেকেই তাকে হত্যা করেন। এর ফলে তার সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। যিনি সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে সুলতান খলিলকে এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী বানিয়েছিলেন, প্রবল ক্ষমতাশালী হওয়ার পর খলিল সেই হেরাতের সুলতানের বিরুদ্ধেও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন। হেরাতের সুলতানকে তিনি চিঠি লিখে তার নামে খুতবা দিতে এবং তার নামে মুদ্রা চালু করতে বলেন। এতে করে সুলতান হুসাইন খুবই রাগান্বিত হন এবং কঠোর ভাষায় তীব্র হুঁশিয়ারি জানিয়ে ফিরতি চিঠি প্রেরণ করেন। খলিল তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনী তাকে বিদ্রোহী হিসেবে বিবেচনা করে তাকে সমর্থন জোগানো হতে বিরত থাকে। এদিকে সুলতান হুসাইনের কাছে খলিলের যুদ্ধপ্রস্তুতির সংবাদ পৌঁছুলে চাচাতো ভাই মালিক ওয়ারনাকে সঙ্গে করে বাহিনী নিয়ে রওনা করেন। রণাঙ্গনে সুলতান খলিল পরাজিত হন। তাকে বন্দি করে সুলতান হুসাইনের কাছে আনা হলে তিনি তাকে জীবিত অবস্থায় একটি ঘরে বন্দি করে রাখতে বলেন। সেখানে তাকে একটি দাসী প্রদান করা এবং প্রয়োজনীয় খরচের ব্যবস্থাও করা হয়। হিন্দুস্তান থেকে চলে আসার পর ৭৪৭ হিজরিতে আমি সুলতান খলিলকে এই অবস্থাতেই দেখেছিলাম।

সফরের বিবরণে ফিরে আসি: সুলতান তারমাশিরিনকে বিদায় জানিয়ে আমি সমরকন্দ শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। বিশালতা ও সৌন্দর্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতর শহরগুলোর একটি এই সমরকন্দ। আল কাসসারিন নামক নদীর তীরে শহরটির গোড়াপত্তন করা হয়। শহরের বাগানগুলোতে পানি সিঞ্চন করার জন্য নদীর বুকে স্থাপন করা হয়েছে অনেকগুলো জলচাকা। প্রতিদিন আসর নামাযের পর শহরের লোকেরা অবকাশ যাপনের জন্য নদীর তীরে ভিড় জমায়। এখানে তাদের বসার জন্য বেশ কিছু বেঞ্চ ও আসন নির্মাণ করা হয়েছে। আরো আছে বেশ কিছু দোকান। যেখানে ফলমূল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। এই নদীর তীরেই ছিল বিশাল বিশাল কিছু প্রাসাদ আর অট্টালিকার অবস্থান। যেগুলো দেখে এখানকার অধিবাসীদের সুউচ্চ মনোবলের কথা সহজেই আন্দাজ করা যেত। এখন সেগুলোর অধিকাংশেরই

নাম-নিশানা মুছে গেছে। তেমনি করে বিরান হয়ে গেছে অনিন্দ্য এই শহরের সিংহভাগ। শহরের কোনো প্রাচীর ও প্রবেশদ্বার নেই। ভেতরে রয়েছে বেশ কিছু বাগান। সমরকন্দের অধিবাসীগণ অত্যন্ত উদারমনা ও অতিথিপরায়ণ। বুখারার অধিবাসীদের তুলনায় তারা অনেক ভালো। সমরকন্দের উপকণ্ঠে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রা.-এর পুত্র কুসাম ইবনুল আব্বাসের কবর অবস্থিত। এই অঞ্চল বিজয় করতে এসে তিনি এখানে শাহাদাতবরণ করেছিলেন। সমরকন্দের অধিবাসী প্রতি সোম ও শুক্রবার রাতে তার কবর জিয়ারত করতে যায়। তাতাররাও এই কবর জিয়ারত করতে আসে এবং বড় বড় মানত করে যায়। তারা মেষ, বকরি ও দিনার-দিরহাম নিয়ে এসে কবর সংলগ্ন খানকার অতিথি ও খাদেমদের খাবারের জন্য ব্যয় করে। তার কবরের উপর চার স্তম্ভবিশিষ্ট একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটিউ স্তম্ভের সঙ্গেই আছে লাল, নীল, সাদা, কালো বিভিন্ন রঙের মার্বেল পাথরের দুইটি করে খুঁটি। ছাউনির দেয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে স্বর্ণের কারুকার্যখচিত মার্বেল পাথর আর ছাদে ব্যবহার করা হয়েছে সীসা। কবরের উপরে রয়েছে কারুকার্যখচিত আবলুস কাঠের খাঁচা। যার প্রান্তগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে রূপার টুকরা। খাঁচার উপরে রাখা আছে রূপার তৈরি তিনটি বাতি। ছাউনির মেঝেতে বিছানো ছিল সুতি ও পশমি কাপড়ের বিছানা। কবর সংলগ্ন খানকাকে দুইভাগে বিভক্ত করে বয়ে গেছে ছোট্ট একটি নদী। যার দুই তীরে রয়েছে ঘন গাছপালা, আঙুরের ঝাঁকা আর জেসমিন গাছে সমাহার। আগত অতিথিদের থাকার খানকার ভেতরে রয়েছে বেশকিছু কক্ষ। তাতাররা কাফের থাকাকালীন বরকতময় এই স্থানটির কোনো ক্ষতিসাধন করেনি। বেশকিছু আশ্চর্য নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তারা এই স্থানটিকে বরকতময় হিসেবে বিবেচনা করে।

আমাদের অবস্থানের সময় আমির গিয়াসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল কাদির ছিলেন এই খানকা ও পার্শ্ববর্তী বাড়িঘরের তত্ত্বাবধায়ক। তিনি ছিলেন আব্বাসি খলিফা আল মুসতানসির বিল্লাহর বংশধর। তার পরদাদা ইউসুফ ছিলেন এই আব্বাসি খলিফার পুত্র। তিনি ইরাক থেকে চলে আসার পর সুলতান তারমাশিরিন তাকে এই দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তবে বর্তমানে তিনি অবস্থান করছেন হিন্দুস্তানের সুলতানের কাছে। তার আলোচনা সামনে আসবে। সমরকন্দে এসে এখানকার বিচারকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি সদর আল জাহান নামে পরিচিত। তিনি একজন বিদগ্ধ ও উদার মনের

ব্যক্তি। আমি হিন্দুস্তানে যাওয়ার পর তিনি হিন্দুস্তানের উদ্দেশে সফর করেছিলেন। সিন্ধু অঞ্চলের রাজধানী মুলতানে পৌঁছানোর পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

একটি ঘটনা

সমরকন্দের বিচারক সদর আল জাহান মুলতানে মৃত্যুবরণ করার পর সেখানকার সাহিবুল খবর তার ব্যাপারে হিন্দুস্তানের সুলতানকে অবগত করেন। জানান, তিনি সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এর আগেই তার মৃত্যু হয়ে গেছে। এই সংবাদ পাওয়ার পর হিন্দুস্তানের সুলতান বিচারক সদর আল জাহানের সন্তানদেরকে কয়েক হাজার দিনার প্রদান করার নির্দেশ দেন। সঠিক সংখ্যাটি মনে পড়ছে না। তিনি যদি জীবিত থাকা অবস্থায় দরবারে এসে পৌঁছুতেন, তখন তার সঙ্গে আসা লোকদেরকে যে পরিমাণ উপহার দেওয়া হতো, এখনো তাদেরকে সেই পরিমাণ উপহার দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। হিন্দুস্তানের সুলতান তার শাসনাধীন প্রতিটি অঞ্চলে একজন করে সাহিবুল খবর বা সংবাদ ও তথ্য সরবরাহকারী অফিসার নিযুক্ত করেছেন। এই অফিসার তাকে সেই অঞ্চলে ঘটে যাওয়া প্রতিটি বিষয় লিখে পাঠায়। কোনো অতিথি এলে তার নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, তার সঙ্গে থাকা সম্পদ, পোশাক, ঘোড়া ও সঙ্গীদের পরিমাণ, তাদের আকৃতি ও খাবারদাবারের ধরণ এবং তাদের কাছ থেকে প্রকাশ পাওয়া সকল কর্মকাণ্ড; যা থেকে প্রকাশ পায় তারা ভালো নাকি মন্দ, এসব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ লিখে পাঠায়। তাই সাম্রাজ্যে কোনো অতিথি প্রবেশ করলেই সুলতান তার ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে অবগত হয়ে যান। অতঃপর সেই অতিথির শান অনুযায়ী যথোপযুক্ত খাতিরদারি করেন।

সমরকন্দ শহর থেকে প্রস্থান করে আমরা পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করি। পথিমধ্যে অতিক্রম করি নাসাফ শহর। আল মানজুমা ফিল মাসায়িলিল খেলাফিয়্যাহ বাইনাল ফুকাহায়িল আরবাআ গ্রন্থের লেখক প্রসিদ্ধ আলেম ও ফকিহ আবু হাফস উমর আন নাসাফি ছিলেন এই শহরেরই সন্তান।[১]

---

[১] নাজমুদ্দিন আবু হাফস উমর বিন মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন ইসমাইল বিন লোকমান আল হানাফি আন নাসাফি। আকিদার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল আকিদাতুন নাসাফিয়্যাহর লেখক। ছিলেন একজন বিদগ্ধ

অতঃপর আমরা পৌছাই তিরমিয শহরে। যে শহরের মাটিতে বাস করেছিলেন হাদীসের ইমাম, সিহাহ সিত্তা বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থ আল জামিউল কাবির ফিস সুনান বা সুনানুত তিরমিযি গ্রন্থের রচয়িতা আবু ইসা মুহাম্মাদ বিন ইসা বিন সূরা আত তিরমিযি রহ. তাআলা। তিরমিয শহরটি বেশ বড়। এখানকার বাড়িঘর এবং বাজারগুলোও বেশ সুবিন্যস্ত ও চমৎকার। শহরের বুক চিড়ে বয়ে গেছে বেশকিছু নদীনালা। দেখা যায় অনেক বাগানের নয়নাভিরাম দৃশ্য। এখানকার আঙুর ও নাশপাতি স্বাদে ও মানে অতুলনীয়। প্রচুর পরিমাণ গোশত ও দুধের সরবরাহ রয়েছে এখানে। এখানকার লোকেরা গোসলখানায় গিয়ে আঠালো মাটির পরিবর্তে দুধ দিয়ে তাদের মাথা ধৌত করে। প্রত্যেক গোসলখানার মালিকের কাছে দুধভর্তি বড় একটি পাত্র থাকে। গোসলখানায় আগত লোকেরা সেখান থেকে ছোট পাত্রে করে দুধ নিয়ে তাদের মাথা ধৌত করে। এর ফলে তাদের চুল অনেক সজীব ও মসৃণ হয়। ভারতবর্ষের লোকেরা তাদের মাথায় তিলের তেল ব্যবহার করে। যেটি তাদের কাছে শিরাজ নামে পরিচিত। তিলের তেল ব্যবহারের পর তারা আবার আঠালো মাটি দিয়ে মাথা ধৌত করে। এতে করে তাদের শরীর হয় হৃষ্টপুষ্ট এবং চুল হয় মসৃণ ও লম্বা। এ কারণেই হিন্দুস্তানের স্থানীয় অধিবাসী ও সেখানে বসবাস করে আসা লোকদের দাড়ি এত লম্বা হয়ে থাকে।

প্রাচীন তিরমিয শহরটির অবস্থান ছিল আমুদরিয়ার কোলঘেঁষে। চেঙ্গিজ খানের ধ্বংসযজ্ঞের পর নদী থেকে দুই মাইল দূরে এই নতুন শহরটি নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে এসে শহরের বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তি শায়খ আজিজানের খানকায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। তিনি অঢেল সম্পদ, জমিজমা ও বাগানের মালিক। আগত অতিথিদের জন্য তিনি সেই সম্পদ থেকে অকাতরে খরচ করেন। শহরে পৌছানোর আগেই এখানকার গভর্নর আলাউল মুলক খোদাওয়ান্দজাদার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদের জন্য একটি পত্র লিখে দেন। যেখানে আমাদের যথাযথ মেহমানদারি করানোর নির্দেশনা ছিল। তাই তিরমিযে অবস্থানকালীন প্রতিদিনই আমাদের কাছে আলাউল মুলকের পক্ষ থেকে মেহমানদারি

ফকিহ, উসুলবিদ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ। তার শহর নাসাফের বর্তমান অবস্থান উজবেকিস্তানে। এমনিভাবে বুখারা ও সমরকন্দ ঐতিহাসিক শহর দুটিও বর্তমানে উজবেকিস্তানে অবস্থিত। –অনুবাদক

পৌঁছানো হতো। এখানকার বিচারক কিওয়ামুদ্দিনের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তখন সুলতান তারমাশিরিনের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন এবং হিন্দুস্তানে সফরের জন্যও অনুমতি চেয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তার সঙ্গে ও তার দুই ভাই জিয়াউদ্দিন ও বুরহানুদ্দিনের সঙ্গে মুলতানে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমরা একসঙ্গে হিন্দুস্তানের উদ্দেশে সফর করি। তার অপর দুই ভাই ইমাদুদ্দিন ও সাইফুদ্দিনের সঙ্গেও হিন্দুস্তানের সুলতানের দরবারে সাক্ষাৎ ঘটে। এমনিভাবে তার দুই পুত্রও তাদের পিতার মৃত্যুর পর হিন্দুস্তানের সুলতানের কাছে গিয়েছিলেন। উজির খাজা জাহানের দুই কন্যার সঙ্গে তাদের বিবাহ হয়। এসব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

তিরমিয থেকে বিদায় নিয়ে আমুদরিয়া পাড়ি দিয়ে আমরা চলে আসি খোরাসান অঞ্চলে। তারপর বালি ও কঙ্করময় মরুপথে দেড় দিন সফর করে উপনীত হই বলখ শহরে। শহরটি তখন বিধ্বস্ত ও বিরান হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু এখানকার ভবনগুলোর মজবুত নির্মাণের কারণে দূর থেকে দেখে মনে হবে তা বুঝি জনকোলাহলে পরিপূর্ণ। একসময় প্রশস্ত এই শহরটি ছিল অনেক জমজমাট। এখানকার মাদরাসা ও মসজিদের স্থাপনাগুলো আজও সেই ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে চলছে। ভবনগুলোর কারুকার্য এবং আকাশী রঙের লাজওয়ারদ পাথরে আঁকা চিত্রকর্ম যেন এখনো প্রাণবন্ত। এই লাজওয়ারদ পাথরকে খোরাসানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বাদাখশান[১] অঞ্চলের পর্বতশ্রেণী থেকে এই পাথর আহরণ এখানে সরবরাহ করা হয়। এই বাদাখশানেই জন্মগ্রহণ করেছেন ইয়াকুত আল বাদাখশি। তার আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ। অভিশপ্ত চেঙ্গিজ খান মনোরম বলখ শহরটিকে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। এমনকি শহরের জামে মসজিদের একতৃতীয়াংশও সে ধসিয়ে দিয়েছে। তাকে বলা হয়েছিল, এই মসজিদের কোনো একটি পিলারের নিচে সম্পদের খনি রয়েছে। এই মসজিদটি পৃথিবীর বুকে অনিন্দ্যতম ও প্রশস্ত একটি মসজিদ। মাগরিব অঞ্চলের রিবাত আল ফাতহ মসজিদেও এমন বিশাল বিশাল স্তম্ভ রয়েছে। তবে সেই মসজিদের চেয়ে বলখের মসজিদটি সবদিক দিয়ে সুন্দর।

---

[১] আফগানিস্তানের চৌত্রিশ প্রদেশের একটি। দেশটির উত্তরপূর্বাঞ্চলে এই প্রদেশের অবস্থান। –অনুবাদক

একটি ঘটনা

একজন ইতিহাসবিদের কাছ থেকে শুনেছি, বলখের এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন একজন নারী। তার স্বামী দাউদ বিন আলী ছিলেন আব্বাসি খেলাফতের পক্ষ থেকে নিযুক্ত বলখের গভর্নর। একবার বলখের অধিবাসীদের দুঃসাহসিক কোনো কাজের কারণে আব্বাসি খলিফা তাদের প্রতি অনেক ক্রুদ্ধ হন। একজন আমিরকে প্রেরণ করেন তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের জরিমানা আদায় করার জন্য। সেই আমির বলখে পৌছানোর পর স্থানীয় নারী ও শিশুরা মসজিদ নির্মাণকারী সেই মহীয়সী নারীর কাছে গিয়ে তাদের এই দুরবস্থা ও জরিমানার কথা ব্যক্ত করেন। তখন তিনি জরিমানা আদায় করতে আসা আমিরকে নিজের অলংকারসজ্জিত একটি পোশাক বের করে দেন। যেটির মূল্য ছিল জরিমানার ধার্যকৃত অংকের তুলনায় অনেক বেশি। আমিরের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, খলিফার কাছে এই পোশাকটি নিয়ে যাবেন। বলখের অধিবাসীদের দুর্বলতার কারণে তাদের পক্ষ থেকে আমি এই পোশাকটি খলিফাকে সদকা করলাম। আমির খলিফার কাছে গিয়ে সেই পোশাকটি উপস্থাপন করে এই ঘটনা বর্ণনা করেন। খলিফা তখন বেশ লজ্জিত হয়ে বলেন, একজন নারী আমাদের চেয়ে উদার হবেন? এই বলে তিনি বলখের অধিবাসীদের জরিমানা রহিত করেন এবং আমিরকে পুনরায় বলখে গিয়ে পোশাকটি ফিরিয়ে দিয়ে আসার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি বলখের অধিবাসীদের এক বছরের কর-ও রহিত করেন। অতঃপর সেই আমির বলখে ফিরে এসে পোশাকটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সেই নারীর গৃহে উপস্থিত হয়। তখন মহীয়সী এই নারী বলেন, খলিফা কি এই পোশাকটি দেখেছেন? আমির জবাব দেয়, হ্যাঁ। তখন এই নারী বলেন, গাইরে মাহরামের চোখে পড়া পোশাক আমি কখনো পরিধান করব না। এই বলে তিনি পোশাকটি বিক্রি করার নির্দেশ দেন। সেই পোশাকের মূল্য দিয়েই তিনি মসজিদ, খানকা ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। সেগুলো এখনো অক্ষত আছে। এসব কিছু নির্মাণ করার পরও পোশাকের মূল্যের একতৃতীয়াংশ পরিমাণ অবশিষ্ট ছিল। কথিত আছে, তিনি সেই অবশিষ্ট অংশ মসজিদের একটি খুঁটির নিচে পুঁতে রাখতে বলেন। যেন প্রয়োজনের সময়ে সেখান থেকে বের করে খরচ করা যায়। চেঙ্গিজ খানকে এই ব্যাপারে জানানো হলে সে মসজিদের খুঁটিগুলোকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। তখন মসজিদের একতৃতীয়াংশের স্তম্ভ ভেঙে কিছু খুঁজে পাওয়া না গেলে সে

বাকিগুলো এমনিতেই ছেড়ে দিয়ে যায়। বলখের শহরতলীতে একটি কবর রয়েছে। কথিত আছে, এটি সাহাবি উকাশা[১] বিন মিহসান আল আসাদি রা.-এর কবর। যিনি বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। কবরকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করা হয়েছে বিরাট একটি খানকা। সেখানেই আমরা অবস্থান করেছিলাম। খানকার বাইরেই ছিল চমৎকার একটি পুকুর। সেই পুকুরের পাশেই ছিল বি·গাল একটি আখরোট গাছ। আগত অতিথিরা গ্রীষ্মকালে এই গাছের ছায়ার নিচে পুকুরে নেমে গোসল করে। এই খানকার শায়খ আলহাজ খুরদ নামে পরিচিত। খুরদ মানে ছোট। তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি। ঘোড়ায় চড়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি বলখের মাজারগুলো দেখিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে নবী হিজকিল[২] আ.-এর সমাধিও রয়েছে। এই সমাধির উপর নির্মাণ করা হয়েছে সুদৃশ্য একটি গম্বুজ। এমনিভাবে বলখে আরো অনেক বুযুর্গের কবর জিয়ারত করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। যা এখন উল্লেখ করছি না। প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ.-এর বাড়িও আমরা দেখেছিলাম। এটি ছিল শ্বেতশুভ্র পাথরের মাধ্যমে নির্মিত বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ও মনোমুগ্ধকর একটি অট্টালিকা। পাশেই নির্মাণ করা হয়েছে একটি খানকা। খানকার জন্য আগত সকল কৃষিপণ্যের গুদামঘর হিসেবে এই অট্টালিকাকে ব্যবহার করা হতো। তাই এটিকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। এজন্য আমরা ভেতরে প্রবেশ করতে পারিনি। বলখের জামে মসজিদের কাছেই এই অট্টালিকার অবস্থান।

বলখ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করি পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। কোহেস্তান পর্বতমালার বুক চিড়ে সফর করি টানা সাতদিন। এই পর্বতমালায় সমৃদ্ধ এক জনপদের অবস্থান। এখানে রয়েছে অনেক চমৎকার ঘরবাড়ি, প্রবহমান নদীনালা, ঝরনা ও পত্রপল্লববিশিষ্ট বৃক্ষের সমাহার। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ জুড়েই দেখা যায় তিন ফলের গাছ। এমনিভাবে এই অঞ্চলে অনেক খানকাও রয়েছে। সেগুলোতে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে নিবেদিত

---

[১] উকাশা ও উক্কাশা দুইভাবেই পড়া যায়। তিনি ইসলামের প্রারম্ভেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলিম হয়েছিলেন। নবীজির সঙ্গে বদর, উহুদ, খন্দক ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। নবীজি তার জন্য জান্নাতের দোয়া করেছেন। নবীজি তাকে আরবের সর্বোত্তম অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। ১১ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। –অনুবাদক

[২] বনু ইসরাইলের একজন নবী। তিনি মুসা আলাইহিস সালামের পরবর্তী সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। হিল্লা শহরেও তার সমাধি রয়েছে। সেটিই অধিক প্রসিদ্ধ। –অনুবাদক

অনেক বুযুর্গ অবস্থান করেন। এরপর আমরা পৌঁছাই হেরাত[১] শহরে। খোরাসানের জনবহুল শহরগুলোর মধ্যে এটিই সর্ববৃহৎ শহর। খোরাসানে মোট চারটি বড় শহর রয়েছে। তন্মধ্য হতে হেরাত ও নিশাপুর শহরে বর্তমানে জনপদের আবাস রয়েছে। আর বলখ ও মারভ শহর দুটি পরিত্যক্ত পড়ে আছে। হেরাত শহরটি আয়তনে বিশাল। বিপুল পরিমাণ লোকের বাস এই শহরে। তবে তারা সৎ, সভ্য, ভদ্র এবং দীনদার। তারা সবাই ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব অনুসরণ করেন। সবধরনের ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা থেকে এই শহরটি পবিত্র।

হেরাতের সুলতানের বিবরণ

তিনি সম্মানিত সুলতান হুসাইন ইবনুস সুলতান গিয়াসুদ্দিন আল ঘুরী। প্রবাদতুল্য বীরত্বের অধিকারী। দুইটি ঘটনায় তার বীরত্ব ও তার প্রতি আল্লাহ তাআলার সাহায্যের নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। একবার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী সুলতান খলিলের বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার সময়। সেই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে খলিলের পরাজয় ও বন্দিদশা বরণ করার মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয়বার প্রকাশ পায় রাফেযি সুলতান মাসউদের বাহিনীর সঙ্গে তার বাহিনীর যুদ্ধের সময়। এই যুদ্ধে মাসউদের বাহিনী লণ্ডভণ্ড হয়ে পরাজয় বরণ করে। সে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায় আর তার রাজত্বের ক্ষমতা চলে আসে সুলতান হুসাইনের হাতে। সুলতান হুসাইন তার ভাই আল হাফিজের পর সালতানাতের ক্ষমতায় বসেছিলেন। তার ভাই ক্ষমতায় বসেছিলেন তাদের পিতা গিয়াসুদ্দিন আল ঘুরীর মৃত্যুর পর।

রাফেযিদের ঘটনা

মাসউদ ও মুহাম্মাদ নামে দুজন লোক ছিল খোরাসানে। তাদের সঙ্গে ছিল আরো পাঁচজন সহচর। এরা ছিল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লোক। যাদেরকে বলা হতো ফুততাক। এরা ইরাকে সুত্তার, খোরাসানে সারবাদরান এবং মাগরিব অঞ্চলের সাকুর নামে পরিচিত।[২] এই সাতজন মিলে বিভিন্ন

---

[১] আফগানিস্তানের তৃতীয় বৃহত্তম প্রদেশ ও শহর। মরু অঞ্চলে এই প্রদেশের অবস্থান। –অনুবাদক

[২] এই পরিভাষাগুলো মূলত স্থানীয় অথরিটি বা সরকারব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। সূত্র : রিহলাহ ইবনে বতুতার ইংরেজি অনুবাদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৭৫। –অনুবাদক

বিশৃঙ্খলা, চুরি-ডাকাতি ও রাহাজানিতে লিপ্ত হয়ে বেশ কুখ্যাতি লাভ করে। বাইহাক শহরের কাছাকাছি দুর্গম এক অঞ্চলে ছিল তাদের আস্তানা। বাইহাক শহরকে সাইজারও বলা হতো। এরা দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকত। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর রাতের অন্ধকারকে পুঁজি করে শুরু হতো তাদের কার্যকলাপ। বিভিন্ন জনপদে হামলা চালানো ও পথচারীদের ডাকাতি করে তাদের সম্পদ লুটপাট করা ছিল তাদের নিত্যদিনের রুটিন। তাদের মতো আরো কিছু নিকৃষ্ট ও পাপাচারী লোক তাদের সঙ্গে যোগ দিলে তারা বেশ শক্তিমত্তার অধিকারী হয়ে যায়। লোকেরা তাদেরকে ভয় পেতে শুরু করে। একপর্যায়ে তারা বাইহাক শহরে হামলা করে এর নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয়। এরপর পার্শ্ববর্তী আরো কিছু শহর চলে যায় তাদের নিয়ন্ত্রণে। বিপুল পরিমাণ সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে তারা সশস্ত্র অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করে। দুরাচার মাসউদ নিজেকে ভূষিত করে সুলতান উপাধিতে। বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রীতদাসরা তাদের মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে তার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিত। সে তাদেরকে সম্পদ ও ঘোড়া প্রদান করে নিজের বাহিনীতে ভিড়িয়ে নিত। কোনো গোলাম যদি সাহসী ও শক্তিশালী হতো তাকে নিযুক্ত করত একটি দলের অধিনায়ক হিসেবে। এভাবে সে বিশাল এক বাহিনী ও প্রবল প্রতিপত্তির অধিকারী বনে যায়। এরা সকলেই ছিল রাফেযি মতাদর্শের অনুসারী। তাই খোরাসান থেকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারীদের নির্মূল করে পুরো খোরাসানে রাফেযিদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার অশুভ চিন্তা জেগে উঠে তাদের মনে। মাশহাদ তুস শহরে হাসান নামে রাফেযিদের এক শায়খ ছিলেন। রাফেযিরা তাকে খুবই সম্মান করত। এই শায়খও তাদের এই কুচিন্তার সঙ্গে একমত হয়। তারা এই শায়খকে খলিফা উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি রাফেযিদেরকে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করতে বললে তারা এমন ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে যে, কারো পকেট থেকে কোনো মুদ্রা পড়ে গেলে কেউ তা উঠিয়ে নিয়ে আত্মসাৎ করত না। মালিক এসে তা খুঁজে পেলে নিয়ে যেত। একপর্যায়ে তারা নিশাপুর শহরটিও দখল করে নেয়। সুলতান তুগাইতুমুর তাদের প্রতিরোধ করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করলে রাফেযিরা তাদেরকে পরাজিত করে। অতঃপর তিনি নিজের নায়েব আরগুন শাহকে প্রেরণ করলে তিনিও পরাজিত হন। রাফেযিরা তাকে বন্দি করে মুক্তিপণ দাবি করে। এরপর পঞ্চাশ হাজার তাতার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে সুলতান তুগাইতুমুর নিজেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নামেন। কিন্তু রাফেযিরা

তাকেও পরাজিত করে তার রাজত্ব দখল করে নেয়। সারাখস, জাওয়া ও তুস প্রভৃতি খোরাসানের বৃহৎ শহরগুলো চলে যায় তাদের নিয়ন্ত্রণে। মাশহাদ শহরে আলী ইবনে মুসার সমাধিতে তারা তাদের খলিফাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এরপর তারা জাম শহরটিও দখল করে নিয়ে হেরাতের উদ্দেশে অভিযান চালানোর জন্য জামের শহরতলীতে অবস্থান নেয়। জাম থেকে হেরাতের দূরত্ব ছিল ছয় দিনের সফর সমান। হেরাতের সুলতান হুসাইনের কাছে এই সংবাদ আসার পর তিনি রাজ্যের আমলা-মন্ত্রী, রাজন্যবর্গ, পরামর্শক, উপদেষ্টা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন। তিনি কি শহরে অবস্থান করে তাদের আগমনের অপেক্ষা করবেন নাকি শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাদের মুকাবিলা করবেন, এ বিষয়ে পরামর্শ কামনা করেন। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে এগিয়ে গিয়ে তাদের মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারা সকলেই ছিলেন একই গোত্রের লোক। তাদের গোত্রের নাম ছিল ঘাওরি বা ঘুরী। তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল শামের ঘাওর অঞ্চলের অধিবাসী। তারা সবাই মিলে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা একত্র হয়ে গঠন করেন বিশাল বাহিনী। বাদগিসের মরুঅঞ্চলের গ্রামীন জনপদে বসবাসকারী লোকেরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেন। হেরাত থেকে বাদগিসের দূরত্ব চার দিনের। তাদের অঞ্চলের চারণভূমিগুলো সবসময় সবুজাভ থাকে। এগুলোতে তারা তাদের গৃহপালিতে প্রাণী ও ঘোড়াগুলো চরিয়ে থাকে। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ জুড়েই রয়েছে পেস্তা গাছ। এখান থেকে ইরাকে পেস্তা রপ্তানি করা হয়। সিমনান[১] শহরের লোকেরাও হেরাতের বাহিনীর সমর্থনে এসে যোগ দেয়। অতঃপর সুলতান হুসাইনের নেতৃত্বে সবমিলিয়ে একলক্ষ বিশহাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের বাহিনী রাফেযিদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যায়। এদিকে রাফেযিদের বাহিনীতেও ছিল প্রায় দেড়লক্ষ অশ্বারোহী সৈনিক। বুশানজের মরুভূমিতে উভয়পক্ষ মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। উভয়পক্ষই অটল হয়ে লড়াই করে। কিন্তু এইবারে পরাজয় রাফেযিদের সঙ্গী হয়। তাদের সুলতান মাসউদ যায় পালিয়ে। এদিকে তাদের খলিফা হাসান বিশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে ময়দানে জমে থেকে লড়াই করতে করতে মারা যান। মারা যায় তার বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য। প্রায় চার হাজার সৈন্যকে করা হয় বন্দি। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক

---

[১] ইরানের একটি প্রদেশ। রাজধানী তেহরান থেকে ২১৬ কিলোমিটার পূর্বে ইরানের উত্তর-মধ্যাঞ্চলে এই প্রদেশের অবস্থান। –অনুবাদক



ব্যক্তির কাছে শুনেছি, যুদ্ধ শুরু হয়েছিল পূর্বাহ্নের সময় আর তারা পরাজিত হয়েছিল সূর্য হেলে পড়ার সময়। সুলতান হুসাইন যোহরের সময় তার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে নামায আদায় করেন। অতঃপর খাবার পরিবেশন করা হয়। একদিন যখন তিনি ও তার বিশিষ্ট সহচরগণ খাবার গ্রহণ করছিলেন, অপরদিকে তার অন্য সৈন্যরা বন্দিদের গর্দান ছিন্ন করছিল। বিশাল এই বিজয়ের পর সুলতান হুসাইন তার রাজধানীতে ফিরে আসেন। আল্লাহ তাআলা তার হাতে সুন্নাহকে করেছেন বিজয়ী। নিভিয়েছেন ফেতনার ঊর্ধ্বমুখী অগ্নিশিখা।

আমি হিন্দুস্তান থেকে চলে আসার পর ৭৪৬ হিজরিতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। নিজামুদ্দিন মাওলানা একজন দুনিয়াবিমুখ বুযুর্গ ব্যক্তি হেরাতে বেড়ে উঠেছিলেন। হেরাতের অধিবাসীদের কাছে তিনি ছিলেন অনেক প্রিয়। তার কথাকে প্রাধান্য দিতেন তারা। তিনি তাদেরকে ওয়াজ-নসিহত করতেন এবং তার কথা মান্য করেই হেরাতের অধিবাসী অসৎ কাজের প্রতিরোধ করতেন। এ ব্যাপারে শহরের খতিব মালিক ওয়ারনাও গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সুলতান হুসাইনের চাচাতো ভাই। সুলতানের পিতার বিধবা স্ত্রীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। দৈহিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই সুলতান হুসাইন তাকে নিয়ে বেশ আশঙ্কায় থাকতেন। এই আলোচনা সামনে করা হবে। হেরাতের অধিবাসীরা কোনো অসৎ কাজ বা অন্যায়ের কথা জানতে পারলেই তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতেন। এই অন্যায় যদি সুলতানের পক্ষ থেকে হতো, তাকেও তারা ছাড় দিতেন না।

একটি ঘটনা

শুনেছি, একবার হেরাতের লোকেরা সুলতানের প্রাসাদে ঘটে যাওয়া এক অন্যায়ের কথা জানতে পারে। তাই তারা একত্র হয়ে প্রতিবাদ জানাতে আসে। এদিকে সুলতান তাদের হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রাসাদের ভেতরেই ঘাপটি মেরে থাকেন। শহরের প্রায় ছয় হাজার লোক এসে প্রাসাদের ফটকে জড়ো হয় তখন। সুলতান তখন ভয় পেয়ে শহরের বিশিষ্ট ফকিহ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আসতে বলেন। সুলতানের অন্যায় ছিল, তিনি মদ পান করেছিলেন। ফলে প্রাসাদের অভ্যন্তরে তাকে মদপানের শাস্তি প্রদান করেই উপস্থিত জনতা সেখান থেকে ফিরে আসে।

ফকিহ নিজামুদ্দিনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা

হেরাতের পার্শ্ববর্তী মরু অঞ্চলে ছিল তুর্কিদের সাম্রাজ্য। তাদের সুলতান তুগাইতুমুর। যার কথা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সবমিলিয়ে তাদের জনসংখ্যা ছিল মোট পঞ্চাশ হাজার। সুলতান হুসাইন তাদের খুব সমীহ করতেন। প্রতি বছর তাদের জন্য উপহার উপঢৌকন পাঠিয়ে তাদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনা ছিল রাফেযিদেরকে হারানোর আগে। তবে রাফেযিদের হারানোর পর তিনি উলটো তাদের উপর প্রভাব জমিয়ে ফেলেন। এই তুর্কিরা প্রায়ই হেরাতে আসা-যাওয়া করত। মাঝেমধ্যে এখানে এসে মদ্যপানও করত। একবার তাদের একজন লোক মদ্যপ অবস্থায় শহরে বসে। ফকিহ নিজামুদ্দিন মাওলানা মদ্যপানকারীদের মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। এদিকে সেই তুর্কিরা ছিল বেশ শক্তিশালী ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। প্রায়ই তারা হিন্দুস্তান সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে হামলা করে হত্যা ও লুটতরাজ চালাত। বন্দী করে আনত নিরপরাধ লোকদেরকে। মাঝেমাঝে তারা হিন্দুস্তানের বিধর্মী অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিম নারীদেরকেও বন্দি করে নিয়ে আসত। তাদেরকে নিয়ে খোরাসান অতিক্রম করার সময় ফকিহ নিজামুদ্দিন তাদেরকে মুক্ত করে আনতেন। হিন্দুস্তানের মুসলিম মহিলাদের চেনার লক্ষণ ছিল তাদের কানে ছিদ্র করা হতো না। বিধর্মী মহিলাদের কানে ছিদ্র করা হতো। একবার তুমুর আলতি নামক তুর্কি এক আমির এক নারীকে বন্দি করে নিয়ে এসে তাকে খুব নির্যাতন করে। জানা যায়, সেই নারী ছিলেন মুসলিম। তখন ফকিহ নিজামুদ্দিন তাকে মুক্ত করে আনেন। এতে সেই তুর্কি আমির খুব খেপে গিয়ে একহাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে বের হয়ে বাদগিস অঞ্চলের চারণভূমিতে বিচরণ করা হেরাতের ঘোড়ার পালে হামলা চালিয়ে সেগুলো লুট করে নিয়ে যায়। হেরাতের অধিবাসীদের আরোহণ ও দুগ্ধদোহনের মতো কোনো পশুই তারা রেখে যায়নি। এগুলো নিয়ে তারা চলে যায় সেখানকার এক পর্বতে। যেখানে তাদেরকে দমন করা ছিল অসম্ভব। এদের হেরাতের সুলতান বা তার বাহিনী যে পিছু নিয়ে তাদের পাকড়াও করবে, সেই উপায়ও ছিল না। সব ঘোড়াই তারা নিয়ে গেছে। তখন সুলতান তাদের কাছে দূত প্রেরণ করে সকল গবাদিপশু ও ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে বলেন। মনে করিয়ে দেন তাদের মধ্যকার চুক্তির কথা। তুর্কিরা জবাবে জানায়, ফকিহ নিজামুদ্দিনকে তাদের হাতে হস্তান্তর না করলে তারা কিছুই ফেরত দিবে না। সুলতান বলেন, এটি

কিছুতেই সম্ভব নয়। শায়খ মাওদুদ আল জিস্তির পৌত্র শায়খ আবু আহমাদ আল জিস্তি ছিলেন খোরাসানের সম্মানিত ও বরেণ্য একজন বুযুর্গ আলেম। তার কথার কেউ অমান্য করত না। তিনি তার অনুচর ও ক্রীতদাসকে নিয়ে এসে বলেন, আমি ফকিহ নিজামুদ্দিনকে তাদের কাছে নিয়ে যাব। অতঃপর তাদের সঙ্গে সমঝোতা করে পুনরায় তাকে নিয়ে ফিরে আসব। তখন লোকেরা তার কথায় আস্থা রাখে। ফকিহ নিজামুদ্দিন তাদের সম্মতি দেখে শায়খ আবু আহমাদের সঙ্গে সেই তুর্কিদের কাছে যান। আমির তুমুর আলতি এগিয়ে এসে তাকে বলে, আপনার এত বড় সাহস, আমার বন্দি করে আনা নারীকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন? এই বলে সে তার হাতে থাকা লাঠি ফকিহ নিজামুদ্দিনের মাথায় আঘাত করে। এতে করে মস্তিষ্কে মারাত্মক আঘাত পেয়ে তিনি তখনই শায়খ আবু আহমাদের হাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে শহরে ফিরে আসেন। তুর্কিরা তাদের লুট করা গবাদিপশু ও ঘোড়ার পাল ফিরিয়ে দেয়।

এই ঘটনার কিছুদিন পর ফকিহ নিজামুদ্দিনকে হত্যাকারী সেই তুর্কি আমির হেরাতে আসে। তখন ফকিহ নিজামুদ্দিনের কিছু অনুসারী তাকে সালাম জানানোর ভান করে এগিয়ে গিয়ে তাদের পোশাকের নিচে লুকিয়ে রাখা তরবারির আঘাতে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়। তার অপর সঙ্গীরা পালিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচায়। এই ঘটনার পর সুলতান হুসাইন তার চাচাতো ভাই ও ফকিহ নিজামুদ্দিনের বন্ধু মালিক ওয়ারনাকে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানোর জন্য সিজিস্তানের সুলতানের কাছে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছানোর পর সুলতান হুসাইন তার কাছে খবর পাঠিয়ে জানায়, তিনি যেন সেখানেই অবস্থান করেন। আর কখনো হেরাতে ফিরে না যান। অতঃপর তিনি হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। সেখানে সিন্ধুর সিওয়াসিতান শহরের বাইরে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি ছিলেন সম্মানিত একজন ব্যক্তি। নেতৃত্ব, শিকার, মল্লযুদ্ধ, অশ্বারোহণ, দাস-দাসী ও সঙ্গীদের মাধ্যমে পরিবেষ্টিত হওয়া ও রাজকীয় অভিজাত পোশাক পরিধান ইত্যাদি বিষয় তার স্বভাবে মিশে ছিল। এমন লোকদের জন্য হিন্দুস্তানের পরিবেশ উপযুক্ত নয়। হিন্দুস্তানের সুলতান তাকে ছোট একটি শহরের গভর্নর নিয়োজিত করেছিলেন। সেখানে এক দাসীর কারণে হিন্দুস্তানে বসবাসকারী হেরাতের এক অধিবাসী তাকে হত্যা করে ফেলে। এমনও শুনা যায় যে, সুলতান হুসাইনের প্ররোচনায় হিন্দুস্তানের সুলতানই তাকে হত্যা করার জন্য

লোক নিয়োগ করেছিলেন। এই কারণে মালিক ওয়ারনার মৃত্যুরপর সুলতান হুসাইন হিন্দুস্তানের সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। বিনিময়ে হিন্দুস্তানের সুলতান তাকে উপহার-উপঢৌকন এবং সিন্ধুর বিকার শহরের নিয়ন্ত্রণ প্রদান করেছিলেন। সেখান থেকে বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার দিনার কর পাওয়া যেত।

(সফরের বিবরণে ফিরে আসি) হেরাত সফর শেষে আমরা জাম শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। এটি মাঝারি আয়তনের, বাগান, গাছপালা এবং অনেক নদীনালা ও ঝরনাবিশিষ্ট সুন্দর একটি শহর। এখানকার গাছপালার অধিকাংশই ছিল তুত বা মালবেরি গাছ। প্রচুর পরিমাণ রেশমও উৎপন্ন হয় এখানে। প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও আল্লাহর ওলি শিহাবুদ্দিন আহমাদ আল জামির দিকে এই শহরকে সম্বন্ধ করা হয়। তার ঘটনা সামনে উল্লেখ করা হবে। হিন্দুস্তানের সুলতানের নির্দেশে হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া শায়খ আহমাদ ছিলেন তারই পৌত্র, যিনি শায়খজাদা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বর্তমানে তার বংশধররাই জাম শহর শাসন করে। সুলতানের পক্ষ থেকে তাদের কর রহিত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে তারা অনেক সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে শুনেছি, ইরাকের সুলতান আবু সাঈদ একবার খোরাসান এসে এই শহরের শায়খের খানকায় অবস্থান করেছিলেন। শায়খ তার সম্মানে বিশাল আতিথেয়তার আয়োজন করেছিলেন। সুলতানের বহরের প্রতিটি তাঁবুতে তিনি একটি করে ভেড়া দিয়েছিলেন। প্রতি চারজন ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ করেছিলেন আরো একটি ভেড়া। এমনিভাবে সুলতানের বহরের প্রতিটি ঘোড়া ও গাধার জন্যও সেই রাতের ঘাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার বহরের একটি প্রাণীও তার আতিথেয়তা থেকে বঞ্চিত ছিল না।

শায়খ শিহাবুদ্দিন আল জামির ঘটনা

জানা যায়, যুবক বয়সে তিনি ছিলেন আরামপ্রিয় একজন মানুষ। অধিক পরিমাণে মদ্যপান করতেন। তার ছিল প্রায় ষাটজনের মতো সহচর। দু মাস পরপর প্রতি একজনের কাঁধে আসত মদ্যপানের খরচ। এভাবে চলতে চলতে একদিন শায়খ শিহাবুদ্দিনের পালা আসে। ঘটনাক্রমে তিনি সেই রাতেই তাওবা করে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতি দৃঢ় সংকল্প করেন। মনে মনে বলেন, যদি সঙ্গীরা এখানে আসার আগেই

তাদেরকে আমার তাওবার কথা বলি, তাহলে ভাববে আমি তাদের মদ্যপানের খরচ মেটাতে অক্ষম। তাই তিনি আগের মতোই খাবার ও মদ্যপানের আয়োজন করেন। সঙ্গীরা এসে মদ্যপানের জন্য মদের বোতল খোলে নেয়। তাদের একজন সেই মদ পান করলে মিষ্টি স্বাদ অনুভব করে। তখন দ্বিতীয় আরেকটি বোতল খুলে পান করলে সেটিতেও মিষ্টি স্বাদ অনুভূত হয়। তৃতীয় বোতলেরও ছিল একই অবস্থা। এ নিয়ে তারা শায়খ শিহাবুদ্দিনের কাছে জানতে চাইলে তিনি তাদের কাছে নিজের প্রকৃত অবস্থা, ভেতরের চিন্তা ও তাওবার কথা প্রকাশ করেন। তাদেরকে বলেন, তোমরা আগে যে মদ পান করতে, এগুলো ছিল সেই একই মদ। কিন্তু আল্লাহ তাআলাই স্বাদ পালটে দিয়েছেন। তখন তারা সবাই আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করে নেয় এবং এই শহরের খানকাটি নির্মাণ করে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে নিজেদেরকে নিবেদিত করে। এই শায়খের কাছ থেকে অনেক কারামাত ও অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল।

জাম শহর থেকে আমরা তুস শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। যা খোরাসানের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শহর। জগদ্বিখ্যাত আলেম আবু হামিদ আল গাজালি রহ. এই শহরেরই সন্তান। এখানেই তিনি সমাহিত হয়েছেন। তুস থেকে যাত্রা করি মাশহাদ শহরে। এখানে সমাহিত হয়েছেন আলী রা.-এর বংশধর আলী ইবনে মুসা আল আজিম। মাশহাদ অর্থ সমাধি। তার সমাধিকে কেন্দ্র করেই এই শহরের নাম হয়েছে মাশহাদ। এই শহরটিও বেশ বড় ও জমজমাট। এখানে রয়েছে অনেক ফলমূল, নদীনালা ও শস্য উৎপাদন ক্ষেত্র। এখানে বসবাস করতেন তাহির মুহাম্মাদ শাহ। মিসর, শাম ও ইরাক অঞ্চলের মানুষরা যাকে নকিব বলে থাকে, এই শহরের লোকেরা তাকে তাহির বলে। আর হিন্দুস্তান, সিন্ধু ও তুর্কিস্তানে তাকে ডাকা হয় 'আস সাইয়িদুল আজাল্ল' নামে। কাজি জালালুদ্দিনও এখানে অবস্থান করতেন। তার সঙ্গে হিন্দুস্তানে দেখা হয়েছিল। আরো দেখা হয়েছিল শরিফ আলী ও তার দুই পুত্র আমির হিন্দু ও দৌলত শাহের সঙ্গে। তারা তিরমিয থেকে হিন্দুস্তানের উদ্দেশে যাত্রায় আমাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। তারা সবাই ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি। আলী রেজা রহ.-এর সমাধির অবস্থান একটি খানকার ভেতরে। সমাধির ঠিক উপরে নির্মাণ করা হয়েছে বিশাল একটি গম্বুজ। এর পাশেই রয়েছে একটি মসজিদ ও মাদরাসা। সবগুলোর স্থাপনাই অনেক জাঁকজমকপূর্ণ। এগুলোর দেয়ালে ছিল কাশানি কারুকার্যের কাজ। কবরের

উপরে ছিল রূপার প্রান্তযুক্ত কাঠের তৈরি খাঁচা। এর উপরে ছিল রূপার তৈরি কিছু বাতি। গম্বুজকক্ষের দরজার চৌকাঠ ছিল রূপার। দরজায় ঝুলানো ছিল স্বর্ণখচিত রেশমি কাপড়ের পর্দা। আর মেঝেতে বিছানো ছিল বিভিন্ন ধরনের গালিচা। এই কবরের পাশেই ছিল খলিফা হারুনুর রশিদের কবর। তার কবরের উপরেও ছিল একটি খাঁচা। যেটির উপর শামদান বা মোমদানি রাখা হতো। রাফেযিরা এই সমাধিতে গিয়ে খলিফা হারুনুর রশিদের কবরে লাথি দিত আর আলী রেজাকে সালাম জানাত।

অতঃপর আমরা সারাখস শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। প্রসিদ্ধ বুযুর্গ লোকমান আস সারাখসির নামে এই শহরটি পরিচিত। তারপর চলে যাই জাওয়া শহরে। এটি হায়দারিয়্যাহ সুফিদলের প্রবর্তক বুযুর্গ শায়খ কুতুবুদ্দিন হায়দারের শহর। তার অনুসারীরাই হাতে, গলায় ও কানে লোহার রিং পরিধান করে। এমনকি যৌনাঙ্গেও তারা এই রিং ব্যবহার করে। ফলে তারা বিবাহ করতে পারে না। এখান থেকে যাত্রা করে চলে যাই নিশাপুর শহরে। যেটি খোরাসানের বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ চার শহরের মাঝে অন্যতম। এখানকার প্রচুর ফলমূল, বাগান, নদীনালা ও ঝরনাধারার আধিক্য এবং সৌন্দর্যের কারণে এই শহরকে বলা হয় ছোট দামেস্ক। শহরের বুক চিড়ে বয়ে গেছে চারটি নদী। বাজারগুলোও বেশ সুন্দর, পরিপাটি ও প্রশান্ত। শহরের মসজিদটি অদ্বিতীয়। বাজারের মাঝে এর অবস্থান। মসজিদের পাশেই রয়েছে চারটি মাদরাসা। যেগুলোতে রয়েছে পানি প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা। বিপুল পরিমাণ ছাত্র এই মাদরাসায় কুরআন, ফিকহ ও ইলমে দীনের জ্ঞান অর্জন করে। খোরাসান অঞ্চলের মধ্যে এই মাদরাসাটিই সবচেয়ে চমৎকার। তবে খোরাসান, ইরাক, দামেস্ক, বাগদাদ ও মিসর প্রভৃতি শহরে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোও যত মজবুত আর সুন্দরই হোক না কেন, আমাদের মাগরিব অঞ্চলের মহৎ ও ন্যায়পরায়ণ সুলতান আবু আন্নানের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার সঙ্গে এগুলোর কোনো তুলনাই হতে পারে না। তার সাম্রাজ্যের রাজধানী ফেজের দুর্গবেষ্টিত এলাকায় এই মাদরাসার অবস্থান। প্রশস্ততা, উচ্চতা ও চুনাপাথরের কারুকার্যের দিক দিয়ে এই স্থাপত্য বিশ্বের বুকে অদ্বিতীয়। এমন নিপুণ ও নিখুঁত কারুকার্য সম্পর্কে প্রাচ্যের মানুষের কোনো ধারণাই নেই। নিশাপুরে নাখ ও কামখা প্রভৃতি রেশমি কাপড় তৈরি করে হিন্দুস্তানে রপ্তানি করা হয়। প্রসিদ্ধ নেককার বুযুর্গ ও ওয়ায়েজ শায়খ কুতুবুদ্দিন আন নাইসাবুরির খানকা এই শহরে অবস্থিত।

আমরা এই শায়খের কাছে অবস্থান গ্রহণ করি। তিনি আমাদের অনেক খাতির-যত্ন করেন এবং উত্তম আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। আমরা তার বেশ কিছু আশ্চর্য গুণ ও কারামাত প্রত্যক্ষ করি।

তার একটি কারামত

নিশাপুরে এসে আমি একটি তুর্কি দাস কিনেছিলাম। শায়খ কুতুবুদ্দিন সেই দাসকে আমার সঙ্গে দেখে বলেন, এই দাস আপনার জন্য উপযুক্ত নয়। তাই একে বিক্রি করে দিন। আমি বললাম, অবশ্যই। পরদিনই আমি সেই দাসটি বিক্রি করে দেই। এক ব্যবসায়ী তাকে ক্রয় করে নিয়ে যায়। এরপর আমি শায়খ কুতুবুদ্দিনকে বিদায় জানিয়ে পরবর্তী গন্তব্যের পথ ধরি। বিসতাম শহরে পৌঁছানোর পর নিশাপুরে অবস্থানরত একসঙ্গীর কাছে থেকে প্রেরিত চিঠি হস্তগত হয়। সে জানায়, সেই দাসটি কোনো এক তুর্কির ছেলেকে হত্যা করেছে। ফলে তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এই ঘটনা থেকে শায়খ কুতুবুদ্দিনের স্পষ্ট কারামত প্রকাশ পায়।

নিশাপুর থেকে বিদায় নিয়ে আমি যাত্রা করি বিসতাম শহরে উদ্দেশে। যা প্রসিদ্ধ আল্লাহর ওলি ও বুযুর্গ আবু ইয়াজিদ আল বিসতামির[১] নামে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করেছে। এখানেই রয়েছে তার সমাধি। একই গম্বুজের নিচে তার কবরের পাশেই রয়েছে জাফর সাদিক রহ.-এর এক সন্তানের কবর। আরেক বুযুর্গ ও আল্লাহর ওলি শায়খ আবুল হাসান আল খারকানিও সমাহিত হয়েছেন এই শহরে। বিসতামে এসে শায়খ আবু ইয়াজিদ আল বিসতামি রহ.-এর সমাধি সংলগ্ন খানকায় অবস্থান করি।

অতঃপর বিসতাম থেকে বিদায় নিয়ে হিন্দুখিরের পথ ধরে কুন্দুজ ও বাগলান[২] শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। এখানে অনেক জনপদের অবস্থান। যেখানে অনেক বুযুর্গ ও নেককার লোক বাস করেন। আরো আছে অনেক বাগান-উদ্যান ও নদীনালার সমাহার। কুন্দুজে নেমে নদীর তীরে নির্মিত

---

[১] ভারত উপমহাদেশে তিনি বায়েজিদ বোস্তামি নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। এটি ভুল উচ্চারণ। তার প্রকৃত নাম আবু ইয়াজিদ আল বিসতামি। যেমনটি ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন। তার পুরো নাম আবু ইয়াজিদ তাইফুর ইবনে ইসা ইবনে সারুসান আল বিসতামি। জন্ম ১৮৮ হিজরিতে আর মৃত্যু ২৬১ হিজরিতে। ইরানের সিমনান প্রদেশের বিসতাম শহরে তার জন্ম। –অনুবাদক

[২] কুন্দুজ ও বাগলান শহরের অবস্থান বর্তমান আফগানিস্তানে। –অনুবাদক

মিসর থেকে আগত এক শায়খের খানকায় আমরা অবস্থান করি। তার নাম ছিল শের সিয়াহ। এর অর্থ হয় কালো সিংহ। এখানকার গভর্নর বিশাল এক বাগানে আমাদের মেহমানদারির আয়োজন করেন। তিনি মূলত ছিলেন মসুলের বাসিন্দা।

উট ও ঘোড়া চরানোর জন্য আমরা কুন্দুজের গ্রামগুলোর বাইরে চল্লিশ দিনের মতো অবস্থান করি। এখানকার চারণভূমিতে ছিল অনেক ঘাস। আমির বুরুনতাইহের কঠোর শাসনের কারণে নিরাপত্তা নিয়েও ছিল না কোনো চিন্তা। আগেই উল্লেখ করেছি, ঘোড়া চুরির ক্ষেত্রে তুর্কিদের বিধান হচ্ছে, কেউ একটি ঘোড়া চুরি করলে জরিমানা হিসেবে আরো নয়টি ঘোড়া দিতে হবে। যদি তার সেই সামর্থ্য না থাকে তাহলে তার ছেলে-মেয়েকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার সন্তানও না থাকে, তাহলে তাকে গরু-ছাগলের মতো জবাই করে হত্যা করা হবে।

তাই এই চারণভূমিতে লোকেরা তাদের গবাদিপশু ও বাহনজন্তুকে কোনো রাখাল ছাড়াই ছেড়ে দিত। সেগুলো হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার পরই এখান থেকে পরবর্তী গন্তব্যের পথ ধরত। আমরাও এই অঞ্চলে এসে এর ব্যতিক্রম করিনি। কিন্তু কুন্দুজে অবতরণের দশদিন পর হঠাৎ আমাদের পাল থেকে তিনটি ঘোড়া হারিয়ে যায়।

অর্ধমাস অতিবাহিত হওয়ার পর কিছু তাতার শাস্তি পাওয়ার ভয়ে সেগুলো নিয়ে এসে আমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। প্রতি রাতেই আমাদের তাঁবুগুলোর পাশে আমরা দুইটি ঘোড়া বেঁধে রাখতাম। যেন রাতের বেলায় আকস্মিক কোনো ঘটনা ঘটলে দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায়। একরাতে আমাদের সেই দুটি ঘোড়া হারিয়ে যায়। এরপর আমরা সেখান থেকে যাত্রা করে পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশে সফর শুরু করে দেই। বাইশদিন পর তারা আমাদের যাত্রাপথে এসে সেই ঘোড়া দুটি ফিরিয়ে দিয়ে যায়। আমাদের অবস্থানের আরো একটি কারণ ছিল তুষারপাত। কারণ, এইপথে হিন্দুকুশ নামক একটি পর্বতমালা রয়েছে। হিন্দুকুশ শব্দের অর্থ হিন্দুদের ঘাতক। এই নামকরণের কারণ হচ্ছে হিন্দুস্তান থেকে এইপথে সফর করার তীব্র ঠান্ডা ও অত্যধিক তুষারপাতের কারণে এখানে এসে অনেকেই মৃত্যুবরণ করে। এই পর্বতমালা পাড়ি দিতে লেগে যায় পুরো একদিন। তাই গ্রীষ্মকালের জন্য আমরা অপেক্ষা করেছিলাম। দিনের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত এই পর্বতের বুক

চিড়ে সফর করার পর অবশেষে রাতের শেষভাগে এটি অতিক্রম করেছিলাম। উটের সম্মুখে আমরা চামড়া বিছিয়ে দিতাম। যাতে করে সেই চামড়ার উপর পা রাখে এবং বরফে পিছলে না পড়ে যায়।

কুন্দুজ থেকে যাত্রা করে আমরা আনদার[১] নামক একটি স্থানে এসে উপনীত হই। পূর্বে এখানে শহর ছিল। বর্তমানে এর কোনো চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। এখানে বড় একটি পল্লীতে মুহাম্মাদ আল হিরাভি নামক এক সম্মানিত শায়খের খানকায় আমরা অবস্থান গ্রহণ করি। তিনি আমাদের বেশ খাতির-যত্ন করেন। আমাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ও বরকত লাভের আশায় তিনি খাবার শেষে আমাদের হাত ধোয়ার পানিও পান করেছিলেন। আমাদের সঙ্গে সফর করে তিনি হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন।

এই পর্বতমালায় আমরা একটি গরম পানি ঝরনা খুঁজে পাই। সেই পানিতে চেহারা ধৌত করতে গেলে আমাদের চামড়া পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। খুব জ্বালাপোড়া করতে থাকে। অতঃপর আমরা এসে উপনীত হই বাঞ্জহির (পাঞ্জশির) নামক স্থানে। বাঞ্জ শব্দের অর্থ হচ্ছে পাঁচ, আর হির শব্দের অর্থ হচ্ছে পাহাড়। এর অর্থ দাঁড়ায় পাঁচটি পাহাড়। পূর্বে এখানে নীলরঙা স্বচ্ছ পানিবিশিষ্ট সাগরের মতো বড় একটি নদীর তীরে বিপুল বাড়িঘরবিশিষ্ট চমৎকার একটি শহর গড়ে উঠেছিল। এই নদীকে দেখে মনে হতো বাদাখশানের পাহাড় থেকে যেন কোনো সমুদ্র নেমে এসেছে।[২] এই পাহাড়েই পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ ইয়াকুত পাথর। যা বালাখশ নামে পরিচিত। তাতার সম্রাট অভিশপ্ত চেঙ্গিজ খান ছবির মতো সুন্দর এই শহরটিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এরপর শহরটিকে আর আবাদ করা হয়নি। এই শহরে শায়খ সাঈদ আল মাক্কির মাজার তথা সমাধি রয়েছে। এখানকার অধিকারী তাকে খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

এরপর আমরা পৌঁছাই বাশাই পাহাড়ে। এখানে শায়খ আতা আউলিয়া নামক বুযুর্গের খানকা রয়েছে। আতা শব্দটি তুর্কি ভাষার। এর অর্থ পিতা। আর আউলিয়া শব্দটি আরবি। আতা আউলিয়া শব্দের অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর ওলিদের পিতা। তাকে সিছাদ ছালা নামেও ডাকা হয়। ফারসি সিছাদ শব্দের

---

[১] বর্তমান নাম আনদারব। আফগানিস্তানের দুর্গম পাহাড়ি এলাকা পাঞ্জশিরে এর অবস্থান। –অনুবাদক

[২] এখানে পাঞ্জশির নদীর কথা বলা হচ্ছে। যা কাবুল নদীর প্রধানতম শাখা। –অনুবাদক

অর্থ হচ্ছে তিনশ। আর ছালা শব্দের অর্থ হচ্ছে বয়স। কথিত আছে, এই শায়খের বয়স তিনশ পঞ্চাশ বছর। এখানকার লোকেরা তাকে খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। দূরদূরান্ত থেকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য লোকেরা এসে ভিড় জমায়। এমনকি অনেক সুলতান, তাদের স্ত্রী ও সম্ভ্রান্ত নারীরাও আসেন। তিনি আমাদের বেশ সম্মান-সমাদর ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। নদীর তীরে নির্মিত তার খানকায় আমরা অবস্থান করেছিলাম। তার কাছে গিয়ে সালাম জানাতেই তিনি আমার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। তার শরীর ছিল খুবই নরম ও মসৃণ। এত নরম শরীর আমি আগে কখনো দেখিনি। তাকে দেখে মনে হবে তার বয়স কিছুতেই পঞ্চাশের বেশি হবে না। জানা যায়, প্রতি একশ বছরে তার নতুন করে চুল ও দাঁত গজায়। প্রসিদ্ধ আলেম আবু রুহমকেও নাকি তিনি দেখেছেন। সিন্ধুর মুলতানে যার সমাধি রয়েছে। আমি তখন শায়খকে বলি তার কাছ থেকে শ্রবণকৃত কিছু হাদীস বর্ণনা করতে। তিনি কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন। যেগুলোর সত্যতা নিয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

অতঃপর আমরা চলে যাই পারওয়ানে। সেখানে সাক্ষাৎ ঘটে গভর্নর বুরনাতাইহের সঙ্গে। তিনি আমাকে বেশ সম্মান করেন ও বেশ আন্তরিক ব্যবহার করেন। গজনি শহরে নিয়োজিত তার নায়েবকে লিখে দিয়েছিলেন, যেন আমার যথাযথ খাতিরদারি করা হয়। এই কথা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর বিশাল দেহ ও শক্তিমত্তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তার সাহচর্যে খানকায় অবস্থানকারী অনেক বুযুর্গ ও নেককার সুফিগণ অবস্থান করতেন।

এরপর উপনীত হই জারখ নামক বড় একটি পল্লীতে। এখানে রয়েছে অনেক বাগান। এখানকার ফলমূল বেশ উৎকৃষ্ট। গ্রীষ্মের সময় আমরা এখানে এসে পৌঁছাই। দেখা হয় একদল ছাত্র ও সুফির সঙ্গে। আমরা এখানে জুমার আদায় করি। এই পল্লীর সর্দার মুহাম্মাদ আল জারখি আমাদের আতিথেয়তার আয়োজন করেন। পরে হিন্দুস্তানে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

জারখ থেকে বিদায় নিয়ে পৌঁছাই বীর মুজাহিদ সুলতান মাহমুদ গজনবীর নামে প্রসিদ্ধ গজনি শহরে। তিনি ছিলেন প্রতাপশালী ও মহান একজন সুলতান। তার উপাধি ছিল ইয়ামিনুদ্দৌলা। হিন্দুস্তানে তিনি অনেকবার



জিহাদ করে সেখানকার অনেক শহর ও দুর্গ বিজিত করেছেন। গজনি শহরে তার সমাধি রয়েছে। সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে একটি খানকা। এই শহরটি অধিকাংশই এখন বিরান পড়ে আছে। সামান্য অংশেই জনপদের আবাস। কিন্তু পূর্বে এটি ছিল বিশাল এক শহর। এই শহরে তীব্র তুষারপাত হয়। শীতের সময় এখানকার লোকেরা কান্দাহার শহরে চলে যায়। কান্দাহার শহরটি খুব বড় আর উর্বর। অবশ্য আমি সেখানে যেতে পারিনি। গজনি থেকে কান্দাহারের দূরত্ব তিন দিনের। গজনির শহরতলীতে দুর্গের পাদদেশে নদীর তীরে আবাদকৃত একটি গ্রামে আমরা অবস্থান গ্রহণ করি। শহরের গভর্নর মারজাক আগা আমাদের অত্যন্ত সম্মানের সাথে আমন্ত্রণ জানান ও বেশ খাতির-যত্ন করেন। মারজাক শব্দের অর্থ ছোট আর আগা শব্দের অর্থ হচ্ছে বড় ও মূল।

এরপর পৌঁছাই কাবুল শহরে। পূর্বে এটি ছিল বিশাল এক শহর। কিন্তু বর্তমানে এখানে একটি গ্রামেও আফগান নামক অনারব একদল লোকের বসবাস। তারা বেশ শক্তিসামর্থ্যের অধিকারী। অনেক পাহাড় ও উপত্যকা তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাদের অধিকাংশই ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের সবচেয়ে বড় পাহাড়টির নাম কোহে সুলাইমান। কথিত আছে, আল্লাহর নবী সুলাইমান আ. এই পাহাড়ে আরোহণ করে হিন্দুস্তানের দিকে তাকিয়েছিলেন। তখন হিন্দুস্তান ছিল কুচকুচে আঁধারে ঢাকা। তাই তিনি সেখানে প্রবেশ করেননি। তার নামেই এই পাহাড়ের নামকরণ করা হয়েছে। আফগানদের রাজা এই পাহাড়ে বাস করেন। কাবুলে শায়খ ইসমাইল আল আফগানির খানকা রয়েছে। তিনি বিশিষ্ট আল্লাহর ওলি ও বুযুর্গ শায়খ আব্বাসের শিষ্য।

কাবুল থেকে যাত্রা করে চলে যাই কারমাশে। এটি মূলত আফগানদের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন দুটি পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত একটি দুর্গ। এখান দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। তারা ছিল পাহাড়ের উপরে আর আমরা ছিলাম নিচে। আমরা তাদের দিকে তির ছুড়ে মারলে তারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। আমাদের কাফেলায় ছিল খুবই অল্প লোক। আর তাদের সঙ্গে ছিল প্রায় চার হাজারের মতো ঘোড়া। এই ঝামেলার কারণে আমার একটি কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমার সঙ্গে তখন আফগান কিছু লোকও ছিল। আমাদের সঙ্গে থাকা কিছু পাথেয়

এবং পথে ক্লান্ত হয়ে পড়া বেশ কিছু উটের বোঝা আমরা এখানে রাখি। পরদিন আমাদের ঘোড়াগুলো ফিরে এলে সেগুলোর পিঠে এই বোঝাগুলো উঠিয়ে দেই। ইশার নামাযের সময় আমরা কাফেলার অবশিষ্ট লোকদের কাছে পৌঁছাই। রাত্রিযাপন করি শাশানগড়ে। এটিই তুর্কি অধ্যুষিত অঞ্চলের সর্বশেষ সীমান্ত।

শাশানগড় থেকে যাত্রা করে আমরা প্রবেশ করি বৃহৎ একটি মরুভূমির মাঝে। এটি অতিক্রম করতে পনেরো দিন সময় লাগে। সিন্ধু ও হিন্দুস্তানে বৃষ্টিপাত হওয়ার পরবর্তী মৌসুমেই কেবল এই পথ দিয়ে যাত্রা করা যায়। জুলাই মাসের শুরুতে এই সময়টা শুরু হয়। এই মরুভূমিতে বিধ্বংসী সাইমুম মরুঝড় সৃষ্টি হয়। যা মানুষের দেহকে পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। এমনকি ঝড়ের কবলে পড়ে কারো মৃত্যু হলে তার দেহ ফুলে ফেঁপে পচন ধরে যায়। পূর্বে উল্লেখ করেছি, হুরমুজ ও সিরাজ শহরের মধ্যবর্তী মরুপথেও এই ঝড় সৃষ্টি হয়। আমাদের আগে একদল বিশিষ্ট ব্যক্তির কাফেলা এই পথে সফর করেছিল। তাদের মধ্যে তিরমিযের বিচারক খোদাওয়ান্দজাদাও ছিলেন। সাইমুমের কবলে পড়ে তাদের অনেক উট ও ঘোড়া বিনষ্ট হয়ে যায়।

অবশেষে আমাদের কাফেলা নিরাপদে বাঞ্জআবে (পাঞ্জাবে) পৌঁছুতে সক্ষম হয়। এটি সিন্ধুর জলাভূমির অঞ্চল। বাঞ্জ মানে পাঁচ। আর আব মানে পানি। এর অর্থ দাঁড়ায় পাঁচটি নদী। এই পাঁচটি নদী মিলে বড় একটি নদীতে প্রবাহিত হয়ে পুরো অঞ্চলে পানি সরবরাহ করে। সামনে এর আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। যিলহজ মাসের শেষদিনে আমরা পাঞ্জাবের এই নদীতে এসে পৌঁছাই। সে রাতেই আমাদের মাথার উপর উঁকি দেয় ৭৩৪ হিজরি বর্ষের নবাগত চাঁদ। এখানকার তথ্যসংগ্রহকারীগণ আমাদের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করে হিন্দুস্তানের সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এখানেই আমার এই সফরের আলোচনা সমাপ্ত হচ্ছে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত। পরেই আসছে দ্বিতীয় খণ্ড।

মাহদি হাসান

পিতা: আবুল কাসেম মুন্সি

মাতা: মোসাম্মৎ মাজেদা বেগম

১৯৯৬ সালের ২৫শে আগস্ট, মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানাধীন লতব্দী ইউনিয়নের পুরান ভাসান চর গ্রামে তার জন্ম।

প্রাথমিক পড়াশোনা করেছেন নিজ গ্রামের দীনি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত আল-মাদানিয়া কেরাতুল কুরআন মাদরাসায়। উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হন মুন্সিগঞ্জের প্রাচীন দীনি বিদ্যাপীঠ আল-জামিআতুল ইসলামিয়া মুস্তফাগঞ্জে। এখানেই কিতাবখানার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষাজীবন কেটেছে তার। তাকমিল সমাপ্ত করার পর এখানেই তিনি তাখাসসুস ফি তাফসিরিল কুরআন সম্পন্ন করেন। তারপর ঢাকার প্রসিদ্ধ দীনি বিদ্যাপীঠ জামিআ রাহমানিয়ায় তাখাসসুস ফি উলুমিল হাদিসে ভর্তি হয়ে কিছুদিন পড়াশোনা করেন।

এরপর থেকেই শুরু হয় তার লেখালেখি ও বই প্রকাশিত হওয়ার পথচলা। রিহলাহ ইবনে জুবাইর তার অনুবাদে প্রকাশিত তেরোতম বই। আরও কিছু বই আছে প্রকাশের অপেক্ষায়। আর তার সম্পাদনা ও নিরীক্ষণ মিলিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আরও পনেরোটির মতো বই।

ulazhar.com

ভ্রমণসাহিত্যের ইতিহাসে ইবনে বতুতা নিরেট একটি নাম নয়; একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস। হিজরি সপ্তম শতাব্দীর এই ভ্রমণপিয়াসী পরিব্রাজক তার যৌবনের পুরো ত্রিশটা বছর পৃথিবীর পথে পথে কাটিয়ে দিয়েছেন। উত্তর মরক্কো থেকে যাত্রা শুরু করে একে একে দেখেছেন উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ আরব, পশ্চিম আফ্রিকা, পারস্য, ইউরোপের একাংশ, খাওয়ারিজম, বুখারা, আফগান, হিন্দুস্তান, বাংলা ও চীন।

৭২৫ হিজরিতে তার সেই বিশ্বভ্রমণ শুরু হয়। অবিশ্রান্ত ভ্রমণ শেষে তিনি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, তখন ক্যালেন্ডারের পাতায় ৭৫৪ হিজরি। তার সেই ভ্রমণকাহিনি পরবর্তীকালে বই আকারে সংকলিত হয়। এই সংকলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো,

* তিনি যাত্রাপথের প্রতিটি জনপদের ভালো-মন্দ তুলে ধরেছেন। প্রকৃতি ও আবহাওয়ার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিবরণ পেশ করেছেন। সেখানকার বিচার-সালিশ ব্যবস্থার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি ধর্মচর্চার প্রকৃত চিত্রও তুলে ধরেছেন।
* তিনি সেসময়ের বিভিন্ন রাজ্যের শাসক, গভর্নর ও বিচারপতিদের আচার-আচরণ, বদান্যতা-কার্পণ্য, নৈতিকতা ও অসততার সার্বিক চিত্র তুলে ধরেছেন।
* আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি প্রতিটি নগরীর ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক মর্যাদা এবং সেখানকার বিখ্যাত মনীষীদের সংক্ষিপ্ত জীবনীর ওপরও আলোকপাত করেছেন।

যার ফলে ধর্মচর্চা, ইতিহাস, ভূগোল, সামাজিকতা ও রাষ্ট্রপরিচালনা-সর্বদিক বিবেচনায় তার এই ভ্রমণকাহিনি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এই আয়োজন মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্যেই দরকারি।